



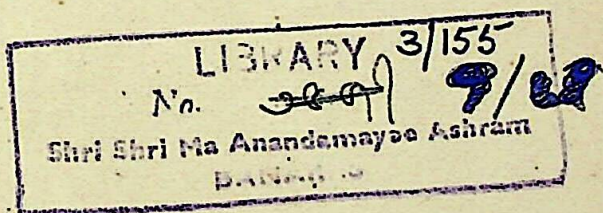
35

3/155-

7/88

9/24

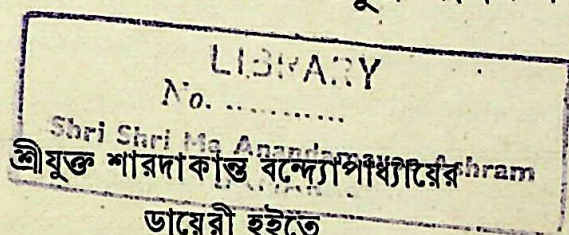
3/155-



আচার্য-প্রসঙ্গ

শ্রীমদাচার্য

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর জীবন-কথা



শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত

প্রকাশক—শ্রীগৌরানন্দমুন্দর তা

২০, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, বড়বাজার
কলিকাতা

মহাষ্টমী—১৩৫০

দুই টাকা চারি আনা

প্রথম সংস্করণ—১৩৩২ সাল

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫০ সাল—১১০০

প্রিন্টার—শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

All rights reserved

For The Thakurbari Committee, Puri

3/155-

৭/১১

নিবেদন

আমার পরম পূজনীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত শারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বি-এ পাশ করিয়া গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। নানা অসুবিধা হেতু এম-এ ও আইন পাঠ শেষ করিয়াও তিনি পরীক্ষা না দিয়া চাকুরী করিতে বাধ্য হন এবং জামালপুর এন্ট্রেন্স স্কুলে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। ভগবৎ ইচ্ছায় অধিক দিন তিনি এই কার্য করিতে পারিলেন না; মস্তিষ্ক-রোগে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় তাঁহাকে চিত্ত প্রফুল্ল রাখিয়া পরিশ্রমসাধ্য কার্যে নিযুক্ত থাকিবার উপদেশ দেন। আমার সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার ৬হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও, ছোটদাদার রোগের কথা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে চাকুরী ত্যাগ করিতে বলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর হইতেই ঠাকুরের সেবা-সম্বের আকাঙ্ক্ষা ছোটদাদার অতিশয় বলবতী হয়। তাঁহার আগ্রহের কথা ঠাকুরকে নিবেদন করায়, তিনি দয়া করিয়া ছোটদাদাকে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে অনুমতি দেন। সেই সময় হইতে ছোটদাদা ঠাকুরের অবিচ্ছেদ-সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার দেহাবসান পর্য্যন্ত প্রফুল্লমনে অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবাকার্য্য সম্পন্ন করেন। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর দেহ সমাধিস্থ হইলে অত্যাধি ছোটদাদা সেবায়েৎ থাকিয়া সমাধি-মন্দিরে সেবা পূজাদি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

ঠাকুরের সঙ্গলাভ কালে ও তৎপরে বিশিষ্ট গুরুভ্রাতাদের মুখে তাঁহার অসাধারণ অবস্থা এবং কৃপার কথা শুনিয়া ছোটদাদা লিপিবদ্ধ করিয়া

রাখিয়াছিলেন। তিনি ৮পূরীধামে ঠাকুরের অবস্থানকালে শেষ ছয় সাত মাস প্রত্যহ তাঁহার অত্যন্ত কার্যাবলী লিখিয়া রাখিতেন। এই ডায়েরী বহুবিভূত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ যথাযথরূপে সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে ছোটদাদার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। নানাপ্রকার অসুবিধা ও আকস্মিক দুর্ঘটনাবশতঃ এ পর্য্যন্ত তাহা সুসম্পন্ন হয় নাই। অনেক গুরুভ্রাতা নিজ নিজ পছন্দ মত বিষয় সকল নকল করিয়া লইয়া আপন আপন গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ অক্ষুণ্ণভাবে প্রকাশ করিতে আমারও আকাঙ্ক্ষা ছিল—কিন্তু নানা বিঘ্নবশতঃ উপস্থিত তাহা সম্ভব হইল না। কোন কোন স্থান বাদ দিয়া ছাপাইতে হইল। ইচ্ছা রহিল, ভবিষ্যতে ছোটদাদার ইচ্ছানুরূপ সমস্ত গ্রন্থখানা অবিকল ছাপাইব। এই গ্রন্থ পাঠে ঠাকুরের বিষয় যতটা পরিষ্কাররূপে জানা যাইবে—এ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সম্বন্ধে প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ পাঠেও তাহা জানা যাইবে না। ইহা পাঠে পাঠকগণের তৃপ্তিলাভ হইলে সমস্ত আশ্বাস সার্থক মনে করিব। ইতি

নিবেদক

শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

ঠাকুরবাড়ী, পুরীধাম

3/155

7/155

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	মনোরমার আত্ম	৩০
বিষয়	পৃষ্ঠা	৩১
ত্রিক্ষেত্র-গমনে ব্যাকুলতা	১ মোহিনীবাবুর স্বপ্ন-দর্শন	৩১
হারিসন রোডের বাসায় ঠাকুরের	প্রকৃত অবস্থা : ভক্তসঙ্গ	৩২
দৈনন্দিন কার্য	৪ ধর্মের পথ সূত্র : সংস্কার চিকিৎসা	৩৩
নানা অবস্থায় ভগবান্না দর্শন	১০ অত্যাচারের পরিণাম	৩৪
ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে ও আসনে	সাধু দর্শন : সূর্য্যবাসুকে উপদেশ	৩৪
দেবদেবীর ছাপ	১২ ভগবানের সামঞ্জস্য	৩৫
ঠাকুরকে নানারূপে দর্শন	১৩ সাধারণ উপদেশ	৩৬
অতিথিবেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও	নেপালি সাধুকে মহাভারত দান	৩৭
শিবের আগমন	১৬ ত্রৈলোক্য স্বামী ও দীক্ষা	৩৮
স্বরস্বতী পূজা	১৭ শাস্ত্র পাঠের নিয়ম :	
কৈলাসবাবুর দ্বীর পীড়া ও ঠাকুরের কৃপা	১৭ গৌর শিরোমণি মহাশয়	৩৯
গ্রানোকোন শ্রবণ : হিমালয়ে বেদধ্বনি :	বৃন্দাবন-পত্রিকা	৪০
কঙ্কাল বাবা	২০ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের স্বরূপ :	
গণেশের কৌতুক : সূর্য্যগ্রহণ	২৪ ওঁকারের রূপ	৪২
গুরুমর্যাদা	২৫ ক্রোধভাগ—আনন্দ নন্দী	৪৩
'বুলির' দূর শ্রবণ	২৬ শোকে সাধনা	৪৪
শ্রীধরের বসন্ত রোগ ও ঠাকুরের দয়া	২৭ ঠাকুরের আবালা সাধন-নিষ্ঠা	৪৪
মনোরঞ্জনবাবুর পূজা	২৭	
মনোরমা ঠাকুরাণীর দেহভাগ	২৮	
মনোরমাকে কারণ-সেহে দর্শন	২৯	

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরীষাত্মার উত্তোগ	৪৬
ঠাকুরের বিদায়	৪৭

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ত্রিক্ষেত্রে বানরবধে ঠাকুরের ক্রোধ		শ্রামল শাঁর গল্প	১৪১
এবং উহা নিবারণের চেষ্টা	১০২	কুঞ্জের বিদায় : কর্ম	১৪২
মন্দিরের গায়ে পায়খানা নির্মাণ	১০৪	কুঞ্জের স্বপ্ন : মহাবীরের কৃপা	১৪৩
গজোদ্ধারণ বেশ দর্শন	১০৫		
কান্দালী ভোজন ও বস্ত্রদান	১০৫	ষষ্ঠ অধ্যায়	
নেংটিসার সাধু : চতুর্দশ সাধনা			
ও পঞ্চম পুরুষার্থ	১০৮	বানরবধের বিরুদ্ধে আন্দোলন	১৪৫
সমুদ্র-স্নান	১১০	মন্দিরের গায়ে পায়খানা ভঙ্গ	১৪৬
মহোদধির পাবনী শক্তি	১১৩	বানরবধের বিরুদ্ধে পাতি সংগ্রহ	১৪৮
মিউনিসিপ্যালিটির অত্যাচার	১১৬	বানরবধের পক্ষে পাতি সংগ্রহ	১৪৯
ঠাকুরের বিগ্রহ পূজা ও দৈনন্দিন কার্য	১১৭	মিউনিসিপ্যাল সভায় বানরবধের	
		প্রস্তাব গ্রহণ	১৫০
		পুনরায় বানরবধ আরম্ভে দেশব্যাপী	
পঞ্চম অধ্যায়		তুমুল আন্দোলন—ছোটলাটের	
		আদেশে বানরবধ বন্ধ	১৫৪
স্নানযাত্রা ও দয়িতাদের সহিত কলহ	১২৩	ছোটলাটের পুরী আগমন	১৫৫
কুঞ্জের স্বয়ং ও চিকিৎসা	১২৪	ছোটলাটকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ	
শনিঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ	১২৬	দান	১৫৫
মাঠাকুরাণীর কৃপা-দর্শন	১২৬		
নবযৌবন দর্শন	১২৭	সপ্তম অধ্যায়	
রথযাত্রার অব্যবস্থা : একাদশীর			
নূতন মত	১২৮	ঝুলন-পূর্ণিমা	১৫৭
জগন্নাথদেবের পট্টভোজী	১৩০	জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব	১৫৮
জগন্নাথদেবের সেবার ক্রটি	১৩০	হরিদাস ঠাকুরের উৎসব	১৫৯
ঠাকুরের আকাশ-বৃত্তি	১৩২	উপদেশ সংগ্রহ	১৬০
ঠাকুরের জীবনে অদ্ভুত নির্ভরতা	১৩৪	অমৃতের স্ত্রীর সদগতি	১৬১
দাদাগোঁসাই : সাধুসেবা	১৩৭	মর্যাদা লঙ্ঘনে ঠাকুরের বিরক্তি	১৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অষ্টম অধ্যায়		পুরীতে সতীশের দৈনন্দিন কার্য	১৯৯
স্বামিজীর দেহত্যাগ ও সমাধি	১৬৩	সতীশের প্রতি মহাপ্রসাদের কৃপা	২০১
স্বামিজীর সদগতি	১৬৬	সতীশের শাস্ত্রবিশ্বাস : ব্রহ্মচারীর সহিত	
স্বামিজীর মৃত্যুতে শোক	১৬৭	কলহ	২০৩
স্বামিজীর স্মৃতিরক্ষা	১৬৯	বিদেহনুগত অবস্থা : মহাত্মা ক্ষেপাচাঁদ	২০৪
পুরীতে স্বামিজীর দৈনন্দিন কার্য	১৭০	সতীশের পরিচয়	২০৬
বানরবধ নিবারণে স্বামিজীর চেষ্টা	১৭১	হস্তিতত্ত্ব	২১০
স্বামিজীর অবস্থা দূরদর্শন	১৭২	একাদশ অধ্যায়	
স্বামিজীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১৭৪	জগন্নাথদেবের আগমন ও কোতুক	২১২
নবম অধ্যায়		মিষ্ট বাক্য ও ভক্ত হনুমান	২১৩
মহাবিক্‌বাবুর নামানুত পান	১৮০	মন্দিরে দর্শন : শতস্কন্ধরাবণ	২১৪
মহাবিক্‌বাবুর দীক্ষা	১৮২	পশুপক্ষীদিগকে আহ্বান দান	২১৭
মহাবিক্‌বাবুর স্বপ্ন : যুগল রূপ দর্শন :		চন্দনতালিওয়ের পরমহংসজী	২১৯
পাঁপপুরুষের শ্রাদ্ধ	১৮৪	নেংটা ছেলে	২২০
ঠাকুরের প্রথম স্বপ্ন : ভগবানের প্রকাশ	১৮৪	শশিবাবুর সহিত বানরবধ প্রসঙ্গ	২২২
ঠাকুরের দ্বিতীয় স্বপ্ন : মহাবীর দর্শন :		এদেশের ছরবহা	২২৩
ব্রহ্মের প্রকাশ	১৮৭	ব্রজবাসী	২২৩
হুর্গা পূজার ছুটিতে ভক্তদের আগমন	১৯১	শ্রীমতীর মানরক্ষা : পুরীবাগীর কর্তব্য	২২৪
ভূতনাথের প্রতি ঠাকুরের ব্যবস্থা	১৯২	জগন্নাথদেবের মকর-বেশ	২২৫
বানরগণ ও কচুর মিঠাই	১৯৩	আফিংখোর বানর	২২৫
দশম অধ্যায়		আমার মৃতপুত্র দর্শন	২২৬
সতীশের দেহত্যাগ ও সংকার	১৯৪	জগন্নাথদেবের অযত্নে ঠাকুরের ক্লেশ	২২৭
সতীশের কামনা : ভাগবতী তমুলাভ	১৯৭	পুরীর সমুদ্র-স্থানের ফল :	
		কৃষ্ণানন্দ স্বামী	২২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নানক সাহেবের কথা	২২৯	সাধকের জীবনে সদগুরুর শক্তির খেলা	২৭০
জগৎবাবুকে উপদেশ	২২২	শ্রীমতী কুম্ভকুমারী	২৬৩
অর্থ দ্বারা সাধুদের মুক্তি	২৩৩	অন্নপূর্ণার পাক	২৬৫
মহাপ্রসাদ বন্ধ	২৩৪	শ্রীমতী সত্যদাসী	২৬৬
কিশোরীবাবুর স্ত্রীর দান	২৩৪	শ্রীমুক্ত শ্রামাচরণ বন্দী	২৬৭
রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও কামিনী		গৌরীদাস ঠাকুর : নিতাই গৌর বিগ্রহ	২৬৮
কাঞ্চন	২৩৬	শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে স্তব	২৬৯
জগন্নাথদেবের ভিক্ষা : হরিবল্লভবাবু	২৩৭	পাণ্ডাদের দুর্গতি	২৭১
নারদের মায়াজয়ের গল্প	২৩৮	মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্তা : অক্ষয়বট	২৭২
ভগবতীর তপস্তা	২৩৯	আচার্য্য বসন্ত নিবেদন : মজ, মাংস ও	
রাজা বিষ্ণুর অবতারণা	২৪০	বিষয় স্পর্শে মলিনতা	২৭৩
পাগল ব্রাহ্মণের শিবস্তোত্র পাঠ	২৪২	নরেন্দ্রের গোস্থানী	২৭৫
কিশোরীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর সাধন-		সমুদ্রের শোভা	২৭৬
প্রাপ্তি : পঞ্চযজ্ঞ	২৪২	লিঙ্গ পূজা	২৭৭
		গুরুতর অপরাধে শাস্তি : জগন্নাথদেবের	
		দর্শন না পাওয়া : রামচন্দ্রের	
		গুহুতপস্বীর মন্তক ছেদন	২৭৮
		গোপিনীদের কাত্যায়নী পূজা	২৭৯
		শ্রীকৃষ্ণের মুক্তাকলের বাগান	২৮০
		শ্রামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের বাগান	২৮১
		শ্রীকৃষ্ণের সেতুবন্ধনলীলা	২৮১
		ব্রহ্মচারীর শাস্তি	২৮২
		দ্রোণদীর স্থানী	২৮৪
		'সকলকে দিলেই ভগবান পান'	২৮৪
		সন্ধ্যা-কোঁঠনে ভাবাবেশ	২৮৫
		একাদশী তথ্য : অম্বরীষ উপাখ্যান	২৮৬

দ্বাদশ অধ্যায়

দীক্ষার তাৎপর্য্য : এই সাধনের

অধিকারী

সদগুরু শক্তির সর্বাদা দান

নামই শক্তি : বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ

এই সাধনের বিশেষত্ব

ঠাকুরের অসাম্প্রদায়িক ভাব

সাধনের সময় উপদেশ : বিধি ও নিষেধ

দীক্ষার সময় নানারূপ অভূত দর্শন

২৪৫

২৪৬

২৪৭

২৪৯

২৫৩

২৫৩

২৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মহাবীরের পূজাদান	২৯০	জগন্নাথদেবের সৌন্দর্য্য দর্শন : দীনতা	৩১১
সত্যকাম ও ব্রহ্মজ্ঞান	২৯১	শান্তিদিদির পূজা	৩১২
ব্রহ্মনাথের অনিচ্ছায় বাবাজীর		ভগবান সহস্রশীর্ষ পুরুষ	৩১৩
মন্ত্রদান	২৯২	ঠাকুরের দানের তাৎপর্য্য :	
জগন্নাথদেবের ঐশ্বর্য্য	২৯৩	আচারী সাধু ও মহাপ্রসাদ :	
		জগন্নাথদেবকে কর্পূরদানের	
		প্রতিশ্রুতি	৩১৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়		শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 'হাড়মান' প্রাপ্তি :	
		কিশোরীবাবুকে সাহুনা :	
পন্নবেশ দর্শনে ভাবাবেশ : জগন্নাথ-		সকলের পক্ষে সমান নয়	৩১৫
দেবের আদেশে দান	২৯৫	শান্তিদিদির গোপালের ভোগ	৩১৬
বসন্তপঞ্চমী	২৯৯	মুন্সেফবাবুর দীক্ষাপ্রাপ্তি উপলক্ষে	
জগন্নাথবল্লভ মঠের মহাবীরকে		নিমন্ত্রণ	৩১৭
ঠাকুরের মানসিক পূজাদান	৩০০	সমুদ্রে সূর্যাস্ত দর্শন : দেবদাসীদের	
ইন্দ্রচ্যাম রাজার প্রার্থনা	৩০১	'গীতগোবিন্দ' বস্ত্রদান	৩১৭
অষ্টম প্রভুর আবির্ভাব তিথি :		একটি কাল বালকে জগন্নাথদেবের	
ভুবনেশ্বর মহাদেবের আগমন	৩০২	প্রকাশ ও মর্যাদা দান	৩১৯
মঙ্গুমঠে বস্ত্রদান : লোকনাথ মহাদেবের		রায়বেরিলির অঙ্ক বাবাজী	৩২০
আগমন	৩০৩	কাঙ্গালীদের বস্ত্রদান : বিমলামায়ীর	
জগন্নাথদেব স্বয়ং ব্রহ্ম	৩০৫	বস্ত্র প্রার্থনা	৩২১
দানযজ্ঞ : মহাবীরের কৃপা	৩০৫	শিবচন্দ্রদীপ্তিতে লোকনাথ দর্শন :	
৩সতীশের মহাপ্রসাদী খাজা গ্রহণ	৩০৭	ঠাকুরের নৃত্য : ভাবে	
রাধালবাবুর মহাপ্রাণ	৩০৭	উক্তি	৩২৩
গৌরানন্দদেব সম্বন্ধে কথা	৩০৮	লোকনাথ ও জগন্নাথ এক	৩২৬
ভক্তি গোপনীয়	৩০৯	বস্ত্রদান মহোৎসব	৩২৬
ঠাকুরের দেশীয় ভাবে শিক্ষার প্রশংসা	৩১০	এ জগন্নাথদেবের দান	৩২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
		পঙ্কতে বৃষ্টি বাধা পড়ে	৩৪৯
		সাধুদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ	৩৫০
চতুর্দশ অধ্যায়		চারি সম্প্রদায়ের পঙ্কত	৩৫২
		ঠাকুর অহুহ	৩৫৫
“সময়ই শোকের দাগ উঠাইয়া থাকে”	৩৩০	সাধুসেবায় মহাপ্রসাদ পাকের	
হুন্নদাসের পদ	৩৩১	প্রশংসা	৩৫৬
জগন্নাথদেবের আদেশ : আজ সেবক-		বাজার ধার সম্বন্ধে নানা সমালোচনা	৩৫৭
দিগকে দাও	৩৩২	মাধোদাস বাবাজীর শিষ্য নারায়ণদাস	
‘গৌসাই আপনি ইহা কোথায়		বাবাজীর আগমন	৩৫৮
পাইলেন ?’	৩৩৪	নানকজীর কথা	৩৬১
ঠাকুরের সমুদ্র-স্নানে আরাম	৩৩৫	‘নামেই’ সব হয়	৩৬২
কাপড়ওয়ানা ভাই দু’টি আশ্চর্য্য লোক	৩৩৬		
সমুদ্র-জলে মিষ্টতা	৩৩৭		
সাধুদের পঙ্কত	৩৩৮		
যাত্রীদিগকে ঘটা, বস্ত্র দান ও তাহাদের		পঞ্চদশ অধ্যায়	
আনন্দ	৩৬৯		
মণিকোঠায় দর্শন—মেড়াপোড়া		বিষ-প্রয়োগ	৩৬৩
উৎসব	৩৪০	রাধাবল্লভবাবুর স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন	
দোলপুর্ণিমা : একটি স্ত্রীলোকে		অবস্থা : জগন্নাথদেবের আদেশ	৩৬৪
বিমলামারীর আবেশ	৩৪২	বিদ্যুবাবুর ধার শোধের চেষ্টা	৩৬৬
সাধুসেবার উত্তোষ	৩৪৪	বাক্য রক্ষা হওয়াতে সোয়ারের	
শ্রুতের চীৎকার	৩৪৪	আনন্দ	৩৬৭
রবিবার পঙ্কত বসিবে	৩৪৫	শিব বিষ্ণু এক : বিভিন্ন ভাবিলে অপরাধ	
জগন্নাথদেবের আদেশে সাধুসেবার		হয় : কুঞ্জবাবুর দান	৩৭০
ভিক্ষা	৩৪৬	সতীশবাবুর দান	৩৭২
জগন্নাথদাস বাবাজীর অসঙ্কত দাবী	৩৪৮	সাধুর গাঁজার ব্যবস্থা	৩৭৫

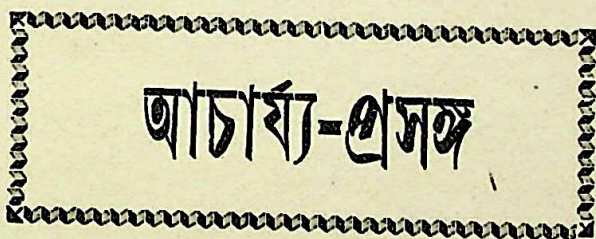
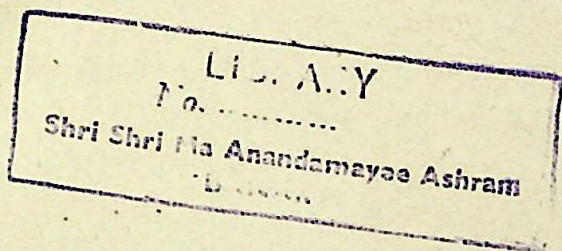
বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পান্নার দিদিমার প্রশংসা	৩৭৭	বাবাজী গুণ্ডার সর্দার	৩৯৮
দান ব্যাপারে কলিকাতায় আলোচনা :		বিষ-প্রয়োগ রহস্য	৩৯৯
ঠাকুরের উক্তি	৩৭৮	ব্রাহ্মসমাজে থাকা সময়ে ঠাকুরের	
রাউলপিণ্ডির সাধু	৩৮১	প্রাণনাশের চেষ্টা	৪০১
সাধু নরসিংদাস	৩৮২	গোঁসাইয়ের পত্র : শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী	৪০৩
জীলোকের মজপান : ঠাকুরের চেষ্টায়		উচ্ছিষ্ট বিচার	৪০৫
উহা নিবারণ	৩৮৩	মহাপ্রসাদ দ্বারা ক্ষেত্রবাবুকে আক্র	
প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ—“দেবী হেবা		করিতে আদেশ	৪০৬
গুণময়ী”	৩৮৬	অভুতরূপে জাম সংগ্রহ	৪০৭
ঠাকুর বিষম স্বরে অভ্যাস	৩৮৭	নরেন্দ্রের গোঁসাইয়ের অভুত ব্যবহার	৪০৯
রেবতীবাবুর কীর্তন : ঠাকুরের নৃত্য	৩৮৯	ঠাকুরের মহাপুরুষের সেবা ও	
চন্দনযাত্রা	৩৯০	তাঁহার আশীর্বাদ	৪১০
দিদিমার গোপালের নিকট কথকতায়		ঠাকুরের গান শুনিতে আগ্রহ	৪১১
উত্তোগ : জগন্নাথদেবের গায়ে		মহেশ্ববাবুকে উপদেশ	৪১২
বেতের বাড়ী	৩৯২	“বিষে ভিতরটা পচিয়া গিয়াছে”	৪১৩
বিষ-প্রয়োগ	৩৯৫	অধমেধ যজ্ঞের ঘোড়া :	
		সরলনাথ	৪১৫
		উইলসন হোটেলের বেদানার রস গ্রহণের	
		প্রস্তাবে ঠাকুরের বিরক্তি	৪১৬
		‘জগন্নাথদেবের ইচ্ছায়ই সব হয়’	৪১৬
		দেবতাদের সাহায্যে গঙ্গার বিপ্লব	
দিদিমার গোপালের নিকট পাঠ	৩৯৬	বায়ু সেবন	৪১৭
চক্রান্তকারীদের অনুসন্ধান : গোঁসাই		প্রিয়নাথের গান	৪১৮
ভাল আছেন ত ?	৩৯৭	বাজার দ্বার শোধ—বিষ-প্রয়োগকারীদের	
কিশোরীবাবুকে বিষ-প্রয়োগ		জালা নিবারণের প্রার্থনা	৪১৯
বৃন্তান্ত কখন	৩৯৭	পাণ্ডাদের আশীর্বাদ	৪২০

ষোড়শ অধ্যায়

দিদিমার গোপালের নিকট পাঠ	৩৯৬	বায়ু সেবন	৪১৭
চক্রান্তকারীদের অনুসন্ধান : গোঁসাই		প্রিয়নাথের গান	৪১৮
ভাল আছেন ত ?	৩৯৭	বাজার দ্বার শোধ—বিষ-প্রয়োগকারীদের	
কিশোরীবাবুকে বিষ-প্রয়োগ		জালা নিবারণের প্রার্থনা	৪১৯
বৃন্তান্ত কখন	৩৯৭	পাণ্ডাদের আশীর্বাদ	৪২০

চিত্রসূচী

১। শ্রীমৎ-আচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	...	...	১	
২। শ্রীশ্রীজগন্নাথ স্বামী	৬৪	}	৬৪	
৩। টোটা গোপীনাথ—পুরীধাম	৭৪			
৪। নীলমণি বর্ষগের বাটী—পুরীধাম	৬৮	}	৭১	
৫। কাশী মিশ্রের বাটী (গম্ভীরা)—পুরীধাম	৭১			
৬। হরিদাস ঠাকুরের সমাধি—পুরীধাম	৭৬	}	৭৬	
৭। চটক পর্বত—পুরীধাম	৭৮			
৮। সিদ্ধ বকুল—পুরীধাম	৮০	}	৮২	
৯। চক্রতীর্থ—পুরীধাম	৮২			
১০। ইন্দ্রহ্যম সরোবর—পুরীধাম	৮৪	}	৮৬	
১১। গুণ্ডিচা বাড়ী—পুরীধাম	৮৬			
১২। লোকনাথ দেবের মন্দির—পুরীধাম	৮৮	}	৯৫	
১৩। নরেন্দ্র সরোবরে চন্দনযাত্রার মন্দির—পুরীধাম	৯৫			
১৪। কুঞ্জবিহারী গুহঠাকুরতা	}	}	১২৪	
দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত				১২৪
শ্রীশারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়				১২৬
১৫। শ্রীরেবতীমোহন সেন	১২৬			
১৬। শ্রীযুক্তেশ্বরী-মা-ঠাকরুণ শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী	...		১২৭	
১৭। গোস্বামী প্রভুর সমাধি মন্দির—পুরীধাম	...		৪২৬	
১৮। শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী	...		৪৩০	







শ্রীমৎ-আচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

LIBRARY

No. ..

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্তেত কহিচিৎ ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যা স্মৃয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ । সর্বকার্য্যারম্ভে সিদ্ধিদাত্রী, পরম দয়াময়ী, আত্ম যোগমায়া ভগবৎ শক্তিকে নমস্কার করি । তিনি আমাদের কুশল করুন, কল্যাণমার্গে সকলের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করুন । ইহলোক, পরলোক-বাসী সমগ্র সাধু ভক্তবৃন্দের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি ।

প্রথম অধ্যায়

হারিসন রোডের বাসায়

শ্রীক্ষেত্র গমনে ব্যাকুলতা

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ১৩০৪ সালের শেষভাগে কলিকাতায় ৪৫ নং হারিসন রোডের ভাড়াটীয়া বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন । কতদিন যাবৎ বায়ু-পরিবর্তনের জন্ত ঠাকুরের পশ্চিমাঞ্চল যাইবার কথা হইতেছিল ।, কিন্তু এই সময়ে ৬পুরীধাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত আমাদের কয়েকটি গুরুভ্রাতার নিকট পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সংবাদ শুনিয়া ঠাকুর তথায় যাইতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন । মাঘের প্রারম্ভে তিনি একদিন

আহারান্তে উক্ত বাড়ীর তেতালার বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আমাদের গুরুভাতা, বরিশাল, লাখুটিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ৬পুরীধাম হইতে আসিয়া ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের চিত্রপট, মহাপ্রসাদ প্রভৃতি ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া তিনি পুরীর বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। আমি হঠাৎ সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঠাকুর চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। রাখালবাবুর ভিতরে তিনি জগন্নাথ দেবের প্রকাশ দেখিয়া কঁাদিয়া আকুল হইলেন। পটখানি অতি আদরে আসনের সম্মুখে দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে গুরুভাতা শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস, অমৃতলাল সেন এবং শ্রীধর বোষও ৬পুরীধাম গিয়াছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরের সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের মুখে পুরীর বৃত্তান্ত শুনিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবার জন্ত একবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগকে করযোড়ে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, “আমাকে দয়া করিয়া পুরীধামে নিয়া চলুন।”

পুরীতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু যে স্থানে (গম্ভীরায়—কাশীমিত্রের বাড়ীতে) বাস করিতেন, যে চটক পর্বত দর্শনে তাঁহার গোবর্দ্ধন ভ্রম হইয়াছিল, যে সমুদ্রে চাঁদনির নিশীথে যমুনা ভ্রমে কাঁপ দিয়া ভাসিতে ভাসিতে চক্রতীর্থের দিকে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে জেলেরা জালে করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়াছিল, যে স্থানে গাভী সকলের মধ্যে ভাবাবেশে কুস্মাকৃতি হইয়া তিনি পড়িয়াছিলেন, সেই সকল স্থান এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এই সকল এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নানাকথা শুনিয়া ঠাকুর পুরী যাইবার জন্ত বড়ই অস্থির হইলেন এবং পঞ্জিকা দৃষ্টে ১৩০৪ সালের ফাল্গুন মাসের ২৪শে তারিখে পুরী যাত্রার শুভদিন স্থির করিলেন।

প্রথম অধ্যায়

৩

কলিকাতা হইতে পুরী যাওয়া তখন বড়ই কঠিন ছিল। রেলওয়ে ছিল না। ঠাকুরের হাঁটিয়া যাওয়াও অসম্ভব, বাতরোগে শরীর অতিশয় কাতর, ভূমিতে পদক্ষেপ করিতেও তিনি ক্লেশ পান; লাঠিভর করিয়া চলিতে হয়। তাঁহার পুত্র যোগজীবন গোস্বামী ও মণীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় একখানি জাহাজ অল্প খরচায় ভাড়া করিয়া তাঁহাকে ৬পুরীধামে লইয়া যাইবার জন্ত উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু অর্থ কোথায়? ঠাকুরের আকাশ বৃত্তি, টাকা কড়ি যখন যাহা আসে, তখনই তাহা খরচ হইয়া যায়। একদিন যোগজীবন দাদা বলিলেন, “হাতে এখন টাকা নাই। আরও কয়েক দিন পরে গেলে হয় না?” তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, “যোগজীবন, বিষয়ী লোকের মত কথা বলিস্ না; যদি ৬জগন্নাথ দেবের আদেশ হয়, যে অমুক দিন আমি তাঁহাকে দর্শন করিব, টাকার যোগাড় তিনিই করিবেন।”

ইহার পর জাহাজ ভাড়ার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ঠাকুর একদিন গুরুভ্রাতাদের বলিলেন, “তোমরা জাহাজ ভাড়ার জন্ত চেষ্টিত হইয়াও অকৃতকার্য হইতেছ, আমি যে প্রকারে হউক পায়ে ছালা (চট) বাধিয়া হামাগুড়ি দিতে দিতে পুরী যাইব। যে দিন ঠিক করিয়াছি কদাচ তাহার অগ্রথা হইবে না।” ঐ তারিখে ঠাকুরের যাওয়া অবধারিত জানিয়া সে বিষয়ে উদ্যোগ হইতে লাগিল।

৪৫ নং হেরিসন রোডের বাসায় আমরা প্রায় দুই বৎসর কাল ঠাকুরের সঙ্গে কাটাইলাম। এই সময়ের মধ্যে ঠাকুরের কার্য্য-প্রণালী ও বিশেষ ঘটনাবলী যাহা দেখিয়াছি এবং গুরুভ্রাতাদের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি এবং অনুসন্ধানে সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

হারিসন রোডের বাসায় ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য

রাত্রি প্রায় পৌনে চারিটার সময় শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ঠাকুর ঘরে বসিয়া মাটির গামলায় কাঠ কয়লা জ্বালাইয়া দ্ব্যত বিষ্ণুপত্র দ্বারা, তাঁহারই নির্দেশে হোম করিতেন। ঠাকুর হোম-মন্ত্র পাঠ করিতেন। তৎপরে রাত্রি চারটা সাড়ে চারটার সময় ভোর-কীর্ত্তন হইত। অনেক সময় ঠাকুর নিজে করতাল বাজাইয়া গান গাইতেন। তৎপরে অচিন্ত্য-বাবু, বেণীমাধব প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা সঙ্গীত করিতেন। শ্রীগৌরানন্দ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীতই প্রায় হইত। কখন কখন তৎসঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীতও হইত। শেষ রাত্রিতে অচিন্ত্যবাবু কখন গদগদভাবে “কানাই একি ভাই র’লি প্রভাতে অচৈতন্ত”, “শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ কেন, কেন বা বঁাকা নয়ন,” “আমার পতিত পাবন গৌরহরি”, “চল ভাই ভার লয়ে বাই অযোধ্যায় রাম রাজা হবে” ইত্যাদি গান করিতেন।* তখন গৃহস্থিত সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িতেন। ঠাকুর ভাবে বিভোর। ঠাকুর

- ১। কানাই, একি ভাই, রলি প্রভাতে অচৈতন্ত ।
 উঠ্লে ভানু, ও নীল-তনু, যায় না ধেনু, বেণু ভিন্ন ।
 অঙ্গন আঁধি যুগলে, গুঞ্জাহার পরয়ে গলে ।
 কদম্ব মঞ্জরী দিয়ে, সাজাও যুগল কর্ণ ।
 পর ধড়া, মোহন চূড়া, ব্রজের চূড়া নীলবর্ণ
 একদিন বনে, রাখালগণে বিধপানে জীবনশূন্য
 জীবন দিলি জীবন কানাই, তুলনা নাই গুণের অন্ত ।
 রাখাল সাজে, রাখালরাঞ্জে নেচে নেচে চল অরণ্য
 সাধ করে তোয় সেধে বলি, যে দিন ক্ষুধায় অজ কালী
 তুই এনে মিলালি, বনমালী, বনে অন্ন ।

প্রথম অধ্যায়

৫

ভাবাবেশে উচ্চ 'হরিবোল' বলিতে থাকিতেন। গান শেষ হইলে ঠাকুর স্তব করিয়া করতাল বাজাইয়া, চারিধাম, চারি সম্প্রদায়, অবতার, দেব-দেবী ও তীর্থস্থান প্রভৃতির জয়ধ্বনি দিতেন। ইহার পর ঠাকুর কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। অতঃপর ভোরবেলার কথাবার্তায় কিছু সময় অতিবাহিত করিয়া তিনি শৌচে যাইতেন। পায়খানা যাইবার পূর্বেই তেতালার ছাদে পাখীদিগকে চাউল জল দেওয়াইতেন। অসংখ্য কাক, পায়রা, শালিক প্রভৃতি পাখী নির্ভয়ে উহা ভোজন করিত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট "রসবড়ি", "সন্দেশ" প্রভৃতিও দেওয়াইতেন। খুব বড় গামলা পরিপূর্ণ করিয়া জল দেওয়া হইত।

পায়খানা হইতে আসিয়া আসনের পার্শ্বস্থিত টবের তুলসী বৃক্ষে

২। শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ কেন, কেন বা বাঁকা নয়ন।

ওলো সখী কহ দেখি, ইহার কি বিবরণ ॥

শ্রাম, চঞ্চল নয়নে চার, কোথা থেকে কোথা যায়,

কে বুঝিবে অভিপ্রায়, ইহার কি মর্থ।

সরল বাঁশের অংশ, বংশীকুল অবতংস।

কুলধর্ম করে ধ্বংস, সে করে মন হরণ।

শ্রাম অতনু সতনু করে, সতনুর মন হয়ে।

শিখি পাখীর পাখা শিরে, সে করে মনোহরণ।

৩। চল ভাই ভার লয়ে যাই, অযোধ্যার রাম রাজা হবে।

দিব তার চরণে ভার, সে বিনে ভার আর কে লবে ॥

পাপে হয়েছি ভারি, আর ত ভার সহিতে নারি,

বিনা সে ভূভারহারী, এ পাপ ভার আর কে লবে ॥

দিয়ে ভার লয়ে শরণ, বলুবো দুটি ধরে চরণ।

এবার ভার বইলেম যেমন, এমন ভার আর যেন না বই ভবে ॥

জল দিতেন এবং তুলসী মৃত্তিকা দ্বারা তিলক করিতেন। এই সময়ে আমি এবং কখন কখন মোহিনীমোহন রায় উপস্থিত থাকিতাম। মোহিনীবাবু ঠাকুরকে বাতাস করিতেন। সেই সময়ে নানাপ্রকার কথাবার্তা হইত। এই সময়ে এক দিবস ঠাকুর পায়খানা হইতে ঘরে প্রবেশ করিয়া তিলক না করিয়াই আসনে যাইতেছেন দেখিয়া আমি বলিলাম, “আজ তিলক করিলেন না?” ঠাকুর শুনিয়া অমনি দাঁড়াইলেন এবং তুলসী গাছে জল দিয়া তিলক করিতে করিতে বলিলেন, “শেষকালে যদি এরূপ স্মরণ করাইয়া দিতে পার তবেই জানি বন্ধুর কার্য্য।” আমি শুনিয়া একটুকু লজ্জিত হইলাম।

ঠাকুর ‘তিলক সেবা’ করিয়া নামাবলী গায়ে তেতালার বারান্দায় একটুকু বেড়াইতেন। তৎপরে কিছু মিষ্টি ও চা সেবার পরে পাঠ আরম্ভ হইত। শ্রীযুক্ত মোহিনীবাবু ‘শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত’ বা ‘চৈতন্য-ভাগবত,’ ‘নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রার্থনা,’ ‘বাঙ্গালা শ্রীমদ্ভাগবত’ এবং ঠাকুরের ‘বক্তৃতা ও উপদেশ’ এবং অপরাপর গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। পরে এগারটা, সাড়ে এগারটার সময় পুনরায় শৌচে যাইতেন এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল তথায় অবস্থান করিতেন। ঠাকুরের পায়খানায় অপর কেহ যাইতেন না এবং অশ্বিনীকুমার মিত্র প্রভৃতি উহা প্রতিদিন চূণ, বালি, নারিকেলের খোষা, মাটি প্রভৃতি দ্বারা ঘষিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতেন। পায়খানার সামনের বারান্দা পর্ব্দা দিয়া আঁটিয়া একটি ভিন্ন কোঠার মত করা হইয়াছিল, উহাতে একখানা জল-চৌকি থাকিত। তিনি পায়খানা হইতে আসিয়া উহাতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেন।

মধ্যাহ্নে শৌচান্তে ঠাকুর তিলকসেবা করিয়া ঔবধ সেবনান্তে অন্নাহার করিতেন। দিদি মাতাঠাকুরাণী, ব্রহ্মচারী বা কখন কখন আমি তাঁহার জন্ত রান্না করিতাম। তিনি সাধারণতঃ কলের জল পান করিতেন না।

আমরা কলসী ভরিয়া গদাঙ্গল আনিতাম, তাহাই পান করিতেন। গঙ্গায় কাঁকড়া ডাসিলে, জল লোণা হইলে এবং বর্ষার সময়ে অপরিষ্কার হইলে ঠাকুর কলের জলই পান করিতেন।

আহারান্তে কিছুক্ষণ বারান্দায় বাইয়া দাঁড়াইতেন। শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার মিত্র (বৈরাগী) ঠাকুরের আসন পাতিয়া দিত, ঘরে ধূনা দিত ও কখন কখন জটা বাছিত। সতীশ ও শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। ঠাকুর আসনে বাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। কখন কখন বা ধর্মালোচনা করিতেন। এই সময় কোনও কোনও দিন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় M. A., B. L. মহাশয় (প্রসিদ্ধ 'ডন' কাগজের সম্পাদক) উপস্থিত থাকিতেন। ঠাকুরের অভিপ্রায়মতেই তিনি 'ডন' কাগজ প্রবর্তন করেন। ঠাকুর তাঁহাকে এক সময় বলিয়াছিলেন, "আপনি দেশের শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের কার্য্য করেন। ইহাই আপনার কার্য্য। আমি আপনার হইয়া 'নাম' করিব। পরন্তু আপনি নিষ্কাম-ভাবে কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ভগবানের কাজ করিতে হইলে, তাঁহারই পানে তাকাইতে হয়। চিন্তে দীনতা থাকিলে পতন হয় না।"

সাড়ে তিনটা চারটা বাজিলে পুনরায় ঠাকুর শৌচে যাইতেন। আমরা বেদানা, কাঁচাগোল্লা, বড়বাজারের মাড়োয়ারীদের দোকান হইতে লাড্ডু প্রভৃতি তাঁহার জন্ত আনিয়া রাখিতাম। শৌচান্তে ঠাকুর তাহার যৎসামান্যই গ্রহণ করিতেন।

ঠাকুর আসনে বসিলে শ্রীযুক্ত পন্নালাল ঘোষ কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারতের বঙ্গানুবাদ' পাঠ করিতেন। পাঠের সময় বহুলোক আসিয়া উপস্থিত হইত এবং পাঠ শুনিত। পাঠ সমাপনান্তে ৫টা কি ৫১টার সময় আসন হইতে উঠিয়া তিনি তেতালার ছাদে স্থান্নিষ্ঠ সমীরণে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতঃ সন্ধ্যা হইলে নীচে আসিতেন। তেতালায় যখন তিনি

বিশ্রাম করিতেন তখন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কয়েকদিন ‘রাধাকৃষ্ণ রসোদ্দীপক’ নাটক সকল পাঠ করিয়াছিলেন। কোনও কোনও দিন অল্প গ্রন্থও পাঠ হইত।

তিনি নীচে আসনে আসিলে আমরা ঘরে ধূনা দিতাম ও শঙ্খধ্বনি করিতাম, এবং গুরু নানকের ‘গ্রন্থ সাহেবে’ ও অত্যাগ্ন গ্রন্থে নাগাজীর চিত্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপটে পুষ্পমাল্য দিয়া শ্রীহরি-সংকীৰ্ত্তন আরম্ভ করিতাম। হরি-সংকীৰ্ত্তনে প্রায়ই ভাবের তরঙ্গ খেলিত, বহুক্ষণ নৃত্য গীতাদি হইত, বহুলোকের সমাগম হইত। এই সময়ে পাড়ার অনেক ছেলে উপস্থিত হইত, উহারা হাত ভরিয়া, টোপরে করিয়া বিস্তর ‘হরির-লুটের’ বাতাসা লইয়া যাইত। কীৰ্ত্তন শেষ হইলে, ঠাকুর অতি মধুর স্বরে—

“হরেনাঁম হরেনাঁম হরেনাঁমৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ।

জয়াঈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবন্দ ॥”

“হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল” এই কয়টি শ্লোক ও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া লুটের বাতাসা নিজ হস্তে ছড়াইয়া দিতেন। সকলেই লুটের বাতাসা অতি আদরে, আগ্রহের সহিত কুড়াইয়া লইতেন। কেহ কেহ ঠাকুরের নিজ হস্তে বিলান লুটের বাতাসা, অতি দুর্লভবোধে দূরদেশে আত্মীয়-স্বজনের জন্ত লইয়া যাইতেন। ঠাকুর কোন সময়ে রেবতী-বাবুকে বলিয়াছিলেন “হরিরলুটের” বাতাসার স্মৃষ্টিদেবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন।”

প্রথম অধ্যায়

৯

কীর্তনান্তে প্রায়ই শ্রামা বিষয়ক সঙ্গীত, শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা সঙ্গীত ও ভজন গান হইত। শ্রদ্ধেয় স্মরণায়ক শ্রীযুক্ত রেবতীবাবু, কখন কখন গোষ্ঠীবাবুর বেহালার তানে, নিজের স্বমধুর কণ্ঠস্বর সংযোগ করিয়া, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীতে সকলকে মোহিত করিতেন।*

ঠাকুর উহা অবশেষে প্রায়ই ভাবাবেশে ‘উহ’, ‘উহ’ করিয়া বিভোর হইয়া পড়িতেন এবং আনন্দধ্বনি করিতেন। শ্রদ্ধেয় স্মরণায়ক ও গোষ্ঠীবাবু, “মৈয় গোলাম, মৈয় গোলাম, মেরি রাম” ইত্যাদি গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। ঐ সকল গানে গৃহে পবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত হইত এবং উহা স্মরণ করিয়া এখনও চিন্তে উহার মাধুর্য ও উদ্ভাদিনীশক্তি অনুভব করিতেছি।

সন্ধ্যা-সংকীর্তনের পর ধর্ম্যালোচনা ও নানাবিধ কথাবার্তা হইত। কখন বা মোহিনীবাবু বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। কখন কখন অচিন্ত্যবাবু, বৃন্দাবন মজুমদার ও মণিবাবুর সহিত ঠাকুরের নানা বিষয়ক কথাবার্তা হইত। রাত্রি ৯।০টা হইলে মুখপ্রক্ষালনাদি করিতে উঠিতেন। তৎপরে ঔষধ সেবনান্তে বৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া ধ্যানস্থ হইতেন। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় রাত্রি ৯।০টার পর মাঝে মাঝে

* “শ্রীরাধাগোবিন্দ চরণারবিন্দ মকরন্দে মত্ত হও মন ভূঙ্গ।

বিষয় কেতকী সে বনে ভ্রমে কি, সেই বনে ভ্রমে যে বনে ত্রিভঙ্গ ॥

শ্রীবৃন্দাবন প্রেম সরোবর মধ্যে, অনন্ত প্রকুল কোটি গোপীপদ ॥

সেই পদমধ্যে মোদের রাধা নীল পদ, এই ব্রজাও গাঁথা যার মৃণালের সঙ্গ ॥

ব্রজে মধুরূপ শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরতি, মধুরূপ শ্রীমতী বামে বিহরতি ॥

রেখো রতি মতি, ঐ মধুর ভাবপ্রতি ; মন মধুপ বেন দিও না ভঙ্গ ॥

গুণ গুণ স্বরে গাও রাধাকৃষ্ণের গুণ, সুধা পাবে যাবে ভবের ক্ষুধাশূন্য ॥

তোর ছাড়িবে বিগুণ ধরিবে সংগুণ, নিগুণ গোবিন্দ গায় গুণ-প্রসঙ্গ ॥”

ঠাকুরের গা, পা টিপিয়া দিতেন। মোহিনীবাবুর কোমল মর্দনে ঠাকুর খুব আরাম পাইতেন এবং কখন কখন উহার প্রশংসা করিতেন।

এই সময়ে আমরা আহাৰ করিতে যাইতাম। আহাৰান্তে আসিয়া অশ্বিনী ও আমি পুরাতন ঘৃত গরম করিয়া ঠাকুরের গায়ে মালিশ করিয়া দিতাম। ঠাকুরের পা বাতে প্রায় অকর্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রি ১২টার পর কাঠের কয়লা বড় গামলাতে জ্বালাইয়া হোম করিতাম।

শীতকালে ১২।টার সময় ও শেষ রাত্রে মুখ হাত ধুইতে এবং প্রস্রাব করিতে গরম জলের প্রয়োজন হইত। ঠাকুরের শরীরে তখন রক্ত বড় কম ছিল; ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারিতেন না। ঔষধ খাইয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের জন্তও কখন কখন গরম জলের প্রয়োজন হইত। ঠাণ্ডা জল খাইতে পারিতেন না। ব্রহ্মচারী গরম জল যোগাড় করিতেন এবং ঠাকুরের সহিত রাত্রে নানা বিষয়ে, নানা প্রশঙ্গ করিতেন। মণিবাবু, অচিন্ত্যবাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণও কখন কখন ঘুম হইতে উঠিয়া ঠাকুরের সহিত ঐ সময়ে গল্প ও হাস্য-পরিহাসাদি করিতেন।

রাত্রি ১২টা হইলে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ঘুম হইতে উঠিয়া ঠাকুরকে মুখ ধুইবার জল দিতেন ও ঔষধ খাওয়াইতেন। এই সময় হইতে ব্রহ্মচারী ঠাকুরের নিকট সারা রাত্রি থাকিয়া তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং শেষ রাত্রে প্রায় ৪টার সময় হোম করিতেন।

নানা অবস্থায় ভগবল্লীলা দর্শন

একদিন এই বাসায় একটি সুন্দর ঘটনা ঘটয়াছিল। মোহিনীবাবু প্রতিদিনই গঙ্গা-স্নান হইতে আসিবার সময় তুলসী গাছে জল দিবার নিমিত্ত ঠাকুরের জন্ত এক কমণ্ডলু গঙ্গাজল আনিতেন এবং বাসায় আসিয়া তুলসী গাছের নিকটে অপেক্ষা করিতেন। ঐদিন মোহিনীবাবু ৭টার

সময় গঙ্গাজল লইয়া ঠাকুরের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর সে সময়ে পায়খানায় গিয়াছিলেন। তাঁহার তথা হইতে ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া তিনি মনে মনে বড়ই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন, কারণ ঠাকুরের চা সেবার পর তাঁহাকে পাঠ শুনাইয়া আফিসে যাইতে হইবে। সেই দিন ঠাকুর সাড়ে নয়টার সময় পায়খানা হইতে বাহির হইলেন। মোহিনীবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার কি পায়খানা হ’তে খুব বিলম্ব হয়?” ঠাকুর বলিলেন, “পায়খানা ত আমার ৫ মিনিটের মধ্যে হইয়া যায়।” মোহিনীবাবু বলিলেন, “তবে আজ এত বিলম্ব কেন?” ঠাকুর বলিলেন, “পাগলামির কথা আর কি বলব, আজ যেই পায়খানায় প্রবেশ করিতে যাইব, অমনি দেখি যে নারদ, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতারা আসিয়া দর্শন দিলেন। কাজেই পায়খানায় বসিতে পারি নাই; অবশেষে অনেক স্তবস্ততি করিলে তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন; পরে পায়খানার কাজ সারিয়া বাহিরে আসিলেই সম্মুখে শ্রীবন্দাবনলীলাটী প্রকাশিত হইল, উহা দর্শন করিয়াই বাহুজ্ঞান লোপ পাইল। সেইজন্তেই আজ এত বিলম্ব হইল। আপনি আজ কেবল গ্রন্থগুলি খুলিয়া ‘জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত’ ইত্যাদি উচ্চারণ পূর্বক শীঘ্র আহার করিয়া আফিসে যান। আজকের পাঠ এইভাবেই হইবে।” মোহিনীবাবু বলিলেন, “সে দিন ঠাকুরের মূর্তি যেন নেশাখোরের মত হইয়াছিল। তাঁহার দেহ হইতে এক অপূর্ণ জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। মুখলগ্ন আনন্দে পরিপূর্ণ।”

ঠাকুর যখন ঢাকায় ছিলেন এবং অর্থের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তখন গৌড়ারিয়া আশ্রমের গুরুভাতারা পর্যায়ক্রমে রান্না করিতেন। ঠাকুর সকলের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিতেন। আহারে বসিয়া অনেক সময় ভাবাবেশ হইত। আহার করিতে করিতে হঠাৎ নিশ্চল হইয়া

বসিতেন—চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রুবর্ষণ হইত। কখন বা শ্রীবৃন্দাবন-লীলা দর্শন করিয়া “এই সখীরা আসিয়াছেন,” বলিতে বলিতে ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতে থাকিতেন। গুরুভাতার নিজ নিজ আসনে চুপ করিয়া, আহারে বিরত থাকিয়া নিবিষ্টমনে উহা শ্রবণ করিতেন! কখন বা ভাবাবেশে কাঁদিয়া আকুল হইতেন—আর আহার হইত না।

ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে ও আসনে দেবদেবীর ছাপ

বৈকালে মহাভারত পঠের সময় ও অস্ত্রান্ত্র সময়েও কখন কখন খুব আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিত। ঠাকুরের আসনে এবং শরীরে আপনাআপনি দেবদেবী-মূর্ত্তির ছাপ পড়িত। কখন কখন নানারূপ চিত্র, কখন যুদ্ধের রথ, সৈন্যসমূহ, দেবমন্দির, কখন রাধাকৃষ্ণ, রাধাশ্যাম, হরেরাম প্রভৃতি অক্ষর এবং কখন বা সম্পূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক প্রভৃতির ছাপ সুস্পষ্টরূপে তাঁহার গাত্রে এবং আসনে পড়িয়াছে ইহা সকলে দেখিতে পাইতেন। বহুকাল পূর্বেও একবার আমি শ্রীবৃন্দাবনে একটি সম্পূর্ণ শ্লোক ঠাকুরের উরুদেশে দেখিয়াছিলাম। ঠাকুরের বস্ত্রেও এরূপ নামাবলী দৃষ্ট হইত। কলিকাতার অনেকেই ইহা দর্শন করিয়া অবাক হইয়াছেন। বোলপুরের উকিল শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় একবার ঠাকুরের আসনে ‘হরেকৃষ্ণ’ নাম অতি সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে সেই বস্ত্রখানা যাক্কা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আর এক দিবস ঠাকুর আহারাঙ্গে আসনে বসিয়া গল্পাদি করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার বাম উরুতে রাম-রাবণের যুদ্ধের চিত্রের ছাপ পড়িয়াছিল। তিনি গুরুভাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ, দেখ, আমার উরুতে কিসের চিত্র পড়িয়াছে।” সে যাইয়া দেখিল একদিকে একখানা সুস্পষ্ট

রথ, তাহার ভিতরে আরোহী, অত্ৰদিকে দুটি লোক ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঠাকুরকে ইহা বলায় তিনি বলিলেন, “এ রামায়ণের যুদ্ধের চিত্র, ঐ দেখ রথের ভিতরে দশানন, অপরদিকে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং একটু পশ্চাতে মহাবীরজী রহিয়াছেন।” কুঞ্জ আর একদিন ঠাকুরের ইন্দিতে তাঁহার আসনের নিকট বাইয়া উরুতে শ্রীশ্রীকালীমাতার চিত্র এবং দেবনাগর অক্ষরের ছাপ দেখিয়াছিল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন উহা উপনিষদের কোন শ্লোকের অংশ।

ঠাকুরকে নানারূপে দর্শন

ভক্তবৃন্দ ঠাকুরকে নানা অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন করিতেন। সাধনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপের অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছিল। প্রচারক অবস্থায় ঠাকুর ব্রাহ্ম ডেপুটি শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইতেন। তিনি কুড়ি পঁচিশ বৎসর পরে ঠাকুরের ফটো দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন, “একি যথার্থই তাঁহার ফটো? এ যে সাক্ষাৎ মহাদেবের মূর্তি।” শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় বলিয়াছিলেন হাওড়ায় আই, সি, বম্বর একটি ছেলে ঠাকুরের ফটো দেখিয়া তাহার বাবাকে বলিয়াছিল “দেখ বাবা, শিবের মাথার সাপ দিতে ভুলিয়া গিয়াছে।”

শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা স্নান করিতে করিতে ঠাকুরের মাথায় জটা হয়। তাঁহার জটাতে তিনটি বেণী হইয়াছিল, উহাতে চুলগুলি ময়ূরপুচ্ছের রঙ্গের গ্রায় কতক কাল, কতক শুভ্র, কতক অরুণবর্ণ ও কতক নীলবর্ণ দৃষ্ট হইত। তিনি কখন কখন জটা উন্টাইয়া দাঁড়াইতেন। তখন জটারূপ চূড়ায় অলঙ্কৃত হইয়া তিনি কি এক অনির্বচনীয় শোভাই ধারণ করিতেন! তাঁহার গলদেশে সপ্তলহরী ছলিতেছে, বর্ণ শ্যাম, আকৃতি দীর্ঘকায়, দেখিতে

যেন যুবাপুরুষ । এ অবস্থায় তিনি যখন সুমধুর স্বরে প্রণবযুক্ত হরিনাম উচ্চারণ করিতেন, তখন ঐ মধুর ধ্বনি সকলেরই প্রাণ স্পর্শ করিত ।

তাঁহাকে কখন কখন যুবতীর ছায় দেখাইত । কটিদেশ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ জটা বেণীর ছায় ছলিতেছে । বক্ষস্থলে স্ত্রীলোকের ছায় সমুন্নত স্তন, চক্ষু জ্যোতিষ্মান ও দীর্ঘ । দক্ষিণ হস্তে গৈরিক বস্ত্র জড়ান একমুখি রুদ্রাক্ষ তাগার আকার ধারণ করিত । তাঁহার জটীর স্বভাবতঃই এক প্রকার স্নগন্ধ ছিল । আমরা জটা বাছিতে যাইয়া মৃগনাভির গন্ধের ছায় মধুমিশ্রিত ঈষৎ উগ্র গন্ধ পাইতাম ।

শ্রীযুক্ত শ্রামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন, একদিন তিনি গেণ্ডারিয়া আশ্রমে বসিয়া আছেন, নিম্নলিখিত ঠাকুরের রূপ বর্ণনাত্মক স্তোত্রটি ভিতর হইতে আপনি আপনি বাহির হইল :—

ওঁ স্বর্ণাভ-জটাজুটপরিশোভিতং স্বর্ণাভ-শ্মশ্রুধারিণং ।

শিরসি জটয়া চূড়কণা ফণিভূষণম্, পৃষ্ঠদেশে লম্বিতবেণীং ।

শ্রীমুন্দাবনচন্দ্রং শ্রীমন্নহাদেবং বা শ্রীমুন্দাবনবিলাসিনীং ।

নখাগ্রাং কেশাগ্রপর্য্যন্তং সুমধুরং, পরিপূর্ণমানন্দং

শ্রীরাধাজ্যোতির্ধারিণম্ ।

কলৌ পতিতবন্ধুং পতিতপ্রেমদাতারং দণ্ডকমণ্ডলুহস্তং ।

কৌপীনবহির্কাসবাসসং কণ্ঠে দোলিতসপ্তলহরীমালাং ।

মধুরহাসং, মধুরভাষং, ব্যবহারেণ চ মধুরং ।

মধুরং মধুরং পরিপূর্ণমানন্দং, সদৃশং হ্যং নমাম্যহং ।

অনেক স্থলে দেখিয়াছি মহাপুরুষগণও তাঁহাকে নানারূপে দর্শন করিয়া স্তবস্তুতি করিতেন । মহাত্মা স্বামী ভোলানন্দ গিরিও তাঁহাকে “মেরা আশুতোষ” বলিয়া ভাবে গদগদ হইয়া অশ্রুমোচন করেন । মহাত্মা নরহিংস দাস (পাহাড়ীবাবা) তাঁহাকে সাক্ষাৎ ‘শ্রীরামচন্দ্র’

প্রথম অধ্যায়

১৫

বলিতেন। মহাত্মা অর্জুন দাস (ফেপার্টাদ), “এ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু হায়, ইহা মেরা ধ্যানমে মিলে” বলিতেন। আবার কখন কখন “মেরা রাম” বলিয়াও স্তুতি করিতেন। একদিন কুস্তমেলায় ঠাকুরের সহিত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত সাধু-দর্শনে বাহির হইয়াছেন। পথে একদল সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। উহার মধ্য হইতে একজন সাধু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন “এই সদগুরু। এই সদগুরুর রূপ দর্শন কর।” ঢাকায় রমণার ফকির সাহেব ঠাকুরকে ‘সিদ্ধ ফকির’ বলিয়া প্রকাশ করিতেন। গুনিয়াছি প্রতিনিয়ত হরিনাম করিতে করিতে শরীরে এক অভিনব দিব্য সৌন্দর্য্য জন্মে। শ্বাসপ্রশ্বাসে বাঁহাদের ভগবানের ‘নাম’ হয় তাঁহারা ক্রমে ভগবতী তনু লাভ করেন। তাঁহাদের রক্তে, মাংসে, প্রতি লোম-কূপে, অস্থিতে অস্থিতে, শরীরের প্রতি অণু পরমাণুতে আপনা আপনি ভগবানের নাম হইতে থাকে। ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িবার অল্পকাল পূর্বে বলিয়াছিলেন, “আমার অস্থিতে অস্থিতে, রক্তেতে তাঁহার ‘নাম’ উজ্জলরূপে জলিতেছে, এ কল্পনা নয়, সত্য, সত্য, বাস্তবিক, বাস্তবিক।” একদিন গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আম গাছের তলে বসিয়া ঠাকুর তর্জ্জনীর মূলদেশে একটি কাল দাগ আমাকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “বাঁহাদের শ্বাসে শ্বাসে ‘নাম’ হয়, তাঁহাদের হাতে এরূপ দাগ পড়ে।”

ঠাকুরের শরীরের সৌন্দর্য্য সকলকেই আকর্ষণ করিত। অনেকে নির্বাক হইয়া তাঁহার মধুর রূপ দর্শন করিয়া আনন্দে ডুবিয়া যাইতেন। অনিমেঘ নয়নে সেই রূপ দর্শন করিতেন। তাঁহার রূপের বর্ণনা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার রূপ ভাবাবেশে নূতন নূতন হইত। কখন বসিয়া পাঠ করিতেছেন ভাবে মুখ অরুণবর্ণ হইয়াছে, চক্ষে জল-ধারা পড়িতেছে।

এই প্রকারে হেরিসন রোডের বাসায় দিন চলিল। কত লোক নানা

স্থান হইতে কত অর্থ ব্যয় করিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন ; এই সময়ে কুলীন গ্রামের বহু লোক আসিয়া সাধন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় দীনহুঃখী, হাড়ি, ডোম প্রভৃতির সাধনের জন্ত কাতর হইয়া ঠাকুরকে জানাইয়াছিলেন। হরিদাসবাবুর বিনীত প্রার্থনায় ঠাকুর তাহাদিগকে দীক্ষা দেন। ফরিদপুরের এবং অগ্নাত স্থানের বহু লোক আসিয়াও ঐ সময়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

অতিথি-বেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের আগমন

এই বাসায় একদিন একটু অধিক বেলায় তিনজন অতিথি আসিয়া দরোয়ানের নিকট আহাৰ্য্য প্রার্থনা করিলেন। দরোয়ান “এখন মিলিবে না” বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিল। ঠাকুর এই সময়ে পায়খানায় ছিলেন, তিনি ইহা শুনিতে পাইয়াই চীৎকার করিয়া বলিলেন, “দেখ, অতিথি তিনজন কোন্‌দিকে গেলেন।” আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আর তাহাদিগকে পাইলাম না।

দিদিমাতা ঠাকুরাণী এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে শান্তিপুর গিয়া-ছিলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, “আমার শান্তিপুর হইতে রওনা হইবার পূর্বে দিবস, তোমাদের বাড়ীতে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। তিনজন অতিথি আসিয়া ৬শ্রামসুন্দরের প্রসাদ চান। যোগীনের স্ত্রী বলিলেন, ‘এখন আর প্রসাদ নাই, যাহা আছে তাহা এক-জনের মত হইতে পারে, অল্প দিন আসিবেন।’ অতঃপর দুই প্রহরের সময় যোগীনের স্ত্রী শয়ন করিয়াছে, স্বপ্নে দেখে যে ৬যোগীন ও তিনজন সাধু আসিয়াছেন। সাধুদের বগলে বাঘের চামড়া। সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, ‘তুই আজ আমাদিগকে প্রসাদ দিলি না।’ এই বলিয়াই চলিয়া গেলেন। যোগীনের স্ত্রী এই ঘটনায় খুব আক্ষেপ করিয়াছে।” সকল কথা শুনিয়া

প্রথম অধ্যায়

১৭

ঠাকুর বলিলেন, “হ্যাঁ তাঁহারা এখানেও আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ঐ বেশেই গিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়া গেলেন ‘আমরা শ্রামশূন্যের প্রসাদ পাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু দিল না। তুই, তিনজন অতিথিকে রোজ ভোজন করাস, তাহা হইলেই আমরা পাব।’ এই সময় হইতে হারিসন রোডের বাসায় ও শান্তিপুর নিজ বাটীতে নিত্য তিনজন অতিথি-সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সরস্বতী-পূজা

এই বৎসর সরস্বতী-পূজার দিন প্রাতে ৯।০।১০টার সময় ঠাকুরের দৌহিত্র দাউজি সরস্বতী-মূর্তির জন্ত রোদন করায় ঠাকুর মণিবাবুকে বলিলেন, “তুমি একখানা ঠাকুর আনিয়া দেও।” তদনুসারে মণিবাবু একখানা ছোট সরস্বতী-প্রতিমা আনিয়া, ঠাকুরের আদেশক্রমে, তাঁহার ঘরের উত্তর পার্শ্বে, তুলসী টবের পশ্চিম পার্শ্বে স্থাপন করেন। পরে ঠাকুরকে ফুল, আবির প্রভৃতি দেওয়া হয়। বৈকালে অনুমান ২।২।০টার সময় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় ও অত্র দুই তিনজন লোক ঠাকুরের ঘরে বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ‘মা’, ‘মা’ বলিয়া ডাকা-মাত্রই কৈলাসবাবু দেখিলেন যে সমস্ত ঘরটি অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া গেল এবং ঐ ছোট সরস্বতী মূর্তি প্রমাণ আকার ধারণ করিয়া বীণা-হস্তে দাঁড়াইলেন। এইরূপ দর্শনমাত্রে কৈলাসবাবু অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সংজ্ঞালাভ হইবার পর সেই মূর্তিকে পূর্ববৎ ছোট দেখেন।

কৈলাসবাবুর স্ত্রীর পীড়া ও ঠাকুরের কৃপা

শ্রদ্ধেয় কৈলাসবাবু এই সময়ে তাহার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপা ও সহানুভূতি ব্যঞ্জক একটি সুন্দর ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যথা—“আমি প্রতিদিন ভোরে হারিসন রোডের বাড়ীতে গোস্বামী মহাশয়কে

দর্শন করিতে যাইতাম। রবিবার ছাড়া অল্প দিন প্রাতে ৯।০ ঘটিকা পর্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিতাম। আমার জ্বর পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে প্রাতে যাইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতাম। এইরূপ তিন চার দিন চলিয়া আসিবার পরে ঠাকুর একদিন পশ্চিমের বারান্দায়, হারিসন রোডের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময় আমি যেমন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া উঠিয়াছি, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে, অসুখ করেছে কি?” আমি বলিলাম, আমার কোন অসুখ হয় নাই, তবে আমার জ্বর অত্যন্ত পীড়িত।” এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আমাকে রোগের অবস্থা ও কিরূপ চিকিৎসাদি হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত অবস্থা বিস্তারিত বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন, “ভয় নাই, যখন রোগী একটু সুস্থ থাকে, দুই একবার ‘নাম’ করিতে বলিবেন।” তাঁহার দৃষ্টি ও কথায় এমন একটা সহানুভূতি বোধ করিলাম যে আশার সঞ্চার হইল। রোগের প্রথম অবস্থায় আমার জ্বর একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, “তাঁহার (গোঁসাইয়ের) পাদোদক খাইতে ইচ্ছা হয়।” আমি এত দিন সাহস করিয়া গোঁসাই মহাশয়কে একথা বলি নাই, আজ তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, “আমার পাদোদকের দরকার নাই, আমার গুরুদেবের নিবেদন আছে। কোন ব্রাহ্মণের (বাহাকে আপনাদের ভক্তি হয়), পাদোদক খাওয়াইতে পারেন।” ‘ব্রাহ্মণ বাহাকে ভক্তি হয়’, কথাটা আমার ভাবানুযায়ী বলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাতে একটু গোল বাধিল। ২।৪ দিন ভাল ব্রাহ্মণের খোঁজ করিলাম। কিন্তু কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না। অবশেষে কথাটি একবারে বিন্মত হইয়া গেলাম। এই কথা আমি কাহাকেও বলি নাই। এমন কি আমার জ্বকেও জানাই নাই। আমার জ্বর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে চলিল। কার্তিক মাসের প্রথম ব্যারামের অবস্থায়

প্রথম অধ্যায়

১৯

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন কবিরাজগণ একমাস আন্দাজ চিকিৎসা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। পরে শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, এম, ডি, একমাস চিকিৎসা করেন। তাঁহার চিকিৎসা-তেও কোনরূপ প্রতিকার না হওয়ায় শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ মহাশয় চিকিৎসা করেন। রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে। অবশেষে মাঘ মাসে একদিন এমন অবস্থা হইল যে হাতে নাড়ী পাওয়া যায় না ও শ্বাসের টান উপস্থিত। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ, মনোরঞ্জন ঠাকুরতা, উপেন্দ্রচন্দ্র বসু, রেবতীমোহন সেন প্রভৃতি সকলেই মনে করিলেন যে ঐ দিন রাত্রি কিছুতেই কাটিবে না। আমি রোগীর অবস্থা দেখিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া রহিলাম। তখন বাড়ীতে কাহারো আছেন, কি ব্যবস্থা করিতেছেন আমি কিছুই জানি না। আমি এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে আমার কথা বলার শক্তি যেন লোপ পাইয়াছিল। বৈকালে শ্রীযুক্ত উমেশবাবু একটি ছোট পাথরের বাটীতে একটু জলের মত কি আমার জ্বীকে খাওয়াইতে সন্মুখে আনিলে হঠাৎ ঐ দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল এবং আমার স্মৃতি জাগিল। আমার মনে হইল যে ব্রাহ্মণের পাদোদক দেওয়া হইতেছে। ইহার দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর অবস্থা পরিবর্তন হইতে লাগিল। আমি উমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে বেলা ৩টা কি ৩টার সময় রোগীর বাঁচিবার কোন আশা নাই ও আসন্ন সময় সন্নিকট মনে করিয়া তাঁহারা পরামর্শ করিয়া কুঞ্জবাবুকে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন এবং কুঞ্জবাবু তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলিলেন, “আর ঔষধ খাওয়াইবার প্রয়োজন নাই, তবে যদি নিতান্ত ইচ্ছা হয় তবে একটু-আধটু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াইতে পারেন এবং ব্রাহ্মণের যে পাদোদক খাওয়াইবার কথা ছিল তাহা খাওয়াইয়া দিন।” কুঞ্জবাবু ফিরিয়া আসিয়া এই কথা বলিলেন। এই সময় যোগজীবন

গোস্বামী ও দিদিমা আমার স্ত্রীকে দেখিবার জন্য কুঞ্জবাবুর পক্ষাৎ আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। উমেশবাবু তখন যোগজীবনবাবুর পাদোদক লইয়া আমার স্ত্রীকে খাওয়াইয়া দিলেন। কুঞ্জবাবু যে গোসাইয়ের নিকটে গিয়া জানাইয়াছেন ও তিনি কি বলিয়াছেন আমি কিছুই জানিতাম না। কথাটি শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম; ভাবিলাম ব্রাহ্মণের পাদোদক যে খাওয়ান হয় নাই, তাহা ত কাহাকেও বলা হয় নাই; তিনি কি প্রকারে বুঝিতে পারিলেন? বুঝিতে পারিলাম এটি তাঁহার বিশেষ কৃপা। তখন চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল ও কিছুকাল স্তম্ভিতের স্থায় পড়িয়া রহিলাম। এই ঘটনার পরে এই মুমূর্ষু রোগীকে আর কোন ঔষধ খাওয়ান হয় নাই এবং সে আশু আশু অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়াছিল।

গ্রামোফোন শ্রবণ—হিমালয়ে বেদধ্বনি—কঙ্কালবাবা

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত এবং বিজয়চন্দ্র দত্তকে আনিয়া ঠাকুরকে ফনোগ্রাফ্ (Phonograph) শুনান।

এই উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রবাবুর সহিত ঠাকুরের নানা প্রসঙ্গ হয়। নৃপেন্দ্রবাবু দয়া করিয়া ইদানীং আমাকে চিঠি লিখিয়া সে সকল লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

“শ্রদ্ধাম্পদেবু.....১৮৯৮ সালে বোধ হয় মাঘ মাসে আমি তখন B. A. পরীক্ষা দিতেছি, সেই সময়ে আমাদের পূজ্যপাদ বন্ধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়া বলেন যে পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয় ফনোগ্রাফ্ যন্ত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে তিনি প্রভুপাদকে ফনোগ্রাফ্ যন্ত্রের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন

যে একদিন শ্রবণ করিবেন। তখন গ্রামোফোন যন্ত্র উঠে নাই। ফনোগ্রাফ-সবে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও সকলের ঘরে নাই, দামও বেশী। আমার এক বন্ধুর একটি ভাল ফনোগ্রাফ ছিল। আমি তাহা আনাইয়া তাহাতে দুইটি গান রেকর্ড করিয়া রাখিয়াছিলাম। সতীশবাবুর ইচ্ছা অনুসারে আমি এবং সতীশবাবু হারিসন রোডস্থ বাটীতে বেলা ২টার সময় উপস্থিত হইলাম; একটুকু অপেক্ষা করিবার পর, ব্রহ্মচারী মহাশয় আসিয়া সংবাদ দিলেন যে প্রভুপাদ ফনোগ্রাফ শুনাইবার অনুমতি দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমি এবং সতীশবাবু যন্ত্র লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম প্রভু তাঁহার আসনে বসিয়া আছেন, পার্শ্বে ধর্মগ্রন্থ সমুদয় একটি চৌকীর উপর সাজান আছে, তাহার উপর একখানি বস্ত্র ঢাকা দেওয়া আছে। আমরা যথারীতি প্রণাম করিলাম। ক্রমে আরও চার পাঁচ জন শিষ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ফনোগ্রাফে রেকর্ড পরাইয়া ভাল ভাল গান শুনাইলাম, পরে কীর্ত্তন দুইটি শুনাইলাম। একটি কীর্ত্তন “কি দিব, কি দিব বঁধু, কি দিব তোমায় হে; অন্তের অনেক ত আছে আমার কেবল তুমি হে ইত্যাদি” শুনিয়া তিনি যারপরনাই প্রীত হইলেন। কি করিয়া গান এ রকমভাবে রেকর্ড করা যায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সতীশবাবু বুঝাইয়া দিলেন। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন যে, শব্দ যে এরূপভাবে রেকর্ড করা যায় তাহা নূতন নহে। শব্দ এরূপভাবে আবদ্ধ আছে তাহা তিনি শুনিয়াছেন। হিমালয়ে এক বনস্থলীতে তিনি গমন করেন। তথায় সকালবেলায় যেন ঠিক বেদপাঠ হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি হইল। তাহার পর দিন ঠিক সেই সময়ে তিনি পুনরায় তথায় গমন করেন, পূর্ববৎ সেই পবিত্র বেদধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। মাহুষ নাই, যেন তরুলতা বেদগান করিতেছে। এইরূপে কয়েক দিন যাইয়া তিনি কারণানুসন্ধানে জানিলেন যে সূর্য্যোদয়ের

প্রারম্ভে তত্রস্থ সাধুমহাত্মাগণ আসিয়া বেদপাঠ করিয়া চলিয়া যান। সেই সুগভীর নাদ, সেই পবিত্র শব্দ, সেই নীরব নিস্তব্ধ বনস্থলীতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতে থাকে। তিনি আরও বলিলেন যে- তিনি মধ্যরাত্রের পর নবদ্বীপে শ্রীবাসের আঙ্গিনার দিক্ হইতে হরিনামের রোল উঠিতে শুনিয়াছেন। আর একটি গল্প বলিলেন—একদা তিনি ৬গয়াধামে ফল্গু নদীর তীরে বসিয়া আছেন তখন বর্ষাকাল; ফল্গুর জল-স্রোতে স্থানে স্থানে পাড় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। তিনি যে স্থানে বসিয়া-ছিলেন তাহার নিকটের এক জায়গা ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেখিলেন কাহার সমাধি ভাঙ্গিয়া কতকগুলি অস্থি বাহির হইয়া পড়িল। তাঁহার একটু কৌতূহল হওয়াতে তিনি একখানি অস্থি তুলিয়া দেখিলেন যে স্পষ্ট ‘রাম-নাম’ লেখা আছে। তিনি বলিলেন যে মহাত্মার সমাধি, রাম নাম তাঁহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া গিয়াছে, প্রত্যেক হাড়ে ঐ পবিত্র নাম অঙ্কিত হইয়া আছে। এমনই নামের শক্তি।

আর একটি স্থানের কোন বৃক্ষের পত্রে, ছালের ভিতরে ‘কৃষ্ণ নাম’ অঙ্কিত দেখিয়াছিলেন।

আর একজন সাধুর কথা বলিলেন, তাঁহার নাম ‘কঙ্কালবাবা’। বৃন্দাবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার দেহে মাংস নাই, মজ্জা নাই, শিরা নাই, কেবল কঙ্কালমাত্রসার। কেবল সেই কঙ্কালমাত্রসার মুখমণ্ডলে দুইটি নয়ন রহিয়াছে। আর আশ্চর্য্যে জিহ্বা আছে। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—“বাবা, আপনার দেহ এরূপ কেন?” তাহাতে সাধু বলিলেন, “যাহা দ্বারা কোন কার্য্য নাই তাহা নষ্ট করিয়াছি। কেবল চক্ষু আছে শ্রীভগবানের লীলা দেখিবার জন্য, আর জিহ্বা আছে তাঁহার নাম করিবার জন্য।”

ফনোগ্রাফ্ বন্ধ করা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার সামনে

গান রেকর্ড করা যায় কি না? আমি বলিলাম, “যায়, তবে আজ আমার নিকট সিলিঙারু নাই।” তিনি বলিলেন যে শান্তিপুত্রের তাঁহার এক দাদা আছেন। তিনি ভাল কীর্তন গাইতে পারেন। তাঁহাকে আনাইয়া তাঁহার কীর্তন রেকর্ড করাইবেন। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারী তাঁহার পায়ে মলম লাগাইয়া দিলেন। পথে লোক যাইতেছে দেখিয়া বলিলেন যে, “আমি দেখিতেছি সকলে হন্ হন্ করিয়া যাইতেছে, যেন কত ব্যস্ত, মহা কাজ তাহার হস্তে, কেহ মনে করে না যে, তাহার কাজ নাই বা কাহার কাজ সে করিতেছে। আশ্চর্য! আশ্চর্য নহে কি? তাহার পর আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম। ইহার দুই দিন পরে আমি আবার ফনোগ্রাফ ও দুইটি নূতন সাদা (Blank) রেকর্ড লইয়া যাই, তাঁহার শান্তিপুত্রের দাদা তখন আসিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে দুইটি কীর্তন রেকর্ড করা হইল এবং রেকর্ডের পর পুনরায় বাজাইয়া শ্রবণ করান হইল। একটি ছোট ছেলে (দাউজী) আসিলে প্রভু আবার একটি ইংরাজী ব্যাণ্ড বাজাইতে বলিলেন, আমিও বাজাইয়া শুনাইলাম। কি কীর্তন রেকর্ড করা হইল তাহা আমার মনে নাই। আসিবার সময় প্রণিপাত করিলাম। তিনি, মঙ্গল হউক, বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার সেই প্রীতিপ্রফুল্ল গম্ভীর মুখমণ্ডল ও সেই আশীস্ বাণী আজও আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই দুইটি দিন আমার কি আনন্দে কাটিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। আমার ফনোগ্রাফ বাজান সার্থক হইয়াছিল। আমার সহিত বোধ হয় আমার প্রিয়তম বন্ধু বিজয় ছিলেন। সতীশবাবু বলিলেন যে প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। আমরা কৃতার্থ হইলাম। তাঁহার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। তাঁহার ভক্তবৃন্দের চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম। আপনারা ধন্য, আপনারা বহুকাল ধরিয়া তাঁহার সঙ্গ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্

আপনাদের মঙ্গল করুন। তপঃ বর্দ্ধিত করুন। শ্রীশ্রীসীতাপতি রামচন্দ্র আপনাদিগকে সতত রক্ষা করুন। আপনারা বলুন যে জয় শ্রী সীতাবর রামচন্দ্র কি জয় !!

প্রণতঃ—

শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণ দত্ত।

গণেশের কীর্তন ; সূর্য্যগ্রহণ

এক সময় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কথা হইল। ঠাকুর তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন “ভগবান ইহা দ্বারা নানারূপ আবিষ্কার করাইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।” এই বাসায় প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাস ভোরে গোষ্ঠলীলা গান করিয়াছিলেন। লীলাটি যেন জীবন্ত করিয়া সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। কীর্তনে ঠাকুর ভাবাবেশে খুব নৃত্য করেন, পরে আসনে বসিয়া পড়েন। ঠাকুরের শরীর অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল। চক্ষু একেবারে পলকশূন্য হইয়া কাহার পানে যেন তাকাইয়া রহিয়াছে। গৌর মণ্ডলের ৬বলরাম দাস বাবাজী ষোড়শপায়ে লক্ষ দিয়া আশ্চর্য্য নৃত্য করিলেন। মাঝে মাঝে আমাদের ভয় হইতে লাগিল পাছে বা ছাদ ভূমিসাৎ হয়।

প্রসিদ্ধ যাত্রাগায়ক শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ও একদিন রাত্রিকালে যাত্রা গান করিয়া ঠাকুরকে শুনান। ইহারা বিনা পয়সায় গান শুনাইয়াছিলেন। জন্মাষ্টমীর সময় নন্দোৎসবে মনোহর দাস বাবাজী আসিয়া গান করেন। দধি, হরিদ্রা দ্বারা উৎসব হয় অর্থাৎ দধিতে হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া সকলের গায়ে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। ঠাকুর সদল মনোহর দাস বাবাজীকে বস্ত্রাদি দান করেন।

এই সময় একদিন সূর্য্যগ্রহণ হয়। অনেক গুরুভ্রাতা ঠাকুরের সঙ্গে

গ্রহণ দর্শন জন্ত তেতালার ছাদে আসিয়া উপস্থিত হন। গ্রহণ সময় গুরু-
ভাতারা হরিসংকীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গুরুভাতা কুঞ্জলাল নাগ ও
অন্যান্য কেহ কেহ কাঁচে কালি মাখাইয়া গ্রহণ দর্শন করিলেন। ঠাকুর
সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া গ্রহণ দর্শন করিতেছিলেন। আরও কেহ
ঠাকুরের দেখাদেখি সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া গ্রহণ দর্শন করায় কয়েক
দিন চক্ষুর পীড়ায় কষ্ট পাইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “ব্রহ্মচর্য্য ঠিক
থাকিলে চক্ষুর শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকা যায়,
নতুবা চক্ষে পীড়া জন্মে।”

এই সময়ে রাধাকুণ্ডবাসী একজন ভাল বৈষ্ণব রাধাকুণ্ড খনন উদ্দেশ্যে
ভিক্ষার্থ আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, “এ সব কাজ আপনার
নহে।” এই বলিয়া পুনরায় শ্রীবন্দাবন বাইতে অতুরোধ করেন। তিনি
সাক্ষ্য শ্রীহরি-সংকীৰ্ত্তনে ঠাকুরের ও গুরুভাতৃগণের ভাবাবেশ দেখিয়া
খুব আশ্চর্য্যাব্বিত হন।

গুরু-মর্য্যাদা

এই বাসায় একদিন একটি সাধুবেশধারী লোক ঠাকুরের নিকট
আপনাকে তৈলঙ্গ স্বামীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া ভোজন প্রার্থনা
করেন। পরে তিনি অল্প কাজে স্থানান্তরে যান। ঠাকুর ক্রমশরীতে
তাঁহার জন্ত বেলা তিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। সেদিন তিনি আর
আসিলেন না। পরদিন তিনি আসিয়া আশ্রম প্রস্তুত করিবার জন্ত
কিছু প্রার্থনা করেন। ঠাকুর দাদা গোঁসাইকে বাঞ্ছা যাহা আছে সব দিতে
বলিলেন। দাদা গোঁসাই বাড়ী ভাড়া দিবার জন্ত ২০০ ধার করিয়া
আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা সব দিয়া দিলেন। লোকটি দু’তিন জন
লোককে দুই তিনখানা নোট দিয়া বাকী টাকা লইয়া চলিয়া গেল। পরে

জানা গেল যে লোকটি কলিকাতার একটি বিখ্যাত গুণ্ডা। ঠাকুরকে এ কথা বলায় তিনি বলিলেন, “উহা আমি জানিতাম, তবে তৈলদ্বয়ামীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় গুরু-মৰ্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি।”

‘বুলির’ দূর শ্রবণ

হারিসন রোডের বাড়ীতে থাকা কালীন এক সময়ে বরিশালের লোন অফিসের সেক্রেটারী ৬হরকান্ত সেন মহাশয়ের পরিবারবর্গ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ৬হরকান্ত বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা “বুলি” (শ্রীমতী শরৎকুমারী রায়) কথা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, “আমি বরিশালে বসিয়া ঠাকুরের ‘গ্রন্থ সাহেব’ পাঠ প্রতিদিন নয়টা দশটা হইতে এগারটা পর্যন্ত শুনিতে পাই।” আমি ব্রহ্মচারীর মুখে ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যাব্বিত হইলাম এবং সময়ান্তরে শ্রীমতী শরৎকুমারীকে উপরোক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি তাহাতে বলিলেন “ঘটনা এইরূপই বটে।” শ্রীমতী শরৎকুমারী সাধন পাইয়া কিছুদিন প্রায়ই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। মাঝে মাঝে কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবী সকলের দর্শন পাইতেন। (১)

(১) কোন সময়ে ঠাকুরের সৌন্যবস্থায় নিম্নলিখিত লেখা পাঠ করিলাম। “এক ব্যক্তিকে অভিন্ন হৃদয়ে ভালবাসিলে, তাহার সুখ, দুঃখ, রোগ, আঘাত, স্পষ্টরূপ অনুভব হয়।”

আমার মাতাঠাকুরাণীর এইরূপ হইত। আমি বিদেশে যদি কোনও আঘাত পাইতাম, রোগ-বন্ত্রণায় কাতর হইতাম, অথবা কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িয়া সম্ভরচিন্তে মাকে ডাকিতাম, বাটী আসিবামাত্র মাতাঠাকুরাণী এক একদিনের ঘটনা উল্লেখ করিতেন। পাহাড়ে হুহুট্ খাইয়া মাকে ডাকিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, “সেদিন পায়ে যেন পাথর পড়িল। অত্যন্ত কষ্ট পাইলাম, ঘরে

শ্রীধরের বসন্তরোগ ও ঠাকুরের দয়া

এই সময়ে শ্রীধরজী উৎকট বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। বাসায় শান্তি-দিদির ছেলে দাউজী থাকায়, দাদা গৌসাই শ্রীধরজীকে হাসপাতালে দিবার প্রস্তাব করিলেন। ঠাকুর বিরক্তভাবে দাদা যোগজীবন গৌসাইকে বলিলেন, “তোরা কি মানুষ, যে আজীবন আমাদের আশ্রয়ে রহিয়াছে, তাহাকে এখন কোথায় পাঠাই, কেহ সেবা না করিস, আমি করিব। ইহাকে তেতালার সিঁড়ির পার্শ্বের ঘরে রেখে দে, ওদিকে কেহ যেন না যান।” ঠাকুরের মুখনিঃসৃত বাক্যই যেন কার্য্য। ঠাকুর দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার সেবার ভার দিলেন।

মনোরঞ্জনবাবুর পূজা

বুলন পূর্ণিমার দিন ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের ইচ্ছা হইল ঠাকুরকে নূতন কোপীন, বহির্কাস পরাইয়া দেন। তেতালার একখানা ছোট কুটীরে বসিবার আসন, মালা চন্দন, কোপীন বহির্কাস রাখা হইল; ঠাকুর মধ্যাহ্ন শৌচান্তর ঐ কোঠায় প্রবেশ করিলেন। ঐ ঘরে অগ্নি কেহ রহিল না। শুনিলাম মনোরঞ্জনবাবু

বসে আছি, পাথর কোথায়? তখন তাঁর ডাক্ আমার কানে বাজিল” এইরূপ অনেক ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের ‘মনোরমার জীবন-চিত্র’ গ্রন্থেও দেখিলাম তিনি লিখিয়াছেন, “হাজারীবাগে একদিন শ্রীশ্রীগুরুদেবকে ভোগ দিয়া ভাবোচ্ছাসে চীৎকার করিয়া ঠাকুরকে ডাকিয়াছিলাম, রেবতীবাবুর দ্বারা কলিকাতার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম সেই ডাক তিনি শুনিয়াছেন কিনা? ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “হাঁ তাহা আমি শুনিয়াছিলাম।”

ঠাকুরের গলে মালা দিলেন, কৌপীন বহির্দ্বার দিলেন এবং পুষ্প চন্দন ঠাকুরের শ্রীচরণে ভক্তিভরে অর্পণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলেন। বিধু ঘোষ দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন, ঠাকুরের পূজা দর্শন করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে মনোরঞ্জনবাবু উঠিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, “এ সব কাজ গোপনে করিতে হয়।” আর একদিন মনোরঞ্জনবাবু একটি সুন্দর ‘গোলাপ ফুল’ ঠাকুরের জন্ত আনিয়া সাহুরাগে, সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, ঠাকুর উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন।

মনোরমা ঠাকুরাণীর দেহত্যাগ

এই বাসায় থাকাকালীন মনোরঞ্জনবাবুর স্ত্রী মনোরমা ঠাকুরাণীর দেওঘরে দেহত্যাগ হয়। মনোরঞ্জন বাবু শুক্রবার কোন বিশেষ কাজে কলিকাতা আসিতে চাহিলে মনোরমা ঠাকুরাণী বাধা দিয়া বলিলেন, “সোমবারে যেও।” মনোরঞ্জনবাবু বলিলেন, “তুমি তো কখন একরূপ বাধা দাও না।” মনোরঞ্জনবাবু বাধা না মানিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। শনিবার সকালে টেলিগ্রাম পান, “ছোট মেয়ের কলেরা, শীঘ্র এস।” শনিবার হাওড়ায় গাড়ি ফেল হন ও টেলিগ্রাম করিয়া খবর জানিতে চান। উত্তর আসিল “দুইটি মেয়ের কলেরা।” রবিবার সকালে দেওঘরে পৌঁছিয়া দেখিলেন, “মেয়ে দুইটির অবস্থা ভাল, কিন্তু মনোরমার চারিবার ‘দাস্ত’ হইয়াছে; রোগের প্রারম্ভ হইতেই তিনি ডাক্তারী ঔষধ খাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে ঠাকুরের চরণামৃত লইতেছিলেন। পঞ্চাননবাবুর কলেরার ঔষধ প্রয়োগের চেষ্টায়, মনোরমা বলিয়াছিলেন, “আমাকে এমন ঔষধ দিও না, যাহাতে আমার নাম করিতে কষ্ট হয়।” অস্থখের প্রারম্ভেই তিনি ঠাকুরঘরে

গিয়া শুইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে কখনও তিনি ঠাকুরঘরে শয়ন করেন নাই। মাঝে মাঝে মনোরঞ্জনবাবু জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, “মনো! কেমন আছ?” উত্তর হইল, “কোন কষ্ট নাই, বেশ নাম করিতেছি।” শেষ পর্য্যন্ত তিনি নামানন্দেই মগ্ন ছিলেন। মেয়েদের অস্থখের কোন সংবাদ পর্য্যন্ত লয়েন নাই। রবিবার বৈকাল হইতে অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। সোমবার সকালে আর আশা নাই জানিয়া, মনোরঞ্জনবাবু, রেবতীবাবু কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ছেলেরাও তাহাতে যোগ দিল। তাঁহারা গাহিতে লাগিলেন, “হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ইত্যাদি।” কীর্ত্তন ও উচ্চ হরিশ্ববির মধ্যে হরিপরায়ণা মনোরমা মায়িক দেহত্যাগ করিলেন।

মনোরমাকে কারণ-দেহে দর্শন

রবিবার রাত্রে গৌসাই মোহিনীবাবুকে বলিলেন, “দেখুন, মনোরমা আসিয়াছেন।” মোহিনীবাবু বলিলেন, “ওসব আমাদের বলেন কেন, আমরা কিছু দেখিতে পাই না।” গৌসাই বলিলেন, “আপনারাও দেখিবেন।” দেখিতে দেখিতে মোহিনীবাবু একটি উজ্জল আলোকচ্ছটা দেখিলেন, তাহার মধ্য হইতে ঋতবস্ত্র-পরিহিতা মনোরমা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইলেন। মোহিনীবাবু বলিলেন, “আমাদের বাড়ী যাবেন না।” মনোরমা বলিলেন, “এখন শাস্তির সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি। আমার বড় কাজ। সময় পাইলে আপনাদের বাড়ীও যাইব।” গৌসাই বলিলেন, “মনোরমা কারণ-দেহে আসিয়াছিলেন।” মোহিনীবাবু বলিলেন, “মনোরমা কি তবে দেহত্যাগ করিয়াছেন?” গৌসাই বলিলেন, “মুক্ত পুরুষেরা দেহত্যাগের দুই প্রহর পূর্বে শরীর ছাড়িয়া বিচরণ করিতে পারেন।”

মনোরমার শ্রাদ্ধ

গঙ্গাতীরে মনোরমার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। আশ্রমের সকলকে এতদুপলক্ষে ভোজন করান হইয়াছিল। মনোরঞ্জনবাবু গৌসাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মনোরমা কি শ্রাদ্ধের সময় আসিয়াছিলেন?” গৌসাই বলিলেন, “আশ্চর্য্য, তিনি উপস্থিত থাকিয়া সব করিলেন। তিনি এই কিছুক্ষণ হইল সন্মুখের বারান্দায় বসিয়াছিলেন।” মনোরঞ্জনবাবু বলিলেন, “আমার ঘরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ, তাই তিনি এখনও সেই মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য বাধ্যতা!”

মনোরঞ্জনবাবু—কত লোকে কত দেব-দেবীর দর্শন পান। মনোরমা কখন কোন দেব-দেবীর দর্শন পান নাই।

ঠাকুর—তাঁহার গুরুনিষ্ঠা এত অধিক ছিল যে, তিনি কখনও দেব-দেবীর দর্শন আকাজক্ষা করেন নাই। গুরুই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিল।

মনোরঞ্জনবাবু—তিনি কি মুক্ত ছিলেন?

ঠাকুর—তাঁহার অবস্থা যুক্তির অনেক উপরে। তিনি শুধু সংসারে থাকিয়া কিরূপে ভগবান লাভ করা যায় তাহা দেখাইবার জ্ঞান জন্ম লইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত কোটাতে গুটি পাওয়া ভার!

রেবতীবাবু—মনোরমা দেবী বলিতেন “এমন গুরু পাইয়াও আমার কিছু হইল না।” তিনি সংসারের নানা কার্য্যে, সাধনে বসিতে পারিতেন না বলিয়া আক্ষেপ করিতেন।

গৌসাই—বসা না বসা তাঁহার সমানই ছিল।

গুরুশিষ্য সম্বন্ধ

একদিন মনোরঞ্জনবাবু ঠাকুরের নিকট একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। মনোরঞ্জনবাবু বলিলেন যে, “স্বপ্নে দেখিলাম, সর্বত্র এই ঢোল পিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, প্রস্তুত হও। অতঃপর দেখিলাম আপনি (ঠাকুর) একখানা জাহাজে পরিচিত গুরুভ্রাতাদের ও অপরিচিত আরও লোক সঙ্গে নিয়া চড়িয়াছেন। হিমালয়ের উপর হইতে প্রবলবেগে খরশোতে জল আসিতেছে, আমাদের জাহাজখানা সম্মুখে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। পরে দেখিলাম আপনি চিৎ হইয়া ঐ প্রবল শোতে সমস্ত গুরুভাইদের নিয়া উজান চলিয়াছেন। যে যতটুকু দূরে ছিল আপনার সহিত ততটুকু দূরে থাকিয়া সকলেই উজান চলিয়াছেন।” ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “ঠিকই দেখিয়াছেন, আমাদের মধ্যে কদাচ বিচ্ছেদ নাই, আমরা অনন্তকাল একত্রে চলিব।”

মোহিনীবাবুর স্বপ্ন-দর্শন

এই বাসাতে একদিন সকালে ঠাকুর তুলসী গাছে জল দিতেছিলেন, মোহিনীবাবু তাঁহাকে নিজের একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন :—“গত রাত্রে ১১টার সময় আপনার পায়ে পুরান ঘি মালিশ করিয়া আপনার আসনের অতি সন্নিকটে আমার কবল বিছাইয়া শয়ন করিয়া আছি। রাত্রি ১১০টা কি ২টার সময় নিদ্রিতাবস্থায় দেখি দুইজন নাগা সাধু বিভূতি-মাখা, আপনার দক্ষিণ পাশে বসিয়া, একজন আপনাকে বিভূতি মাখাইতেছে আর একজন আপনার দক্ষিণ পা টিপিতেছে এবং আপনার বামপার্শ্বে দুইটি যুবতী দেবকণ্ঠা, পরিধানে কিংখাপের বস্ত্র (অর্থাৎ সিম পাতার বর্ণ) এবং নানা অলঙ্কারে ভূষিতা ; তাঁহাদের সৌন্দর্য্যে ঘর ঘেন

আলোকিত হইয়াছে। উহারা আপনার জটা লইয়া বিননি করিতেছেন। উহাদের মধ্যে একজনের লক্ষ্য আমার দিকে পড়ায় উহারা সঙ্কুচিতভাবে সরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আপনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, ‘সঙ্কোচ করিবেন না, উনি আমারই লোক।’ ইহাতে তাঁহার সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া জটা বিনাইতে লাগিলেন। এ সময়ে আমার ভিতরে নাম ও প্রাণায়াম প্রবলবেগে চলিতে থাকায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং অপূর্ব আনন্দশ্রোতে ভাসিতে লাগিলাম। যাহা দর্শন হইল এটা কি স্বপ্ন?’ ঠাকুর বলিলেন, “না, স্বপ্ন নয়, দর্শন। ইহা কাহাকেও প্রকাশ করিবেন না।”

প্রকৃত অবস্থা—ভক্তসঙ্গ

এক দিবস শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কয়েকটি ব্রাহ্ম যুবক সহ আসিয়া ঠাকুরের নিকট ব্রহ্ম উপাসনা করেন। উপাসনা শেষ হইলে ঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, “দেখুন, শ্রীবৃন্দাবনে জগদীশ বাবা আমাকে বলিয়াছেন, ভগবানকে লাভ করিতে হইলে তাঁহার চরণাশ্রিত ভক্তজনকে আশ্রয় করিতে হয়। যেমন গাভীকে আয়ত্ত করিতে হইলে রাখালগণ গোবৎস কোলে করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকে, গাভীও দিগ্‌বিদিক্ না তাকাইয়া বৎসের পিছনে পিছনে চলিয়া যায়—তদ্রূপ।”

আর একদিন বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঠাকুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্তের গো-বৎস কোলে জনৈক লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাভী ধাবিত হইতে দেখাইয়া বলিলেন, “ঐ যে দেখিতেছ, উহাই প্রকৃত অবস্থা। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে ঐরূপেই তাঁহার ভক্তকেই ধরিতে হয়। তাহা হইলে ভগবান তাহার পিছনে পিছনে যান।”

ধর্মের পথ সূক্ষ্ম : সদগুরুর চিকিৎসা

একদিন অশ্বিনী বৈরাগী ঠাকুরকে বলিল, “রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম একটি নদী। নদীর এপারে-ওপারে একটি সূক্ষ্ম চুল রহিয়াছে। একটি দেবী ঐ চুলের উপর নৃত্য করিতেছেন। অগ্নি পারে আপনি রহিয়াছেন। দেবী আমাকে আহ্বান করিতেছেন, এবং অগ্নিকে তাকাইতে নিষেধ করিতেছেন। আমি কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিলাম, পরে কোন দিকে না তাকাইয়া উহার উপর দিয়া পার হইলাম। আপনাকে প্রকাণ্ড খেতবর্ণ মূর্তিতে দর্শন করিলাম।” ঠাকুর গুনিয়া বলিলেন, “এ স্বপ্ন নয়, যথার্থ ঘটনা; ধর্মের পথ অতি সূক্ষ্ম। ঋষিরাও ক্ষুরধারবৎ বলিয়াছেন; ইহার অর্থ পরে বুঝিবে। যতক্ষণ অভিমান ততক্ষণ এনিক্-ওদিক্ ইতস্ততঃ করা; পরে অভিমান বিনষ্ট হইলে, অগ্রসর হইয়া অক্লেশে হঠাৎ পার হওয়া যায়।” অশ্বিনী বলিল, “আমার ক্রোধ প্রভৃতি আছে।” ঠাকুর বলিলেন, “ক্রোধ প্রভৃতির এখন প্রয়োজন। এ সকলের প্রতি দৃকপাত করিও না। এ সমস্ত যাইবে। দুইরূপ চিকিৎসক দেখা যায়,—এক নিদানবিৎ আর অস্ত্র। জ্বর হইলে আনুষঙ্গিক কাহারও কাহারও মাথা ধরে, পায় ব্যথা হয়, প্লীহা যকৃৎ বর্দ্ধিত হয়। কুচিকিৎসক মাথা ধরা ছাড়াইতে ঔষধ দেন, যকৃৎ প্লীহার বেদনার চিকিৎসা করেন। কিন্তু মূলের দিকে দৃষ্টি নাই। নিদান-বিৎ পণ্ডিত জরেরই ঔষধ দেন, ইহারা ভিতরের ব্যারাম বাহিরে প্রকাশ করিয়া বিনষ্ট করেন, উহা গেলেই আনুষঙ্গিক সমস্ত উপসর্গ দূর হয়। তদ্রূপ ক্রোধ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সংগুরু অভিমানের প্রতি আঘাত করেন। অভিমান বিনষ্ট হইলে সকল বিনষ্ট হইবে। ভিতরের কুভাব জাগ্রত করিয়া বিনষ্ট করেন। এ শক্তি যাহারা পাইয়াছেন তাঁহাদেরই এইরূপ। অস্ত্রের নিন্দা প্রশংসা কিছু নহে। ‘নাম’ যখন করিবে

একবার করিলেও খাস-প্রস্থাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিও। তাও না হইলে যদি কখন ঐরূপ হইয়া থাকে তাহা স্মরণ করিয়া ভক্তিবাবে নমস্কার করিও। বাহিরে ক্রোধ প্রভৃতির প্রয়োজন, উহা দ্বারা অভিমান নষ্ট হয়।”

অত্যাচারের পরিণাম

ধনীলোকের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুর একদিন গল্প করিলেন। “আমার বয়স যখন সাত আট বৎসর তখন একবার শিশুবাড়ী যাই। শিশুরা বড়লোক। তাহাদের প্রজা একটি দরিদ্র কৃষক ৫৬ শত টাকা জমাইয়াছে জানিতে পারিয়া ঐ ধনী ‘আমরা কোঠা বাড়ী করিব’ বলিয়া ঐ টাকা চাহিল। সে অস্বীকার করিলে উহাকে বাড়ী আনিয়া হস্তে ইট দিয়া ‘লাড়ু গোপাল’ করিয়া রাখিল। ইট পড়িলেই, প্রহার করিতে লাগিল। ইহা দর্শন করিয়া আমার হৃৎ রহিল না। আমি ‘ইহারা খুন করিল রে, মারিল রে’ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমাকে ভুলাইয়া, উহাকে লইয়া ইহারা আধার ঘরে বন্ধ করিল। আমি টের পাইয়া তথা হইতে তাহাকে হাত ধরিয়া আনিলাম এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম, ‘ইহাকে ছাড়িয়া না দিলে তোদের বাড়ীতে ‘ঘুষু’ চরিবে।’ এখন তাহাদের ঘোর দুঃবস্থা।”

সাধুদর্শন : সূর্য্যবাবুকে উপদেশ

শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা সূর্য্যনারায়ণ রায়কে একদিন ঠাকুর বলিলেন “কাশীতে যখন আমি ছিলাম, তখন একটি সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি নিজেকে বাহিরে পাগলের স্থায় প্রকাশ করিতেন। একদিন ঘাটে বসিয়া আছেন, আমিও নিকটে বসিয়া আছি। ঘাট হইতে একে একে সকলে চলিয়া গেল। সাধুটি আমাকে বলিলেন “তুই যাস্ না কেন, তুইও যা।” আমি

প্রথম অধ্যায়

৩৫

বলিলাম, “আমি যাব না।” তাতে তিনি বলিলেন, “তোমার গায়ে হেগে দেব, প্রস্রাব ক’রে দিব।” আমি বলিলাম “দিব্ না, বাপেও ত দেন, তাতে আর কি হয়, গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিব।” পরে একটি শিশু খাবার আনিতে তিনি খাইলেন, আমাকেও দিলেন। সাধুটি বলিলেন নিজেকে খুব ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা কর। অন্তরে ভক্তি করিয়া নিজেকে ছোট দেখিতে দেখিতে ভগবানের কৃপা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নিজেকে খুব গোপন করিতে হয়। নিজের ভিতর ঢুকিয়া বাইতে পারিলেই হইল।”

সূর্য্যবাবুকে আরো বলিলেন, “আপনি যে অবস্থায় আছেন এইরূপই থাকিতে হইবে। চাকরি চাকরি করিয়া আর ঘুরিবেন না। লোকে যখন নিন্দাদি করিবে চুপ করিয়া ভিতরে ডুবিয়া নাম করিবেন। অসহ্য হইলে উঠিয়া একান্তে একটু পায়চারি করিবেন।” পরে কথায় কথায় বলিলেন “মহিমন্তব শৈবমাত্রেয়ই পাঠ্য।”

ভগবানের সামঞ্জস্য

ঠাকুর পুনরায় গল্প করিলেন। “কেহ শীত চাহিতেছে, আর একটু পরেই গরমের প্রয়োজন। এক বুড়ি রোদ্রে ‘বড়ি’ শুকাইতেছিল, হঠাৎ মেঘ দেখা দিল। বুড়ি প্রার্থনা করিল একটু রোদ্র হউক। পার্শ্বে এক চাষা ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে। জলাভাবে চারা বুনিতে পারিতেছে না। চারাগুলি মৃতপ্রায়। চাষা প্রার্থনা করিল ভগবান একটু জল হউক। এই প্রার্থনা শুনিয়া বুড়ি রাগিয়া বলিল, ‘আমার প্রতি হিংসা করিয়া তোমার এরূপ প্রার্থনা।’ চাষার স্ত্রীও প্রত্যুত্তরে বলিল, ‘আমার চারা নষ্ট করিবার জন্য তোমার এ প্রার্থনা।’ এই বলিয়া উভয়ে ঝগড়া করিতে লাগিল। ভগবানই কেবল সকলের সামঞ্জস্য করিতে পারেন। তিনি

বুড়ি হইয়া জল দিয়া চাবার ক্ষেতে শস্য জন্মাইতেছেন, আবার রৌদ্র হইয়া বুড়ির 'বড়ি' শুকাইতেছেন। আবার তিনিই 'চাষা,' তিনিই 'বুড়ি'।

সাধারণ উপদেশ

(১) বাক্য যত সংযম করিতে পারিবে হৃদয়ে ততই শান্তি লাভ করিবে।

(২) আচার্যের নিকট শাস্ত্র পাঠ না করিলে শাস্ত্রার্থ বুঝা যায় না। ঋষিবাক্যে যত শ্রদ্ধা ভক্তি হ'বে ততই শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(৩) 'নাম' করিলেই সব তত্ত্ব প্রকাশ হয়। কলিতে 'নাম' ও দান। যাহারা ধর্ম অর্থাদির অনুষ্ঠান করিবেন দানই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সাধন। যাহারা ভগবানের আরাধনা করিবেন তাঁহাদের কেবলমাত্র 'নাম'। সব মুনি ঋষি কলিতে নামই ভগবৎ লাভের উপায় বলিয়াছেন।

(৪) ধর্মের প্রাধান্য সত্যযুগ। নীতির প্রাধান্য ত্রেতাযুগ। শক্তির প্রাধান্য দ্বাপরযুগ। ধনের প্রাধান্য কলিযুগ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি সর্বদা লোকের মনে ঘুরিতেছে। যখন লোকের মনে সত্যযুগের আবির্ভাব হয় তখন প্রলোভনের বস্তু কোলের উপর লইয়াও পরিত্যাগ করে। পর মুহূর্ত্তে কলিযুগের আবির্ভাব হইলে ভাবে "আহা, এমন বস্তু পাইয়াও পরিত্যাগ করিলাম কেন?"

(৫) ভূতে যেমন মানুষকে ধরে, ধর্মও সেইরূপ মানুষকে ধরে। যাহাকে ভূতে ধরে, তাহার যেমন আপনার উপর কর্তৃত্ব থাকে না, ভূত যেখানে নিয়ে যায়, সেথায় যায়, যাহা করায়, তাহাই করে; যাহাকে ধর্ম ধরে তাহার অবস্থাও তদ্রূপ।

(৬) যাহা প্রত্যক্ষ না করিয়াছি তাহা বলা মিথ্যা কথা বলার সমান।

নেপালী সাধুকে মহাভারত দান

এই বাসায় একদিন একটি নেপালী সাধু ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে পুনঃপুনঃ কিছু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সাধু বলিলেন, “যদি দানই করিবেন তবে সর্বশ্রেষ্ঠ দান করুন। আমাকে একখণ্ড মহাভারত দিন।” ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার সংস্কৃত সমগ্র মহাভারত দান করিলেন।

একদিন কথায় কথায় ঠাকুরের মুখে শুনিলাম যে বোম্বাই-এর ছাপা মহাভারত বর্তমান সময়ে সর্বোৎকৃষ্ট। আশ্রমে এই গ্রন্থ ছিল না। ঠাকুর ইতঃপূর্বে তাঁহার সংস্কৃত মহাভারত একটি সাধুকে দান করিয়াছিলেন। ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ঐ গ্রন্থ খরিদ করিয়া দিতে আমার প্রবল ইচ্ছা হইল। বড়দাদা ডাক্তার হরকান্ত বাবুকে ইহা জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ এই জন্ত পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। বড়বাজার হইতে বোম্বে ছাপার একখণ্ড মহাভারত ৪২ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া আনিয়া ঠাকুরকে দিলাম। তিনি উহা পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “টাকা কোথায় পাইলে?” তাহাতে বড়দাদার নাম করিলে তিনি বলিলেন, “তুমি কি আমার নামে তাঁহার নিকট হইতে টাকা চাহিয়া আনিয়াছ?” আমি কহিলাম, “আপনার ইহা প্রয়োজন এবং আমারও উহা আপনাকে দিতে খুব ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই বড়দাদাকে জানাইয়াছিলাম।” তিনি আর কিছু বলিলেন না। পরে কথায় কথায় বলিলেন, “যে গৃহে রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত থাকে তথায় সমস্ত তীর্থ বর্তমান। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত আশ্চর্য্য জিনিস। গীতা, ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, ও কাম সম্বন্ধে; পরে “হরেনাট্টমিব কেবলম্।”

তৈলঙ্গ স্বামী ও দীক্ষা

ঠাকুর গুরুভাতা গোষ্ঠীবাবুকে বলিলেন, “কাশীতে বিশ বৎসর পরে আবার যাই। তৈলঙ্গ স্বামীকে গিয়া দেখি প্রস্তাব করিয়া কালীর মুখে, বুকে, পায়ে দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, ওকি করিতেছেন? তিনি বলিলেন, ‘গদ্যোদকম্’, তখন ইহা বুঝিলাম না। স্বামীজী ‘অসিতে’ ডুব দিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে ভুস্ করে উঠিতেন। অত সিঁড়ি এক দৌড়ে উঠিতেন। একদিন দাক্ষিণাত্যের এক রাজার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতে-ছিলেন। দারোয়ান পায়ে পড়াতে একটু দাঁড়াইলেন। এই অবসরে রাজা আসিয়া অহুরোধ করিয়া তাঁহাকে অন্তরে লইয়া গেলেন। আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন কিন্তু আমি পাছে পাছে গেলাম না। তাঁহার হাতে, কোমরে, বাহুতে, মাথায় সোণার অলঙ্কার ও খুব উৎকৃষ্ট চীনা পট্ট কাপড় পরাইয়া দিলেন। কাশীর শুল্লু আসামাত্র নমস্কার দিয়া সব খুলিয়া লইয়া গেল। দারোয়ানেরা পুলিশে খবর দিতে চাহিল; রাজা স্তবোধ, বলিলেন, “উহার জিনিস উনি যা ইচ্ছা করুন।” কিছু দূরে গিয়া স্বামীজী মাথায়, হাতে, বাহুতে, কণ্ঠে ইঙ্গিত করিয়া ‘কলা’ দেখাইলেন। এইভাবে, ‘ওরা আমার কি করিল? আমি যেই সেই।’ আমি বলিলাম, ‘ছুনিয়ার লোক কামিনী কাঞ্চন পাইলেই খুসী। দিলেই ভাবে, খুব দিলাম।’ মণিকর্ণিকার ঘাটে একদিন ক্লান্তভাবে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, স্বামীজী আসিয়া ইঙ্গিত করিলেন, ‘ডুব দিয়া, স্নান করিয়া এস’; বলিলাম, ‘আমি ক্লান্ত, পারিব না।’ বারবার জেদ করিলেন, আমিও হঠ্ করিলাম। কারও সঙ্গে কথা বলেন না কিন্তু আমাকে বলিলেন, ‘আমি তোমাকে মন্ত্র দিব।’ আমি কহিলাম, ‘মন্ত্র পাইয়াছি।’ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কে দিয়াছে?’ আমি উত্তর করিলাম, ‘মা’। পরে তিনি বলিলেন, ‘আমিও দিব।’ আমি বলিলাম, ‘আমার

বিশ্বাস নাই। আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক।’ তাহাতে তিনি বলিলেন, ‘ও ত আচ্ছা, আমিও ব্রাহ্মসমাজের লোক।’ তবুও আমি হঠ্ করিলাম। বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরে তেমনিভাবে তিনি আমাকে ধরিয়া চা’র ডুব দেওয়াইয়া উঠাইয়া মন্ত্র দিলেন।’ বৃন্দাবনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘শিব-মন্ত্র?’ ঠাকুর বলিলেন, ‘হাঁ।’ “মন্ত্র দিয়ে বলিলেন, ‘বসন্তের’ দাওয়াই, বসন্ত যেমন, তেমন মন্ত্র দিলাম। অল্প কথা কানে লাগিবে না। বিষয়-তুষা থাকিবে না। ইয়াদ রাখ্, হাম তোমরা গুরু নেহি।’ তিনি লোক-শিক্ষার জন্য হাজার শিবলিঙ্গ মাঝে মাঝে পূজা করিতেন। আর অঝোর-ভাবে কাঁদিতেন। পরে যখন গুরুজী আমাকে গয়ায় রূপা করিলেন, তখন তৈলঙ্গ স্বামীর মন্ত্রের কথা আমার মনে ছিল না। কাশীতে গিয়া দেখি তিনি হঠ্-যোগাদি ছাড়িয়া অঙ্গুর বৃত্তি নিয়াছেন। হঠ্-যোগ ছাড়িলে শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়। ঠুঁও সেইরূপ হইয়াছিল। গিয়া নমস্কার করিলে, দক্ষিণ বাহুর নীচ দিয়া (বোধ হয় নিয়ম আছে) আমার দিকে তাকাইলেন, চিনিয়া ফেলিলেন। লিখিলেন ‘ইয়াদ হায়?’ বলিলাম, ‘হাঁ।’ গায়ে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বৃন্দাবনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘পরমহংসজীও কি শিবমন্ত্র দিয়েছিলেন?’ ঠাকুর উত্তর করিলেন, ‘মুখেই শিবমন্ত্র, বিষ্ণুমন্ত্র বলে। সবই এক মন্ত্র।’

শাস্ত্রপাঠের নিয়ম : গৌর শিরোমণি মহাশয়

শ্রদ্ধের রেবতীবাবু ত্রীত্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের শ্লোকার্থ মাঝে মাঝে ঠাকুরের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন। ঠাকুর ছ’চারদিন তাঁহাকে ওসকলের অবয়ব করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পরে একদিন পাঠের সময় বলিলেন, “এরূপ অবয়ব করিয়া পড়িতে হয় না। প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত শ্লোক পাঠ

করিতে করিতে গ্রন্থের কুপা হইলে শ্লোকার্থ আপনিই খুলিয়া যায় ; তখন বুঝা যায় । আমিও প্রথম প্রথম ঐরূপ পাঠ করিতাম ।”

একদিন ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন, “শ্রামশূন্যের কত কাণ্ড করিয়া আমাকে ফিরাইলেন ! যে দিন প্রথম দেখা, বলিলেন, ‘আমার কথা মানিস্ না, ও ধ্বংসের পথ ।’ ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইব, দর্শন দিয়া বলিলেন, ‘ঋষিবাক্য যখন প্রকাশ হইবে তখনি বুঝিবি নিরাপদ ; তা না হইলে পতন হইতে পারে ।’ ঋষিবাক্য—শাস্ত্র, উহা কালী নয়, অক্ষয় নয় । বর্ণের স্বরূপ মূর্ত্তি আছে, স্বর আছে । শুভদিন হইলে পাথার মত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যার যার স্থানে দাঁড়ায় । ঋষিবাক্য—‘শাস্ত্র’, ‘মন্ত্র’ ।”

একদিন গৌর শিরোমণি মহাশয় এক গ্রামে ভাগবত পাঠ করিতে গেলেন । ভাগবত পড়িবার পূর্বে মহাপ্রভুর স্তব পড়িতে লাগিলেন । কোন শ্রোতা বলিলেন, “তুমি ত বড় কপট, এখানে মহাপ্রভুর স্তব কোথায় ?” শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, “হাঁ, এখানে লেখা আছে ।” তিনি কহিলেন, “কৈ আমরা ত দেখিতে পাই না ।” তিনি উত্তর করিলেন, “ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে লেখা আছে ।” তিনি বলিলেন, “তুমি ত বড় প্রতারক, দেখাতে পার ?” শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, “পারি বৈ কি । জয় মহাপ্রভু, জয় নিত্যানন্দ প্রভু, জয় অদ্বৈত প্রভু, লজ্জা নিবারণ কর ।” পরে বলিলেন, আপনাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে ।” এই কথায় তিনি এক বৈষ্ণব বাবাজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া আসিলে ঐরূপ লেখা দেখিতে পাইলেন । এই ঘটনায় গ্রামকে গ্রাম বৈষ্ণব হইল ।

বৃন্দাবন-পরিক্রমা

ঠাকুর শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায়কে বলিলেন, “আপনারা বৃন্দাবনে যাবেন ?” অভয়বাবু বলিলেন, “আজই যাব ।” ঠাকুর বলিলেন, “বেশ !

কাটিয়াবাবা, জগদীশবাবা, গোবিন্দজী, গোপীনাথজীর নিকট আগার হইয়া সাষ্টাঙ্গ দিবেন। 'বৃন্দাবনে-সংসদের অভাব হইয়াছে' সকলেই একথা বলিলেন। কাটিয়াবাবা ও কমলদাস বাবাজীকে ব্রজবাসী মাঝেই বিশ্বাস ও ভক্তি করেন। ব্রজমায়ীরা আসিয়া কমলদাস বাবাজীকে বলেন, 'ব্রজ গাঁওমে চল। তোমরা পা দলেগা, রুটি দেগা, আচ্ছা করকে সেবা করেগা।' বাবাজী বলেন, 'নেই মাই, হামরা কুছ দরকার হয় নেহি। বৃন্দাবন ছাড়কে যানেকো মেরা দিল নাহি চায়তে হয়।' বাবাজী অতি চমৎকার। চুটকি ভিক্ষা করেন। সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ আসনের চারি ধারে লইয়া বসিয়া যান। কাটিয়াবাবা সেবাকুঞ্জের ধারেই বসিয়া থাকেন। সেইখানেই তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর দর্শন পাইয়াছিলেন। তাই ঐস্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহেন না। বাবাজী ব্রজবাসী ও ছেলেদের সঙ্গে চিমটা টানাটানি ও প্রণয় কৌন্দল করেন। দেখিতে চমৎকার, শাসনও বেশ আছে। আশ্রমের সাধু কেহ আসন ছাড়িয়া রাত্রে চলিয়া গেলে পর দিন আর রক্ষা নাই। লালাজীর কুঞ্জের ব্রহ্মচারী বেশ লোক। প্রতিদিন পঞ্চকোশী পরিক্রমা করেন। কাটিয়াবাবা প্রতি বৎসরই চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমায় যান। বলেন, 'আমাদের নাগাবাবাজী প্রতিদিন চৌরাশী ক্রোশ করিতেন। আমরা কি বৎসরেও একবার করিব না?' অভয়বাবু বলিলেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বাবাজী বৎসর বৎসর পরিক্রমায় যান কেন? ফল কি?' তাতে রেগে উত্তর দিলেন, 'ওকি, এক একবার পরিক্রমায় এক এক নূতন জন্ম হয়।' ঠাকুর বলিলেন, 'তাইত একবার পরিক্রমা করেই সমস্ত ঘটনা স্বদয়ে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। আর ভাগ্যে হইল না, দরকারও নাই। আশ্চর্য ঘটনা! সব ঠিকঠাকই আছে। দ্বিতীয়বার পরিক্রমায় বাহির হ'ব, হঠাৎ পায়ের অস্থ হ'ল। মনে হ'ল একবারই ভাল। আর কেন? যা অন্তরে, তার বা কিছু

গোলমাল হয়।' একজন ব্রজবাসী বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে দেবতাগণ এই পরিক্রমা করেন। ঐহাদের হৃদয়ে কোন দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের ভাগ্যে এই পরিক্রমা ঘটে।' বর্ষাণের ব্রজবাসিগণ অতি মধুর, আট, নয়, দশ বৎসরের ব্রজমায়ীরা দৌড়িয়া এসে গলা ধরিয়া বলে, দাদাজী কিছু খেতে দে।' শ্রীধর, চাউল ও চানা ভাজা দিলেন। এরা বলিল, 'এ কোন্ চিজ্ হায়।' শ্রীধর বলিলেন, 'চাউল'। 'চামেল হায় ? এরে বহিন দেখকে ধাও, চামেল মিলা।' এই বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'আর কিছু খাবার দেও।' টাকা পয়সার ধার ধারেন না। দেবেশ্বের মাসী (মন্দাকিনী) এখন আর অর্থ সাহায্য নেন না। রাধাকুণ্ডে মাধুকরী করেন। অতি সুন্দর অবস্থা। সাধুরা সন্ধ্যার পর কিছু না খাইয়া আপন আপন আসনে যাইয়া বসেন। ৯।১০টার পর উঠেন। সারারাত্রিই ভজন করেন। রাত্রিই ভজনের কাল। বাকিপুত্রের মহাস্ত ভিখনদাস তদ্বির করেন যে সাধুরা আপন আপন আসনে আছেন কিনা।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের স্বরূপ : ওঁকারের রূপ

ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ঐদের বলা হয় ও ঐদের পূজা হয়, তাঁরা এক কিনা ?" উত্তর,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সৃষ্টি প্রণালীতে ভিন্ন। কিন্তু পূজা ঐদের করা হয়, তাঁরা এক। ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। যেমন থিয়েটারে এক ব্যক্তি চাষা সাজিয়া অভিনয় করে, সেই ব্যক্তিই কোন সময়ে রাণী সাজে, এবং কোন সময়ে ঐ ব্যক্তি বীরপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করে। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্বেই চিনেন, তিনি বুঝতে পারেন যে একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিনয় করিতেছেন।

সতীশবাবু প্রশ্ন করিলেন, ‘ওঁকারের কি রূপ আছে?’ ঠাকুর বলিলেন, “ওঁকারের রূপ অনন্ত। ওঁকারের ধ্বনিও ভিন্ন ভিন্ন এবং রূপ, রস ও গন্ধও আছে।”

ক্রোধত্যাগ—আনন্দ নন্দী

গুরুভাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্তদেব প্রতিমা এবার জলে বিসর্জন হয় নাই। সেই উপলক্ষে কথায় কথায় ঠাকুর বলিলেন, “মারামারিতে মারা অর্থাৎ মার খাওয়া ভাল, কিন্তু ‘মারি’ ভাল নয়। সহ্য করার যে কি গুণ তা বলিয়া শেষ করা যায় না।”

ঠাকুর একবার ব্রাহ্মধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে কালীকচ্ছে গিয়াছিলেন। ডাক্তার পি, কে, রায় প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ ও মাতাঠাকুরানী সঙ্গে ছিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মণ্ডপগৃহে উপাসনা হইয়াছিল। উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলে বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ঠাকুরের কান মলিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য ব্রাহ্মদের উপরেও অত্যাচার আরম্ভ করিল। ঠাকুর এই সময় সকলকে কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। কীর্ত্তনে সকলের ভিতর ভাবের স্রোত বহিতে লাগিল। ঠাকুরের ভাবাবেশে নৃত্য ও হুঙ্কারধ্বনিতে সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুর বলিলেন, “কালীকচ্ছের আনন্দ নন্দী মহাশয়কে আমি কখনও ক্রোধ করিতে দেখি নাই। একজনকে দশ হাজার টাকা দিয়া নিলাম রদ্ করিতে পাঠান। সে সেই সম্পত্তি নিলামে উঠাইয়া, সেই টাকা দিয়া নিজ নামে খরিদ করে। একদিন নন্দী মহাশয়ের সহিত পথে সাক্ষাৎ হওয়ায় সে এক পাশ দিয়া সরিয়া যাইতেছিল। নন্দী মহাশয় তাহাকে দেখিয়া ডাকিয়া কহিলেন, “আমার ছিল, না হয় তোমার হইয়াছে, ইহাতে আর লজ্জা কি? বলি, তুমিও তো ভোগ করিবে? ইহাতে যান্ন-আসে

কি ?” সেই হইতে দেশ-ভরা লোক তাঁহার পক্ষ। তাঁর স্ত্রী অনেক লোকের রান্না করেন। কখন ১০০।১৫০ লোক আসে। মুসলমান শিশুর বাড়িতে যান, কিন্তু তাঁহাকে একঘরে করিতে কেহ মনেও করে না।

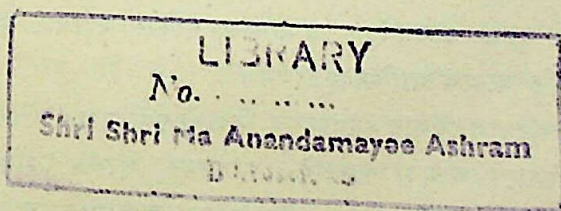
শোকে সান্ত্বনা

এই বাসায় ভক্তিভাজন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এক দিবস পুত্রশোকাক্ত হইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। তিনি সময়ান্তরে বলিয়াছিলেন, “আমার ১৬।১৭ বৎসরের ছোট পুত্র বিয়োগের ৫।৭ দিন পরে হারিসন রোডের বাসায় ঠাকুরের দর্শনে গিয়াছিলাম। তখন তিনি আমার মলিন মুখ দেখিয়া বলিলেন, ‘শোক অগ্নি।’ তাঁহার দর্শনমাত্রই আমার সমস্ত শোকতাপ যে কোথায় চলিয়া গেল বুঝিলাম না। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, ‘ইহার পিণ্ডদান নবদ্বীপে গিয়ে করিবেন।’ আমি তাহার পরদিন নবদ্বীপ রওনা হইয়া ষ্টিমার ঘাটে উপস্থিত হইলাম। সেখানে শ্রীধরবাবুকে দেখিলাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আপনি এখানে কেন আসিয়াছেন?’ শ্রীধরবাবু বলিলেন, “আপনি নবদ্বীপে ছেলের পিণ্ডদান করিতে যাইবেন, তাই ঠাকুর আমাকে আপনার সঙ্গে যাইতে পাঠাইয়াছেন।”

ঠাকুরের আবাল্য সাধন-নিষ্ঠা

প্রীতিভাজন শান্তিপুরনিবাসী বড় গোস্বামী পাড়ার শ্রীযুক্ত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন এই বাসায় আসিয়াছিলেন। তিনি কথায় কথায় ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিলেন, “গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমার বাল্যকাল হইতে ভালবাসা ছিল। তাঁহার মধ্যে বাল্যকাল হইতে একটা ধর্মের জন্ম পিপাসা দেখিয়াছি। বাল্যকাল হইতেই দেখিয়াছি, সন্ধ্যা

হইলে তিনি শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর সাধনের স্থান 'বাবলার' চলিয়া যাইতেন। কখনও রাত্রি ১২টায়, কখন ১টায়, কখন বা ২টায়, কখন বা ভোরে বাড়ী ফিরিতেন। সে স্থানে যাইয়া সাধন-ভজন করিতেন। যখন তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দলে ছিলেন তখনও তিনি অত্যন্ত ধর্মপিপাসু ছিলেন। কেহ উপস্থিত না থাকিলেও উপাসনাগৃহে বসিয়া একাকী উপাসনা করিতেন। আমি যখন রাজসাহীতে কন্ট্রাক্টারী (Contractor) কাজ করি তখন তিনি একদিন উপাসনা করিতে-ছিলেন। আমি উপাসনায় যোগ দিয়াছিলাম। দেখিলাম তিনি উপাসনা করিতে করিতে, 'জাগো মা কুণ্ডলিনী' বারে বারে বলিতে বলিতে কাঁদিয়া অধীর হইলেন। আমরাও কাঁদিতে লাগিলাম। তখন যে দৃশ্য দেখিয়াছি তাহা ভুলিতে পারিব না।" এই বলিতে বলিতে ভক্তলোকটির কণ্ঠরোধ হইল এবং চক্ষের জল দরদরধারে পড়িতে লাগিল।



দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরীর পথে

পুরীযাত্রার উত্তোগ

গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের শ্রীক্ষেত্র যাওয়ার অভিপ্রায় অবগত হইয়া চারিদিক্ হইতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। বোলপুরের উকিল শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় ৫০০ টাকা পাঠাইলেন। কাটাখাল দিয়া কটক পর্যন্ত যাইবার জন্য একখানা ছোট জাহাজ ৭০০ টাকায় ভাড়া করা হইল। আমাদের জনৈক বন্ধু হরিনারায়ণ রায় মহাশয় এজন্য বহু পরিশ্রম করিলেন। তিনি তাঁহার আফিসের সাহেবকে বলিয়া উক্ত জাহাজের কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ আমাদের সঙ্গে যাইবেন, ঠিক করিলেন।

এদিকে ঠাকুর চলিয়া যাইবেন শুনিয়া নানাস্থান হইতে বহুলোক ঠাকুর দর্শন করিতে, কেহ বা সঙ্গে যাইতে ঠাকুরের হারিসন রোডের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে পণ্ডিত ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর হইতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অত্যাশ্চর্য স্থান হইতে শ্রামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়, কুঞ্জবিহারী গুহ প্রভৃতি অনেকে আসিয়া জুটিলেন।

বরিশাল জেলার নারায়ণপুর নিবাসী দুর্গামোহন পণ্ডিত মহাশয় এবং সপরিবারে অনেক গুরুভাই আমাদের পূর্বেই কলিকাতা হইতে চাঁদবালির জাহাজে রওনা হইয়া কটকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যাত্রার উদ্যোগ চলিতে লাগিল। গ্রন্থগুলি ঠাকুরের আদেশে বাহ্যে পুরিয়া লওয়া হইল; কতক কতক জিনিষ-পত্র আমাদের গুরুভাই শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে রাখিয়া দিলাম। পথের জন্ত চাউল, ডাইল, মিষ্ট, ফলমূলাদি ও হরিরলুটের বাতাসা নেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় পথের জন্ত অনেকগুলি হাঁড়ি খরিদ করিয়া লইলেন, রাস্তায় উহাতে পাক হইবে। পাচক কেনারাম পূজারীকে পাকের জন্ত নেওয়া হইল। পুরী যাইবার উদ্দেশ্যে ঠাকুর সকলের নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন। সকলেই খুব বিমর্ষ। কলিকাতা মির্জাপুরের যে তাত্ত্বিক সাধুটি অনেক সময়েই ঠাকুরের নিকট আসিতেন, ঠাকুর যাইবেন শুনিয়া তিনি বড় কাতর হইলেন; তিনি আমাদের সঙ্গেই শ্রীক্ষেত্রে যাইতে চাহিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া নিজের আহারের খেত পাথরখানা দিলেন। রওনা হওয়ার দুই এক ঘণ্টা পূর্বে নবদ্বীপের একটি বৈষ্ণব বাবাজী (যাহাকে আমরা গাড়ুদাস বলিয়া ডাকি) উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে পুরী যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন।

ঠাকুরের বিদায়

২৪শে ফাল্গুন প্রায় দুইটার সময়, ঠাকুর বিধুবাবুকে ধরিয়া তেতালা হইতে নীচে নামিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ঠাকুরঘরে যে তুলসী গাছটি ছিল তাহা সঙ্গে লইলেন। আমরা ঠাকুরের সহিত গাড়ীতে কদমতলার ঘাটে আসিলাম। কদমতলায় আমাদের ভাড়াটীয়া জাহাজ রহিয়াছে। ঐ ছোট জাহাজখানার সহিত দুইখানা বজরা বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। একখানা বোটে ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ উঠিলেন, অন্য খানায় শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মৈত্র, দিদিমাতা, শাস্তি দিদি ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা

চলিলেন। পথে ষাওয়ার জন্ত খুব বড় ছুটা জালায় করিয়া গঙ্গাজল নেওয়া হইল, কারণ পথে লোণা জল, ভাল জল তেমন মিলে না। ঠাকুর বোট চড়িয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় হাইকোর্টের উকিল মোহিনীমোহন চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন গুহ, রাধারমণ, গুহ, স্বরেন্দ্রচন্দ্র বসু, বামাপুকুরের চারুচন্দ্র দত্ত, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, ভূতনাথ গোয়াল প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন।

ভূতনাথ গোয়াল ঠাকুরের পায়ে ধরিয়া কঁাদিতে লাগিলেন, মনোরঞ্জনবাবু কঁাদকঁাদ হইয়া পদপ্রান্তে বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর করযোড়ে বলিলেন, “আপনার আমাকে দয়া করিয়া আশীর্বাদ করুন।” মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন, “আপনাকে আমরা কি আশীর্বাদ করিব?” ঠাকুর বলিলেন, “এই আশীর্বাদ করিবেন, জগন্নাথদেব আমায় যেন গ্রহণ করেন। আমার যেন শ্রীক্ষেত্রপ্রাপ্তি হয়।” মনোরঞ্জনবাবু একথা শুনিয়া হাউ হাউ করিয়া বালকের ন্যায় কঁাদিতে লাগিলেন। স্বরেনবাবু ও রাধারমণ বাবু কঁাদিয়া অধীর হইলেন।

চারুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমরা কি করিব?” ঠাকুর বলিলেন, “ঘরে করো নাম সঙ্কীর্্তন, শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবন।” ঠাকুরের বিদায়ে গুরু ভ্রাতারা শোকে মুহুমান হইলেন।

জাহাজ ছাড়িবার সময় যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল ঠাকুরমার কথা এবং ঠাকুরের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কাহারও কাহারও ভিতর একটা বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল। অনেকেই ভাবিতে লাগিলেন, ঠাকুর যেখানকার জিনিষ বুঝি চিরকালের জন্ত সেইখানেই চলিলেন। ঠাকুরম বহুবার ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, “তুমি যথা ইচ্ছা যাইও, কিন্তু কখনো শ্রীক্ষেত্র যাইও না।” তাঁহার বিশ্বাস ছিল ঠাকুর শ্রীক্ষেত্রে গেলে আ ফিরিবেন না।

ঠাকুরের মাতার পরিচয়

ঠাকুরের মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। শুনিয়াছি ঠাকুরের মাতামহ শ্রীযুক্ত গৌরীদাস জ্যোদ্ধার, বহুদিন পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি নীলকর সাহেবদের মধ্যে কার্য্য করিতেন ও কর্তাবাবু ছিলেন। তিনি সন্তান অভাবে দুঃখিত হইয়া একবার একজন ফকিরের নিকট যান। ফকির সাহেব তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তোমার সন্তান হইবে, কিন্তু ঐ সন্তানটি যদি আমাকে দাও, তাহা হইলে দেখিতে পারি।” তিনি ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। “আচ্ছা, সন্তান হইলে ফকিরের হাতে-পায়ে ধরিয়া ঘরে রাখিব।” এইরূপ স্থির করিয়া ফকিরের বাক্যে স্বীকৃত হইলেন। সেই ফকিরের প্রভাবেই এই কন্যাটি জন্মে। তিনি, কন্যা জন্মিলে, ফকিরকে অনেক বলিয়া-কহিয়া তাহাকে কিছু বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেন এবং কন্যা-সন্তানটি ঘরেই রাখেন। কিন্তু অনেক দিন পরে ঐ বৃত্তি বন্ধ হওয়ায় ফকির চটিয়া যান। তৎপরেই ঠাকুরমাতা মাঝে মাঝে পাগল হইতেন। শুনিয়াছি ঐ ফকিরই আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাতে আবিষ্ট হইতেন।

ঠাকুরমার পাগলামি

ঠাকুরমাতা মাঝে মাঝে পাগল হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখশ্রী দেখিলে কদাচ পাগল বলিয়া বোধ হইত না। তাঁহার কার্য্য-কলাপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা অহুসন্ধান করিলেই মনে হইত তিনি যেন যথার্থই সাধনের কোন উৎকৃষ্ট অবস্থা সম্ভোগ করিতেছেন। এই অবস্থায় ঘরের জিনিষ-পত্র, ঘটা, বাটা, কাঙ্গাল দীনহুঃখীদিগকে দিয়া ফেলিতেন। এইজন্ত এ সময়ে তাঁহাকে মাঝে মাঝে বাঁধিয়া রাখা হইত। গেণ্ডারিয়ার আশ্রমে

তঁাহাকে একবার ক্ষিপ্ত অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছি, “আমি কালী, দুর্গা, চিল, পাটকেল।” মাঝে মাঝে এই অবস্থা আসিলে তিনি পলাইয়া যাইতেন।

ঠাকুর একবার প্রচারোদ্দেশ্যে পশ্চিমদেশে ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইলেন যে ঠাকুরমা পাগল হইয়া পলাইয়া গিয়াছেন। ঐ সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি বাড়ী চলিয়া আসেন। জনেক অনুসন্ধান ও সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াও তঁাহার কোন সন্ধান পান না। পরে একদিন রাণাঘাট ষ্টেশনে কয়েকটি কাঠুরিয়ার সঙ্গে তঁাহার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা বলাবলি করিতেছিল, “জঙ্গলের ভিতর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম। একটি উল্লঙ্গ স্ত্রীলোক একটা বাঘের গায়ে মাথা দিয়া শুইয়া আছেন।” তিনি ঐ জঙ্গলের নিকটে উপস্থিত হন ও গ্রামস্থ ভদ্রলোকদের সংবাদ দিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করেন। দূর হইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে তঁাহার মাতা ঠাকুরাণী বাঘের গা চাপড়াইতেছেন ও বলিতেছেন, “তুই যদি আমার হ’স তবে আমাকে পিঠে কর না। তুই আমার নয়, তুই দশভুজার, আর আমি কালী।” “ও আমার বাঘ, তুই ঘুমো, আমি তোরা জন্ম খাবার নিয়ে আসি।” ইহা বলিয়া তিনি দৌড়িয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইলেন। তখন ঠাকুর নিজের উত্তরীয় বস্ত্র তঁাহার পায়ে জড়াইয়া দিয়া তঁাহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুরমা ঠাকুরের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, “তুই কে? আমার ছেলে? তা নয়, আমার ছেলের দাড়ি হবে কেন?” পরে ঠাকুর তঁাহাকে ধরিয়া আনিয়া নিকটস্থ ভদ্রলোকের বাড়ী হইতে তৈল চাহিয়া স্নান করাইলেন; তুলসীতলায় আসন করিয়া সন্ধ্যা করিতে বলিলেন। ঠাকুরমা বলিলেন, “সন্ধ্যা কি?” ঠাকুর বলিলেন, “তুমিই ত আমাকে মন্ত্র দিয়াছিলে আমি মন্ত্র বলিব?” এই বলিয়া মায়ের কানে মন্ত্র বলিলেন। শ্রবণমাত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

৬৩

নয়ন ঝরে, ঐ দেখ তারা দু' ভাই এসেছে রে।” এইরূপে সংকীৰ্ত্তন চলিল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একজন বলিলেন, “এই স্থানে গৌরান্দ মহাপ্রভুর সহিত ভক্তবৃন্দের সম্মিলন হইয়াছিল”; ইহা শুনিয়া ঠাকুর একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। সম্ভোরাও সকলে ভাবে বিভোর। বিধুবাবু অস্থির হইয়া গেলেন। তাঁহার বহির্কাস কোথায় পড়িয়া গেল, হাত তুলিয়া নানাভাবে নৃত্য করিয়া উন্মত্তবৎ চলিলেন। এইরূপে আমরা সকলে নরেন্দ্র সরোবরের পূর্বপাড়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। ঠাকুর এই সরোবরের জল গাঙুবে গাঙুবে পান করিয়া মাথায় দিলেন এবং সকলের গায়ে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দও তাঁহার হাতে জল আনিয়া দিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন, জগন্নাথ বল্লভ মঠ হইতে খোল আনিয়া সত্যেন্দ্রকে বাঁজাইতে দিলেন। কীৰ্ত্তন আরও জমিয়া উঠিল। এইরূপে কীৰ্ত্তন করিতে করিতে আমরা ধীরে ধীরে বড় রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম এবং আমাদের জন্ত নির্দিষ্ট বড় দাণ্ডের পূর্বপার্শ্বস্থিত, নীলমণি বর্ষণের পুরান দোতারা বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীতে প্রবেশকালে দরজায় দাঁড়াইয়া ঠাকুরের একটি শিষ্ট ভাবাবেশে স্ত্রীলোকের শ্রায় স্তম্ভল উলুধ্বনি করিয়া সকলকে পরম আদরের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমান সতীশ, মণিবাবু ও কুঞ্জ চাঁদা ১০টি গরুরগাড়ীতে জিনিষ-পত্র লইয়া পরে আসিলেন।

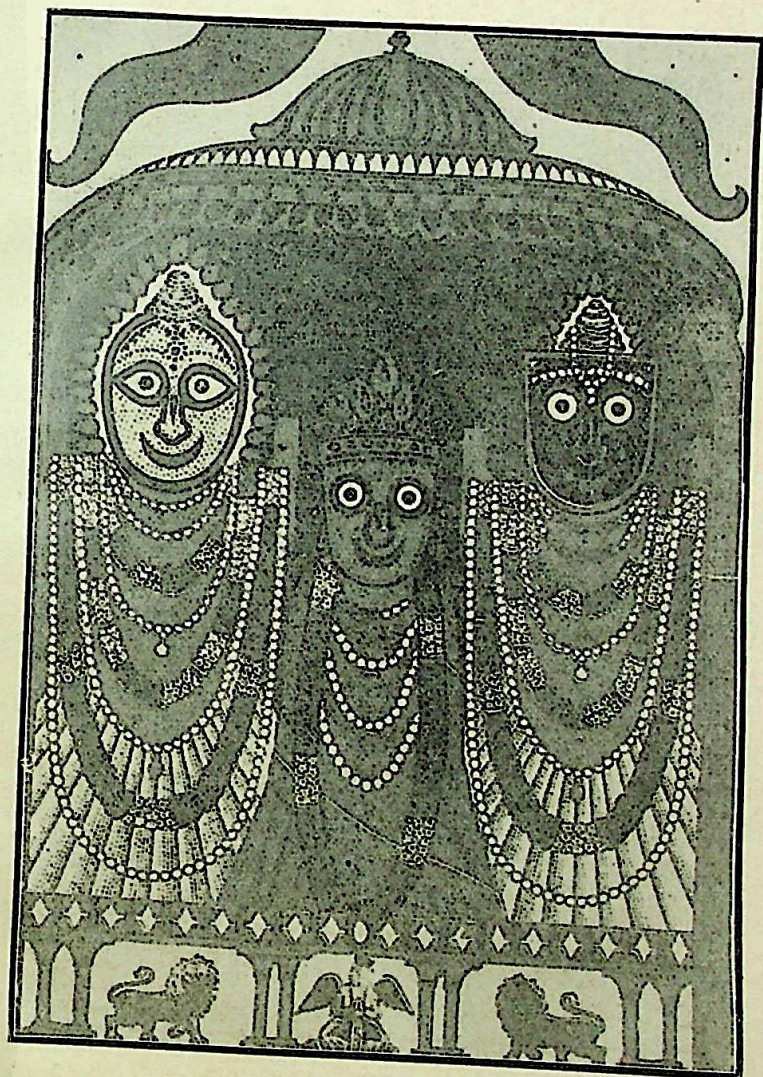
• বাসায় আগমন ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ

ঠাকুর বাসায় একটু বিশ্রাম করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে সকলের সঙ্গেই বসিয়া গেলেন। এই সময়ে মণিবাবু অগ্ৰজ ছিলেন, ঠাকুর তাঁহার জন্ত একখানা পাতা নিজেই পাশে পাতিয়া রাখিয়া “মণি”, “মণি” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মহাপ্রসাদ গ্রহণকালে আসনে বসিতে

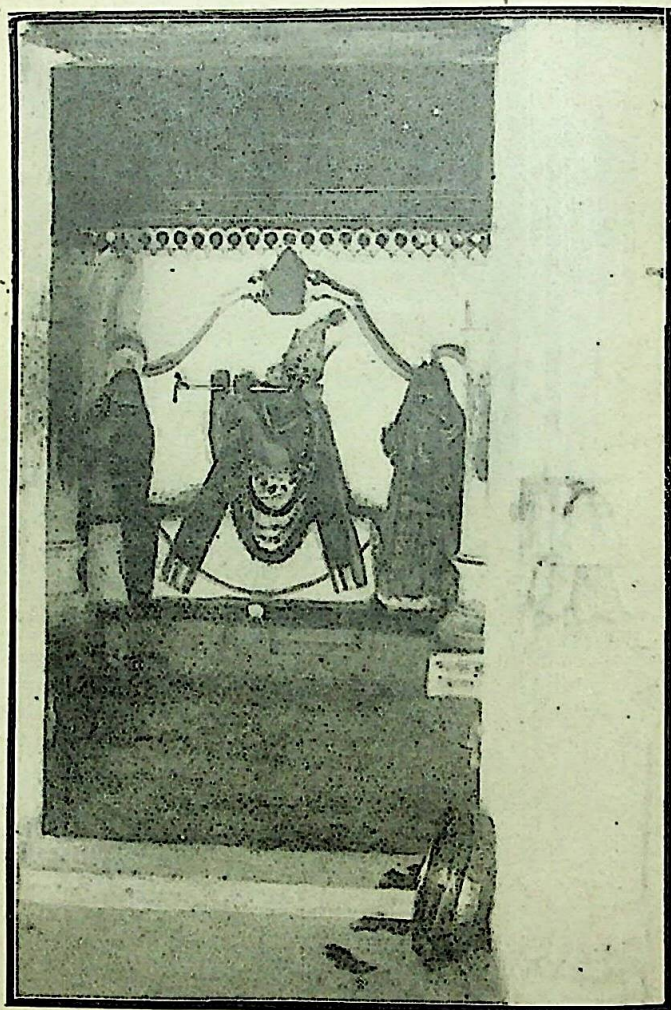
নাই, তাই ঠাকুর ও আমরা সকলে ভূমিতেই বসিলাম। ঠাকুর পাণ্ডাদিগকে বলিলেন, “আমি তো এখানকার নিয়মপ্রণালী কিছুই জানি না, আপনারা আমাকে শিখাইবেন।” মহাপ্রসাদ পাইতে পাইতে ঠাকুর মণিবাবুর পাতা হইতে স্বয়ং কিছু গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন, “মণি, সকলের পাতা হইতে কিছু কিছু মহাপ্রসাদ আমাকে আনিয়া দেও”; মণিবাবু তাহাই করিলেন, ঠাকুর তাহা সাদরে আহাৰ করিলেন।

জগন্নাথস্বামী দর্শনে ভাবাবেশ

আহারান্তে ঠাকুর জগন্নাথদেবের দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন। “আজই দর্শন করা চাই; কারণ মৃত্যুর স্থিরতা নাই, পাছে দর্শনের পূর্বে মৃত্যু হয়”—এই বলিয়া বিধুবাবুকে ধরিয়া যষ্টিভর করিয়া দর্শনে চলিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় আমরা মহোৎসাহে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দর্শনে চলিলাম। ঠাকুর প্রথমতঃ অরুণ স্তম্ভের নিকটে উপস্থিত হইলেন; দর্শনী চাহিলে দশ টাকা দিলেন। অতঃপর সিংহ দরজা দিয়া প্রবেশকালে পতিতপাবন ঠাকুরকে দর্শন করিয়া পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়া একেবারে শ্রীমন্দিরে প্রথম চন্দনকাষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় অনন্তরাম ছড়িদার ঠাকুরের মাথায় বেত্র স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “আমরা দ্বারী, কিছু ভিক্ষা চাই।” ঠাকুর বলিলেন “কি চাও?” অনন্তরাম বলিলেন, “একটি মোহর।” ঠাকুর যোগজীবন গোঁসাইকে তাহাই দিতে আদেশ করিলেন। ঠাকুর প্রথম চন্দনকাষ্ঠ অতিক্রম করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শনান্তে বসিয়া পড়িলেন। তখন ভাবে বিভো হইয়া মাতালের মত তিনি, “এই নৃসিংহদেব, এই গোপাল, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব হইতে প্রকাশ পাইতেছেন” এইরূপ বলিতে বলিতে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া উঠিয়া চলিলেন। অতঃপর গরুড় স্তম্ভের নিকট প্রস্তা



श्रीश्रीजगन्नाथ स्वामी



টোটা গোপীনাথ—পূরীধাম

দ্বিতীয় অধ্যায়

৬৫

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গুলি-চিহ্ন ও চরণ-চিহ্ন দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলেন। ঐ সকল স্থানে দর্শনী চাহিলে পাঁচ টাকা করিয়া দেওয়া হইল। আমরা এই প্রকারে ঠাকুরের সহিত বাসায় ফিরিলাম। নীচে একতালার বারান্দায় ঠাকুরের আসন করা হইল। তিনি সারা রাত্রি আসনে বসিয়া রহিলেন; বিধুবাবু এবং ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ঠাকুরের নিকট জাগিয়া রহিলেন। এইরূপে অবশিষ্ট রাত্রি পরমানন্দে অতিবাহিত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

পুত্রীশ্রাম দর্শন

তীর্থগুরুর চরণ-পূজা

আজ ভোরে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর আমি ও কুঞ্জ চা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইলাম। সকলেই নূতন স্থানে আসিয়া দর্শনের জন্ত লৌপ, উৎসাহে ও আহ্লাদে পরিপূর্ণ। কিছু বেলা হইলে আমরা সকলে চা পান করিলাম। বাসাতে যেন এক আনন্দের শ্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমাদের পাণ্ডাঠাকুর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া আসিলে, ঠাকুর সকলকেই তাঁহার ‘চরণ-পূজা’ করিতে বলিলেন এবং নিধে ফুল, চন্দন ও জল দ্বারা তাঁহার চরণ-পূজা করিলেন। আমি ও কুঞ্জ, দাদা গৌসাইর নিকট হইতে এক এক টাকা প্রণামী দিয়া চরণ-পূজা করিলাম। শ্রামকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরকে কথায় কথায় বলিলেন, “সব সন্ন্যাসী মহাস্তের সঙ্গেই উদাসীন ও সাধুরা থাকেন; আপনার সঙ্গে আমরা কতকগুলি বিষয়ী লোক এবং স্ত্রীলোক; অত্যা মহাস্তেরা আমাদের স্থান দিতে পারেন না।” ইহা শুনিয়া গৌসাই বলিলেন, “আপনাদের মত লোকের স্থান কেবল জগন্নাথদেবই দিতে পারেন।” এই সময়ে শ্রীমান সরলনাথ, ‘নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রার্থনা’ পড়িতেছিল; কি জানি কি ভাব হইল, অন্ধকে জড়াইয়া ধরি কাদিতে লাগিল। আজ সকলেরই ভিতর একটা ভাবের শ্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই বাসায় অনেক বিষয়ে বিশেষ অনুবিধা থাকা

তৃতীয় অধ্যায়

৬৭

নূতন বাসা করা প্রয়োজন হইল। তখন বিশ্বাস মহাশয় বড় দাঁণ্ডের উত্তরপার্শ্বস্থ জগন্নাথ বল্লভ উত্তানের মংলথ নীলমণি বর্ষণের বাড়ী ভাড়া করিয়া চূণকামের ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। শান্তিদিদির সহিত আমরা কেহ কেহ নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করিয়া আসিলাম।

কুঞ্জের প্রতি মহাপ্রসাদের কৃপা

আজ ঠাকুর কোথাও দর্শনে বাহির হইলেন না। বেলা প্রায় ১টার সময় আমরা প্রসাদ পাইতে বসিলাম। প্রসাদ পাইবার পরে দেখিলাম যে, কুঞ্জ চীৎকার করিয়া “আরে মারে, আমি কোথায়? তারা কৈ? তারা কোথায়?” ইহা বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। কেহ কিছুতেই তাহার কান্না থামাইতে পারিতেছে না; শ্রীমন্দিরের একটি ছড়িদারের পা জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিতে করিতে ধরায় লুপ্তিত হইতেছে। আমরা ইহাকে স্থির করিতে না পারিয়া দুই তিনজনে ধরাধরি করিয়া ঠাকুরের পদপ্রান্তে নিয়া ফেলিলাম। ঠাকুর পুনঃপুনঃ “স্থির হও,” “স্থির হও” বলিলে কুঞ্জ স্থির হইল এবং ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তর পদধূলি লইয়া চলিয়া আসিল। কুঞ্জকে পরে জিজ্ঞাসা করিলাম “ভাই, তোর এ কিরূপ ভাব হইল?” সে বলিল, “মহাপ্রসাদ পাওয়ার পর হাত মুখ ধুইয়া বাহিরে গিয়া দেখিতে পাইলাম, নানাতে প্রসাদের যে সকল পাতা ফেলা হইয়াছে, তাহা হইতে কতকগুলি কুকুর প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিতেছে; দেখিয়াই, সেই কুকুরের মুখের মহাপ্রসাদ খাইতে ইচ্ছা হইল; অমনি খাইলাম। পরে বাটীতে ঢুকিয়া ছড়িদারকে দেখিয়া তাহাকে প্রণাম করিলাম। সেই সময়েই হঠাৎ কি এক ভাবে অধীর হইয়া পড়িলাম। তখন আমার সুস্পষ্ট অনুভূতি হইল যে, আমি পূর্বে এই স্থানে ছিলাম ও আমার সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন। আমি এখানে

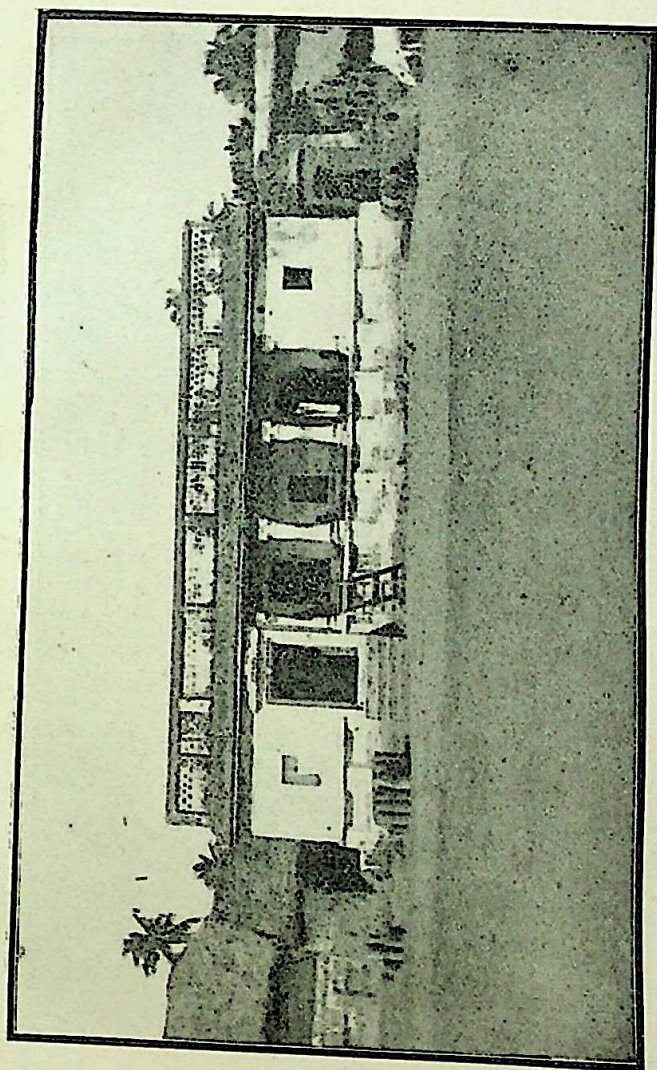
একা পড়িয়া আছি, আমার সেই সব সঙ্গীরা এখন কোথায় ?—এই কথা মনে হওয়ায় প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল। তাহাতেই আমি অস্থির হইয়া, চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলাম। কিছুতেই আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলাম না।” ইহার পরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “কুঞ্জকে মহাপ্রসাদ কৃপা করিয়াছেন। স্থির হইয়া থাকিতে পারিলে, পূর্বজন্মের আরও অনেক কথা জানিতে পারিত।”

নূতন ভাড়াটীয়া বাটী প্রবেশ

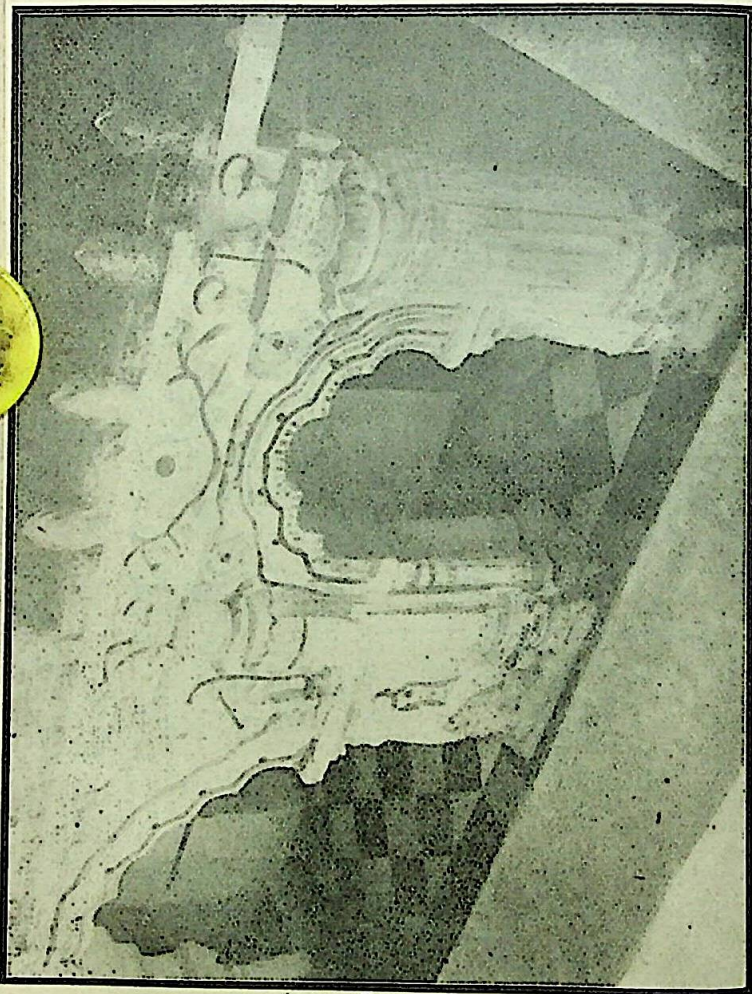
আজ সকলের আহাৰ শেষ হইলে আমরা নূতন ভাড়াটীয়া বাড়ীতে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ঠাকুর ধীরে ধীরে নূতন বাড়ীতে চলিলেন। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া সন্মুখের বড় ঘরে কোথায় আসন করিতে হইবে দেখাইয়া দিলেন; অশ্বিনী ও ব্রহ্মচারী ঐ নির্দিষ্ট স্থানে আসন পাতিল। দোতালার কোঠাঘরে শাস্তিদিদি ও তাঁহার ছেলেপিলেরা রহিল, অপর একখানা বড় খড়ের ঘরে পান্নার মাতা প্রভৃতি থাকিলেন। অন্তর্য্যামুর গুরুভ্রাতারা তাঁহাদের নিজ নিজ অভিলষিত স্থানে আসন পাতিলেন। আমাদের বাসার ঠিক দক্ষিণপার্শ্বস্থ ‘সোণা গোসাইদের’ ভাড়াটীয়া বাড়ীতে সঙ্গীক উমেশবাবু ও বানরীপাড়ার কেহ কেহ রহিলেন।

সন্ধ্যা-কীর্তনে ভাবাবেশ

সন্ধ্যা হইলে কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্তনে ভাবের প্রবল বহা বহিঃ লাগিল। ঠাকুর ও গুরুভ্রাতারা কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে হইতে বারান্দায় যাইয়া পড়িলেন। অমৃত, অশ্বিনী, সরলনাথ ও বিধুনাথ খুব নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া বসিয়া পড়িলেন। এদিকে সরলনাথ ভাবে অজ্ঞান; হাত পা কৌকড়াইয়া



নীলমণি বর্ষণের বাটি—পুরীধাম
[এই বাটিতেই গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব হয়]



অদ্ভুতাকার হইলেন এবং হাত পা আছড়াইয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে একদিকে পড়িয়া রহিলেন। বিধুবাবু তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অমৃত কাঁপিতে কাঁপিতে হাত নাড়িয়া কিছুক্ষণ ঠাকুরকে আরতি করিলেন এবং নিম্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাত্তায় বহু লোক অবাক্ হইয়া উহা দেখিতে লাগিল। বিধুবাবু, অশ্বিনী প্রভৃতি কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া স্থির হইলেন।

কীর্তনে ঠাকুরের নানা ভাব

প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুরের কীর্তনে ভাবাবেশের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। কীর্তনের সময় ঠাকুরের ভাবাবেশ ও অদ্ভুত নৃত্য ঐহারা একবার দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কদাচ উহা ভুলিতে পারিবেন না। আমাদের বোধ হইত, তিনি যেন নিত্য নূতন ভাবে নৃত্য করিতেন। ভাবে কখন তিনি কটিদেশ হইতে বহির্কাস খুলিয়া ঘোমটা দিতেন; কখন বা চীৎকার করিতেন; কখন বা দরদরধারে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতেন। কখন কখন বা শরীর হইতে ধারায় ঘর্ষ পড়িতে থাকিত। নৃত্যকালে উহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। দূরস্থ আমরাও উহা দ্বারা কতবার সিক্ত হইয়াছি। বিধুবাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা মাঝে মাঝে ঠাকুরের নৃত্যকালে তাঁহাকে ধরিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন বটে কিন্তু অনেক সময়ই তাঁহাকে সামলাইতে পারিতেন না। কখন কখন, এক এক অঙ্গ আপনা আপনি, ঘন ঘন কম্পিত হইত। কখন হাতখানি উঠাইতেই উহা এমনি দ্রুতগতিতে কাঁপিতে থাকিত যে, আমরা দেখিয়া অবাক্ হইতাম। কখন শুধু হুঁপিয়া হুঁপিয়া কাঁদিতেন। কখন উর্দ্ধে তাকাইয়া হস্ত দ্বারা, আবার কখন বা চক্ষের জলে অভিষিক্ত হইয়া জটা ধরিয়া কাহাকে আরতি করিতেন। কখন ষোড়হাতে দাঁড়াইয়া রোমাঞ্চিত দেহে শ্বাস ও

পলকশূন্য অবস্থায় কাষ্ঠবৎ কাহার দিকে যেন তাকাইয়া রহিয়াছেন, দেখা যাইত।

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসায় একদিন চিড়া মহোৎসবে কীৰ্ত্তন হইতেছিল। মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর ভোগ দেওয়া হইল। ভোগ আরতির গানের খোল বাজিল। দরজা খোলা হইয়াছে— ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া সজলনয়নে জটা দ্বারা তিন ঠাকুরকে আরতি করিতে লাগিলেন। কীৰ্ত্তনের মধুর ধ্বনিতে দিক্ সকল পুরিয়া গেল। দাদাগোঁসাই পিছন হইতে নিজ বস্ত্র দ্বারা ঠাকুরের ঘর্ষ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের এই আরতি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আজও যেন উহা চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে।

অপর একদিন কলিকাতায় শ্রামবাজারের বাসায় কীৰ্ত্তন হইতেছে। ঠাকুর স্বদীর্ঘ ঘরের মধ্যে দৌড়িতে লাগিলেন। শূন্যে কাহাকে হস্তদ্বারা আরতি করিতে লাগিলেন, নীচু হইয়া দুই হাতে ভূমি হইতে যেন কাহাদিগকে উঠাইয়া দ্রুত চলিলেন। (১) ‘আমি চলিলাম, ঐ পরম-হংসজী, ঐ বৃন্দাবনের সখীগণ আমাকে নিতে আসিয়াছেন।’ এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।*

(১) পরে তিনি বলিয়াছেন যে, কীৰ্ত্তনস্থলে দেবদেবীগণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া পড়িয়া ছিলেন। তিনি দ্রুত চলিবার সময় উহাদিগকে উঠাইয়া ছুটিতেছিলেন।

* প্রচারক নগেন্দ্রবাবু, ইহা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “না, যেতে দিব না, কখনই যেতে দিব না, জয় পরমহংসজী, জয় পরমহংসজী।” ঠাকুর কীৰ্ত্তনে অনেক সময় চীৎকার করিয়া বলিতেন, “জয় শচীনন্দন,” “জয় শচীনন্দন,” “জয় নিত্যানন্দ অবধূত,” “জয় নিত্যানন্দ অবধূত,” “জয় রাধে,” “জয় রাধে,” “ঐ পরমহংসজী আসিয়াছেন,” “ঐ সখী সকল,” “ঐ বংশীবট,” “ঐ শ্রীবৃন্দাবন” ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

৭১

গম্ভীরা দর্শন

কল্যা ঠাকুর অশ্রুস্থ বলিয়া কোথাও বাহির হয়েন নাই। আজ আমরা সকলে প্রত্যুষে বাহির হইলাম। সকলেরই মনে আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আঠার বৎসর নিয়ত অবস্থিতির স্থান দর্শন করিব। ঠাকুর ভোরে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া বিধুবাবুর স্কন্ধে ভর করিয়া বাহির হইলেন। তাঁহার কোপীন ও বহির্কাস লওয়া হইল; ঘটা নিতে যাইয়া দেখি, ঘটাটি নাই; ভোরে বারান্দা হইতে উহা কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের সঙ্গে বহুপুরুষ এক দলে ও বহু স্ত্রীলোক আর এক দলে দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ঠাকুর বাসা হইতে বাহির হইয়াই শ্রীমন্দির নমস্কার করিলেন, আমরা পিছনে পিছনে চলিলাম। তিনি সিংহ দরজায়, ‘পতিতপাবন ঠাকুর’ দর্শন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের আসন-বাড়ী দর্শনার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঐ আসন-বাড়ীতে মহাপ্রভুর বাসস্থানকে ‘গম্ভীরা’ বলে। সিংহ দরজায় অনেক গরু থাকে, লোকে ঘাস কিনিয়া উহাদিগকে খাইতে দেয়, আমরাও তাহাই করিলাম। আমরা মহাপ্রভুর বাসস্থান কানীমিশ্রের বাড়ীর দরজায় যাইয়া প্রণাম করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং যাইতে যাইতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব যে কুঠুরীতে বাস করিতেন তথায় উপস্থিত হইলাম; ঘরখানা বড় ছোট, মাত্র আট হাত লম্বা ও ঐ পরিমাণ চওড়া হইবে। পূর্বে এইস্থানে একখানা কুটার ছিল; এখন কোঠাঘর হইয়াছে। ঠাকুর, দর্শন করিয়াই ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; যেন অতি প্রিয় পুরাতন দৃশ্য সমূহ স্মৃতিতে জাগ্রত হওয়ায় তাঁহার শরীর এলাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু অপূর্ব ধৈর্য্য সহকারে তিনি সমস্ত সংবরণ করিয়া বাহির হইলেন। পরে বলিলেন, “আহা! এই স্থানের প্রভাব সেবকেরা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।” ঠাকুর

মহাপ্রভুর ছেঁড়া কাঁথা প্রভৃতি দর্শন করিয়া দরজা দিয়া বাহির হইতেছেন, তখন বিশ্বাস মহাশয় অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাভী দেখাইয়া বলিলেন, “মহাপ্রভু এইস্থানেই গাভীগণের মধ্যে পড়িয়া কুস্মাকৃতি হইয়াছিলেন। গাভীগণ তাঁহার গা চাটিয়াছিল এবং তাঁহার হাত পা পেটের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।” রাস্তায় আসিতে আসিতে ঠাকুর বলিলেন, “৬পুরীধামে আসিয়া সর্বপ্রথমে আমাদের এইস্থানে আসাই উচিত ছিল।”

সমুদ্রে দর্শন

আজ আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে সমুদ্র-স্নানে চলিলাম। বিধুবাবুর সাহায্যে ঠাকুর অতিকষ্টে সমুদ্রতীরে পৌঁছিলেন। কিছুদূর হইতে নীলাভ অপার জলরাশি দৃষ্টিতে পড়ায় সকলেরই মনে এক অপূর্ব আনন্দ উথলিয়া উঠিল। কেহ কেহ দৌড়াইতে দৌড়াইতে বালির উপর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সমুদ্রে যাইবার পথে কতকগুলি গাভী, বিশ্বাস মহাশয় আমাদের দেখাইলেন; মহাপ্রভুর সময়েও ঐ স্থানে গাভীগণ এইরূপ ভাবেই বিচরণ করিত। সকলে ইহাদিগকে ঘাস খাইতে দিতেন; মহাপ্রভু এই সকল দর্শন করিয়া সমুদ্রে স্নান করিতেন। নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে, মহাপ্রভুর লীলাভূমি সমূহ গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে কিন্তু সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করে না বলিয়া নীলাচলের যে স্থানের বাহা, তাহা তথায়ই বর্তমান আছে। কেহ কেহ, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত ‘চটক পর্বত’ কোথায়, হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান কোথায়, এই প্রকার প্রশ্ন ঠাকুরকে করিতে লাগিলেন। কিন্তু আজ ঐ সকল স্থান দর্শন হইবে না। আমরা এইরূপ কথাবার্তা বলিতে বলিতে শনৈঃ শনৈঃ সমুদ্রতীরে স্বর্গদ্বারী ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ঠাকুরের পায়ে বাতের ব্যায়ারাম, এজ্ঞ কটকের প্রসিদ্ধ উকিল, ৬হরিবল্লভ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন,

তৃতীয় অধ্যায়

৭৩

“প্রভুকে সমুদ্রে স্নান করিতে বলিও।” ঠাকুর ঐ উপদেশ অনুসারে রোজ সমুদ্র-স্নান করিবেন স্থির করিয়াছেন। সমুদ্রপারে উপস্থিত হইয়া আমরা কেহ কেহ নানাবর্ণের ঝিঝু কুড়াইতে আরম্ভ করিলাম, বাসায় যাইয়া ঠাকুরকে উপহার দিব। ঠাকুর বিধুবাবুর সাহায্যে সমুদ্র-স্নান করিলেন। সত্যেন্দ্র, সরলনাথ, মণিবাবু প্রভৃতি তাঁহাকে ধরিলেন। পরে কোপীনাদি পরিবর্তন করিয়া বাসার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে কাজাল-দিগকে পয়সা দেওয়া হইল। আমি ও কুঞ্জ, বিধুবাবুর ইচ্ছিতে, অগ্রে অগ্রে দ্রুতগতিতে বাসায় চলিলাম। বাসায় আসিয়া চায়ের জল চাপাইয়া দিলাম। ঠাকুর ধীরে ধীরে গল্প করিতে করিতে বাসায় ফিরিলেন। মণিবাবু বলিলেন, “স্নানের সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন “স্বর্গদ্বারই স্নানের উপযুক্ত স্থান, অন্যস্থানে স্নান করা ভাল নহে।” ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন, “এ স্থানে পাকাল প্রসাদ শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। সমুদ্র-স্নান করিয়া পাকাল না খাইলে শরীর অসুস্থ হয়।”

ঠাকুরের আদেশ মত আমি কুঞ্জ ও গ্রন্থাদি রাখিবার জন্ত ২৪ টাকা দিয়া দুইটি র্যাক্ (Rack) কিনিয়া আনিলাম। আমরা এখানে নূতন বলিয়া দাম কিছু বেশী হইল। পরে দেখিলাম, ভাল আলমারিই ঐ দামে পাওয়া যাইত। ঐ বিষয় ঠাকুরকে বলায় তিনি বলিলেন, “প্রয়োজন ছিল যাহা আনিয়াছ, ভালই হইয়াছে। প্রয়োজনেরই মূল্য, জিনিষের কোন মূল্য নাই।” গ্রন্থাদির ভিতরে কোন কোন গ্রন্থের চামড়া বাইণ্ডিং ছিল। তাঁহার আদেশ মত আমরা সেই সব চামড়া গ্রন্থ হইতে খুলিয়া নূতন ছিট আনিয়া তাহার দ্বারা মলাট দিলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেন, “চমৎকার হইয়াছে।”

টোটা গোপীনাথ ও হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন

একদিন ঠাকুর ভোরে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন করিতে বাহির হইলেন। আমরা ঠাকুরের কোপীন, বহির্কাস, কমণ্ডলু প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ঠাকুর রাস্তায় বাহির হইয়াই শ্রীমন্দিরের দিকে দৃষ্টি করিয়া করবোড়ে নমস্কার করিলেন এবং বড় রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের রাস্তা ধরিয়া যাইতে যাইতে পুরীর রাজার পুরাতন বাড়ীর রাস্তা পড়িল। উহা অতিক্রম করিয়া ‘টোটা গোপীনাথের’ দ্বারস্থ বটবৃক্ষমূলে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছা হইল, টোটা গোপীনাথের বিগ্রহ দর্শন করিয়া হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান দর্শন করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পারিষদ, গদাধর পণ্ডিত মহাশয় এই গোপীনাথ বিগ্রহের পূজা-অর্চনা করিতেন। কথিত আছে, মহাপ্রভু অন্তর্ধানকালে এই শ্রীবিগ্রহের ভিতরে বিলীন হইয়া যান। এই বিগ্রহের উরুতে একটি স্তব্ধরেখা আছে। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, মহাপ্রভু যে যথার্থই এই বিগ্রহে বিলীন হইয়াছেন, এই স্তব্ধরেখাই তাহার নিদর্শন। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া অন্তর্ধানকালে এই বিগ্রহে উক্ত চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। এই বিগ্রহ সম্বন্ধে আরও গল্প আছে যে, ইনি পূর্বে অত্যাশ্রিত বিগ্রহের গ্রায় দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। সেবক বৃদ্ধ হইয়া পূজা করিতে অসমর্থ হইলে তাঁহার প্রার্থনায় ইনি বর্তমান উপবিষ্ট ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। পূজারী দরজা খুলিয়া দিলে ঠাকুর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমরা সকলে যাইয়া গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলাম এবং কেহ কেহ পয়সা দর্শনী দিতে লাগিলেন। পরে ঠাকুর পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গোপীনাথ দেবের কটিদেশে যে স্তব্ধ-

তৃতীয় অধ্যায়

৭৫

রেখা মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের চিহ্নস্বরূপ বর্তমান আছে, তাহা দেখাতে পার।” পূজারী বলিল, “পাঁচসিকা দর্শনী দেও ত পারি।” ঠাকুর শুনিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসিলেন। লোকে কি দর্শন করিবে? “দর্শনী”, “দর্শনী” করিয়াই ইহারা লোককে অস্থির করে। আমরা কালবিলম্ব না করিয়া ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিলাম। পূজারী যদি দর্শনী না চাহিয়া ঠাকুরকে দর্শন করাইত, তাহা হইলে পাঁচসিকা হইতে অনেক অধিক অর্থ পাইত। ঠাকুর যেন ইহাদিগের শিক্ষার নিমিত্তই উহা দর্শন না করিয়া চলিয়া আসিলেন।

অতঃপর আমরা ঠাকুরের সহিত ধীরে ধীরে হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান দর্শন করিতে চলিলাম। আমাদের মনে কতই ঔৎসুক্য! এই হরিদাস ঠাকুরকে স্বয়ং মহাপ্রভু বালি খুঁড়িয়া সমাধিস্থ করেন। নিজে অঞ্চল পাতিয়া এই হরিদাস ঠাকুরের জন্ত ভিক্ষা করিয়া মহোৎসব করিয়া ছিলেন। এই সকল ঘটনা স্মৃতিতে আসিতে লাগিল। এইরূপে ধীরে ধীরে বালি ভাঙ্গিয়া সমাধিস্থানে যাইয়া আমরা উপনীত হইলাম। হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিলাম। এইস্থানে তিন প্রভুর বিগ্রহই প্রতিষ্ঠিত আছে। সকলে দর্শনী দিলেন। তৎপরে আমরা ঠাকুরের সহিত স্বর্গদ্বার ঘাটের দিকে চলিলাম। সমুদ্রের কিনারা ধরিয়া স্বর্গদ্বার ‘বিহুরের খুদ’ নামক মঠে ঠাকুরের সহিত উপস্থিত হইলাম। তথাকার পূজারী কিছু প্রসাদী খুদের পিঠা ও সুমিষ্ট জল পান করিতে দিলেন। আমরা ঠাকুরের চতুর্দিকে বসিয়া তাঁহার সহিত আনন্দ করিতে করিতে উহা আহার করিলাম। পিঠার সঙ্গে কিছু তুলসীপত্রের শাকও ছিল। আমরা বেশ জলযোগ করিয়া ক্লাস্তিদূর করিলাম ও সমুদ্র-স্নানান্তে বাসায় ফিরিলাম। এইস্থানে দাদা গোঁসাই তিন টাকা প্রণামী দিলেন। মণিবাবু অনেক শাক ও কুলের আচার চাহিয়া খাইলেন ও সহস্র শালগ্রাম দর্শন

করিয়া আসিলেন। ঠাকুর পথে নানারূপ সুন্দর সুন্দর গল্প করিয়া সকলকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

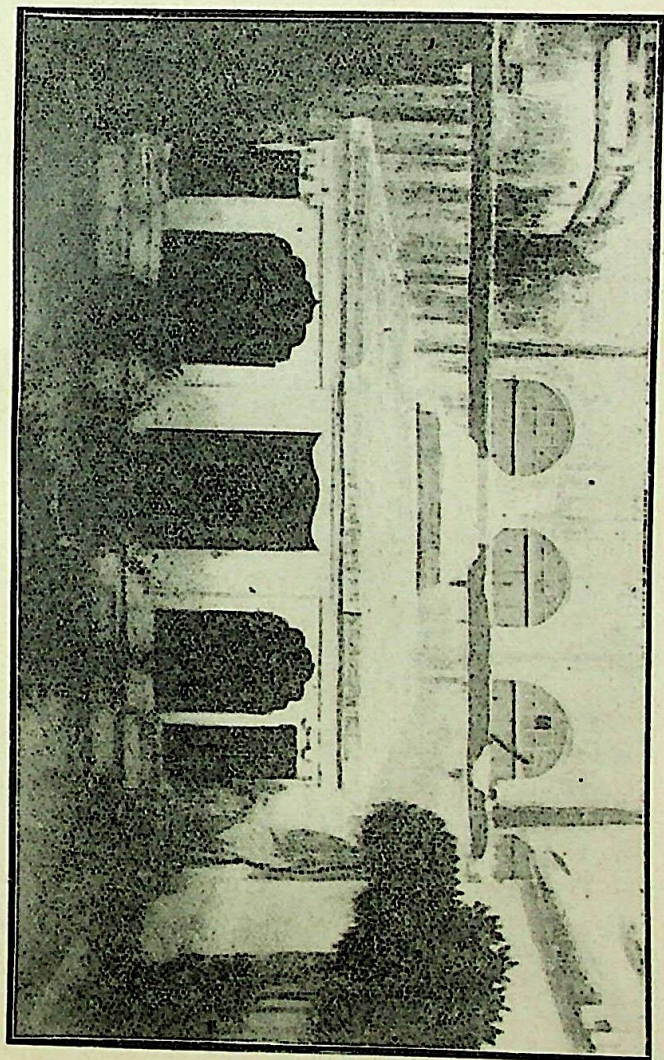
চটক পর্বত দর্শন : স্বরূপ দামোদরের প্রকাশ

অন্য একদিন পূর্বোক্ত রাস্তা দিয়াই চটক পর্বত দর্শন করিতে ঠাকুরের সহিত চলিলাম। পথে যমেশ্বর মহাদেবের নিকটবর্তী বটবৃক্ষতলে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ দামোদর ঠাকুরের নিকট প্রকাশিত হইলেন। ঠাকুর বলিলেন, “তিনি শ্রামবর্ণ, কিছু স্থূলকায় এবং শরীরের মাংস শিথিল, হাঁটলে থল থল করে।” তিনি আরও বলিলেন, “আজ-কালও মহাপ্রভু নিশীথ সময়ে টোটা গোপীনাথ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সৈকত ভূমিতে বিচরণ করেন। এই কলিকাল ভরিয়াই তিনি আতিবাহিক দেহে লীলা করিবেন।” ‘চটক পর্বত’ অর্থ বালির পাহাড়। বালি স্তূপীকৃত হইয়া মাঝে মাঝে পর্বতাকার হইয়াছে। মহাপ্রভুর এই চটক পর্বত দর্শন করিয়া ভাবোন্মত্তাবস্থায় গোবর্দ্ধন ভ্রম হইয়াছিল এবং এই চটক পর্বত হইতেই জ্যোৎস্না রাত্রিতে সমুদ্র দর্শন করিয়া যমুনা ভ্রমে তিনি উহাতে ঝাঁপ দেন এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভাসিতে ভাসিতে কোনার্কের দিকে চলিয়া যান। জেলেরা রাত্রে জালে করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়াছিল। বোধ হয়, ঠাকুর এই সকল পুরাতন কাহিনী শ্রবণ করিয়াই আকুল হইয়া এই সব স্থান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

ঠাকুর, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি হইতে সমুদ্রের পারে পারে আসিবার সময় আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন, “তোমরা খুব সতর্ক হইয়া সমুদ্র-স্নান করিবে।” তিনি আরও বলিলেন, “আমার চক্ষে পড়িল, তোমাদের মধ্যে দু’একজনকে সমুদ্র ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন।” আমরা এই কথা শুনিলাম বটে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ করিলাম না।

হরিন্দাস ঠাকুরের সমাধি—পুন্নিখাম

৭৬



চটক পৰ্বত—পূৰ্বাধায়

৭৬



কুঞ্জের প্রতি বিমলাময়ীর কৃপা

শ্রীযুক্ত শ্রামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় এই সময়ে একদিন শ্রীমন্দির হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণয় করিলেন, “এইস্থানে কি ব্রজলীলাও হয়?” ঠাকুর বলিলেন, “হাঁ, তাও হয়। মন্দিরে মণি কোঠায় বাইয়া আমি খুঁজিতেছি, রাধারাণী কোথায়। দেখি তিনি রত্নসিংহাসনের এক কোণে দাঁড়াইয়া আছেন। এই স্থানে সব লীলাই হয়।”

কুঞ্জ ঠাকুরকে কথায় কথায় বলিলেন, “৮পুরীধামে পৌছিবাব দিন যখন স্টেশন হইতে বাসার দিকে আসিতেছিলাম, মন্দিরের চূড়া ও ধ্বজা দর্শন করিয়া রাস্তায় সাষ্টাঙ্গ দেওয়ামাত্র একটি অপূর্ব দেবমূর্তি দেখিতে পাইলাম; তিনি স্তম্ভদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। এরূপ মূর্তি আমি আর পূর্বে কখনও দেখি নাই। সময়ান্তরে বিমলাময়ীর মন্দিরে বাইয়া দেখিলাম, সেই মূর্তি।” ঠাকুর বলিলেন, “বিমলাময়ী শ্রীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনিই কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন। তাঁহার কৃপা না হইলে কেহ ক্ষেত্রে আসিতে পারে না।” শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ আমাদিগকে বলিলেন, “ঐ দিনের কীর্তনের সময়ে তিনি এরূপ একটা নেশায় মত্ত হইয়াছিলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত তাঁহাকে বিভোর রাখিয়াছিল।”

উলঙ্গ সাধু

ঠাকুর মধ্যাহ্নে বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন, একটি উড়িয়া সাধু, প্রায় উলঙ্গ বেশ, জগন্নাথ দেবের মন্দিরের দিক হইতে হঠাৎ আসিয়া রাস্তায় পড়িয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। পরে দুই হাতে ঠাকুরকে আরতি করিতে করিতে গান গাহিতে লাগিলেন। তিনি চলিয়া

যাইতেছেন এমন সময়ে, ঠাকুর বলিলেন, “উহাকে একখানা গায়ের কাপড় দিলে হয়।” অমনি সতীশ একখানা কম্বল ও চারি আনা পয়সা দৌড়িয়া দিয়া আসিলেন। কিন্তু একটু পরেই সেই সাধুটি কম্বল ও চারি আনা পয়সা দ্বারে রাখিয়া পূর্ববৎ উড়িয়া ভাষায় গান গাহিয়া চলিয়া গেলেন। তখন ঠাকুরকে গণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি গাইলে ? এ গানের অর্থ কি ?” ঠাকুর বলিলেন, “প্রথম গানের অর্থ এই যে, হে রাম, তোমাকে বহুদিনের পর দেখিলাম। কতদিন অপেক্ষা করিয়াছি— কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। এতদিন দেখা দাও নাই কেন ? আজ বড় ধন্য হইলাম। দ্বিতীয় গানের অর্থ এই যে, হে প্রভু, হে রাম, আবার ছলনা কেন ? আবার ঐশ্বর্য্য কেন ? কম্বল কেন ? আমার হাত আছে। তাহা দ্বারাই আমি শীত নিবারণ করিব। অর্থের আবশ্যকতা কি ? প্রসাদ ত আছেই।” পরে ঠাকুর বলিলেন, “কম্বল ও পয়সা অগ্রকে দিয়ে দেও।” তাহাই হইল।

সিদ্ধবকুল দর্শন

আমরা একদিন ঠাকুরের সহিত ‘সিদ্ধবকুল’ মঠ দর্শন করিতে গেলাম। এই স্থানে হরিদাস ঠাকুর ভজন করিতেন। ত্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন এই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। হরিদাস ঠাকুর বুদ্ধ হইলেও এই স্থানে শূন্য আকাশের নীচে রোদ্দে বৃষ্টিতে বসিয়া ভজন করিতেন। মহাপ্রভু একদিন ভোরে বকুল কাষ্ঠ দ্বারা দস্ত মার্জনা করিতে করিতে হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থানে আসিলেন এবং উহা ভূমিতে পুঁতিয়া বলিলেন, “হরিদাস, তুমি রোদ্দে বৃষ্টিতে বড় ক্লেশ পাও, আমার প্রাণে বড় লাগে, অতঃপর ইহার নীচে বসিয়া ভজন করিও।” কথিত আছে তখনই ঐ কাষ্ঠখণ্ড বড় বৃক্ষ হইয়া উঠে এবং উহারই নীচে বসিয়া তিনি

দ্বিতীয় অধ্যায়

৫১

তাহার চক্ষে দরদরধারে জল পড়িতে লাগিল। ক্রমে তিনি সুস্থ হইলেন। ঠাকুরমা আরও দুই একবার একরূপভাবে পাগল হইয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বোগুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত ঠাকুর-মাতার সহস্কে ঠাকুরকে শাস্তিপুরে একবার প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর উত্তরে বলিলেন, “ওর জীবনযুক্ত অবস্থা। ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন বিশেষ অবস্থাতে লোকে উহাকে পাগল বলিয়া মনে করে, কিন্তু বাস্তবিক উনি পাগল নন। কারণ সেই অবস্থাতে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহা সমস্ত স্মরণ থাকে। পাগলদের তাহা থাকে না।”

ঠাকুরমার দয়া

ঠাকুরমাতার মত দানশীলা জ্ঞীলোক আমার চক্ষে পড়ে নাই। তিনি যেমনিই দয়ালু ছিলেন, তেমনিই সকলের প্রতি সমব্যবহার করিতেন। তিনি বেষ্ট্রাদের পর্য্যন্ত ক্লেদ দেখিলে সহ্য করিতে পারিতেন না; আহা, অর্থ, বস্ত্র বাহা থাকিত, দিয়া ফেলিতেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, “আমাদের ঝির একটি ছেলে ছিল। মা আমাদের মতনই তাহাকে একখানা থালা, একটি গ্লাস ও একটি পিঁড়া করিয়া দিয়াছিলেন। কোন পরবের সময় আমাদের মতনই তাহাকে কাপড় দিতেন।”

ঠাকুর তাহার মায়ের একটি ঝির প্রতি দয়ার বিষয় গল্প করিয়াছিলেন—“মা একটি ঝিকে দয়া করিয়া মন্ত্র দেন। চরিত্র-দোষ বলিয়া সকলে মন্দ বলিলেও তাহাকে আশ্রয় দিয়া গৃহে রাখেন ও সমস্ত গৃহস্থালীর ভার তাহাকে দেন। ইহাতে সে শোধরাইয়া যায় এবং প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া প্রাণপণে সেবার কার্য্য করে। সকলেরই সে যথাসাধ্য উপকার করিত। স্বজাতীয় বেষ্ট্রাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিত, ‘মাঠাকুরণ আমাকে রক্ষা না করিলে আমারও ঐ দশাই হইত। আহা! অমুকে

বেশা হইয়াছে, এক ঘটা জল দিয়া জিজ্ঞাসা করে এমন লোকও নাই। আমি (ঠাকুর) শুনিয়া বলিলাম, ‘কেন, তুমি উহাকে প্রসাদ দিয়া আইস।’ সে লোকের কটাক্ষ-ভয়ে বাইতে ভয় পাইল, তখন আমি বলিলাম, ‘আমাকে প্রসাদ দাও, আমি দিয়া আসি।’ আমি ঐ প্রসাদ লইয়া বেশা গলিতে দৌড়াইলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম, ‘অমুক খান্‌কি, তোর জন্ত প্রসাদ এনেছি।’ খান্‌কি ডাক শুনিয়া, ‘করে?’ —বলিয়া বাহিরে আসিল এবং ‘দাদা গোঁসাই আসিয়াছ?’ এই বলিয়া আদরে প্রসাদ গ্রহণ করিল। ঠাকুরের বয়স তখন ৫৬ বৎসর।

ঠাকুরের পিতার পরিচয় : ঠাকুরের জন্ম

ঠাকুর শান্তিপুরের ৩৭নন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র। ঠাকুরের পিতাকে শান্তিপুরের লোক “খড়ি ধোওয়া গোঁসাই” বলিত। তিনি প্রতি খণ্ড লাকড়ি (খড়ি) ধুইয়া রোঁদ্রে দিতেন এবং তৎপরে উহার দ্বারা পাক করিতেন। একরূপ আচার্য্য ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে এমন হুঙ্কার করিতেন যে দূরস্থ লোকেরাও উহা শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইত। ঠাকুর একবার ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে মেদিনীপুর জেলার তমলুক অঞ্চলে গিয়াছিলেন। তথায় একটি নিষ্ঠাবান হিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্মের মত সকল বিবৃত করিলে তিনি বলিলেন, “আপনার ঐক্য মতিচ্ছন্ন হইল কেন? আপনার বাড়ী কোথায়?” ঠাকুর বলিলেন, “আমার বাড়ী শান্তিপুর।” সেই ব্রাহ্মণটি ইহা শুনিয়া বলিলেন, “মহাশয়, শান্তিপুরে এক আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়াছি, তথায় ঐ গোস্বামীপাদ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে চক্ষুর জলে ভাসিয়া থাকেন। ভাগবতের পাতা চক্ষুর জলে ভিজিয়া যায়, রোঁদ্রে দিয়া উ

দ্বিতীয় অধ্যায়

৫৩

গুকাইয়া নেন। এমন ভাবাবেশ হয় যে প্রতি লোমকূপ দিয়া মাঝে মাঝে রক্তোদগম হয়। লোমগুলি শিমুলের কাঁটার মত দাঁড়াইয়া উঠে। মাঝে মাঝে “হরেকৃষ্ণ,” “রাধাশ্যাম,” “রাধাপ্যারী” বলিয়া এমনি হুঙ্কার করেন যে দূরস্থিত লোকেরা শুনিয়া চমকিয়া উঠে।”

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, “তিনিই আমার পিতা।” ব্রাহ্মণটি শুনিয়া, বলিলেন, “মহাশয় আপনার হাতখানা দেখি?” হাত দেখিয়া বলিলেন, “হইয়াছে, যে সময়ে, যে স্থানে, আপনার জন্ম হবার কথা ছিল তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি।” ঠাকুর বলিলেন, “হ্যাঁ, আমার জন্মকালে, পুলিশ আসিয়া আমার মাতুলালয় ঘেরাও করে এবং মাতাঠাকুরাণী আমাকে কচুবনে প্রসব করেন।”

ঠাকুরের পিতা বহুদিন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। প্রথমতঃ দুইবার বিবাহ করেন, দুটি জীই মারা যান। বয়স তখন ৫০।৬০ বৎসর। আর বিবাহ করিবেন না বলিয়া স্থির করেন। আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভুপাদ গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয়েরও কোন সন্তান ছিল না। তিনি মৃত্যুকালে গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দকিশোর গোস্বামীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “আমার নিকট তোমার একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে; তোমায় আবার বিবাহ করিতে হইবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তাহাতে তোমার দুইটি পুত্র সন্তান জন্মিবে; উহাদের মধ্যে কনিষ্ঠটিকে আমাকে দত্তক দিতে হইবে।” তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে ইহাতে সন্মত হইলেন এবং তৃতীয়বারে ঠাকুরমাকে বিবাহ করেন। বিবাহের কিছুদিন পরে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মে। ইহার পরে, তিনি সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে শান্তিপুর হইতে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। তিনি কি অভিপ্রায়ে এক্রপ কঠোর ব্রত সম্পন্ন করেন, তাহা আমরা অবগত নহি; শুনিয়াছি তিনি দেড় বৎসরে পুরী পৌঁছেন।

সঙ্গে সেবার জন্ত পিসি ছিলেন ও একজন চাকর ছিল ; সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে বুকে যা হয় ; তৎপরে বুকে ঝাকড়া জড়াইয়া সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে পুরী পৌছেন। তিনি পুরী হইতে ফিরিয়া গেলে, ঠাকুরমার গর্ভসঞ্চার হয়। ঠাকুরের গর্ভে থাকা কালে, প্রতি সূর্য্যারশ্মিতে ঠাকুরমা রাধাকৃষ্ণ দর্শন পাইতেন। নদীয়ার অন্তর্গত দহকুল গ্রামে মাতুলালয়ে ১২৪৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ, সোমবার, ঝুলন পূর্ণিমা রাত্রে, ঠাকুরের জন্ম হয়।

পুরীর পথে

আমরা অল্পমান ৪টার সময় শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত কদমতলাঘাট হইতে পুরী যাত্রা করিলাম। আমরা উৎসাহে ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঠাকুরের সহিত বোটে চলিলাম। আমাদের নৌকায় ঠাকুর, তাঁহার পুত্র শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ মিত্র, বানরীপাড়ার সরলনাথ গুহ, ললিতকুমার গুহ, কুঞ্জবিহারী গুহ, শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস, শ্রামাকান্ত পণ্ডিত, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, অশ্বিনী বৈরাগী, সতীশ, সত্যেন্দ্র, বেণীমাধব দে, ভারত পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতি চলিলেন। শ্রীযুক্ত জগবল্লু মৈত্র, সস্ত্রীক উমেশচন্দ্র বসু ও মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ; শান্তিদিদি, দিদিমাতা, শ্রীমতী ভূষণ, শশি দাসী প্রভৃতি অপর বোটে চলিলেন। আমাদের জাহাজ, বোট দু'খানা লইয়া, আজ গঙ্গার ভিতর দিয়া চলিল। গঙ্গার সুস্বিষ্ট সায়ং সমীরণে যেন নবজীবন লাভ করিয়া আমরা আনন্দ করিতে করিতে চলিলাম। রাত্রিকালে জাহাজ যাইতে যাইতে হঠাৎ অগ্ন জাহাজের সহিত টক্কর লাগিবার উপক্রম হইল কিন্তু ভগবৎকৃপায় বাঁচিয়া গেল। পরদিন জাহাজ কাটা খাল দিয়া চলিল, একস্থানে সকায়ে জাহাজ লাগাইয়া আমরা ঠাকুরের জন্ত চা ও মোহনভাগ তৈয়ার্য করিয়া লইলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৫৫

দোল উৎসব

অনুমান ১২টার সময় আমরা গৈয়োখালীতে পৌঁছিলাম। খালপারে একটি ইষ্টক নির্মিত ভাল বাঙ্গালা পাওয়ায় আমাদের জাহাজ এই স্থানে নোঙ্গর করিল। হারিসন বোডের বাড়ীতে থাকাকালীন সামান্য বালুকণাও ঠাকুরের পায়ে বিঁধিত। কাঁকরাদি পায়ে বিদ্ধ হইবার আশঙ্কায় গুরুভাইগণ তাঁহার চলিবার পথে কঞ্চল বিছাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি তাহার উপর দিয়া, বিধুবাবুকে অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিলেন এবং শৌচাদি কার্য সম্পন্ন করিয়া বাঙ্গালায় যাইয়া বসিলেন।

আজ ২৫শে ফাল্গুন, দোল পূর্ণিমা তিথি; আসিবার সময় মেয়েরা সঙ্গে করিয়া আবীর আনিয়াছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরের পায়ে উহা দিয়া প্রণাম করিলেন। অশ্বিনী বৈরাগী ঠাকুরের তিলকের ঝোলা লইয়া এবং কিছু ফলমূল তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে দিয়া আসিল। ঠাকুরের চরণে ব্রহ্মচারী, অশ্বিনী, সরলনাথ, নবকুমারবাবু প্রভৃতি আমরা সকলেই আবীর দিলাম। ঠাকুরও আমাদের সকলের মুখে আবীর মাখাইয়া দিলেন। তৎপরে বলিলেন, “একটা গান কর।” অশ্বিনী, নবকুমারবাবু প্রভৃতি গান ধরিলেন।

“চাইনা, চাইনা, যাও, শঠ শিরোমণি,
গোপালে, গোপালে সমাদর,
সে কেমনে জানিবে প্রেমের আদর
নৈলে ধেহুগণে দিবে কেন মুকুতা মণি।”

পাককার্যে হৃদক্ষ কেনারাম পূজারী অতি সত্বর আমাদের জন্য পাক প্রস্তুত করিল। আমরা সকলে ঠাকুরের সহিত বারান্দায় ও ঘরে বসিয়া আহার করিলাম। আহার হইতেছে, এমন সময় সরলনাথ হঠাৎ উঠিয়া

পড়িল—কাহারও উচ্ছিষ্ট আসিয়া তাহার পাতে পড়িয়াছে। ঠাকুর সরলনাথকে আহারকালে পংক্তি ছাড়িয়া উঠিবার জন্ত বিরক্ত ভাব দেখাইয়া বলিলেন, “ইহাতে বাকি সকলকে নিজের উচ্ছিষ্ট খাওয়ান হয়। বাহার্য্য একরূপ করিবেন তাঁহাদের সকলের সঙ্গে না বসিলেই হয়।” এখানে একটি ভাল পুকুর ছিল, তাহা হইতে কয়েক কলসী জল নেওয়া হইল।

অতঃপর জাহাজ ছাড়িল। রাত্রিকালে মণিবাবুর শয়নের স্থান দুই বজরাতে কোথাও মিলিল না। খানিক রাত্রে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “মণি, শয়ন করিতে পাও নাই বুঝি?” এই বলিয়াই পার্শ্বস্থ তুলসী গাছ সরাইয়া মণিবাবুর শয়নের স্থান করিয়া দিলেন। তাঁহার আসনে যে মণিবাবুর মাথা ঠেকিবে সে বিষয়ে ভ্রক্ষেপ না করিয়া তাঁহাকে নিম্নপার্শ্বে শোওয়াইলেন।

ঠাকুর কখন শয়ন করিতেন না। ১৩৩০ সালের কুম্ভমেলায় সময় হইতে ঠাকুর শয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পরদিন সকাল বেলায় প্রায় ৯টার সময়ে জাহাজ থামাইয়া চা ও মোহনভোগ তৈয়ার করিয়া লওয়া হইল। বিধুবাবু ও সরলনাথ নিকটস্থ গ্রাম হইতে দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। চা খাওয়া শেষ হইলেই পুনরায় জাহাজ চলিল। বেলা অনুমান ১২টার সময় জাহাজ এক দোকানের নিকট থামান হইল। এইস্থানে পাক হইলে ঠাকুর ও আমরা সকলে মুদির দোকানের সম্মুখে সারি বাঁধিয়া আহার করিতে বসিলাম। আনন্দের সহিত আমাদের আহার শেষ হইলে ঐ স্থান হইতে একটি সুন্দর তুলসী বৃক্ষ লওয়া হইল; পূর্বেরটি পরিত্যক্ত হইল। ঠাকুর নিজের আসনের নিকটে এই তুলসী বৃক্ষটি রাখিলেন। ঠাকুর রোজ সকালে, ‘গ্রন্থসাহেব’ ও অন্যান্য দুই একখানা গ্রন্থ পাঠ করিতেন। সন্ধ্যাকালে ধূপধূনা জ্বলাইয়া হরি-সংকীৰ্ত্তন হইলে তুলসীবৃক্ষমূলে

হরির লুট দিতেন। প্রায়ই ধর্মপ্রসঙ্গ ও নানারূপ ধর্মকথা হইত। ভারত পণ্ডিত মহাশয়কে এই সময়ে একখানা ধর্মগ্রন্থ উপহার দিলেন।

আহারাদি শেষ হইলে পুনরায় আমাদের জাহাজ চলিল। পরদিন সকালবেলা একবার জাহাজ থামিলে সকলে শৌচাদি সমাধা করিয়া লইলেন। পথে জাহাজ রাখিবার আর ভাল স্থান মিলিল না। অল্পমান ৫১১টার সময় অগত্যা একস্থানে জাহাজ থামান হইল। ঐস্থানে একটা বড় লম্বা খড়ের ঘরে আমাদের পাকাদি সম্পন্ন হইল। আহারাদি করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এইস্থানেই প্রথম ‘কন্দ’ চিনি দেখিয়া কিছু খরিদ করিয়া লইলাম। সতীশের বড় পেটের অসুখ হইয়াছিল, সে জলসাণ্ড পথ্য করিল।

পুনরায় জাহাজ চলিল। পরদিন প্রায় ১১টার সময় একটি পাকা বাঙ্গালার নিকট জাহাজ লাগিল। ঐ বাঙ্গালাটি পুরাতন, বড় ভাল ছিল না। অগত্যা উহাতেই পাক হইল। ঠাকুর উপরে উঠিলেন। বিধুবাবু ঐস্থান হইতে তাঁহাকে নীলগিরি দেখাইলেন। ঠাকুর উহা দর্শন করিয়া অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বাঙ্গালায় যাইতে পথে বড় কঁাকর। কয়েকখানি কয়ল সংগ্রহ করতঃ একখানার পর একখানা ক্রমান্বয়ে পাতিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালায় নেওয়া হইল।

উৎকলদেশে আগমন ও পয়সা দান

আজ উৎকলদেশ দিয়া জাহাজ চলিয়াছে। আমাদের অদম্য উৎসাহ, ছুই পারের বৃক্ষাদির শোভা উৎসুকনয়নে দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বৈকালবেলা কতকগুলি ছেলে, “পয়সা দেও” বলিয়া বোটের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে লাগিল। ঠাকুর ছুঁড়িয়া পয়সা দেওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু উহাতে অনেক পয়সা জলে পড়িতে লাগিল। ছেলেদের মধ্যে একটি

ছোট কুজা মেয়ে ছিল। সে পয়সা পাইতেছে না দেখিয়া, ঠাকুর হৃৎকরিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিধুবাবু একটি টাকা ও কতকগুলি পয়সা কাপড়ে বাঁধিয়া লক্ষ দিয়া বজরা হইতে জলে পড়িলেন এবং সাতরাইয়া পারে উঠিয়া ছেলেদের মধ্যে পয়সাগুলি ও কুজা মেয়েটিকে টাকাটি দিয়া পুনরায় সাতার দিয়া বজরায় আসিলেন। জাহাজ থামাইয়া তাঁহাকে লওয়া হইল। পুনরায় জাহাজ চলিতে লাগিল। (১) বিধু ঘোষ

(১) এখানে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষের সামান্য একটু পরিচয় দিতেছি। বিধুবাবু ঢাকা নগরীর ১৯০ ক্রোশ পূর্বে স্থিত মাওভাইল নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনাবস্থায় তাঁহার অপরিমিত বল ও সাহস ছিল। একবার দ্রুতবেগে চলন্ত রেলগাড়ী হইতে লক্ষ দিয়া অক্ষুণ্ণ শরীরে অভীষ্ট স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশে বেশী টাকা মাহিনায় কাজ করিতেন। নিত্য-নৈমিত্তিক আবশ্যকীয় ধরার বাদে, যৎসামান্য রাখিয়া, সমস্ত তথাকার দীনদ্রুখী লোকদিগকে দান করিয়া ফেলিতেন। তথাকার লোকেরা তাঁহাকে “ফুঙ্গী” অর্থাৎ ধর্ম্মযাজক বলিয়া সম্বোধন করিত। মেয়েরা মন খুলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ এবং কর্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন করিত। তাঁহাকে অসাধারণরূপে সম্মান ও বিশ্বাস করিত। বিধুবাবুর অসাধারণ সাধুতা দেখিয়া একজন বড় সাহেব তাঁহাকে একটা (Cross) ক্রস উপহার দিয়াছিলেন। স্থানীয় আরও দুই একজন সাহেব তাঁহাকে পাদরীর তায় মর্যাদা ও সম্মান করিতেন। একবার একটি ‘বল্লম’ হাতে করিয়া অল্প কয়েকজন লোক সহ একটা বিদ্রোহ দমন করেন। ব্রহ্মদেশের ধর্ম্মযাজকেরাও তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তি করিত। ঐখানে পার্বত্যীয় জর হওয়াতে তিনি ব্রহ্মদেশ ছাড়িতে বাধ্য হন। ঠাকুরের সের্বকাৰ্য্য ইনি এমনই সুন্দর ও শৃঙ্খলার সহিত দরদ করিয়া করিতেন যে, তেমনটা বড় দেখা যায় না। ইঁহার নিকট সেবা সম্বন্ধে অনেক শিখিয়াছি। ঢাকা গেণ্ডারিয়া শেষ ধুলটে ইঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা দর্শন করিয়াছি। ইনি ১৫ দিন পর্য্যন্ত একজন অনাহারে ও অনিদ্রায় থাকিয়া অতি দক্ষতার সহিত সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। প্রায় সমস্ত কর্তৃত্বভার ইঁহারই হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ছেলের আসন্ন মৃত্যু অগ্রাহ্য করিয়া প্রয়াগে অবস্থানকালে ইনি ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন।

ভিন্ন একরূপ হুঃসাহসের কাজ এমন ক্ষিপ্ৰকারিতার সহিত করিতে পারে
একরূপ অতি অল্প লোকই আছেন।

কটকে শিষ্যগণের সহিত মিলন

আমাদের জাহাজ চলিতে লাগিল। আমরা দুই পারের নানারূপ
দৃশ্য ও সবুজবর্ণ বৃক্ষশ্রেণী দর্শন করিতে করিতে উৎফুল্লমনে প্রায় সন্ধ্যা-
কালে কটকে আসিয়া পৌঁছিলাম। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন পণ্ডিত
মহাশয় ও নারায়ণপুরের গুরুভ্রাতাগণ, বানরীপাড়ার কৈলাসচন্দ্র বসু,
শশিকুমার গুহ, সঙ্গীক রামকৃষ্ণ গুহ ঠাকুরতা, বাণীকণ্ঠ ঘোষ, সঙ্গীক
ললিত গুহ প্রভৃতি এক সন্দেশেই সামুদ্রিক জাহাজে আসিয়া আমাদের জন্ত
কটকে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা পৌঁছিলে, তাঁহারা বোটে
আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন এবং একত্র এক জাহাজে
আসিতে পারেন নাই বলিয়া হুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর
মধুরবাক্যে তাঁহাদের অন্তরের ক্লেশ দূর করিয়া দিলেন। তাঁহারা
প্রফুল্লমনে বাসায় ফিরিয়া গেলেন। আমাদের পাক সন্ধ্যার পর একখানা
ভাড়াটীয়া ঘরে হইল। সকলে ঐ ঘরে বাইরা আহার করিয়া আসিলেন।
আমি, কুলদা ও ঠাকুর নৌকাতেই রহিলাম। ঠাকুর তাঁহার চা খাওয়ার
নারিকেলের মালায় করিয়া পরিপূর্ণ একমালা অন্ন ও ডাল তরকারী
ব্রহ্মচারীকে আনিতে বলিলেন। অবিলম্বে তাহা আনা হইল। ঠাকুর
আহার করিয়া বাকিটা ব্রহ্মচারী ও আমাকে দিয়া বলিলেন, “তোমরা
এইখানেই বসিয়া খাও, আর দেৱী করিও না।” আমরা দুই ভাই এক
পাত্রেই বসিয়া গেলাম। আমাদের আহারের সময়ে ঠাকুর “জয় জগন্নাথ,”
“জয় জগন্নাথ” বলিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, “জগন্নাথের প্রসাদ
তোমরা এইস্থানেই পাইলে।” আমরা দুই ভাই আনন্দে ঠাকুরের নিকট

বসিয়া ঐ প্রসাদ একত্রে ভোজন করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে বিশ্বাস মহাশয় কটকের প্রসিদ্ধ উকিল, শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু মহাশয়ের বাসায় গেলেন। তিনি কলিকাতা হইতে হরিবল্লভবাবুকে আমাদের জন্ত পুরীতে একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিবার জন্ত লিখিয়া দিলেন। তাঁহার আসিতে গোণ দেখিয়া মণিবাবু ও বিধুবাবু ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিলেন। ইতিপূর্বে গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু রাত্রি ১১টার সময় ঠাকুর কথোপকথনহলে মণিবাবু প্রভৃতির নিকট বলিলেন, “গোয়ানারোহণে তীর্থে যাওয়া উচিত নয়।” এইজন্তই ইহারা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিতে বাহির হন।

ঠাকুর বোট হইতে যখন নামিলেন, তখন ১০ টাকার একখানা নোট হাতে লইলেন, এবং এক পা বোটে ও অপর পা ‘জোবরার’ ঘাটের সিঁড়িতে রাখিয়া অতি বিনীতভাবে করযোড়ে মাঝিদিগকে ঐ নোটখানি দিয়া বলিলেন, “তোমরা কৃপা করিয়া আমাকে লইয়া আসিয়াছ, আশীর্বাদ করিবে যেন শ্রীশ্রীজগন্নাথ স্বামীর দর্শন পাই।” ঘাটের উপরে রাস্তায় শত শত লোক জড় হইয়াছিল। তাহারা ঠাকুরের গৈরিক বস্ত্র ও জটাশোভিত শ্রীমুখ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইল এবং চিত্রপুতলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বোরাং যাত্রা

অতঃপর তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলেন। যাহার যাহার ইচ্ছা হইল গোয়ানেও গেলেন। আমরা গাড়ীতে চড়িয়া ধীরে ধীরে কটকের ভিতর দিয়া বোরাং স্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কটক ছাড়াইয়া পথে নদী পড়িল। আমরা হাঁটিয়া ঐ নদী পার হইলাম। নদীতে অল্প জল ছিল। জিনিষ-পত্র ক্লেশে পার হইল। নদী পার হইয়া আমরা

দ্বিতীয় অধ্যায়

৬১

ধীরে ধীরে বালির উপর দিয়া হাঁটিয়া বোরাং স্টেশনের দিকে চলিলাম। গাড়ীও সঙ্গে ধীরে ধীরে চলিল। ঠাকুরের গাড়ী প্রায় অধিকাংশ স্থলে বিধুবাবু, সত্যেন্দ্র প্রভৃতি ঠেলিয়া লইয়া চলিলেন। এইরূপে কষ্টেসৃষ্টে আমরা বোরাং স্টেশনে পৌঁছিলাম। এ সময়ে বোরাং হইতে পুরী পর্যন্ত রেলের গাড়ী যাতায়াত করিত। মণিবাবু আমাদের জিনিষ-পত্র ওজন করাইয়া টিকেট খরিদ করিয়া লইলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা গাড়ী ছিল। মণিবাবু ঐ শ্রেণীরও কয়েকখানা টিকেট খরিদ করিয়া আনিলেন। অনেকে তৃতীয় শ্রেণীতে গেলেন। স্টেশন-গৃহ হইতে গাড়ী অনেকটা দূরে ছিল। পথ কঙ্করময়, ঠাকুর চলিতে ক্লেশ পাইবেন, তাই কুঞ্জবাবু, সরলনাথ, সত্যেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ কবুল খুলিয়া ঠাকুরের অগ্রে পাতিয়া দিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতাগণের এই সান্নিধ্য সেবা দর্শনে এখনও চিত্তে উহার আনন্দ অনুভব করিতেছি। বোরাং স্টেশন হইতে গাড়ীতে চড়িয়া প্রায় ১২টার সময় আমরা শ্রীক্ষেত্রে রওনা হইলাম। বোরাং স্টেশনে ঠাকুর জল খাইতে চাহিলে, কুঞ্জ ও আমি কূপ হইতে জল আনিয়া দিলাম। শ্রদ্ধেয় মণিবাবু, শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী প্রভৃতি ঠাকুরকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠাইয়া লইয়া চলিলেন।

বোরাং হইতে পুরী যাত্রা—তীর্থগুরু মিলন

আমরা বোরাং স্টেশন হইতে অনুমান বারোটার সময় রওনা হইয়া অপরাহ্ন প্রায় ৪টার সময় পুরী স্টেশনে পৌঁছিলাম। পথে এক স্টেশনে গরম জিলিপি পাওয়া গেল। উহার কিছু খরিদ করিয়া ঠাকুর ও আমরা সকলে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। থুরদা স্টেশন হইতে তিন পাউণ্ড চা খরিদ করিলাম; কলিকাতা হইতে যে ভাল চা আনা হইয়াছিল, রাস্তায়ই উহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এক পাউণ্ড চা জাহাজের খালাসীরা

চাহিলে তাহা তাহাদিগকে দেওয়া হয়। “জয় জগন্নাথ স্বামী” বলিতে বলিতে আমরা স্টেশন হইতে হাঁটিয়া পুরীর দিকে রওয়ানা হইলাম। সকলেরই অদম্য উৎসাহ ; একখানা ঘোড়ার গাড়ী জুটিল, ঠাকুর কিছুতেই গাড়ীতে উঠিলেন না, হাঁটিয়া চলিলেন ! শাস্তি দিদি, দিদিমাতা ও ছেলেরা গাড়ীতে চলিলেন ; মালপত্র সব গরুরগাড়ীতে রওয়ানা হইল। স্টেশন হইতে বাসা প্রায় চার মাইল দূরে। ঠাকুর বেশ উৎসাহের সহিত হাঁটিতে হাঁটিতে বলিতে লাগিলেন, “জগন্নাথ দেবের কিছুই অসাধ্য নাই ; এই যে খোঁড়া আমি, আমাকেও দেখ, কি অপূর্ব শক্তিতে লইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার অপার করুণা।” কিছুদূর অগ্রসর হইলে পাণ্ডা গঙ্গাধর খুঁটিয়া বলিলেন, “ঐ দেখ মন্দিরের ধ্বজা দেখা যাইতেছে।” ঠাকুর উহা দর্শন করিবামাত্র অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং বাহার হাতে যাহা আছে সমস্ত গঙ্গাধর খুঁটিয়ার পদতলে দিয়া প্রণাম করিতে বলিলেন। সকলেই তাহা করিতে লাগিলেন। কিছুদূর এইভাবে আসিতেছি, এমন সময় হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া নামক একটি ছোট ছেলে আসিয়া ঠাকুরকে তুলসী দিলেন। তখন গণেশ পাণ্ডা বলিলেন, “ইনিই গোবর্দ্ধন খুঁটিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আপনাদের প্রকৃত পাণ্ডা ; গঙ্গাধর খুঁটিয়া তাঁহার ভ্রাতা, আপনাদের পাণ্ডা নহে।” ঠাকুর ইহা শুনিয়া হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া পাণ্ডাকে একখানি ১০ টাকার নোট দিয়া নমস্কার করিলেন এবং এইস্থানে একটু বিশ্রাম করিয়া লইলেন।

কীর্ত্তনানন্দে মন্দিরাভিমুখে প্রয়াণ

ধ্বজা দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবাবেশে মত্ত হইয়া চলিলেন। গুরুভ্রাতার কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন ; ঠাকুর কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিধুবাবু প্রভৃতি গান ধরিলেন, “যাদের হরি বলতে

তৃতীয় অধ্যায়

৭৯

ভজন করিতেন। ঠাকুর এ সকল গল্প শুনিলেন এবং মঠের ভিতর যাইয়া তথায় বড়ভুজ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। ঐ মঠের মহাস্ত বাবাজী ঠাকুরকে খুব আদর করিয়া একখানা নামাবলী দিলেন, ঠাকুরও উহা খুব আগ্রহের সহিত মাথায় বান্ধিয়া লইলেন। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধ বকুলের পাতা ও বীজ কুড়াইয়া লইল। এইস্থানে ঠাকুরের ইঙ্গিতে কিছু বেশী পরিমাণে দর্শনী দেওয়া হইল। শ্রীমান অমৃত একটি পাকা বকুলের ফল কুড়াইয়া আনিয়া ঠাকুরের হাতে দিলেন। ঠাকুর উহা তখনই খাইয়া ফেলিলেন।

ঠাকুর একদিন কুঞ্জ ও আমাকে বলিলেন, “ঐ যে সিদ্ধবকুল বৃক্ষটি দেখিয়াছ, উহা হরিদাস ঠাকুরের তপঃপ্রভাবে ও মহিমায় একটি বীজ আকারে পরিণত হইয়াছে।” আমরা উভয়ে পুনরায় একদিন উহা অনুসন্ধান করিতে সিদ্ধবকুলে গেলাম। যাইয়া দেখি বৃক্ষটি যথার্থই বাকিয়া প্রণবাকার হইয়াছে। বৃক্ষের গায়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি যেন প্রকাশিত রহিয়াছে। আমরা এ সকল দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া আসিয়া ঠাকুরকে জানাইলাম, ঠাকুর কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না।

চক্রতীর্থ দর্শন

আজ ঠাকুরের সঙ্গে আমরা সকলে চক্রতীর্থ দর্শন করিতে চলিলাম। তিনি অতি প্রত্নাবে বাহির হইলেন। মন্দিরের নিকট ‘টিনদাস বাবাজী’* ও অগ্র একটি সাধুকে কিছু পয়সা ও গরুকে ঘাস কিনিয়া দিয়া ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। বালির মাঠ দিয়া চলা বড় ক্লেশকর,

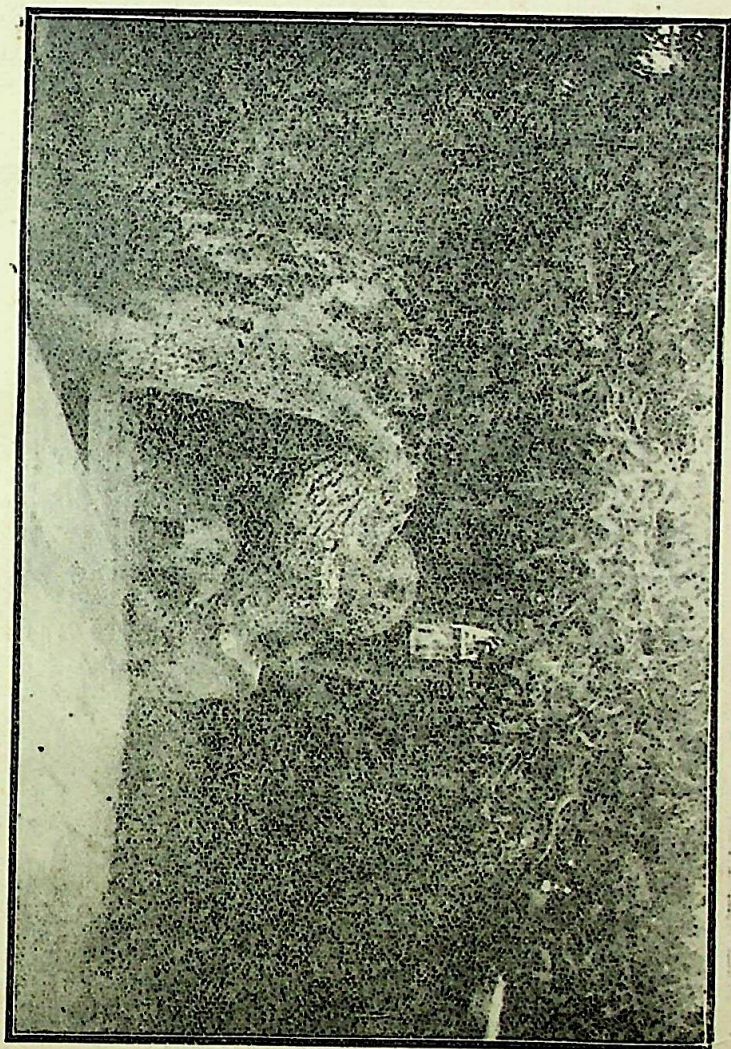
* এই বাবাজী একটা টিন বাজাইয়া ভজন করিতেন, তজ্জন্ত সকলে ইহাকে ‘টিনদাস’ বলিত। ইনি একজন কবীরপন্থী সাধক। লোকটি বড় বিনয়ী ও ভজনশীল।

এইজ্ঞা কাছারির রাস্তায় ঠাকুর চলিলেন। সমুদ্রের কিনারা দিয়া হাঁটিবার যে রাস্তা আছে তাহা ধরিয়া চক্রতীর্থের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া শৌচাদি কার্য্য সমাধানান্তর চক্রতীর্থে পৌঁছিলেন। চক্রতীর্থের নিকটে দুই-একটি মন্দির আছে; তথা হইতে ব্রাহ্মণের আসিলেন এবং ঐস্থানের অবশুকরণীয় ক্রিয়া-কলাপ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। চক্রতীর্থে জল অল্প; ঠাকুর বসিয়া কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া উঠিলেন; আমরা শুইয়া শুইয়া স্নান করিলাম এবং পরে উঠি বালি দিয়া মন্দির প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। কেহ কেহ তীর্থের কার্য্য-কলাপ করিতে লাগিলেন ও ব্রাহ্মণদিগকে পয়সা দিলেন।

চক্রতীর্থের গল্প হইতে লাগিল। এইস্থানে ব্রহ্মদাক্ষ ক্ষীরোদসাগর হইতে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া সমুদ্রের চড়ায় লাগে। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ স্বয়ং আসিয়া এই ব্রহ্মদাক্ষ অতি সমারোহে পূজা, অর্চনা, প্রণতি করিয়া মন্দিরে যজ্ঞবেদীতে লইয়া যান এবং স্বয়ং ভগবানই বিশ্বকর্মারূপে আসিয়া ঐ ব্রহ্মদাক্ষ দ্বারা চারি বিগ্রহ নির্মাণ করেন। ব্রাহ্মণেরা এইরূপ গল্প করিলেন। এইস্থানে চক্রনারায়ণ বিগ্রহ আছেন, ঠাকুরের সহিত আমরা যাইয়া দর্শন করিলাম। পূজারী, নারায়ণের জন্ত ভাল মন্দির করিতে ২৫ টাকা চাহিল। ঠাকুর বলিলেন, “এখন সঙ্গে টাকা নাই, বাসাতে আদৌ তো দিতে পারি।” তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে বাসায় আসিয়া ২৫ টাকা লইয়া গেলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ভ্রমণের বড়ই আনন্দ। মন্দির সম্বন্ধে, স্থান সম্বন্ধে মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কতই গল্প করেন। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুন্দর গল্প বলিয়া ও উপদেশ দিয়া সকলকে আনন্দ দিয়া থাকেন। আজ অনেক ভ্রমণ হইল, ঠাকুর বাসায় ফিরিলেন। পানের পর নিয়মিত পাঠ হইল।

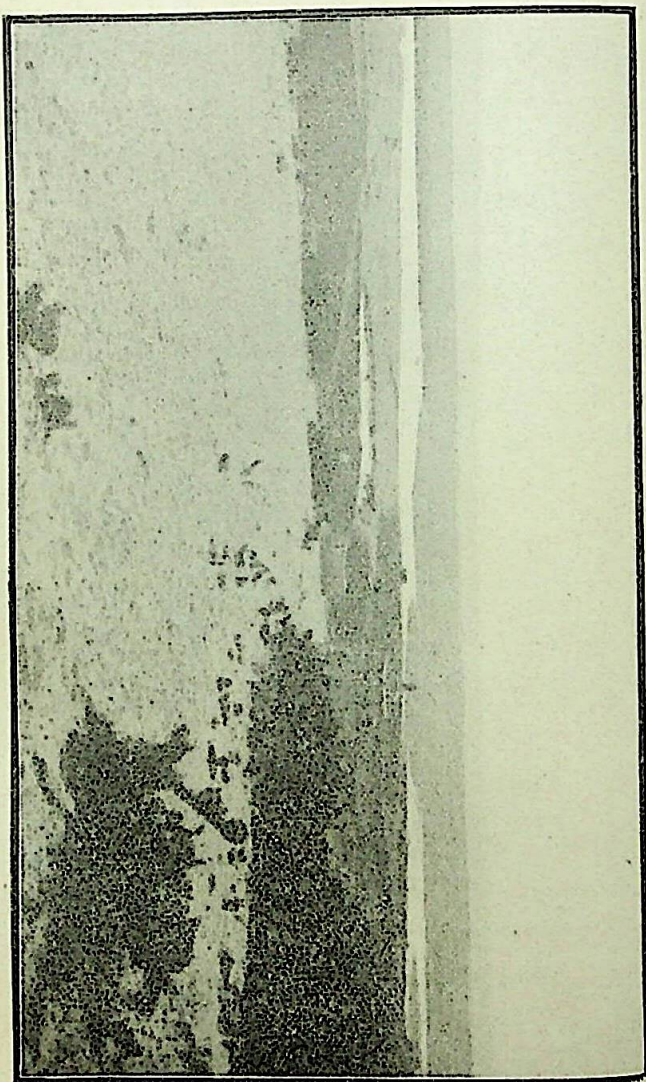
নিজ বহুল—পুঁথিখান

০৮



চক্রতীর্থ—পুরীধাম

৮২



গুণ্ডিচাবাড়ী ও ইন্দ্রহ্যম্ন সরোবর দর্শন

একদিন আমরা ‘গুণ্ডিচাবাড়ী’ ও ‘ইন্দ্রহ্যম্ন সরোবর’ দর্শন করিতে চলিলাম। ঠাকুর ভোরে বাহির হইলেন এবং মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিলেন। গুণ্ডিচাবাড়ী ইন্দ্রহ্যম্ন মহারাজের যজ্ঞবেদী ; তিনি ঐ স্থানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ভগবান জগন্নাথদেবের কৃপালাভ করেন এবং তিনি দারুব্রহ্মস্বরূপে চক্রতীর্থে প্রকট হন। ঐ যজ্ঞকালে যে সকল গোদান হইয়াছিল, সে সকল গরুর খুরদ্বারা ভূমি খাত হইয়া ইন্দ্রহ্যম্ন সরোবর হইয়াছে। ঐ সরোবরে অকুপা নামে একটি পুরাতন কচ্ছপের কথা, মহাভারতে উল্লেখ আছে। আরও একটি প্রবাদ এই যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের শীর্ষদেশে যে চক্রাকার প্রকাণ্ড একখণ্ড প্রস্তর আছে, তাহা ইন্দ্রহ্যম্ন সরোবরের কচ্ছপগণ পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া উক্ত স্থানে রাখিয়াছিল। বালি ঢালু করিতে করিতে বহুদূর পর্য্যন্ত রাস্তা তৈয়ার হইয়াছিল, উহারই উপর দিয়া ঐ সকল কচ্ছপ ভগবানের মন্দিরের জন্ত এই প্রস্তরখণ্ড বহন করে। যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণেরা এই সকল গল্প করিলেন। পথে ‘মাসীয়ার’ মন্দির পড়িল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে যাইতে যাইতে এই স্থানে একদিন বিশ্রাম করেন। ‘মাসীয়া’ অর্থ জগন্নাথদেবের মাসীয়া। ইনি ক্ষেত্র রক্ষাকারিণী অষ্ট শক্তির মধ্যে এক শক্তি। কেহ কেহ এই বিগ্রহ দর্শন করিয়া চলিলেন। আমরা যজ্ঞবেদীতে পৌঁছিলাম। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে চড়িয়া আসিয়া ছয় সাত দিন এই যজ্ঞবেদীতে বা গুণ্ডিচাবাড়ীতে বাস করেন। আমরা গুণ্ডিচা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞবেদী প্রভৃতি দেখিলাম। এই স্থানে একজন গ্রহরী ছিল ; সে সকলের মাথায় ঝাড়ু ছোঁয়াইতে লাগিলে ঠাকুর খুব আদর করিয়া কয়েকটা ঝাড়ুর আঘাত

মাথায় লইলেন। গ্রহরী বেশ দুই পয়সা পাইল। গুণ্ডিচাবাড়ীতে দশ টাকা প্রণামী দেওয়াইলেন।

পরে যজ্ঞবেদীর কূপ দর্শন করিলেন এবং উহা হইতে জল উঠাইয়া কিছু পান করিলেন। আর সকলেও গণ্ডুবে গণ্ডুবে জল পান করিতে লাগিলেন। অতঃপর ঠাকুর রান্নাঘর ও চুলা সকল দর্শন করিয়া ইন্দ্রচান্দ্র সরোবরের দিকে চলিলেন।

পথে প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, “হাজার হু’ হাজার বৎসরের গাছ, সকলেই দেবত্ব পাইয়াছে।” পথ হইতে ব্রাহ্মণদের কথায় কয়েক আনার মোয়া কিনিয়া লওয়া হইল, উহা সরোবরের কচ্ছপদের দিতে হইবে। কেহ কেহ এই মোয়া নিজেরাই আশ্বাস্য করিতে লাগিলেন। দোকানিদের একদর ছিল না। সুবিধামত যাহার নিকট যাহা আদায় করিতে পারে তাহাই করিল। তাই অনেকে ঠকিয়া অতি অল্প সংখ্যক মোয়া বেশী পয়সায় কিনিল। শ্রীযুক্ত জগবন্ধুবাবু ঠকাইতে পারিল না। তিনি এই বিষয় ঠাকুরকে কথাগুলো বলাতে তিনি বলিলেন, “ধর্মের অর্থ এ নয় যে সকলে বোকা হইবে, সর্পের মত চতুর হইতে হইবে।” এইরূপে কথাবার্তায় আনন্দ করিতে করিতে আমরা সরোবরে পৌঁছলাম। ঠাকুর সিঁড়ি দিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া জলের নিকট যাইয়া বসিলেন। আমরা সকলে স্নানের উদ্দেশ্যে করিতে লাগিলাম। ঠাকুর বলিলেন, “হাঁহারা তর্পণাদি পিতৃকার্য্য করিতে চাহেন, হাঁহারা করিয়া লউন।” জগবন্ধুবাবু ভাল করিয়া পিতৃকার্য্য করিলেন, আমরাও কেহ কেহ ব্রাহ্মণদের কিছু কিছু পয়সা দিয়া স্নান ও তর্পণাদি করিলাম।

এইস্থানে আসিয়াই ব্রাহ্মণেরা কচ্ছপগুলোকে “কাড়ে”, “কাড়ে”, “গোপাল”, “গোপাল” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন; কয়েকটি

তৃতীয় অধ্যায়

৮৩

কচ্ছপ আসিলে, উহাদিগকে মোয়া দেওয়া হইল; উহারা খুব আনন্দ করিয়া খাইতে লাগিল; ঠাকুর বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, “আরও কচ্ছপ আছে, রৌদ্রে উঠিয়াছে, এখন আসিবে না।” এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের কার্য শেষ করিয়া আমরা ঠাকুরের সহিত উঠিলাম।

ঘাটের কিছু উপরেই ‘নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব।’ ঠাকুরের সহিত আমরা সকলেই মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া মহাদেব দর্শন করিলাম। ঠাকুর পাণ্ডাদিগকে পাঁচ টাকা দিলেন। আসিবার সময়ে তাঁহার দৌহিত্র দাউজীকে বলিলেন, “দাউজী, মহাদেবের নিকট আশীর্বাদ চাও, যেন বিবাহ করিতে না হয়।” আমরা ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণদের সহিত বাসায় ফিরিলাম, তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দক্ষিণা দেওয়া হইল।

ঠাকুর বলিলেন, “ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ও গুপ্তিচার স্থান দেখিলাম। তাহা বহু কালের পরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মহাপ্রভু এই স্থান কতই পরিস্কার করিয়াছেন, আজ এই স্থান দেখিয়া ভালই হইল, আর দেখা নাও হইতে পারে।”

ঠাকুর রামনবমীর একদিন পর আমাদের লইয়া হরচণ্ডি সাহিতে শোভাযাত্রা দর্শন করিতে গেলেন। আমরা রাস্তার ধারে ঘরের বারান্দায় বসিয়া দর্শন করিতে লাগিলাম। কেহ রাবণ সাজিয়াছে, কেহ দেব, দেবী, সিপাহী ইত্যাদি সাজিয়াছে। আনন্দে দর্শন করিলাম। বাসায় আসিতে রাত্রি হইল। রাস্তায় খুব অন্ধকার বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া বাস হইতে লঠন আনা হইল।

ভূতানন্দ স্বামী : দোনাচুরি উৎসব

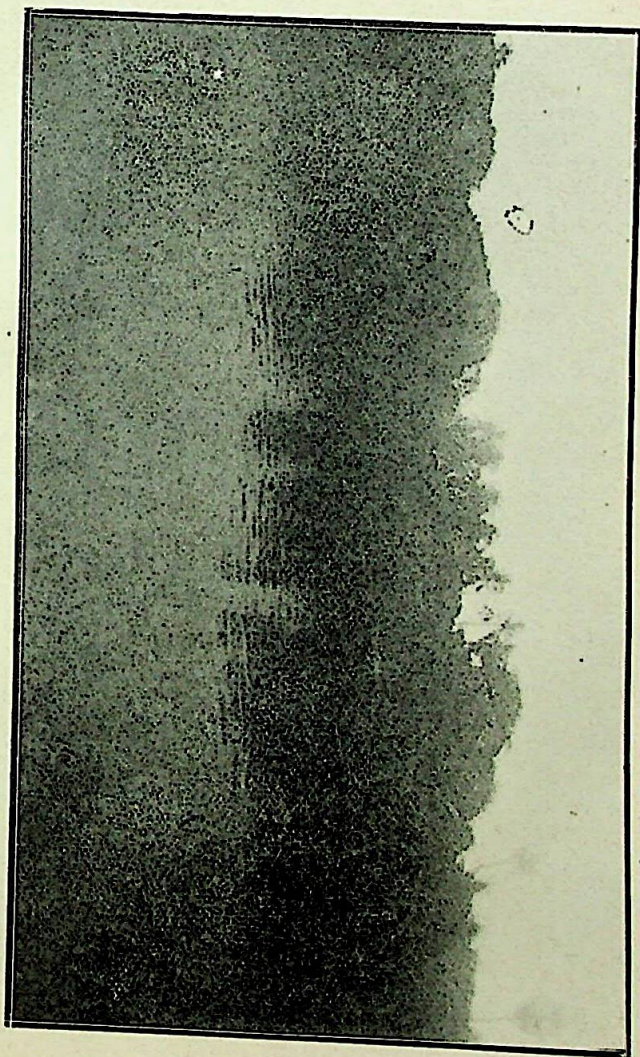
একদিন আমরা ঠাকুরের সঙ্গে জগন্নাথবল্লভ মঠ দর্শন করিতে যাই। তখন তথাকার জগন্নাথবল্লভ মঠের মহন্ত বহু প্রাচীন মহাত্মা ভূতানন্দ স্বামী ঠাকুরকে সমস্ত বাগান দেখাইলেন। পরে মহাবীরের মন্দিরে সন্নিকটে অঞ্জনামায়ীর বেদীর পূর্বধারে একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, এই স্থানে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ৭ দিন একাসনে সমাধিস্থ ছিলেন। এই সময়ে যে সকল কথাবার্তা হয় তাহাতে বুঝা গেল ইহা তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। এই উদ্দানে মহাপ্রভু সান্ধোপাঙ্গ সহিত অনেক সময়ে আসিয়া বিশ্রাম ও কীর্ত্তন মহোৎসবাদি করিতেন।

প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসরের ঘটনা ভূতানন্দ স্বামী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলাতে আমাদের কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ জন্মিল। ঠাকুর বলিলেন, “হরিদ্বারের কুস্তমেলায় আমার সহিত একটি প্রাচীন গুজরাটী মহাত্মার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমায় পরিচয় জিজ্ঞাস্য করায়, শাস্তিপুরে আমার বাড়ী শুনিয়া বলিলেন, “প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে আমার সহিত শাস্তিপুরের একটি মহাত্মার দেখা হয়। তাঁহার নাম কমলাক্ষ ছিল। তাঁহার একখানা গীতা এখনও আমার নিকটে আছে।” আমি বলিলাম, “কমলাক্ষ আমারই পূর্বপুরুষ।”

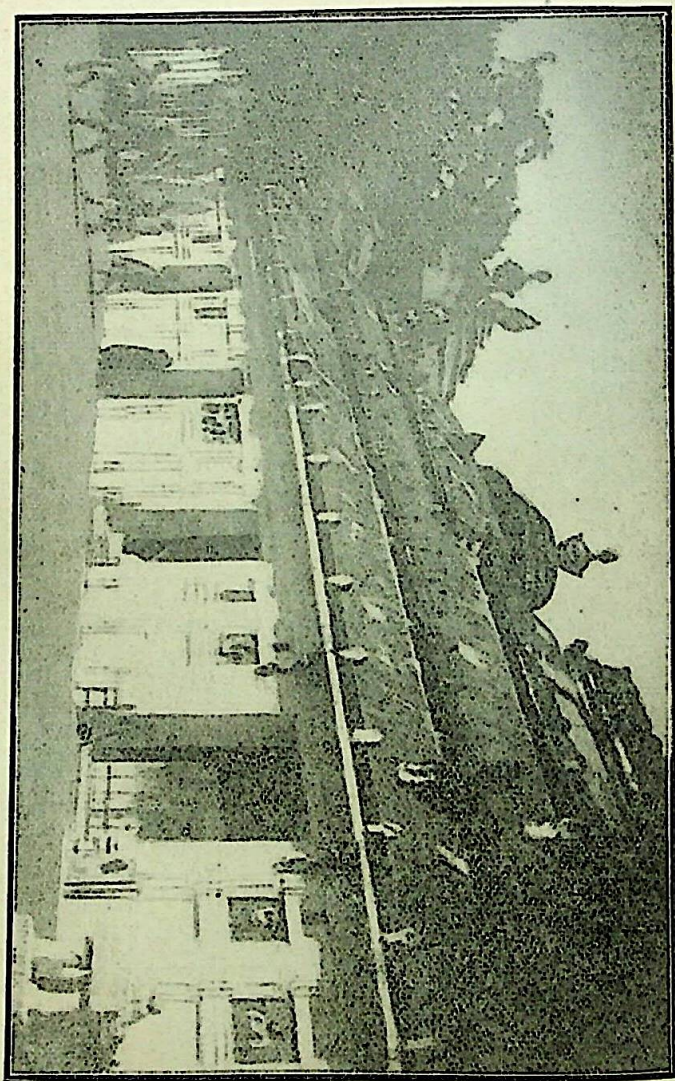
আর একদিন জগন্নাথবল্লভ মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয়ের ‘দোনাচুরি’ উৎসব দর্শন করিতে ভূতানন্দ স্বামী আমাদের নিমন্ত্রণ করেন। জগন্নাথবল্লভ মঠে মহাবীর বিগ্রহের নিকট রামকৃষ্ণ দুই ভাই আদি ঐ ‘দোনা’ বা ‘দমনক’ পুষ্প চুরি করেন। আমরা, মহাবীরের নিকট গিয়া জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে রামকৃষ্ণ আসিতে গৌণ আছে বলি। ভূতানন্দ স্বামীর কাছে তাঁহার বৈঠকখানায় বসিলাম।

ইন্ডিয়ান সেরাবর—পুরীধাম

৪৭



শুভিলা বাড়ী—পুরীধাম



তিনি মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার নিকট হাত পাতিয়া বলিলেন, “আমাকে একটু প্রসাদ দেন।” স্বামীজী প্রসাদ দিলে পর ঠাকুর উহা মস্তকে স্পর্শ করাইয়া খাইয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, “এ মহাপ্রসাদ”। আমরাও সকলে ঐরূপ হাত পাতিয়া প্রসাদ পাইলাম।

আমরা নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম, স্বামীজী না জানি আজ কি আমাদের সঙ্গে থাকিবেন। কিন্তু আজ আমাদের ঐ পর্য্যন্তই।

ইতিমধ্যে ঠাকুর একদিন ‘মার্কণ্ডেয়’ মহাদেব দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বিধুবাবু ও সরলনাথকে ধরিয়া সরোবরে নামিয়া জল স্পর্শ করিলেন। পরে মহাদেব দর্শন করিয়া ফিরিলেন।

লোকনাথ দর্শন : সত্যভামার দর্পচূর্ণ

সকালবেলা ঠাকুরের সহিত আমরা লোকনাথ মহাদেব দর্শন করিতে বাহির হইলাম। লোকনাথ মহাদেবের মন্দির শ্রীমন্দির হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এ দেশের লোকে লোকনাথ মহাদেবকে বড় মান্য করিয়া থাকে; বিপদে পড়িলে ‘লোকনাথ মহাদেব’ ও ‘বিমলামায়ীর’ দোহাই দেয়। সেবার বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। শিবরাত্রির সময়ে আপামর সাধারণ লোক তথায় উপস্থিত হইয়া রাত্রি জাগরণ করে। বহু দূরদেশ হইতেও লোকের সমাগম হয়।

আমরা ঠাকুরের সহিত আনন্দ করিতে করিতে বাহির হইলাম। মন্দির পার হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে পথের ধারে একটি প্রকাণ্ড মহাবীরের বিগ্রহ দর্শন হইল এবং মহাবীরের গল্প হইতে লাগিল। একটি দৃশ্য ঠাকুরের চক্ষে পড়িল, আবেশে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, “সেবকের জয় চিরকালই; শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আজ কত যত্ন করিয়া নিজহস্তে মহাবীরকে সাজাইতেছেন। মাথায় মুকুট পরাইয়া মণিমাণিক্য

দ্বারা আদরে সাজাইয়া দিতেছেন। মহাবীর আনন্দে অধির হইয়া ষোড়হাতে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার কি অনির্বচনীয় শোভা হইয়াছে! ভক্তদিগকে প্রভু এরূপ কতই আদর করিয়া থাকেন। ইনি তো সামান্ত নন—রুদ্রাবতার।

পথে ঠাকুরকে একটা গরুতে গুঁতাইতে অগ্রসর হইতেছিল। বিধুবাবু তাহাকে শিং ধরিয়া টানিয়া অশ্বদিকে লইয়া গেলেন। মন্দিরে যাইবার পথটি বড়ই সুন্দর, দুধারে বড় বড় বটবৃক্ষ, বহুকালের অতীত কাহিনী যেন ব্যক্ত করিতেছে। পথে যাইতে যাইতে ঠাকুর অশ্বথ গাছের নূতন পাতা বানরদিগকে খাইতে দেখিয়া বলিলেন, “সত্যভামার দর্পভঙ্গ সময়ে হনুমান আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া গরুড় বলিল ‘অশ্বথ গাছের নূতন পাতা খেয়ে বুঝি তোর বল হয়েছে?’ হনুমান বলিল, ‘কি কিচির-মিচির করুছি’ এই বলিয়া বাঁধিয়া লইয়া চলিল। পথে সুদর্শন বাধা দিল। মহাবীর গরুড়কে বগলে পুরিয়া লইলেন এবং সুদর্শনকে অঙ্গুরীরূপে পরিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, ‘সত্যভামা, বড় বিপদ, শীঘ্র সীতা হও।’ সত্যভামা পারিলেন না। রুক্মিণী ধ্যান করিয়া সীতা হইলেন। হনুমান রামরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কৃষ্ণ বলিলেন ‘ওটা কি?’ হনুমান বলিলেন, ‘পথে একটা পোষা পাখী টে’ টে’ করিতেছিল, ধরিয়া আনিয়াছি।’ কৃষ্ণ, ‘ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও’ বলাতে হনুমান ছাড়িয়া দিলেন। পরে বলিলেন, ‘শুনেছি আমার মাকে ছাড়াও হাজার হাজার বিয়ে করেছ। তুই একটা দেখাও ত হাড় পিষে দি।’ সত্যভামার আঁকল গুড়ুম!”

আমরা এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের সহিত আনন্দ করিয়া লোকনাথ দেবের মন্দিরের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর কিছুকাল এধার-ওধার দর্শন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সেবকেরা ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইবে, তাই কিছু ভিক্ষা চাহিল ; যাহার হাতে যাহা ছিল সব দেওয়া হইয়াছে ; ঠাকুর আরও ১০টা টাকা চাহেন ; অব্বেষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আছে, আছে,” এই বলিয়া পান্নার মাতার দিকে তাকাইয়া “টাকা আয়, আয়, আয়” বলিতে লাগিলেন । আমরা হাসিতে লাগিলাম ; পান্নার মাতাও হাসিয়া একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন । আমি ঠাকুরের আদেশে উহা সেবকদিগকে দিয়া দিলাম । প্রতিদিনই ঠাকুরের সহিত বাহির হইবার কালে পান্নার মা কিছু টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়া যাইতেন । ঠাকুরের প্রয়োজন হইলে অমনি উহা দিয়া দিতেন ।

মন্দিরে লোকনাথের বাগানে বড় সুন্দর সুন্দর আম হইয়াছে । ঠাকুর বলিলেন, “খুব সুন্দর আম তো ; মাটি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে ।” আমি ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া পাণ্ডাদের নিকট হইতে কাঁচা দুটি আম চাহিয়া লইলাম । বাসায় ফিরিয়া আসিলে ঠাকুরকে উহা দেখাইলাম ; তিনি খুব আনন্দ করিয়া উহা কাটিয়া আনিতে বলিলেন, নিজে কিছু গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট সকলকে দিতে বলিলেন ।

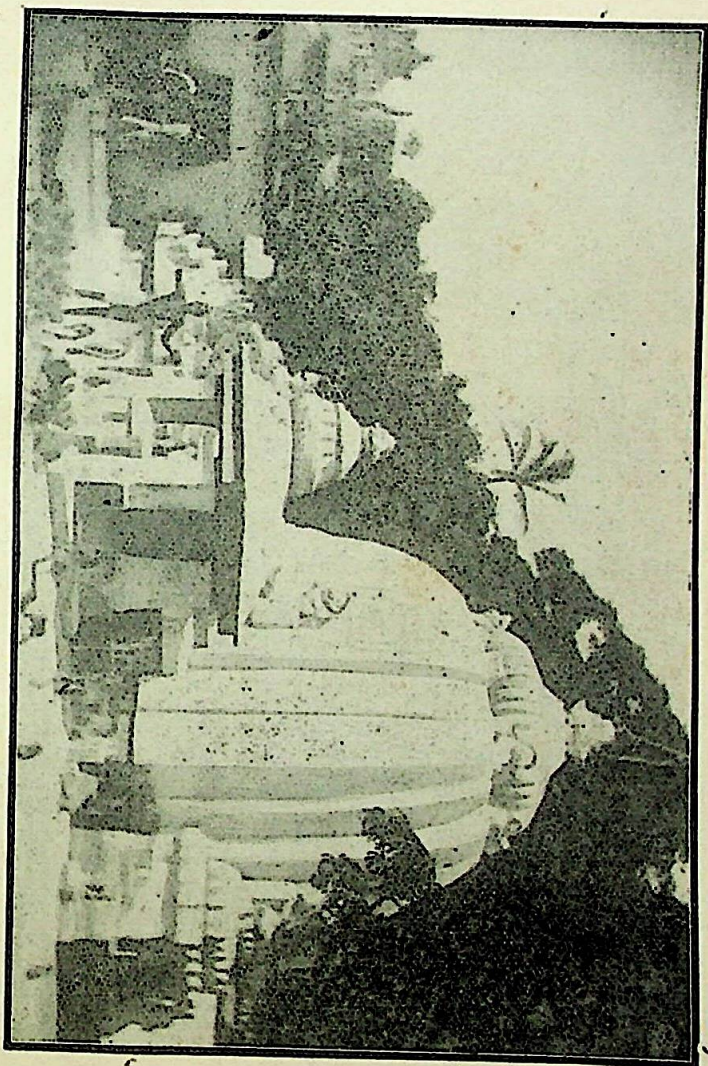
স্বামী দেবপ্রসাদের পুরী আগমন

আজ আমাদের গুরুপ্রাতা স্বামী দেবপ্রসাদ বহু স্থান ঘুরিয়া পুরী পৌঁছিলেন । তিনি বোম্বাই সহরে জজ রাণান্দ মহাশয়ের বাটীতে মাসাধিক কাল ছিলেন । জজ মহাশয় স্বামীজীর সুন্দর চরিত্র, আশ্চর্য্য বিদ্যাবত্তা এবং সন্ন্যাসবেশ দেখিয়া নিজের পরিবারের ভিতরে উহাকে মাসাধিক কাল রাখেন । ঐ সময়ে তাঁহার পুস্তকাগারের বহু গ্রন্থ দেবপ্রসাদ পাঠ করেন । তিনি পুনায়ে চারি মাস ছিলেন । পঞ্চবটীর এবং উজ্জয়িনীর মেলা দর্শন করিয়া বদরিকাশ্রম হইয়া পুরীতে আসেন । ঠাকুর

তাঁহাকে অতি আদরে গ্রহণ করেন ও একখানা ভিন্ন ঘর তাঁহার বাসের জন্ত নির্দেশ করিয়া দেন এবং তাঁহার নাম দেবপ্রসাদ রাখেন। তিনি কালীতে 'বিদ্যং সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, বোধ্যাই হইতে 'বিদ্যং সন্ন্যাস' সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ আনাইয়া ঠাকুরকে উপহার দেন। ঠাকুরের আদেশ মত স্বামীজী তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে আসন করিয়া বসিতেন ও ঠাকুরের কথাবার্তা শুনিতেন, কখন কখন ধ্যানস্থ হইয়াও থাকিতেন। স্বামীজী পুরী পৌছিবার কয়েকদিন পূর্বে ঠাকুর কুঞ্জকে বলিলেন, "স্বামীজী এখানে আসিয়া বিশেষ আনন্দ পাইবেন এরূপভাবে একখানা চিঠি কানপুরে মন্মথের নিকট, অপর একখানা কলিকাতায় অভয়বাবুকে লিখিয়া দাও।" কুঞ্জ তাহাই করিলেন। পত্র দু'খানার মন্ত্য স্বামীজী কিছুই জানিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ পুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী আসিবামাত্র ঠাকুর আমাকে ও কুঞ্জকে, দিদিমার ঘরের নিকট-বর্তী মহাপ্রসাদ রাখিবার ঘরের সংলগ্ন কোঠাটি জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিতে বাললেন। কিন্তু ঐ ঘরে কয়েকটি গুরুভগিনী থাকিত বলিয়া দিদিমা তাহাতে বিশেষভাবে আপত্তি করিতে লাগিলেন। উহা ঠাকুরকে বলিতে তিনি বলিলেন, "এখনই যেয়ে ওঘরের জিনিষ-পত্র বাহির করিয়া দেও। উহাদের জন্ত এ বাড়ী করা হয় নাই। উহারা অত্যাচার গিয়া থাকিতে পারেন।" আমরাও অমনি জিনিষ-পত্র সরাইয়া ঘর পরিষ্কার করিলাম। ওখানেই স্বামীজীর থাকিবার স্থান হইল।

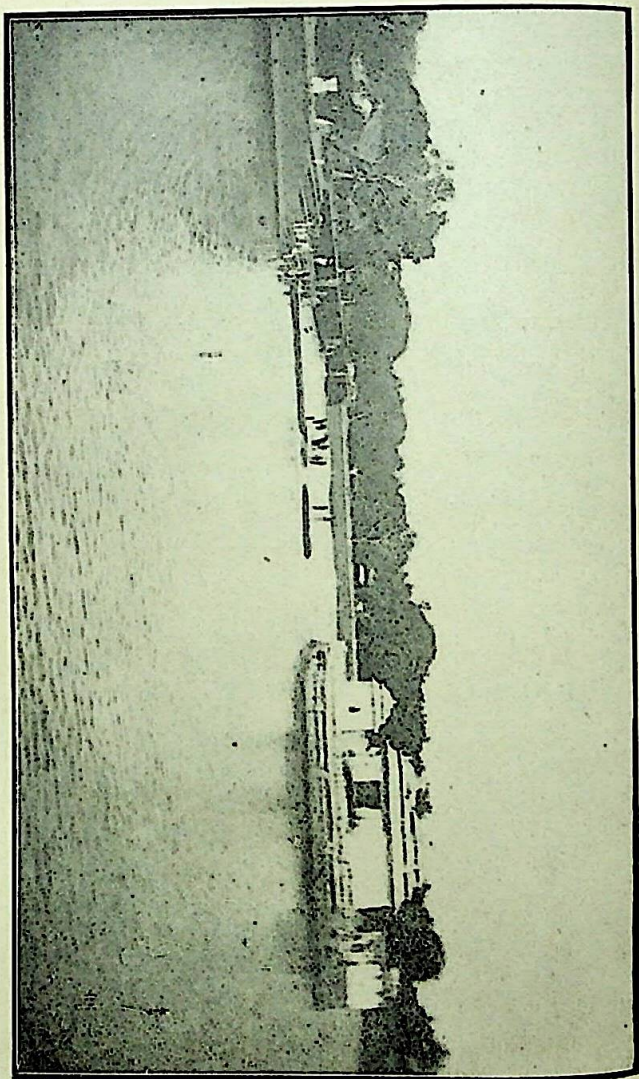
আমাদের গুরুভাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সময়ের কতকগুলি ঘটনা সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত এই হইতে ১১ই বৈশাখ পর্য্যন্ত দিনলিপির কিছু কিছু বিবরণ এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

লোকনাথ দেৱৰ মন্দিৰ—পূৰ্বাখান



নব্ব্ব্ব্ব সত্ত্ব্ব্ব্বব্ব্ব চন্দনযাত্রার মন্দির—পুর্বাধাম

৩৫



তৃতীয় অধ্যায়

৮৯

পূজা ও দান

ঠাকুর সতীশকে বলিলেন “কাল রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, নরেন্দ্রের পারে যে সব সাধু থাকেন তাঁহাদের বড় কষ্ট। তুমি দেখিলে? কেমন?”

সতীশচন্দ্র—আমি স্নান করিয়া আসিবার সময় লক্ষ্য করি নাই।

ঠাকুর—যেদিন কিছু দান করা না হয়, তাহাকে মন্থ বলিয়াছেন, বক্ষ্যা দিন। বিধু, আজ নরেন্দ্রের পারে যাব, দেখতো ছুটি টাকা যদি যোগাড় করিতে পার।

টাকা যোগাড় হইল। ঠাকুরের সহিত আমরা নরেন্দ্র সরোবরের দিকে চলিলাম। সতীশ পথে যাইতে যাইতে ঠাকুরকে বলিলেন, “বাসায় একটি সাধু আসিয়া বলেন, “খাইতে দাও”, আমি বলিলাম, “বাহা ছিল বাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।” সাধু বলিল, “একটু জল দাও।” জল আনিতে যাইয়া মনে হইল, ছুটি প্রসাদও দেই, সাধুকে আর পাইলাম না; খুঁজিতে খুঁজিতে ধর্মশালায় গেলাম, তথায়ও না পাইয়া একটি পীড়িত সাধুকে ঐ প্রসাদ ধরিয়া দিলাম।” তিনি মালা জপ করিতেছিলেন। তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বড় ভাল লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন, “‘পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং নিজের ইষ্টদেবের পূজা, চাহিলে দিলে—দান, অযাচিত ভাবে দিলে—নিজ ইষ্টদেবের পূজা। ধর্মশালায় অনেক ভদ্রলোক থাকেন, তা না হ’লে ঐ সাধুটি জগন্নাথ স্বামী আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, বলিতে পারিতেন না। দেখিও, যদি তিনি না আসেন তবে সেদিন ওর জায়গায় প্রসাদ পৌঁছাইয়া দিও।” নরেন্দ্রের পারের সাধুদের স্থানে পৌঁছিয়া ঠাকুর বলিলেন, “আপনারা কেমন ছিলেন?” ইতিমধ্যে বিধুবাবু দুইটি টাকা দিলেন।

সাধুরা—“আমরা কষ্টে ছিলাম, দুইটি টাকা হইলে আমাদের একটি কাপড়ের ছাউনি হয়।”

ঠাকুর—বিধু, পাঁচ টাকা যোগাড় করিতে পারিবে ?

বিধু—দেখি বাসায় গিয়ে,—এই বলিয়া বিধুবাবু বাসায় চলিয়া গেলেন। ঠাকুরকে একজন সাধু দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ও নির্ঝাঁক হইয়া রহিলেন। তিনি বস্ত্রহীন ছিলেন। ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়া লাগিলেন, “এখানে আসিলে পর, গৈরিক বস্ত্র দান করিতে, আমায় কোন মহাত্মা নিষেধ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ‘এ তোমার যে ষাঁহারা গুরু হইতে অধিকার লাভ না করেছে, তাহাদিগকে গৈরিক বেগু হইবে না।’ ইনি সে অধিকার পেয়েছেন কি না জানি না।” এই সব কথা শুনিয়া সতীশ ও শ্রীধর নিজ নিজ বস্ত্র ছাড়িয়া ঐ সাধুটিকে দিলেন তখন সতীশকে ঠাকুর বলিলেন, “আজ তোমার বস্ত্রহরণ হইয়া গেছে পর্যন্ত সকলকে তেনাচুর না করিব সে পর্যন্ত আমি ছাড়িব না।”

সতীশ—“তাই চাই।” বিধুবাবু আসিলে সাধুদিগকে টাকা দেওয়া হইল।

“ঠাকুরের ভাবে উক্তি”

রাত্রিকালে মাণিক মাথায় কালো একটি ছেলে ঠাকুরের নিকট প্রকাশিত হইলেন। ঠাকুর—“তোমার ভোগে এত কঁকর ও ধান কেন?” ঠাকুর (জগন্নাথদেব)—“আমি আর কি ইহা খাই? যে জিনিষ আমি খাই তাতে আমার গায়ের গন্ধ পাইবি।” (১)

(১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রকার ভগবানের অধরামৃতযুক্ত মহাপ্রমাণ ‘মুক্তি লব্ধ ফেলানব’ বলিয়াছেন। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, অন্তর্লীলা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।) পক্ষান্তরে ঠাকুর পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, মন্দির হইতে যে সকল

তৃতীয় অধ্যায়

৯১

একটি সাধু পয়সা চাহিতে ঠাকুর তাহাকে চারি পয়সা দিতে বলেন। সারদা তাহাকে ১ পয়সা দিল। আমি বলিলাম “দেখুন ভাগ্য কি? আপনি বলিয়াছেন এক আনা দিতে, সারদা দিয়া আসিল ১ পয়সা।” ঠাকুর বলিলেন, “জগবন্ধু দেখিলেন লোকটা নিতান্তই কিছু না পাইয়া যায়, তাই প্রেরণা করিলেন।” পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “জগবন্ধু দয়াল কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাঁহার হাত নাই।” ঠাকুর—“হঁ। ভাগ্য কি বদলান যায়? তবে গুরু উপদেশ মতে ভগবদ্ ধ্যানে থাকিলে প্রারব্ধ কিছু করিতে পারে না। মার্কণ্ডেয়কে যম নিতে আসিলেন। উনি তখন ধ্যানে। যম কিছুই করিতে পারিলেন না। মার্কণ্ডেয় চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন কল্লাস্তর হইয়াছে। কালকেই কালে পেয়েছে। পরে মার্কণ্ডেয় ভগবানের মায়া দেখিতে চাহিলে, সে সময় তাঁহাকে কুমীরে খাইতে আসিল। তিনি ভয় পাইলেন ভগবানের পেটের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পরে সেই প্রারব্ধের ভোগটা (ভগবানের) পেটের ভিতর গিয়া করিতে হইল।”

(আটকে ভাঙ্গা) খোলার উপর দিয়া ঠাকুরের বেগে গমন। ঠাকুর আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, “জগন্নাথদেব চোর। উনি লোন্ডার শেষ সীমা, সাধুরও শেষ সীমা; নানা খেলা।” বাসায় আসিয়া ঠাকুর বলিলেন, “আজ জগবন্ধু বলিলেন, ‘চড়ার উপর দিয়া যা। পায়ে বিক্ষিপ্তে আমায় দুই চড় দিস’।”

আসে সমস্তই মহাপ্রসাদ, সমস্তই ভগবানের দৃষ্টি পড়ে। মহাপ্রসাদ ‘ভাল মন্দ’ বলিয়া বিচার করাতে ঠাকুর একদিন শাসন করিয়াছিলেন।

পুনরায় একদিন আহারাণ্ডে শ্রীধর ঘোষ মহাশয়কে ঠাকুর বলিলেন, “দেখ, কি দুর্ভাগ্য, আজ মহাপ্রসাদে ধান ছিল; তাহা বাছিয়া খাইয়াছিলাম; এইরূপ করিতে নাই।”

একটু রাত্রিতে ঠাকুর বলিলেন, “দেখ জগবন্ধু বলরাম সমুদ্রে ডুবাইয়া
করছেন। দেবলীলা বিচিত্র! সুভদ্রা নিষেধ কর্ছেন।”

নরেন্দ্রের ব্রহ্মচারী

আজ প্রাতে ঠাকুর নরেন্দ্রে গেলেন। সাধুদিগকে এক টাকা দেওয়া
হইল। নরেন্দ্রের তীরস্থ শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতবংশের এক ব্রহ্মচারী
নিকটে উপস্থিত হইলেন। একজন বাড়ীর ভিতরে যাইয়া খবর দিয়া
ঘর হইতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, “আমার এই মরণকাল, প্রভুকে ভিত্তি
আসতে বল।” ঠাকুর ভিতরে যাইয়া বসিলে তিনি বলিলেন, “আমার
চালের ছাউনি নাই, ১০ টাকা লাগিবে। চন্দনযাত্রার দ্বার খুলিয়া
হইবে, ভোগ দিতে ২২ টাকা লাগিবে। এ কুটীর দালান হলে ভাল
তাহাতে চারি শত টাকা লাগিবে।” ঠাকুর—আমাদের যখন যা আছে
তখনই খরচ হইয়া যায়। এখন ত খালি হাত। সম্প্রতি কিছুই নাই
ব্রহ্মচারী—আমার অদৃষ্ট। ঠাকুর বাসায় আসিয়া তিন টাকা তিন
দিনের চন্দনযাত্রার ভোগ ও দরজা খোলার জন্ত দিলেন। পরে নয় টাকা
দিদিমাকে দিয়া ঘর ছাউনির জন্ত পাঠাইলেন।

বৈকালে ঠাকুর নরেন্দ্রের পারের ব্রহ্মচারীর কথা উঠাইলেন
ঠাকুর—দেখ বৃদ্ধকালের দশা। এক পরমেশ্বর বিনা ভরসা নাই
স্বার্থনাশ হইলে তাহাতে প্রেম হয়, যেমন গোপীদের। সেতো দুই
কথা। জীবে দয়া হইলে কিছুই হয় না।

দাদা গৌসাইয়ের আত্মপুরুষ দর্শন

যোগজীবনদাদা রাত্রে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তিনি আসিয়া ঠাকুর
তাহা বলিলেন :—“মাতা ঠাকুরাণীর উজ্জ্বল মূর্তি দেখিলাম ; পরে আ

তৃতীয় অধ্যায়

৯৩

নিজ মূর্তিও অতি উজ্জ্বল দেখিলাম; আমার দেহটা দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ উজ্জ্বল মূর্তির নিকট আমি প্রস্থ করিলাম,—তুমি কে? উত্তর হইল,—“আমি আত্মপুরুষ”। পরে মাতাঠাকুরাণীকে আবার দেখিলাম, এ কিরূপ?” ঠাকুর বলিলেন, “যাহা দেখিয়াছ তাহাই স্বার্থ স্বরূপ।”

দাদা গৌসাই—তবে এ সব পাপ কেন? ঠাকুর—ও সব কিছুই নয়। প্রারব্ধ মাত্র। তোমার নূতন ইচ্ছা নাই। তা থাকিলে নূতন কৰ্ম হইত। ভগবান আপনার ফেরে পড়িয়া আপনাকে কৌশলে বাহির করেন। দৃষ্টান্ত গুটীপোকা। গুটীর মাঝে পোকা আপনার লালে বদ্ধ হয়। প্রজাপতি উপরে বসে, তখন তা দেখে তার ধ্যানে নিজের পাখা হয়, পরে উড়িয়া যায়। সে দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ খাটে না। ঐ কৌশল ভগবান কাহাকেও জানান না; অবতার হইয়া “হা সীতা,” “হা সীতা” বলিয়া কত কাঁদাকাটি করিলেন। যখন কৰ্মের শেষ অবস্থা জন্ম আর হবে না, তখনই এইরূপ দর্শন মিলে; কাহাকেও বলিস্ না।”

কামাখ্যায় অহিংসা

আজ ঠাকুর প্রাতে দর্শনে গেলেন, কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, “আফিং খেয়ে কামাখ্যার পুরুষেরা অকৰ্মণ্য হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা কাজকৰ্ম করে। পঞ্চকোশী কামাখ্যায় হিংসা নাই। একদিন অচলানন্দ পুকুরের এক পাড়ে আছেন, অগ্ন পাড়ে বাঘ আসিল। সকলে দেখিয়া ভীত হইলেন। স্বামীজী বলিলেন, “এখানে হিংসা নাই। ভীত হইবেন না।” বাঘ জল খাইয়া চলিয়া গেল। অগ্ন একদিন স্বামীজী পায়খানায় গিয়াছিলেন; ‘হুম্’ করিয়া বাঘ আসিল। নিকটে আলো ছিল, মুখ দেখিয়া একপাশ হইয়া চলিয়া গেল। সে দিন গুঁরও কিছু

ভয় হইয়াছিল।” ঠাকুর আরও বলিলেন, “এক সময়ে একটি বৃষ চরিতে কামাখ্যায় পঞ্চকোশীর বাহিরে যায়, অতি প্রকাণ্ড একটা অশ্বপু উহাকে টানিয়া বেড়িয়া হাড়গোড় পিণিয়া গিলিয়া ফেলিল।”

এক মিশনারী সাহেব গোরখপুর হইতে সাধনপ্রার্থী হইয়াছেন বোধ হয় মনোরঞ্জন (১) নিকট গুনিয়া প্রার্থী হইয়া থাকিলে ঠাকুর বলিলেন, “এখন সাধন পাবে না।” কলিকাতায় গেলে তে পুনরায় প্রার্থনা জানায়, এই মর্মে পত্রের উত্তর দিতে বলিলেন।

আজ ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। পথে এক ব্রাহ্মণকে কবল ওঁট দেওয়াইলেন।

(১) আমাদের গুরুভ্রাতা মনোরঞ্জন গুপ্ত গোরখপুরে মিশনারি হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

চন্দনযাত্রা উৎসব

চন্দনযাত্রা : নরেন্দ্রের পূর্বের স্বর্ণ মন্দির

১২ই বৈশাখ, ১৩০৫ সাল। আজ অক্ষয় তৃতীয়া। ঠাকুর ভোরে সমুদ্র-স্নানে গেলেন। ঠাকুর বৈকালে আমাদের লইয়া নরেন্দ্র সরোবরে চন্দনযাত্রা মহোৎসব দর্শন করিতে চলিলেন।

বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া হইতে এই যাত্রা আরম্ভ হয়; একুশ দিন ব্যাপিয়া ভগবানের এই জনকেলি লীলা হইয়া থাকে। ইহা পুরী-বাসীদিগের জাতীয় উৎসব।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে সত্যভামা ও মহালক্ষ্মী দেবীকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্ন তিন চারিটার সময় শ্রীমন্দির ত্যাগ করিয়া নরেন্দ্র সরোবরে এই জনকেলি করিতে বাহির হন। নরেন্দ্র সরোবরের অপর নাম 'চন্দনতলাও' অথবা চন্দনপুকুর। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্বকীয় বিশাল বিগ্রহে বাহির না হইয়া মদনগোপাল নামক ছোট প্রতিমিখি বিগ্রহে বাহির হন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রকাণ্ড বিগ্রহ বহন করিয়া আনা নেওয়া সেবকদের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর। তাই তিনি এই মদনগোপাল বিগ্রহে সাধারণতঃ যাওয়া-আসা প্রভৃতি নানা লীলাকার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীমদনগোপাল প্রতিদিন অপরাহ্নে মহিবীদেব সহিত অপূর্ব ফুল-সাজে সজ্জিত হইয়া, 'বড়দাণ্ডের' রাস্তা দিয়া আসিতে থাকেন। তখন

পথের পার্শ্বস্থিত অনেক বাড়ী ও মন্দির হইতে তাঁহাকে ভোগ দেওয়া হয়। তিনি ভোগ পাইতে পাইতে, নানারূপ সংকীৰ্ত্তন, চামর ব্যঞ্জন, গীতিবাণী স্তুতির সহিত অগ্রসর হইয়া চন্দনপুকুরে আসি নৌকায় উঠেন।

তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণ নামক দুই বিগ্রহ ভিন্ন দোলাতে চড়ি অগ্রে অগ্রে আসেন এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ পঞ্চ মহাদেব আসিয়া রামকৃষ্ণ অগ্রে নৌকায় উঠেন। এই পঞ্চ মহাদেব পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিবিধ অংশে অবস্থিত—মার্কণ্ডেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, যমেশ্বর, কপালমোহী এবং লোকনাথ। ইহারাও প্রতিনিধি বিগ্রহে আসেন। নৌকায় মদন গোপালের সম্মুখে দেবদাসীরা নৃত্য ও জয়দেব গান করেন এবং নৌকায় রামকৃষ্ণ পঞ্চ মহাদেবের সম্মুখে নৃত্যগীতে সুশিক্ষিত স্থানীয় ছেলেরা অপূৰ্ব্ব মধুর নৃত্য ও গীত করেন। ইহাদিগকে স্থানীয় ভাষায় ‘আকড়া পিলা’ বলে। অগ্রে একখানা নৌকায় বাজনা বাজান এবং এই সকল নৌকায় নরেন্দ্র সরোবরে ঠাকুরেরা ভ্রমণ করেন এবং তাঁর তীরে ঘুরিয়া জলমধ্যস্থিত মন্দিরের সম্মুখে আসেন। যখন বিগ্রহ নরেন্দ্রের তীরে তীরে নৌকায় ঘুরিয়া আসেন তখন তীরে বহু লোক দলে হরিসংকীৰ্ত্তন করিয়া এবং কতক লোক পরিক্রমা করিয়া ঠাকুর চামর ব্যঞ্জন করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকেন। ঐ নরেন্দ্র সরোবরের মধ্যে ছোট একখানি মন্দির, ভোগশালা, চন্দনের জন্য ছোট চৌবাচ্চা ও পঞ্চ মহাদেবের বসিবার জন্য ছোট ছোট পৃথক পৃথক মন্দির আছে। মদনগোপাল মহিষীদের সহিত তাঁহার মন্দিরে চন্দ্র চৌবাচ্চায় আকর্ষণ পর্য্যন্ত ডুবিয়া গ্রীষ্মের তাপ দূর ও কিছুক্ষণ উষ্ণ জলকেলি করেন। তৎপরে বেশভূষা করিয়া অপূৰ্ব্ব ফুলসাজে সজ্জা হইয়া নানারূপ জলপান (ভোগ) গ্রহণ করেন এবং পুনরায় বিহার

চতুর্থ অধ্যায়

৯৭

নিশীথ সময়ে সেবকদের সহিত শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসেন। মদনগোপাল প্রভৃতি বিগ্রহগণ যখন বড় রাস্তা ধরিয়া শ্রীমন্দিরে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সম্মুখভাগ অপূৰ্ণ দীপমালায় আলোকিত করা হয় এবং সেবকেরা স্তম্ভধ্বরে জয়দেব গান করিতে করিতে ঠাকুর লইয়া মন্দিরে যান। এই সময় মদনগোপালের বিগ্রহ অতীব দর্শনীয় হয়। অনেকেই ইহা দর্শন করিয়া এবং অতীব মধুর সাত্বিক ভাবপূর্ণ গান শুনিয়া মুগ্ধ হন। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিতেন, এই সময়ে যথার্থই বিগ্রহে কখন কখন ভগবানের আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঠাকুর প্রতিদিন আমাদিগকে লইয়া এই উৎসব দর্শন করিতে চন্দনতলাও যাইতেন। কখন কখন বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেও যাইতেন। মদনগোপাল প্রভৃতি ঠাকুরদের নমস্কার ও এক এক টাকা দর্শনী দিয়া লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেন। চন্দনতলাও যাইয়া দক্ষিণপারের বড় ঘাটের পশ্চিমপার্শ্ব সংলগ্ন যে বট বৃক্ষটি আছে উহার নিকটে বসিয়া কখন কখন ধ্যানস্থ হইতেন।

ঠাকুর মাঝে মাঝে সুন্দর কোতুক করিতেন। একদিন বারেন্দ্রায় দাঁড়াইয়া অশ্বিনী ও কুঞ্জকে বলিলেন, “দেবদাসীর নাচ দেখ বে?” এই বলিয়া হাতের দণ্ড দেওয়ালের গায়ে রাখিয়া বন্ধিমভাবে দাঁড়াইলেন এবং কটিদেশ দোলাইয়া দক্ষিণ হস্ত নাড়িতে নাড়িতে তালে তালে পা ফেলিতে লাগিলেন।

একদিন নরেন্দ্রের পারে বসিয়া কিছু পরে আমাদিগকে বলিলেন, “তোমরা ওপারে ঐ গাছের মাঝখানে কিছু দেখছ?” শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন, “ঐ গাছের শূণ্য মধ্যস্থানটি যেন একটি মন্দিরের আকার নিয়েছে।” ঠাকুর বলিলেন, “একটি সুন্দর মন্দির দেখা যাইতেছে, যেন সোনার মত ঝকঝক করিতেছে।” (১)

(১) পরে এইখানেই ঠাকুরের দেহ সমাহিত হয় এবং তত্পরি মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও সাম্প্রদায়িকতা

আজ ১৩ই বৈশাখ, ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। (১) পথে স্বামী দেবপ্রসাদের সহিত বৈষ্ণবদিগের ভেকের কথা হইল। ঠাকুর বলিলেন, “গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে সাম্প্রদায়িক চিহ্ন না থাকিলে, তাহাদের বলিয়া গ্রহণ করেন না, ইহা মহাপ্রভুর মত নয় বা গোস্বামীদের কোন গ্রন্থে দেখা যায় না।”.....ইহা বলিয়া বৈষ্ণবের লক্ষণ—“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা; অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” এবং “আদৌ শ্রদ্ধা” ইত্যাদি শ্লোক বলিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে ঢাকার আশানন্দ বাউলের কথা হইল। আশানন্দ বাউল অতি গোপনে একদিন ঠাকুরকে বলিল, “বীর্ষাই পরমেশ্বর, ... তাইতে সৃষ্টি!” ঠাকুর বলিলেন, “তবে যে ‘হরি হরি’ বলেন?” আশানন্দ—সে কেবল লোক সংগ্রহার্থে। আমিই ত স্বয়ং কঙ্কি অবতার। ঠাকুর—সকলকে কি এই শিক্ষা দেন?.....

নারায়ণগঞ্জের আশানন্দের যে শিষ্যটি সব ছাড়িয়া তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিল, সে আসিলে এই কথা উঠিল। তাকে ঠাকুর বলিলেন, “এ পথে নরকে যাবেন।” সে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, “আমিও ত তাই বলি।”

বশিষ্ঠদেবের উপদেশ : নরলীলা

গত রাত্রে যে একজন পুলিশ, এক চোর আমাদের বাসায় চোরাই ঘটি রাখিয়াছে বলিয়া অনুসন্ধান করিতে আসে ও তাহাকে যে সতী

(১) সতীশের ১৩ই বৈশাখের দিনলিপি হইতে সংগৃহীত।

চতুর্থ অধ্যায়

৯৯

তর্জন করিয়া তাড়াইয়া দেয় সে সম্বন্ধে কথা উঠিল। ঠাকুর বলিলেন, “আমাদের যে সব লোক, হয়তো তাহারা চোরকেই দণ্ডবৎ দিলেন। তাতে গোলমাল হওয়ার কথা। সব কাজই বিচারপূর্বক করিতে হয়। শম, দম, বিচার, সাধুসঙ্গ, সকল কার্যে আসিলে আর ক্লেশ পাইতে হয় না। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন, মুক্তির দ্বার চারিটি— শম, দম, বিচার ও সাধুসঙ্গ। একটি অবলম্বন করিয়া চলিলেই লোকে মুক্তিলাভ করিতে পারে। চারিটির আর কি কথা? শম—বাহিরে আফিসে কাজকর্ম করে কিন্তু অন্তর ঠাণ্ডা। বাহিরের ঘটনায় স্পর্শও করে না। শম না থাকিলে পরের দোষ দেখা হয়। দম—হাত, পা, চক্ষু প্রভৃতি বহিরিস্থিরের দমন। শাস্তিপূরে এক বুড়া তাঁতি ছিল। সে কৃষ্ণভক্ত। আমরা ছোটকালে তাহাকে খেপাইতাম। ‘তাঁতি তাঁত বুনতে গন, দুটো কৃষ্ণকথা শোন’। সে তেড়ে মারিতে আসিত। একদা নিকটে দাঁড়াইয়া শুনিলাম, সে একজন সমবয়সীকে বলিতেছে, ‘ছেলেদের মত বন্ধু আমার আর কেহ নাই। আমি উহাদিগকে ঠাট্টাভাবে মারিতে উঠিয়া হাত সংযম করিতে শিখি।’ তখন আমার বয়স আট বৎসর। এখনও আমার উহা মনে আছে। বিচার না থাকিলে এইরূপ কষ্টে বিপদে পড়িতে হয়। সাধুসঙ্গ না হইলে অভিমান বাড়ি।” কথায় কথায় বলিলেন, “মহাবীর যে রামচরিত লিখেন (মহানার্টক) তাহাতে আছে বিশ্বামিত্র ঋষি যাঁহার ঘটকালী করিলেন, স্বয়ং বশিষ্ঠ দেব যাঁহার মন্ত্র পড়িলেন, সেই রামচন্দ্রের কপালে কত কষ্ট। তাই বিধাতার লিপি খণ্ডাইবার নয়। সীতা হরণ হইবে, তিনি কি জানিতেন না যে তাঁহার সৃষ্টিতে সোণার মৃগ নাই? না; তিনি যে নরলীলা করিতেছেন।”

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন, “তবে তো মায়ায়।” তিনি

বলিলেন, “ঠিক নরলীলা করিতে হইবে। একটু কম বেশী হইলে চলিবে না।

দানে শুষ্কতানাশ : চন্দনযাত্রার আনন্দ

আজ দৈনিক দানের পয়সা ছিল না। ঠাকুর তাঁহার পাশখানা যাওয়ার দুইটি ঘণ্টার মধ্যে একটি বিক্রয় করিতে বলিলেন। বিক্রয় করিয়া যাহাকে বাহা দিতে বলিলেন দেওয়া হইল, অপরটি সঙ্গে করিয়া সতীশ সমুদ্রে নিলেন। ইহার পর ঠাকুরকে পুনরায় সুবিধামত একটি ঘণ্টা খরিদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সকলে শ্রীমন্দিরের নিকট একজন ব্রজবাসী মিটাইওয়ালাকে তাহার ছেলের উপবীতের জন্ত ৫, কি ৬, দিলেন। ঠাকুর ঐ টাকা দেওয়াইয়া তাহাকে বলিলেন, “পত্র পুষ্প দিয়ে কোনরূপে।” ব্রজবাসী উহা পাইয়া অত্যন্ত হর্ষে বলিতে লাগিলেন, “রাধারানী তোমকে বনায়ে রাখে (কুশল করুন)। ও হাম্কে লাখ।” একটি জ্বীলোককে টাকা দেখাইয়া, ব্রজবাসীটি বলিলেন, “বাবা মহারাজজীকি জয়, বাবাকে বনায়ে রাখে, যমুনা মাই উনুকে বনায়ে রাখে।”

একদিন ঠাকুর আমাদিগকে লইয়া চন্দনযাত্রা দর্শন করিতে গিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল শ্রীহরিসংকীৰ্ত্তন হয়, বাসা হইতে দৌড়িয়া যেয়ে খোল আনা হইল। কীৰ্ত্তনে ঠাকুরের খুব ভাব হইল, তিনি ভাবে অজ্ঞান হইয়া গেলেন ; একথণ্ড কাষ্ঠের ত্রায় শ্রীশ্রীগোপীনাথ দেবের মন্দিরের সম্মুখে নরেন্দ্রের কোণে তিনি পথের উপর পড়িয়া রহিলেন। বিধুবাবু, সরলনাথ প্রভৃতি গুরুভাতাগণ অনেকক্ষণ ভাবাবেশে কীৰ্ত্তন করিলে তাঁহার জ্ঞান হইল।

এই কীৰ্ত্তনে ঠাকুর সত্যেন্দ্রের খোলের বাজে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন

চতুর্থ অধ্যায়

১০১

এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। এই দিন রাত্রিকালে, ঠাকুরের পদসেবার সময় ঠাকুরকে কুঞ্জ বলিল, “আপনারা আজ যখন কীর্ত্তনের সময় নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন আমারও খুব নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু হৃদয় শুষ্ক ও ভিতরে ভাব না থাকাতে পারিলাম না।” তখন ঠাকুর বলিলেন, “লোককে খুব দিবে, তাহা হইলেই সব খুলিয়া যাইবে।”

একদিন রাত্রি ৩টার সময় ঠাকুরকে কুঞ্জ কহিল, “শ্রীমন্দিরে যেয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিতে ইচ্ছা হইতেছে।” ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “যাওনা, এখন যাও।” কুঞ্জ শ্রীমন্দিরে যাইয়া দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিল, “শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে গণেশ মূর্ত্তিতে দেখিলাম।” ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “বেশ দর্শন পাইয়াছ; গণেশ ‘ওঁকাররূপী মহাবিশ্ব।’”

প্রথম দিন চন্দনপুকুরে আসিয়া ঠাকুর দেখিলেন, দলে দলে লোক সাঁতারাইয়া নরেন্দ্র সরোবরের মধ্যস্থানে গঙ্গাদেবীর মন্দিরে যাইতেছে। কোন কোন দল গান করিতে করিতে সাঁতার দিতেছে। এই সকল মহোৎসব দেখিয়া ঠাকুর খুব আনন্দ পাইলেন এবং আমাদিগকে বলিলেন, “তোমরা নাম না কেন?” ইহা শুনিয়া অমৃত, ব্রহ্মচারী সাঁতারাইতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া খুব আনন্দের সহিত দর্শন করিতে লাগিলেন। মন্দিরের মধ্যস্থিত ভোগবতী গঙ্গার জল ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে আনিয়া দিলেন।

যখন মদনগোপাল প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তি সকল নৌকায় চড়েন তখন শ্রীমুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় দর্শন পাইলেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্বয়ংই স্বকীয় বিগ্রহে দুই মহিষী লইয়া নৌকায় চড়িলেন।

একদিন চন্দনযাত্রাকালে ঠাকুর নরেন্দ্র প্রদক্ষিণ করিতেছেন, এমন

সময় নরেন্দ্রের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি বটগাছ দেখাইয়া বলিলেন, “মহাপ্রভু সান্নোপাদসহ নরেন্দ্রে জলকেলি করিয়া সরোবর পার হইয়া এই বটগাছে বহির্বাস শুকাইতেন। গাছের গুঁড়িটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একটা বোয়া হইতে এই বর্তমান গাছটি জন্মিয়াছে।”* আর একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রের উত্তরপাড়ে জঙ্গলপূর্ণ স্থানটি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “ঐ স্থানে মহাপ্রভু কখন কখন বনভোজন করিতেন।”†

শ্রীক্ষেত্রে বানরবধে ঠাকুরের ক্লেশ

এবং উহা নিবারণের চেষ্টা

একদিন ঠাকুর নরেন্দ্র সরোবরের মধ্যস্থিত মদনগোপালের মন্দির পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। ঐ সময় স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত জগৎজয় রায়, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট কালীবাবু ও মুন্সেফ কিশোরীলাল সেন আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। স্থানীয় ঘটনা আলোচনা করিতে করিতে বানর মারার কথা উঠাইয়া জগৎবাবু বলিলেন, “এই স্থানে মিউনিসিপ্যালিটি বানর মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহু বানর মারিয়া স্থান প্রায় বানরশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। খোলা ভাঁটার ভিতর দেখিয়া আসিলাম বানরগুলি মারিয়া ফেলায় তাহাদের দুষ্কপোষ্য বাচ্চাগুলি দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছে। যার তার কাছে যাইতেছে।” ঠাকুর শুনিয়া আর আশ্চর্যবরণ করিতে পারিলেন না। বালকের গ্রায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজল গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। ঠাকুর বাসায় ফিরিলেন। জগৎবাবু, কালীবাবু ও কিশোরীবাবু পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

* এই গাছ বর্তমান সমাধি উদ্ভানের ভিতরে পড়িয়াছে।

† এইস্থানেই ঠাকুরের সমাধি মন্দির স্থাপিত হইয়াছে।

ঠাকুর বলিলেন, “হিন্দুজাতি সর্বত্রই বানরদিগকে সম্মান করে। সর্বত্রই বানরদের উৎপাত আছে কিন্তু এরূপ বানর বধ করা প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এবার শান্তিপুরের নিকটে এক গ্রামে বানর বধ করিতে আরম্ভ করে, তথায় মহামারী লাগিয়া স্থান উৎসন্ন হইবার উপক্রম হয়। সর্বত্র এই প্রবাদ যে বানর মারিলে সেই স্থানে মহামারী লাগে। উড়িয়া জাতি যে নিতান্ত নির্ধর হইয়া পড়িয়াছে, বানর মারা ঘটনাই তাহার একটি নিদর্শন।”

আমাদের দারোয়ান গৌরীশঙ্কর একদিন ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বলিল, “এক আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করিয়া আসিলাম। নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করিতে গিয়াছি, দেখি দুটি অল্পবয়স্ক বালক স্নান করিতে করিতে বেশী জলে যাইয়া হাবুডুবু খাইতেছে। তাঁরে দাঁড়াইয়া লোকেরা তামাসা দেখিতেছে কিন্তু কেহই উহাদিগকে উঠাইতেছে না, কি উঠাইবার প্রয়াসও পাইতেছে না। আমি অতি ক্রেশে উহাদিগকে উঠাইয়া পারে রাখিয়া আসিলাম।”

ঠাকুর বলিলেন, “এই জাতি অত্যন্ত নির্ধর ও মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমার মাতাঠাকুরানী যখন পুরীতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি দেশে গিয়া গল্প করিলেন যে, এ দেশের লোকে ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, পথিককে ছাঁচতলায় পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে দেয় না। দয়া কাহাকে বলে ইহারা যে ভুলিয়া গিয়াছে।”

কথাবার্তায় এই স্থির হইল যে অমৃতবাজার, মিবার প্রভৃতি পত্রিকায় তারে খবর দিয়া হিন্দুমাত্রকেই এই তীর্থস্থানে বানর বধ ব্যাপার জানান হইবে।”

কালীবাবু ত্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে নানা গল্প করিলেন, ঠাকুর শুনিয়া খুব সম্ভুষ্ট হইলেন। রাত্রি ৯টা ১০টা হইলে তাঁহারা উঠিয়া বাসায়

চলিলেন। পরদিন পত্রিকায় তার করিতে হইবে। দাদাগোঁসাই, ঠাকুরকে জানাইলেন, ভাণ্ডার শূন্য। তখনই ঠাকুর বলিলেন, “সতীশ উহাদিগকে বলিয়া আইস, আজ তোমাদের ভাণ্ডারে অর্থ নাই।” সতীশ তাঁহাদিগকে বড় রাস্তায় যাইয়া জানাইলেন কিন্তু হস্তে অর্থ নাই বলিয়া তাঁহারাও কিছু দিতে পারিবেন না, বলিলেন। সে যাহা হউক, দাদাগোঁসাই পরদিন ধার করিয়া তারের খরচের টাকা দিলেন। অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় তার করা হইল। ইহাও স্থির করা হইল যে, স্থানীয় ভদ্রলোকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানা দরখাস্ত, বানর মারা যে অশাস্ত্রীয়, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির নিকটে পেশ করা হইবে। ঠাকুর এইজন্য একদিন উকিল বড় হরিশবাবুর বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে এরূপ একখানা দরখাস্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। সতীশ প্রভৃতির যত্নে বড় হরিশবাবু, জগৎবাবু, কিশোরীবাবু, কালীবাবু প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা স্বাক্ষর করিয়া মিউনিসিপ্যালিটিকে এই ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

মন্দিরের গায়ে পায়খানা নির্মাণ

একদিন সকালবেলা আমাদের পাঠ শেষ হইলে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স দারোগাবাবু আসিয়া বলিলেন, “দেখুন, মিউনিসিপ্যালিটির বেয়াদবির কথা আর কি বলিব, শ্রীমন্দিরের গায়ে সেবকদের ব্যবহারের জন্য পায়খানা উঠাইতেছে।” ঠাকুর এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং ‘ইহারা এ কি করিতেছে!’ বলিয়া বড় দুঃখ করিতে লাগিলেন। মন্দির স্বয়ং ভগবানের অঙ্গ, মন্দিরের গায়ে পায়খানা, আর ভগবানের গায়ে পায়খানা, একই কথা; মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হইলে ভক্তদিগকে পায়খানা প্রদক্ষিণ করিতে হইবে, এই সকল

চতুর্থ অধ্যায়

১০৫

উল্লেখ করিলেন। তৎপরে দাদা গৌসাইকে ডাকিয়া বলিলেন, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় এ বিষয়ে 'তার' করিয়া দাও। তিনি তার লিখিয়া ঠাকুরজের শুনাইয়া পাঠাইয়া দিলেন।

গজোদ্ধারণ বেশ দর্শন

আজ বেশী রাত্রে ঠাকুর চন্দনপুকুরে মদনগোপালের সাজ দেখিতে গেলেন। মদনগোপালের আজ 'গজোদ্ধারণ' বেশ; ঠাকুর দেখিয়া খুব আনন্দ করিলেন। সেবকেরা ভোগ দিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া আহ্বার করিবেন, তজ্জন কিছু যাক্সা করিলেন। আমাদের ভাঙারে টাকা নাই, দাদাগৌসাইয়ের হাত খালি; ঠাকুর বলিলেন, "কুঞ্জ আসিয়াছে, তাহার নিকট টাকা আছে, আমার নাম করিয়া তাহার নিকট হইতে কুড়ি টাকা চাহিয়া লইয়া আইস।" সরলনাথ শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের নিকট হইতে চাহিয়া ঐ টাকা মদনগোপালের সেবকদের আনিয়া দিলেন।

কুঞ্জবাবু এই ঘটনাতে একটু আশ্চর্যান্বিত হইলেন, তাঁহার নিকট টাকা আছে, উনি কি করিয়া জানিলেন।

কান্দালী ভোজন ও বস্ত্রদান

ঠাকুর দীনহুঃখী কান্দালদের ভোজন করাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাই কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় ঠাকুরের অনুমতি লইয়া ধারে পাঁচ সাত শত টাকা ব্যয় করিয়া উত্তমরূপে কান্দালী ভোজন করান। সরলনাথ ও সতীশের ভাই শ্রীশ গিয়া আম খরিদ করিয়া আনিল। সরলনাথ বলিলেন, "খুব উৎকৃষ্ট আম। আমেই খরচ হইল প্রায় দুইশত টাকা।" উৎকৃষ্ট কানিকা মহাপ্রসাদ, মালপোয়া, নানাপ্রকার উত্তম তরকারি, দধি প্রভৃতির দ্বারা ভোজনকার্য্য নিষ্পন্ন হইল। আম পাঁচ ছয়টা করিয়া, কানিকা,

মালপোয়া প্রভৃতি পরিতোষ পূর্বক প্রতিজনকে দেওয়া হইল। এমন কান্দালী ভোজন আমি আর দেখি নাই। ঠাকুর বারান্দায় দাঁড়াইয়া খুব প্রীতির সহিত ইহা দর্শন করিয়া আনন্দ করিলেন।

কুঞ্জ নাগ মহাশয় কান্দালীদিগকে বহু বস্ত্রও দান করিলেন। বস্ত্রদান সম্বন্ধে এক রহস্য ঘটিল। কুঞ্জবাবু কয়েকখান কাপড় খরিদ করিয়া আনিয়া রাখিয়াছেন, ইচ্ছা কান্দালীদিগকে আট হাত করিয়া প্রতিজনকে দিবেন। ইতিমধ্যে বিধুবাবু দুইটি হুংখী লোককে দুইখানা কাপড় দিতে ইচ্ছুক হইয়া ঠাকুরকে বলিলেন, “কুঞ্জের নিকট কাপড় আছে। আপনি বলেন ত দুইখানা কাপড় চাহিয়া লইয়া দিই।” ঠাকুর বলিলেন, “বেশতো, কুঞ্জের নিকট দুইখানা কাপড় চাহিয়া লইয়া দিয়া দেও।” বিধুবাবু অতঃপর কুঞ্জবাবুর নিকট গিয়া বলিলেন, “ঠাকুর বলিলেন, তুমি যদি দুইখানা কাপড় দেও, তাহা হইলে দুইজন কান্দালীকে তিনি উহা দেন।” কুঞ্জবাবু বাক্যবিত্তাস শুনিয়াই চটিলেন এবং বুঝিলেন এ ভাষা ঠাকুরের নয়, বিধুবাবুর। তিনি আবার আমার নিকট “যদি দেও” ইত্যাদি ভাষা প্রয়োগ করিবেন কেন? তিনি ত জোর করিয়া নিবেন—ইহা ভাবিয়া কুঞ্জবাবু বলিলেন, “গৌসাইকে গিয়া বল, আমি কাপড় দিব না। আমি তোরা গৌসাইএর কথা মানি না, আমি যাকে ইচ্ছা দিব।” বিধুবাবুও ইহা শুনিয়া ম্লান হইয়া চলিয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, “কুঞ্জ কাপড় দিল না।” কুঞ্জবাবু অতঃপর শোচে যাইয়া গা ধুইয়া ঠাকুরের ঘরে গেলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন, “আপনি নাকি আমার নিকট দুইখানা কাপড় চাহিয়াছেন? বিধু চালাকি করে কেন? কাপড় ত দিবার জন্তই, সে নিলেই পারে, আপনার নাম করিয়া চাও কেন?” ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, “দেও গিয়া, আমিই চাহিয়াছি।” কুঞ্জবাবু বলিলেন, “ধানগুলি সব আনিয়া

চতুর্থ অধ্যায়

১০৭

আপনার নিকট ফেলি না কেন ? আপনি যাকে ইচ্ছা দিবেন ।” ঠাকুর বলিলেন, “না, তুমিই দিও । বিধু, যাও, কাপড় দুইখানা নিয়া আইস ।” তখন বিধুবাবু আনন্দে হাসিতে হাসিতে যাইয়া কুঞ্জবাবুর নিকট হইতে কাপড় দু’খানা আনিলেন এবং তখনই দৌড়িয়া গিয়া কাদালী দুইটিকে দিয়া আসিলেন । কুঞ্জবাবুর সহিত ঠাকুরের এই শেষ দেখা । (১)

(১) প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের সামান্য পরিচয় দেই । ইনি ঢাকা জেলার বারদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি ঠাকুরের অতি প্রিয় ছিলেন । তিনি সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে এম্. এ. পাশ করিয়াছিলেন । তিনি প্রথমে বর্দ্ধমান রাজ কলেজের, পরে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন । তিনি কঠিন বাতরোগে পীড়িত হইলে, ঠাকুর তাঁহাকে কলিকাতা আসিতে বলেন । সেখানে প্রায় দুই বৎসর ভোগের পর তিনি সুস্থ হন । কলিকাতার তিনি পীড়িত অবস্থায় অনুরুদ্ধ হইয়া বিভাসাগর কলেজে বিনা বেতনে অধ্যাপনা করেন, পরে বঙ্গবাসী কলেজে ইংরাজী ও সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপক হন । ঢাকা প্রচারক আশ্রমে হরিসংকীৰ্ত্তনকালে একবার কুঞ্জবাবুকে আলিঙ্গন করিবা ঠাকুর বলিয়াছেন, “মহাপ্রভু সনাতন গোবাম্বীকে আলিঙ্গন করিয়া যজ্ঞপ স্থানুভব করিয়াছিলেন, আজ আমি ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া তজ্জপ স্থানুভব করিলাম ।”

কুঞ্জবাবু একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, “আমি কি কিছু পাঠ করিব ?” তাহাতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “তুমি উপনিষদ পাঠ করিও ।” এই কথাবার্তার সময় ঠাকুরের নিকট, তাঁহার সম্পর্কিত আমাদের কোন ব্রাহ্মণ গুরুভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন । তিনি ইহাতে বলিলেন, “কুঞ্জ কায়স্থ হইয়া কি করিয়া উপনিষদ পাঠ করিবেন ?” ঠাকুর বলিলেন, “ইহার সে অধিকার হইয়াছে ।” এই কথা শুনিয়া তিনি প্রতিবাদ করিলে, ঠাকুর ধমক দিয়া বলিলেন, “জ্যাঠামি করতে হবে না । আমি বলছি, ইহার সে অধিকার হইয়াছে, তোমার হয় নাই ।”

নেংটিসার সাধু : চতুর্দশ সাধনা ও পঞ্চম পুরুষার্থ

একদিন ঠাকুর সমুদ্র-স্নান করিয়া আসিতেছেন, পথে একটি সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সতীশ, ঠাকুর ও সাধুর কথাবার্তা সেই সময়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এই :—রাস্তার পরিত্যক্ত হাঁড়ি হইতে মহাপ্রসাদ খাইতেছে এইরূপ নেংটিসার একজন সাধুকে ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন ; আমাকে (সতীশকে) বলিলেন, ‘চারটি পয়সা দাও’ এবং ঠাকুর নিজের গায়ের কাপড় তাঁহাকে দিয়া দিলেন। আমি পয়সা দিতে গেলে, তৃণশুচ্ছ হাতে করিয়া ঠাকুরকে আরতি করিতে আসিলেন। কিছুদূরে গিয়া গান ধরিলেন।—“নীল চক্র, জগন্নাথ, মন ভজনা চৈতন্য, মন ভজনা চৈতন্য।” পরে ঠাকুরকে বলিলেন, “আমি বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, সে স্থান খালি দেখিলাম, এখানে তুমি দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া বিরাজ করিতেছ।”

আমরা পয়সা দিতে গেলে বলিলেন, “আমার প্রারদ্ধ কন্ম বাহা আছে তাহা হইবে। একশত বৎসরের উপর কাটাইলাম। এখন আবার জগদ্বন্ধু এ সব দিতেছেন কেন ?” আবার গান গাহিতে লাগিলেন, যেন দর্শন হইতেছে। কোনমতে কিছু নিলেন না। ঠাকুর বলিলেন, “কাপড় ফেলিয়া রেখে এস, যে নেয়।”

শুনিলাম ইনি এই দেশীয় লোক। ইনি লেখাপড়া জানেন। কেবল পড়িতে পড়িতে, ধ্যান করিয়া অজ্ঞান হইতেন। তারপর এই দশা। ঠাকুর বলিলেন, “পঞ্চম পুরুষার্থ একেই বলে। অনেক যোনি ভ্রম করিয়া মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। পরে আমি কে ? কি করিতেছি ? কোথা হইতে আসিলাম ? কোথা যাইব ? ইত্যাদি চিন্তা আইসে। এই সময়ে গুরুলাভ হয়। তিন জন্ম সূর্য্য, তিন জন্ম গণেশ, পরে শত জন

চতুর্থ অধ্যায়

১০৯

শক্তি উপাসনা করিয়া তিন জন শিবের ও তিন জন বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়। ইহা চতুর্ভুজের সাধনা। ইহা বেদাধীন। তৎপরে পঞ্চম পুরুষার্থ।”

আমি (সতীশ) বলিলাম, “মাথা টুকরা টুকরা করিয়াও যদি এ জিনিস পাওয়া যায় তাও ভাল।” ঠাকুর—তাও কি হয়? রাবণ তপস্যা করিলেন,—তমোধর্ম পাইলেন। তাঁহার ভাই ধর্ম চাহিলেন—সত্ত্বধর্ম পাইলেন, ইহার গন্ধও পাইলেন না। শ্রুতিরা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, ‘আমরা চতুর্ভুজ পর্য্যন্ত তোমার স্তুতি করিতে পারি কিন্তু তার পর পঞ্চম পুরুষার্থ, তাহাতে আমাদের অধিকার দাও।’ শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—‘বৈবস্বত মন্বন্তরে অমুক দ্বাপরে হ’বে।’ তাই তাঁহারা গোপী হইলেন। ব্রাহ্মণী হইলেও জ্ঞাতির গৌরব থাকিত। দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। তাঁহারা রামচন্দ্রকে বলিলেন, ‘তোমার নবজলধর রূপ দেখিয়া আপনার করিয়া তোমাকে ভজিতে চাই।’ তিনি বলিলেন, ‘দ্বাপরে হবে।’ তাই তখন তাঁহারা পান।”

পুনরায় সেই সাধুটি উপস্থিত হইয়া গাইলেন “চৈতন্য ভজনা মন, চৈতন্য ভজনা, দেখ মোর কেলে সোণা। চন্দ্র বদন আমি দেখিয়াছি। আমার সাধ পূর্ণ হইল।” এই বলিয়া ঠাকুরকে আরতি! মেয়েরা ছাদে ছিল, তাঁহাদিগকে দেখিয়া আরতি! ঠাকুরকে দেখিয়া হাসিয়া আটখানা—কোথায় বা রহিল গ্রাকড়ার টুপি! আবার গান “কত রোজ দেখি নাই তোমার চন্দ্র বদন; এমন প্রেম দেখি নাই।”

আর একদিন দ্বিপ্রহরে আসিয়া বলিলেন—“আজ অবলা (যাহা বলা হয় নাই, কি উচিত নয়) বলিযু, অচেনা চিনিযু” এই বলিয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন।

সমুদ্র-স্নান

এই সময়ে ঠাকুর সমুদ্রে স্নান করিতে যাইতেন। খুব ভোরে উঠিয়া যাইতে হইত ; কারণ বেশী রোদ্র না উঠিতে উঠিতে ফিরিতে হইবে। এ স্থানের রোদ্র বিষমরূপ, গায়ে লাগিলে জ্বর হয়। তজ্জন্ত ঠাকুর আমাদিগকে ১০টার পর বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর প্রতিদিন সমুদ্র-স্নানে রওয়ানা হইবার সময় রাস্তায় নামিয়াই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে করবোড়ে প্রণাম করিয়া চলিতেন। শ্রীমন্দিরের নিকট একজন কবীরপন্থী সাধু সারারাত্রি হিমে সিংহ দরজায় পড়িয়া থাকিতেন। তিনি এমনই অকিঞ্চন ছিলেন যে, তাঁহার একখানা কঞ্চল পর্য্যন্ত ছিল না। একদিন তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর একখানা কঞ্চল কিনিয়া দেওয়াইলেন এবং প্রতিদিন তাহার আহার ও অস্ত্রাশ্র প্রয়োজনের নিমিত্ত দুই আনা করিয়া পয়সা দিতে বলিলেন। আমরা ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া রোজ ইহাকে দুই আনা পয়সা দিয়া যাইতাম।

আর একটি সাধুকেও তাঁহার আদেশ মত রোজ দু'পয়সা দেওয়া হইত এবং গরুদিগকে দুই চারি পয়সার ঘাস কিনিয়া খাইতে দিয়া ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে পৌছিলাম।

রোজ সমুদ্রে যাওয়ার সময় দানের নিমিত্ত ঠাকুর কিছু পয়সা নিতে বলিতেন। আমরা আনা আটেক পয়সা লইয়া যাইতাম। একদিন ভাণ্ডার খালি, শ্রীমৎ দাদা যোগজীবন গৌসাইয়ের হাতে কিছুই নাই। কাহারও নিকট অনুসন্ধান করিয়াও পয়সা পাইলাম না, ঠাকুরকে এ বিষয় জানাইলাম। তিনি বলিলেন, “আমার দুটা ঘটা ; একটি লইয়া চল, উহা বিক্রি করিয়া যাহাকে যাহা দাও দিয়া আইস।” আমি উহা লইয়া চলিলাম এবং গোবিন্দ মুদির দোকানে বিক্রি করিয়া একটাকা পাইলাম।

তৎপর উহার দ্বারা গরুর ঘাস, টিন্দাস বাবাজির পয়সা এবং অপরাপর দান করা হইল। একদিন হঠাৎ ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন “আজ কাঙ্গালদের কিছু দেওয়া হয় নাই ; আজ দিনটা বৃথায় গেল,” এই বলিয়া হুঃখ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে কাঙ্গালদের কিছু দেওয়াইলেন।

সমুদ্রের খুব নিকটে, কাছারী যাইবার পথে ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত হীরালাল গুপ্ত মহাশয়ের বাসা ছিল। ঠাকুর ঐ স্থানে প্রতিদিন প্রাতঃ-শৌচাদী সমাধা করিতেন। অভয়বাবুর সহিত হীরালালবাবুর আলাপ ছিল। এই স্ত্রেই প্রাতঃশৌচাদির নিমিত্ত ঐ স্থান বোগাড় হইল। ঠাকুর যখন বাহিরে পায়খানায় যাইতেন তখন স্বামীজী ও সতীশ হীরালালবাবুর সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। স্বামীজীর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ছিল ; তাঁহার দার্শনিক যুক্তি অনেক সময় বুঝিতাম না।

ঠাকুর সমুদ্রে নামিয়া স্নান করিতেন। ঠাকুরের শরীর স্থূল ও অশক্ত ছিল। তাই তিনি বিধু ঘোষ ও সত্যেন্দ্রের কাঁধে ভর করিয়া চেউ নিতেন। জটা না ভিজে এজন্ত পশ্চাৎ হইতে আমি জটা উঠাইয়া ধরিয়া থাকিতাম।

কখন কখন বড় বড় চেউ আসিয়া সকলকেই ওলট্-পালট্ করিয়া দিত। ঠাকুর দুই একটি চেউ লইয়া উপরে উঠিতেন, পরে ঘটা ভরিয়া পুনঃপুনঃ জল লইয়া উহা দ্বারা বালি ধোয়াইয়া দেওয়া হইত। বিধুবাবু শরীর ধোয়াইয়া দিতেন, জটা ও পিঠ মুছাইয়া দিতেন। ঠাকুর স্নানান্তে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সমুদ্রশোভা দর্শন করিতেন। কখন বা স্নানের পূর্বেই কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিতেন ও সমুদ্রশোভা দর্শন করিতেন। মাঝে মাঝে তিনি “ঐ সমুদ্রে মন্দিরের ছায়া পড়িয়াছে, তোমরা দেখিতেছ কি ?” জিজ্ঞাসা করিতেন ও নানাবিধ কৌতুক করিতেন।

সমুদ্রের পাড়ে যখন তিনি দাঁড়াইয়া একমনে দর্শন করিতেন, তখন

তাহাতে কি অপূর্ব শোভা খেলিত তাহা বর্ণনা করা যায় না। আমাদের সম্মুখে এক নবীন শ্রামবর্ণ পুরুষ, পৃষ্ঠদেশে অপূর্ব জটা, শ্রামগাত্রে অপূর্ব মাধুরিমা, সম্মুখে অসীম নোলিম সাগর, পাদদেশে স্বর্ণাভ সৈকতভূমি—যেন হইত যেন এক অপূর্ব দেবতা, এইমাত্র শাস্তির রাজ্য হইতে নাগিয়া সৌন্দর্য্যে চারিদিক্ ভাসাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

এই যে মূর্তি ইহা কল্পনা করা যায় না, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা ই বুঝিয়াছেন। কখনও মনে হইত সমুদ্রের এই অসীম অন্তরের নিকট ঠাকুর একটি বালকের মত খেলিতেছেন, কখনও কখনও আবার তাঁহার বিরাট মূর্তির নিকট সমুদ্র যেন ক্ষুদ্র বোধ হইত।

এইস্থানে সমুদ্রের পাড়ে কতকগুলি জেলে বাস করে। ঠাকুর এই জেলেদিগকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তিনি বলিতেন, ইহাদের পূর্ব পুরুষেরাই ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে সমুদ্রগর্ভ হইতে জালে করিয়া উঠাইয়াছিল। একজন জেলে সম্মুখে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি?” সে বলিল, “কৃষ্ণম্।” ঠাকুর বলিলেন, “দেখেছ ইহাদের ভিতর এখনও মহাপ্রভুর প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, নাম রাখিয়াছে “কৃষ্ণম্।” ঠাকুর বলিলেন, “তোমরা সমুদ্রে যে জাল বেয়ে থাক, কানে জল যায় না?” সে বলিল, “আমরা একরূপ টুপী ব্যবহার করি।” ঠাকুর বলিলেন, “আমাকে একটা দিতে পার?” সে বলিল, “হাঁ পারি।” কয়েক দিন পরে সেই জেলে, একটি টুপী তৈয়ার করিয়া বাসায় আনিয়া ঠাকুর মহাপ্রভুকে ইহারা সমুদ্র হইতে উঠাইয়াছিল, সেই ভাবেই মন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহার দাম কত?” সে বলিল, “তিন টাকা।” ঠাকুর বলিলেন, “আচ্ছা আমাকে ইহা পরাইয়া দেও।” জেলে ঠাকুরকে উহা পরাইয়া দিল। ঠাকুর উহাকে মধুরবাক্যে তুষ্ট করিয়া তিন টাকা দিয়া বিদায় করিলেন।

জ্ঞানের সময় জেলেদের ছেলেপিলেরা আসিয়া ঠাকুরের নিকট দাঁড়াইত। ঠাকুর একদিন বিধুবাবুকে বলিলেন, “বিধু, ইহাদিগকে আম খাওয়াইতে পার ?” পরদিন প্রত্যুষে বিধুবাবু সরলনাথের দ্বারা দুই শত আম আনাইলেন। ‘ক্লষ্টম্’ আসিয়া সকলকে বাঁটিয়া দিল। আম কিছু কম পড়িলে বাকি সকলকে পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন। আমরা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম।

মহোদধির পাবনী-শক্তি

ঠাকুর মহোদধির অসীম পাবনী-শক্তির কথা মধ্যে মধ্যে বলিতেন। “পুরীর সংলগ্ন হরিহাস ঠাকুরের সমাধি হইতে চক্রতীর্থ পর্য্যন্ত এই মহোদধির তুলনা নাই। এইস্থানে গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি পুণ্যতোয়া সপ্ত নদীর দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে। এই সলিলে ক্ষীরোদসাগরের দ্বারাও মাঝে মাঝে প্রবাহিত হয়। ইহাতে মৃত্যু হইলে মানুষ মুক্তিলাভ করে। গঙ্গোদক হইতেও ইহার অধিক পাবনী-শক্তি।”

ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনিয়া কুঞ্জঠাকুর—তার মনে হইল ইহা কিরূপে সম্ভব ? তখন হঠাৎ পারশ্চ উপসাগর হইতে সামুদ্রিক শ্রোত (Gulf Stream) ভারতবর্ষের দ্বার ঘেসিয়া কুমারিকা হইতে ক্রমে গঙ্গাসাগরের নিকটে ঘুরপাক খাইয়া ব্রহ্মদেশের দিকে প্রবাহিত হইতেছে, সেই কথা তাহার মনে পড়িল। তখন ঠাকুরকে বলিল, “আপনি মহোদধির যে সপ্তদ্বারার কথা বলিলেন, আমরা ভূগোলে যাহা পড়িয়াছি তাহার সহিত অনেকটা মিল পাই”—এই বলিয়া সামুদ্রিক শ্রোতের (Gulf Stream) কথা বলিল। ঠাকুর শুনিয়া কহিলেন “ঐক্লপই বটে।”

একদিন জ্ঞানকালে ঠাকুর আমাদিগকে বলিলেন, “দেখ, দেখ, সমুদ্রের জল আজ কেমন মিষ্ট। আজ ক্ষীরোদসাগরের শ্রোত এই স্থান দিয়া

প্রবাহিত হইতেছে।” মাঝে মাঝে একরূপ হয়। ঠাকুরের কথা শুনিয়া কেহ কেহ তখনই উহা পান করিয়া জলের মিষ্টতা অনুভব করিয়া আবাক হইলেন। আবার কখনও কখনও স্নানকালে বলিতেন “আজ মহোদধি আমাকে বড় কৃপা করিয়াছেন। আজ যেন ভিতর ও বাহিরের ময়লা সব পুঁছিয়া নিয়াছেন।”

কখন কখন জল ঈষৎ গৈরিক রঙে মিশ্রিত জলের স্থায় দেখাইত। কখন কখন জল বিষাক্ত বলিতেন ; কখন কখন সমুদ্রের অতুলনীয় শোভা দেখিয়া বর্ণনা করিতেন, বাল-সূর্য্য-কিরণ পড়িয়া সমুদ্রজলে যেন অসংখ্য হীরকখণ্ড জলিতেছে। কখন সূর্য্যোদয়, কখন সূর্য্যাস্ত দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

ঠাকুর যখন বসিয়া সমুদ্রের শোভা দর্শন করিতেন—ঠাকুরের পিছনে আসিয়া বিধুবাবু ও সতীশ আনন্দ করিতে করিতে বালিতে লড়াই করিত ; আমরা তাহাদের আনন্দখেলা দর্শন করিয়া হ্রষ্ট হইতাম। বিধুবাবু মাঝে মাঝে স্ফুর্তি করিয়া সানন্দে সমুদ্রের তরঙ্গের সহিতও লড়াই করিতে যাইতেন। ঠাকুরের সঙ্গ ও সেবাস্থখে ইহাদের নিকট সমুদ্রও যেন তুচ্ছ বোধ হইত। ইহাদের শরীরে আর আনন্দ ধরিত না। স্নানের কালে দাদাগোঁসাই, অশ্বিনী বৈরাগী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সঙ্গে থাকিত না ; ঠাকুর উহাদিগকে স্বর্গদার ঘাটে বাইয়া স্নান করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। কখনও কখনও ইহারা আমাদের সঙ্গে কাছারীর ঘাটে স্নানে যাইতেন।

ঠাকুর ৮টা ৮।০টার সময় ধীরে ধীরে বাসায় রওয়ানা হইতেন ; পরে কখন কখন পাণ্ডা ঠাকুরদের সহিত আলাপ হইত ; কখন ব্রাহ্মণ বালকেরা পুষ্টক, পয়সা প্রভৃতি যাক্ষা করিত ; ঠাকুর তাহাদিগকে উহা দিতে আদেশ করিয়া বাসায় প্রবেশ করিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

১১৫

একদিন স্নান করিয়া বাসায় আসিতেছেন, পথে দেখিতে পাইলেন, শিকারীরা পথের পার্শ্বে একটি বানর মারিয়া রাখিয়াছে। বানরটির হাত পা শক্ত ও সটান হইয়া রাহিয়াছে, মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। ঠাকুর দেখিয়া খুব ক্লেশ পাইলেন; বাসায় আসিয়াও ঐ ক্লেশ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। আর একদিন বাহির দিয়া শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেও ঐরূপ এক ঘটনা ঘটে। তিনি দেখিতে পাইলেন শ্রীমন্দিরের এক দ্বারে রক্ত ছড়ান রহিয়াছে, দেওয়ালে রক্তে লেপিয়া গিয়াছে, উহা দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি ক্ষুণ্ণমনে বাসায় ফিরিলেন।

ঠাকুর জীবহিংসা দর্শন করিতে পারিতেন না। শুনিয়াছি তিনি একবার তাঁহার গুরুদেবের আদেশে গয়ার নিকটস্থ 'বরাবর পাহাড়ে' তান্ত্রিক সাধুদের এক 'চক্র' দর্শন করিতে যান। তথায় এক সিদ্ধ মহাত্মা চক্র করিয়া সেই দিন 'ছিন্নমস্তা' সাধন করিবেন। ঠাকুর তাঁহার গুরুদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন শুনিয়া সেই সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহাকে চক্রে স্থান দিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই নির্জজন অরণ্যে কয়েকজন তান্ত্রিক সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ চক্রে একটি জ্বীলোকও আসিলেন। গৃহদ্বারে নিষ্কাশিত তরবারীহস্তে গ্রহরী নিযুক্ত হইল, সকলেই নিস্তব্ধ নীরব। পূজার প্রয়োজনীয় অব্যাসামগ্রী সংগৃহীত হইল। মহাপুরুষটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তখন প্রতি মন্ত্র যেন জীয়াস্ত হইয়া দেবীকে আকর্ষণ করিতেছে অল্পভব করিলাম। দেবী সাক্ষাৎ প্রকাশিত হইলেন ও পূজা গ্রহণ করিলেন। যখন সেই মহাপুরুষটি তরবারীহস্তে মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ঐ তরবারী শন্ শন্ করিয়া ঘুরাইয়া স্বয়ং চক্রে ঘুরিতে লাগিলেন, আমি দেখিতে পাইলাম, মন্ত্রপ্রভাবে আমি একটি চার পাঁচ বৎসরের বালক হইয়াছি। আমি হামাগুড়ি দিতে দিতে, সেই চক্রস্থিত জ্বীলোকটির নিকটে

যাইয়া তাঁহার স্তনপান করিতে লাগিলাম। মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে দেবী নিজ মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিয়া রুধির পান করিতে লাগিলেন। চক্র শেষ হইয়া গেল, ষথাবিধানে বলি প্রভৃতির দ্বারা পূজা হইল, দেবী অন্তর্দ্বান করিলেন।”

চক্রশেষে সেই মহাপুরুষটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন দেখিলে?” ঠাকুর বলিলেন, “সমস্তই উত্তম, কিন্তু আপনাদের জীবহিংসা ব্যাপার ভাল লাগিল না।” মহাপুরুষ বলিলেন, “আচ্ছা বলিয়াছ, তোমার গুরু বৈষ্ণব, তোমার ভিতর সে ভাব প্রবল।”

ঠাকুরের সঙ্গে একবার কলিকাতায় কালীঘাটের মহাষ্টমী পূজার দিন দর্শনে গিয়াছিলাম। তিনি দর্শনের পর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, “দর্শন আর কি করিব? বলি ও রক্ত দেখিয়া চিত্ত যেন শুকাইয়া গেল; দর্শন আর কি হবে?”

একবার আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান রোহিণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিপদে পড়ায় আমাদের কোন নিকট আত্মীয় কালীঘাটে দেবীর নিকট দুইটি পাঠা মানস করিয়াছিল। রোহিণী বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া কলিকাতায় হারিসন রোডে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিষয় জানাইলে ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন “যখন মানস করিয়াছ তখন দিতেই হইবে। ভবিষ্যতে এরূপ মানস করিও না। বলি দিলে উহারাও তোমাকে বলি দিবে।” ইহার পর ব্রহ্মচারী জীবহিংসা না হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি কালীঘাটে পৌছিয়া পূজার সময়ে পাঠা উৎসর্গান্তে উহা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন।

মিউনিসিপ্যালিটির অত্যাচার

ঠাকুরের সমুদ্রে স্নান করিয়া বাসায় ফিরিবার সময়ে কোন কোন দিন উড়িষ্যা দেশবাসী ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত রাসবিহারীবাবুর সহিত

সাক্ষাৎ হইত। রাসবিহারীবাবু একদিন বলিলেন, “দেখুন, সময় ক্রমেই কদর্য হইতেছে। পূর্বে মন্দিরে আমার বাবা যখন দর্শনে যাইতেন, গরুকে ঘাস খাওয়াইয়া সাধুদিগকে দর্শন করিয়া প্রবেশ করিতেন। এখন সাধুদিগকে সিংহ দরজা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। শুধু তাহা নয়, গরুদের উপরও নানা উৎপাত শুনিলাম। নিংহ দরজায় অরুণ স্তম্ভের উত্তর পার্শ্বে খালি স্থানে বহুকাল হইতে কাপড়ের একটা প্রকাণ্ড ছাতা ছিল, উহার নীচে ও নিকটস্থ স্থানে বসিয়া সাধুরা ভোজন করিতেন। ঐ স্থান হইতে মিউনিসিপ্যালিটি সাধুদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইদানীং লোকের অনিষ্ট করে বলিয়া গরুদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

কটকের উকিল শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও নানা সদালাপ হইত। ঠাকুর হরিবল্লভবাবুদের পরিবারের বড় প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন “এই একটি ধার্মিক পরিবার; ইহাদের নানা সদগুণ আছে। শ্রীমদ্ভাবনে এবং দেশে বিগ্রহ সেবা আছে। কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রাস্তা তাহা ইঁহারা প্রস্তুত করাইয়াছেন।

ঠাকুরের বিগ্রহ-পূজা ও দৈনন্দিন কার্য্য

ঠাকুর প্রতিদিন খুব ভোরে সমুদ্র-স্নানে যাইতেন। পথে ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত হীরালাল গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় প্রাতঃশৌচাদি শেষ করিতেন। পরে সমুদ্র-স্নান করিয়া ৮টা ৮০ টার সময়ে ধীরে ধীরে বাসায় প্রত্যাবর্তন করিতেন। ঠাকুর বাসায় আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেন, পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলভদ্র স্বামী প্রভৃতি বিগ্রহ সকলের পূজা করিতেন।

প্রথম প্রথম কোনও বিগ্রহ-পূজা ছিল না। বৈশাখ মাসে একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, “সারদা, রাস্তাতে যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলভদ্র

স্বামী প্রভৃতির বিগ্রহ, ছোট ছোট কাষ্ঠ নির্মিত মন্দিরে বিক্রয় হয়, তাহা আমাকে একখানি আনিয়া দিতে পার ?” আমি বাজারে যাইয়া ঐরূপ একখানা কিনিয়া আনিয়াছিলাম। তদবধি তিনি সকালে জল খাইবার পূর্বে প্রতিদিন উহা পূজা করিয়া চা প্রভৃতি সেবা করিতেন। প্রতি বিগ্রহের পদতলে সচন্দন তুলসী পত্র দিয়া, ‘অন্নরা’ ও ‘কুন্দ’ ফুল দ্বারা বিগ্রহ স্তম্বররূপে সাজাইয়া রাখিতেন।

কোন কোন দিন সকালে পূজার সময় বাহারা সম্মুখে থাকিতেন, তাঁহাদিগকে বিগ্রহ দেখাইয়া বলিতেন “দেখেছ, আমার ঠাকুরের গায়ে যে সকল ফুল ছিল তাহার একটিও ম্লান হয় নাই, সকল ফুলগুলিই সজীব রহিয়াছে।” তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেন “আপনারা ঠাকুরকে ভোগ দেন না ?” তিনি বলিতেন “আমি বাহা খাই আমার ঠাকুরও তাহাই খান।” কখনও কখনও পাখা দিয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতেন। কখনও বলিতেন “যে ঠাকুর আমার সহিত কথা না বলেন, তাঁহাকে আমি পূজা করি না।”

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলদেব ও শূভদ্রা মায়ীর পূজা হইলে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের একখণ্ড দস্তকাষ্ঠে সচন্দন তুলসী ও পুষ্প দিয়া আসনের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ চৌকির উপরিস্থিত গ্রন্থ সকলে ও গুরু নানকের ‘গ্রন্থসাহেবে’ ফুল তুলসী দিতেন। তৎপরে সম্মুখস্থ পটে নাগাবাবা অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সচন্দন তুলসী দিয়া ও তুলসী বৃক্ষমূলে পুষ্প দিয়া পূজা সমাপন করিতেন।

তিনি বলিতেন “শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সংস্পর্শযুক্ত এই যে ‘দস্তকাষ্ঠ’ দেখিয়াছ, ইহাও গুণাতীত ব্রহ্ম পদার্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি বাহা কিছু ব্যবহার করেন, তাহাই নিগুণ চিৎ পদার্থ হইয়া যায়। তিনি যে অন্ন ভক্ষণ করেন উহা ‘অন্নব্রহ্ম’। উহা বিগ্রহের আয় চৌকিতে রাখিয়া

পূজা করা যায়। তিনি যে পদার্থ, তাঁহার প্রসাদ অনাদিও সেই পদার্থ।”

পূজা শেষ হইলে তিনি চাও কিছু মহাপ্রসাদ দ্বারা জলযোগ করিতেন। তৎপরে জগবন্ধুবাবু বা অমৃত পাঠ করিতেন। নিত্য পাঠের গ্রন্থ :— শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, নরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রার্থনা, শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ ও অন্ত কিছু। আমাদের পাঠ শেষ হইলে তিনি নিজে গ্রন্থসাহেব ও অগ্রাগ্র সংস্কৃত ও হিন্দি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। ভোর কীর্তনের সময় হইতেই একটি তুলসী বৃক্ষ গ্রন্থ সকলের সম্মুখে আসনের নিকটে রাখা হইত। রাত্রি কীর্তনের পর বৃক্ষটিকে বারান্দায় রাখিতাম। তুলসী গাছের নীচে চড়ুই পাখীদের রোজ চাউল দেওয়াইতেন, চড়ুইগুলি সর্বদাই আসিয়া ঐ চাউল নির্ভয়ে খাইত। বানরের বাচ্ছাগুলিও ঐ চাউল খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতে থাকিত এবং গ্রন্থ সকলের চৌকীর নীচে যাইয়া নিঃশব্দভাবে পূর্বদিনের হরির লুটের বাতাসা খাইয়া আনন্দ করিত। ঠাকুর প্রতিদিনই ইহাদের জন্য লুটের বাতাসা রাখিয়া দিতেন। অতি প্রত্যুষে বড় রাস্তায় পাখীদিগকে চাউল ও মাটির গামলায় জল দেওয়াইতেন।

পাঠ শেষ হইলে ১১।০টার সময় পায়খানায় যাইতেন। তথায় প্রায় ১ ঘণ্টা কি ততোধিক কাল বিলম্ব হইত। ঠাকুরের শরীর অশক্ত বলিয়া বারান্দায় পায়খানায় বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। পায়খানার কার্য শেষ হইলেই স্নানরূপে বারান্দা ‘ফিনাইল’, ‘চূণ’ প্রভৃতির দ্বারা পরিষ্কার করা হইত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে একদিন সমুদ্রে ঠাকুরের পা ভাঙ্গিয়া যায়, সমুদ্রের একটি বড় ঢেউ আসিয়া হাঁটুর গ্রন্থি আলগা করিয়া দেয়; আবার আর একটা ঢেউ আসিয়া ষথাস্থানে উহা সংলগ্ন করে। এই দুর্ঘটনায় প্রায়

তিন মাস কাল ঠাকুরের পায়ে বল ছিল না ; তিনি কোথাও বাহির হইতেন না । এই সময় হইতে প্রতিদিন দুই কলসী সমুদ্রের জল ঠাকুরের স্নানের নিমিত্ত আনা হইত ; দুই প্রহরের সময়ে তিনি উহাতে স্নান করিতেন । শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার ও বিধুভূষণ ঘোষ এই সময় ঠাকুরকে স্নান করাইতেন ; তাঁহারা চলিয়া গেলে অশ্বিনী ও আমি স্নান-কার্য্যে ঠাকুরকে সাহায্য করিতাম ।

ঠাকুর মধ্যাহ্নকালে পায়খানা হইতে আসিয়া ইদানীং চন্দন দ্বারা তিলক করিতেন, পরে ঔষধ খাইয়া ‘পাকাল মহাপ্রসাদ’, মুড়কী, দধি প্রভৃতি দ্বারা সামান্তরূপ জলযোগ করিতেন । ফলমূল, ডাবের জলও সংগ্রহ হইলে খাইতেন । সরলনাথ এই সকল ও নানারূপ উৎকৃষ্ট মহাপ্রসাদ সংগ্রহ করিতেন এবং সর্বদা মন্দিরে থাকিয়া জগন্নাথদেবের সেবা পূজাদির সমস্ত ব্যাপার জানিয়া আসিয়া ঠাকুরের নিকট গল্প করিতেন ।

আহারান্তে ঠাকুর কিছু সময়ের জন্ত ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন, কখন কখন বারান্দায় রোদ্রে বসিতেন । এই সময়ে প্রায়ই অশ্বিনী নিকটে থাকিয়া জটা বাছিত ।

অতঃপর ২টা বাজিলে শ্রীযুক্ত পান্নালাল ঘোষ আসিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের অহুবাদ বাঙ্গালা মহাভারত পাঠ করিতেন ; ৩টা ৩০টা পর্য্যন্ত পাঠ হইত । বানরগুলি এই সময়ে প্রায়ই আসিত ; তাহাদিগকে নানারূপ আহার দেওয়া হইত । শ্রীমন্দির হইতে এই সময়ে মহাপ্রসাদ আসিত । ঠাকুর হাত মুখ ধুইয়া, ঔষধ ও কন্দের সরবৎ খাইয়া মহাপ্রসাদ আহার করিতেন ।

ঠাকুর পুরীতে আসিলে শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ঠাকুরের আদেশক্রমে তাঁহার অস্ত্র রোজ ঔষধ তৈয়ার করিয়া খাইতে দিতেন ।

এই সময়ে কাঙ্গালীদিগকে দুইটি ‘বাইহাণ্ডি’ মহাপ্রসাদ ও তিন চারি

কুড়িয়া ডাল তরকারী দেওয়া হইত। এক একটা বাইহাঙিতে পাঁচ ছয় সের চাউলের অন্ন ধরে। তিনি আহার করার পূর্বে কাঙ্গালীদিগকে মহাপ্রসাদ দিতে বলিতেন। সরলনাথ, অমৃত প্রভৃতি উহা বাঁটিয়া দিত। মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট মহাপ্রসাদও কাঙ্গালীদিগকে দেওয়া হইত। জ্যৈষ্ঠ মাসে আম উঠিলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে, জগন্নাথ বল্লভ মঠের ছাত্রদিগকে, পণ্ডিতজী প্রভৃতিকে এবং ছেলেপিলেদিগকে আম দেওয়াইয়া তবে আম খাইতেন। কাঙ্গালীদিগকে এবং রোজ বানরগুলিকেও আম দেওয়াইতেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে কিশোরীবাবু, জগৎবাবু ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা আসিতেন। ইঁহারা প্রতিদিন না আসিয়া যেন থাকিতে পারিতেন না, কীর্তনান্তে চলিয়া যাইতেন। কীর্তনান্তে প্রায়ই ঠাকুর কিশোরীবাবু প্রভৃতির সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। রাত্রি ৯।০টা হইলে ঔষধ ও যৎসামান্য কিছু মিষ্টি জলযোগ করিয়া ধ্যানস্থ হইতেন। রাত্রি ১০টা হইতে ব্রহ্মচারী সারারাত্রি জাগিয়া ঠাকুরের প্রয়োজন মত সেবা করিতেন। ঠাকুর সাড়ে ১২টা বাজিলে হাত মুখ ধুইয়া প্রস্রাব করিয়া যৎসামান্য মিষ্টি মুখে দিয়া জল খাইতেন এবং ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। পরে ৩।০টা ৪টা বাজিলে বারান্দায় হাত মুখ ধুইতে উঠিতেন। ব্রহ্মচারী আমাকে এই সময়ে নিদ্রা হইতে তুলিয়া দিত। ঠাকুর ঘরে আসিলে আমি পরিধেয় কোপীন দিব বলিয়া, তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতাম। ব্রহ্মচারী হোমের নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া প্রস্তুত থাকিত। ঠাকুর আসনে আসিয়া হোমের মন্ত্র পাঠ করিতেন। ব্রহ্মচারীও ঘৃত বিদ্বপত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিতে থাকিতেন। তৎপরে ঠাকুর 'করতাল' সহযোগে ভোর সংকীর্তন করিতেন। কখন কখন শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে, রেবতীবাবু প্রভৃতিও গান গাহিতেন। ঠাকুর করতাল সহযোগে প্রতিদিনই স্বরচিত নিম্নলিখিত গানটি গাহিতেন।

“হরে মুরারে, মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ গাও রে ।

গাও শ্রীমধুসূদন, যশোদা নন্দন, গোপীজনবল্লভ প্রাণারামে ॥”

কখন কখন তাঁহার রচিত এই গানটিও গাহিতেন, যথা :—

“বৃন্দাবিপিনে মঙ্গল আরতি, হেরে নয়ন আনন্দে ।

আরতি হোতেছে, নাচিছে সখীবৃন্দে ॥

কুঞ্জ কুঞ্জ হ’তে ধাইছে সবে দেখিতে শ্রীগোবিন্দে ॥”

অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন ঠাকুরদের ও কেশীঘাট, বংশীবট, দ্বাদশাদিত্যের টীলা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভগবৎ লীলাস্থলী সকলের, সংকর্ষণ, প্রহ্লাদানিরুদ্ধ প্রভৃতি ঠাকুরগণের, ইহলোকবাসী, পরলোকবাসী হরিভক্তবৃন্দের “জয় জয়” ধ্বনি প্রদান করিয়া কীর্ত্তন সমাপন করিতেন । ঠাকুর প্রতিনিয়ত ঘড়ি ধরিয়া চলিতেন ।

ঠাকুরের ঘরে ব্রহ্মচারী, সরলনাথ, যোগজীবন দাদা, সতীশ, বিধু মজুমদার, কুঞ্জ (অস্থখের পূর্বে) প্রভৃতি এবং আমি রাত্রে শয়ন করিতাম ও তাঁহার সম্মুখে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতাম ।

পঞ্চম অধ্যায়

স্নান ও রথযাত্রা মহোৎসব

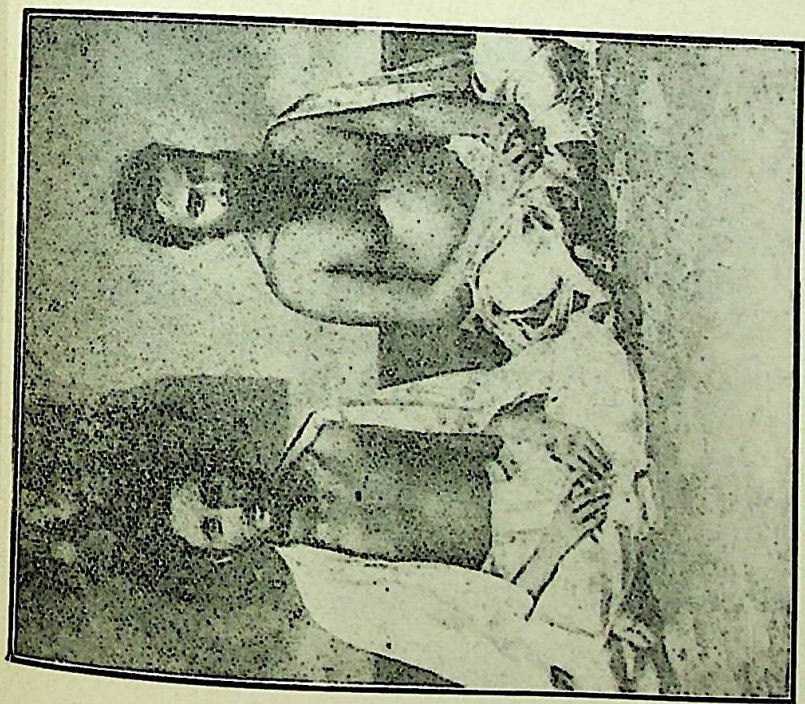
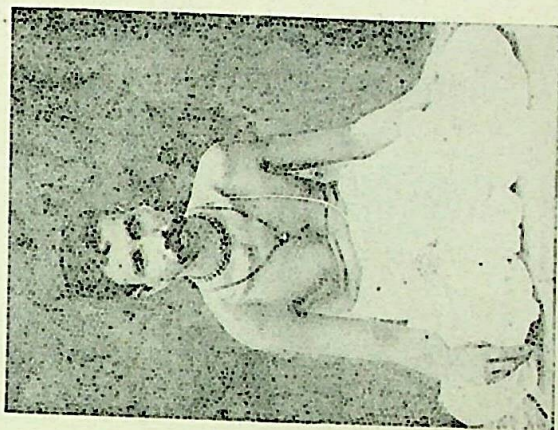
স্নানযাত্রা ও দ্বৈতাদের সহিত কলহ

আজ ২২শে জ্যৈষ্ঠ, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। জগন্নাথদেব আজ স্বয়ং রত্নসিংহাসন ছাড়িয়া বলভদ্র স্বামী, সুভদ্রাময়ী ও চক্র সুদর্শনের সহিত স্নান করিতে স্নানবেদীতে আসেন। শাস্ত্রে আছে যে জগন্নাথদেবের স্নানের সময়ে সমস্ত দেবতারা উপস্থিত হন এবং পূজারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে স্নান করান। আমরা স্নানবেদীর দক্ষিণ পার্শ্বে ঠাকুরের সহিত অনেকক্ষণ পূর্ব হইতেই বসিয়াছিলাম। আজ ‘দ্বৈতা’ সেবকদিগের সহিত আমাদের ঝগড়া হয়। ‘দ্বৈতা’ অর্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চণ্ডাল সেবক; ইহারাই জগন্নাথদেবকে বহন করিয়া স্নানবেদীতে নিয়া আসে এবং রথযাত্রার সময় ঠাকুরকে রথে উঠায় ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। জগন্নাথদেব ও বলভদ্র স্বামী প্রভৃতি স্নানবেদীতে আসনে বসিলে আমরা ঠাকুরের সহিত দর্শন করিতে যাই। অনেকেই তখন দর্শন করিতেছিল। ‘দ্বৈতারী’ ঠাকুরের গতিরোধ করিয়া বলিল, “টাকা না দিলে দর্শন করিতে দিব না”; জোর করিয়া তাড়াইয়া দিতে উত্তত হইল। ঠাকুর কিছুক্ষণ তাড়াইয়া তেজের সহিত বলিলেন, “বিধু চল; ঠাকুর কৃপা করিলে অন্ত্রও দর্শন হইবে।” এই বলিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন এবং নাটমন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় একটা দরজার নিকট বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইতি-মধ্যে দ্বৈতারী ঠাকুরের নিকট আসিল, স্নানবেদীর নিকট যাইবার জন্য ঠাকুরের পা ধরিয়া সাধাসাধি করিতে লাগিল এবং নিজেদের অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা চাহিল। ঠাকুর অনেকক্ষণ পরে উহাদের অনুরোধে যাইয়া

দর্শন করিলেন এবং স্নানের সময় ভগবানের স্নান দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলেন। দ্বৈতারা কিছু দর্শনী চাহিল। ঠাকুর উহাদিগকে ৪০ টাকা দিতে চাহিলেন। দাদাগোঁসইয়ের হাতে টাকা নাই, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় কলিকাতা যাওয়ার পাথেয় বাবদ ৪০ টাকা রাখিয়াছিলেন, তিনি উৎসুল্লচিত্তে উহা দিয়া দিলেন। পরে দ্বৈতারা খুব যত্ন করিয়া দর্শনাদি করাইয়া দিল।

কুঞ্জের জ্বর ও ঠাকুরের চিকিৎসা

শ্রীযুক্ত কুঞ্জরিহারী গুহের এ সময়ে জ্বর ছিল। তিনি আমার কাঁদে ভর করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া গুরুদেবকে নমস্কার করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রভৃতি দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলেন। তাঁহার জরের চিকিৎসা ঠাকুর নিজে করেন। এই চিকিৎসায় একটু বিশেষত্ব আছে। জ্বর প্রকাশ হইবার দুইদিন পূর্বে হইতে ঠাকুর ইহাকে মহাপ্রসাদ না খাওয়াইয়া বারি খাইতে আদেশ করেন। এইরূপ অকারণ আদেশে একটু ত্রস্ত হইয়া বিধুভূষণ ঘোষ কুঞ্জকে বলিলেন, “তোরা বোধ হয় কোন অসুখ করিবে, তাই উনি তোকে বারি খাওয়াইতেছেন।” যে দিন প্রথম জ্বর হয় সেদিন শান্তিদিদির ছেলের মলস্পর্শ হওয়াতে, সে নরেন্দ্রে বাইয়া স্নান করিয়া আসে। পথেই জ্বর হয়, বাসাতে আসিলে জ্বর খুব বেশী হয় এবং একরূপ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। ঠাকুর সমুদ্র-স্নান হইতে আসিয়া কুঞ্জের জ্বরের কথা শুনিলেন, এবং স্নানের কথা শুনিয়া বলিলেন, “স্নান না করিয়া গাত্রের ঐ স্থানটুকুতে একটু জল দিলেই হইত।” পরে বলিলেন, “কুঞ্জ যে জ্বর হইবে ইহা আমি পূর্বেই জানিতাম; তাই, বাহাতে না হয় তজ্জন্য ২১৩ দিন বারি খাইতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু বাহা হইবার তাহা এড়াইবার যো নাই। অতঃপ্রাতে স্নান করিল ও জ্বর আসিল।”





শ্রী রবতীমোহন সেন

পরে ঠাকুর বলিলেন, “দেখ, এখানে ভাল ডাক্তার কবিরাজ নাই, ঔষধে কিছু হয় না, আমার ইচ্ছা তুমি কোন ঔষধ না খাও।” কুঞ্জ বলিল, “আমার ঔষধ খাইবার ইচ্ছা নাই।” পরে ঠাকুর কোন ঔষধ না দিয়া খাওয়ার মাত্র এই বন্দোবস্ত করিলেন। প্রাতে ‘পাকাল মহাপ্রসাদ,’ বৈকালে ‘মহাপ্রসাদ’ ও রাত্রে তাঁহার প্রসাদী আম, ক্ষীর ও মিছরী।” ১০৪।১০৫ জরের উপর এইরূপ পথ্য চলিতে লাগিল। ব্যারাম অনেকটা ভাল হইল। একদিন রাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি হয় এবং দরজা খোলা থাকায় ঠাণ্ডা লাগিয়া আবার জ্বর হইল। ইহাতে রামকৃষ্ণ ঠাকুরতা প্রভৃতি কেহ কেহ এরূপ প্রকাশ করিলেন যে, “বিনা চিকিৎসায় কুঞ্জ হয়ত মারা যাইবে।” এই কথা ঠাকুরের কানে উঠিল, তিনি উহা শুনিয়া ডাক্তারী ঔষধ খাওয়াইবার জন্ত বলিলেন এবং কুঞ্জকে কহিলেন “তুমি ঔষধ খাও, সত্যকুমারের (১) চিকিৎসা হইল, তোমাদের গ্রামে প্রচার, বিনা চিকিৎসায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।” কুঞ্জ ঔষধ খাইতে স্বীকৃত হইল না। তথাপি ঠাকুর শ্রীগুপ্ত বাণীকর্ষ ঘোষ ডাক্তারের দ্বারা প্রেক্ষপ্‌সন করাইয়া এবং নিজে দেখিয়া ঔষধ দিতে বলিলেন এবং আবার বার্লি খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

ইহাতে ব্যারামের কিছুই হইল না। একদিন রাত্রে কুঞ্জ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। ১০৩।১০৪ ডিগ্রি জ্বর। কুঞ্জের কথামত সতীশ

(১) বানরোপাড়া নিবাসী সত্যকুমার গুহ, কুঞ্জ ঠাকুর তাঁরই আত্মীয়। তিনি শান্তিপুরে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া ঠাকুরের নিজ বাড়ীতে তাঁহার সম্মুখে দেহ-ত্যাগ করেন। তিনি খুব ভজনশীল ও বিনয়ী ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “ইহার দেহত্যাগের পরই পুনরায় গঙ্গার তীরে কোন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হইয়াছে। ইহার গর্ভক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। লোকের কদাচিত্‌ এরূপ সৌভাগ্য হয়।”

যাইয়া বলায় ঠাকুর তখনই রাত্রি ১১টার সময় 'পাকাল' দিতে বলিলেন। কুঞ্জ এক হাঁড়ি পাকাল খাইল এবং খুব আরাম বোধ করিল। তৎপরে পূর্বের মত পাকাল ও মহাপ্রসাদ দ্বারা পথ্য করিতে লাগিল। ব্যায়াম ক্রমে ক্রমে সারিয়া গেল। ইহার বাঁচিবার আশা ছিল না। অনেক দিন ডাক্তার প্রভৃতির মনে করিতেন, রাত্রে মরিয়া থাকিবে। ব্যায়াম ভাল হওয়ার পর ঠাকুর বলিয়াছেন যে, কুঞ্জের বাঁচা, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড, কি যে হইয়াছিল, লোকে তা ত জানে না ; তাহার পুনর্জন্ম হইয়াছে।

শনি ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ

ইহার পর একদিন কুঞ্জ ঠাকুরের নিকট বসিয়া বলিল, “আজ আপনি যখন বৈকালে মহাপ্রসাদ আহার করিতেছিলেন তখন আমি ঘুমাইতে ছিলাম। স্বপ্নে দেখি শনি ঠাকুর আপনার খাওয়া শেষ হওয়ায়ই আপনার পাত হইতে প্রসাদ নিয়া যাইতেছেন। আমার দেখিয়া রাগ হইল। আমি দৌড়াইয়া গিয়া শনি ঠাকুরকে বলিলাম “আপনি কি রকম লোক, কাহাকেও না বলিয়া এইরূপ প্রসাদ নিয়া যাইতেছেন ?” শনি ঠাকুর কিছু উত্তর না দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। তখন আমি আবার দৌড়িয়া গিয়া ব্রহ্মচারীকে বলিলাম, “তুই দরজার ধারে বসিয়া আছিস, দেখছিস না যে-সে আসিয়া ঠাকুরের প্রসাদ নিয়া যায় ?” ইহার পরই আমার ঘুম ভাঙিল। আমি দেখিলাম যে তখনই আপনার প্রসাদ ঘর হইতে বাহিরে আনা হইল। ঠাকুর বলিলেন, “হাঁ, যা দেখেছ ত ঠিকই, শনি ঠাকুর এসেছিলেন।”

মাঠাকুরাণীর কৃপা : দর্শন

কুঞ্জ আরও বলিল—কয়েকদিন হইল স্বপ্নে দেখিলাম লতাপুষ্পদ্বারা সজ্জিত অতি সুন্দর একটি কুঞ্জের ভিতরে একখানা অপূর্ব সিংহাসন।

११



শ্রীযুক্তেশ্বরী-মাঠাকরুণ শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী

পঞ্চম অধ্যায়

১২৭

তাহার উপরে শ্রীকৃষ্ণ ও বামে মাঠাকুরাণী বসিয়া আছেন। সিংহাসনে উঠিবার সিঁড়ির নীচে বাম দিকে আপনি দাঁড়াইয়া আছেন। আপনাকে নীচে দাঁড়ান দেখিয়া ভাল লাগিল না। ইচ্ছা হইল আপনি বাইরা মাঠাকুরাণীর দক্ষিণে বসেন এবং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া নীচে দাঁড়ান।" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "তাতে দোষ কি?"

কুঞ্জের এই সব কথা শুনিয়া মাঠাকুরাণী সম্বন্ধে আমার একটি প্রত্যক্ষ দর্শনের বিষয় মনে হইল। এক দিবস মধ্যাহ্নকালে গেণ্ডারিয়ার আশ্রমে মাঠাকুরাণীর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া দরজার সম্মুখে সান্ধ্য হইয়া প্রণাম করিলাম। উঠিতেই দেখি চতুর্ভুজা শ্রীমা শূন্তে সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। অঙ্গের বর্ণ নীলকান্ত মণির স্থায়। বুঝিলাম মাঠাকুরাণী রূপা করিলেন।

মাঠাকুরাণী সম্বন্ধে ঠাকুর গেণ্ডারিয়ার আম গাছের নীচে শ্রীযুক্ত বাণীকর্ষ ঘোষ ও কুঞ্জকে বলিয়াছিলেন, "লোকে সাধন ভজন করিয়া ভগবানকেও লাভ করিতে পারে, কিন্তু উহার রূপা না হইলে উহাকে কেহ পান না। বাহারা উহার দর্শন পাইয়াছেন, তাহারা যথার্থই সৌভাগ্যবান।"

নবযৌবন দর্শন

স্নানযাত্রার পনের দিন পরেই রথযাত্রা। এই পনের দিন জগন্নাথদেব নির্জনে থাকেন। এই কয়দিন কাহারও দর্শনের অধিকার নাই, কেবল বৈতা সেবকেরা সেবা করেন। এই দেশে প্রবাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান করিয়া জ্বর হয় এবং এই পনের দিন তজ্জন্ত নির্জনে থাকেন ও পান্য ভোগাদি গ্রহণ করেন। পনের দিন অস্তে যে দিন সকলকে দর্শন দেন সেই দিন জগন্নাথদেবের 'নবযৌবন' দর্শন। ইতিপূর্বেই শ্রীমূর্তির অঙ্গরাগাদি হইয়া থাকে।

রথযাত্রার অব্যবস্থা : একাদশীর নূতন মত

এবার ৬ই আষাঢ় জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন। ঠাকুর পুজি শুনিয়াছিলেন সেবকেরা দ্বিতীয়া তিথির ভিতর প্রায়ই জগন্নাথদেবের রথে তোলেন না। ঠাকুর বলিলেন দ্বিতীয়ার মধ্যে রথে না উঠাইবে, রথে 'বামন' দর্শনে যে সন্তুমুক্তির কথা আছে তাহা হয় না। সহস্র সহস্র লোক ব্যাকুল হইয়া এই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করিতে যে অর্থব্যয় ও বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া দূরদেশ হইতে আসেন, আর সে সেবকদিগের ও রাজার ক্রটিতে যথাশাস্ত্র দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন না, ইহা অত্যন্ত ক্লেশ ও দুঃখের বিষয়। ঠাকুর ডেপুটী জগৎবাবু ও কিশোরীবাবুকে অনুরোধ করিলেন—“আপনারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট বলিয়া যে প্রকারে হউক দ্বিতীয়ার মধ্যে যাহাতে জগন্নাথদেবের রথ উঠেন তাহার চেষ্টা করিবেন। ম্যাজিস্ট্রেট জেলার কর্তা, রথে ঠাকুর উঠাইবার সময় তিনি পুলীশ সঙ্গে শান্তিরক্ষা করেন। তাঁহার আদেশে রাজাকে রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। কিশোরীবাবু ও জগৎবাবু দুইজন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট বলিয়া হুকুম বাহির করিলেন যে দ্বিতীয়ার ভিতর ঠাকুর যে প্রকারে রথে উঠেন তাহা করিতে হইবে।

কিন্তু যখন উড়িষ্যাবাসী, ডেপুটী রাসবিহারীবাবু ও জগন্নাথদেবের সেবকেরা শুনিলেন যে জটিয়া বাবার চেষ্টায় দ্বিতীয়ার মধ্যে ঠাকুরকে রথে উঠাইবার হুকুম হইয়াছে, তখন সেবকেরা গোপনে রাসবিহারীবাবু সাহেবের নিকট পাঠাইয়া জানাইলেন “এ বৃহৎ ব্যাপার; দ্বিতীয়ার ভিতর ঠাকুরকে রথে উঠাইতে পারা যাইবে না, যে দিন দ্বিতীয়া সেই দিন ঠাকুরকে রথে উঠাইলেই হইল। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া

পঞ্চম অধ্যায়

১২৯

আদেশ প্রত্যাহার করুন।” সাহেব তাহাই করিলেন, দ্বিতীয়ার ভিতর জগন্নাথদেব রথে উঠিলেন না।

সাহেবের নিকট উহার। যে যুক্তি দেখাইয়াছেন—ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন “এতো বালকের মত কথা, একি একাদশীর উপবাস পাইয়াছেন যে, যেদিন একাদশীতে কিষ্কিৎমাত্রও দ্বাদশী থাকিবে সেইদিনই উপবাস করিতে হইবে?” শাস্ত্র হইতে উহাদের অযৌক্তিকতার প্রমাণস্বরূপ ভুরি ভুরি শ্লোক দেখাইতে লাগিলেন। শুনলাম এ দেশে একাদশীর এক নূতন মত কয়েকটি মঠ অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। রাধাকান্ত মঠ, গঙ্গামাতার মঠ, জগন্নাথদাস বাবাজীর পাপুরিয়া মঠ এইরূপ কতিপয় মঠে এই অভিনব মতে একাদশী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার। না স্মার্ত মতে মন্দিরের একাদশীর দিনে উপবাস করিবেন, না গোস্বামী মতে করিবেন। ইহা শুনিয়া ঠাকুর সতীশ ও স্বামীজিকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন এবং শাস্ত্র হইতে নানারূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এই সম্বন্ধে ঐ সকল মঠে আলোচনা করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সকলেই কর্তৃত্ব করিতে চায়। শাস্ত্র শোনে কে? ঠাকুর অদ্বৈতবংশের প্রথানুসারে স্মার্ত মতেই একাদশী করিয়া থাকেন।

ঠাকুর রথযাত্রার ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, “অল্প সময়ে জগন্নাথদেব দর্শনেও যে ফল এই অ-তিথিতে রথে ঠাকুর দর্শনেও সেই ফল। দ্বিতীয়ার ভিতর যখন উঠান হইল না তখন এত ভিড়ের ভিতর দর্শনে যাওয়া নিশ্চয়োজন।” তিনি আর সেই দিন রথে জগন্নাথদেব দর্শনে গেলেন না। বারান্দায় দাঁড়াইয়া রথ টানার সময়ে জগন্নাথদেব দর্শন করিলেন। ইতিপূর্বে একদিন সমুদ্র-স্নানকালে ঢেউয়ের আঘাতে ঠাকুরের হাঁটুর সন্ধিস্থান চ্যুত হইয়াছিল। তাই তিনি কোথায়ও যাতায়াত করিতে অতিশয় ক্লেশ পাইতেন।

সকালবেলা বিধুবাবু ওভারসিয়ার সুরেনবাবুর দোলা চাহিয়া আনিয়া-

ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ঠাকুর উহাতে চড়িয়া দর্শনে বান। দোলা ঘরের ভিতর আনিয়া ঠাকুরকে উহাতে চড়িতে সকলে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরও কৌতুক করিয়া উহাতে চড়িলেন। বিধু ঘোষ প্রভৃতি দোলা কাঁধে লইলেন। তখন মহেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন “এই আমাদের রথ জগন্নাথ দর্শন করা হইল।”

জগন্নাথদেবের পট্টডোরী

মহাপ্রভুর আদেশে কুলীনগ্রামের বনু রামানন্দ রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথদেবের পট্টডোরী যোগাইতেন। সেই সময় হইতে তাঁহার বৎসরেরা ঐ পট্টডোরী নিয়মিত প্রতি বৎসর দিয়া আসিতেছিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তাহা বন্ধ হইয়াছে জানিয়া ঠাকুর রামানন্দ বনু মহাশয়ের বংশের কুলীনগ্রামের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস বনুকে উহা পূর্ববৎ দিতে আদেশ করেন। তিনি তদনুসারে ১৩০৩ সন হইতে উহা দি আসিতেছেন। সম্প্রতি ঠাকুর অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, ঐ পট্টডোরী তাঁহাদের পাণ্ডা ভূবন মিশ্র রাজসরকারে জমা না দিয়া বিক্রয় করিয়া পয়সা লন; ঠাকুর ইহা হরিদাসবাবুকে জানাইলেন। হরিদাসবাবু রাজা ম্যানেজার ‘প্রাইচ সাহেব’কে এই বিষয় অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করেন। প্রাইচ সাহেব অনুসন্ধান করিয়া ভূবন পাণ্ডা হইতে গত বৎসরের টাকা আদায় করিয়া লইলেন এবং তাহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করিলেন। ভূবন পাণ্ডা হরিদাসবাবুকে ধরিয়া রক্ষা পাইলে পরন্তু আমাদের উপর জাতক্রোধ হইয়া রহিলেন।

জগন্নাথদেবের সেবার ক্রটি

ইদানীং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিয়মিত সেবার খুব ক্রটি হইতেছে। ঠাকুর উহা দর্শন করিয়া বড় দুঃখ করিতেন। কখন কখন ভোজ

পঞ্চম অধ্যায়

১৩১

আরতি দুই প্রহরের সময় হইত, বাল ভোগ তিন প্রহরের সময়, রাজভোগ সন্ধ্যাকালে ; পূর্বদিনের ফুল শ্রীবিগ্রহে দুই প্রহর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিত। এই সকল সেবার ক্রটি দেখিয়া ঠাকুর ক্রোশে অধীর হইতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শরীর আরশোলায় ও ইন্দুরে কাটে শুনিয়া একদিন খুব মর্মান্তিক ক্রোশ প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “ইহারা জগন্নাথদেবকে বিশ্বাস করে না ; বাহার বিশ্বাস আছে সে কি আর—জগন্নাথদেব অনাহারে রহিয়াছেন, আরশোলায় অঙ্গ কাটিতেছে, পূর্বদিনের ফুল শ্রীঅঙ্গে ১০টা ১১টা পর্যন্ত রহিয়াছে, এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারে ? এখন জগন্নাথদেব সেবকদের এক উপার্জনের বিষয় হইয়াছেন, বাগড়া-বিবাদ করিয়া অনায়াসে ইহার সেবার ও ভোগের ক্রটি করে। রাজারও এদিকে দৃষ্টি নাই।”

শুনিলাম শাস্ত্রে আছে পূর্বরাত্রের ফুল বিগ্রহের অঙ্গ হইতে সূর্যোদয়ের পূর্বেই ফেলিতে হয়। সূর্যোদয়ের দুই মুহূর্তের ভিতর প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বিগ্রহ-শরীরে ফুল কণ্টক হইতেও ক্রমশঃ তীব্ররূপে বিদ্ধ হইতে থাকে। অতঃপর ঐ পুষ্প বিগ্রহ-শরীর বজ্রবৎ বিদ্ধ করে। সূর্যোদয়ের দুইমুহূর্ত পরে ফুল উন্মোচন করিলে আর উহার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

নারদ পঞ্চরাত্রে আছে :—

“অরুণোদয় বেলায়াং নির্মাল্যাং শল্যতাং ব্রজেৎ
প্রাতস্ত শ্রামহাশল্যাং ঘটিকা মাত্র যোগতঃ
অতিশল্যাং বিজানীয়াত্ততো বজ্র প্রহারবৎ ॥
অরুণোদয় বেলায়াং শল্যাং তৎক্ষমতে হরিঃ
ঘটিকায়ামতিক্রান্তৌ ক্ষুদ্রং পাতকমাবহেৎ ।
মুহূর্তে সমতিক্রান্তে পূর্ণং পাতকমুচ্যতে ।
অতি পাতকমেবশ্রাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে ।

মুহূর্ত্তে ত্রিতয়ে পূর্ণে মহাপাতকমুচ্যতে ।

ততঃ পরং ব্রহ্মবধো মহাপাতক পঞ্চকং ।

প্রহরে পূর্ণতাং যাতে প্রায়শ্চিত্তং ততো নহি ॥ (১)

শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস । ৩য় বিলাস, ৭৯৮।

(অর্থাৎ অরুণোদয় কাল হইতে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ৪ দণ্ড হইতে বিগ্রহ-শরীরে পুষ্প শল্য, মহাশল্য এবং সূর্য্যোদয়ের পর বহু-প্রহারবৎ অতিশল্যরূপে বিদ্ধ করে । চারিদণ্ডের পর অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে দুই মুহূর্ত্ত পর কিম্বা অরুণোদয় হইতে এক প্রহরের পর পুষ্প রাখিলে আর প্রায়শ্চিত্ত নাই ।)

ঠাকুর বলিলেন “সুযোগ্য লোকের হাতে মন্দিরের ভার থাকা প্রয়োজন । দুইজন উৎকৃষ্ট পণ্ডিতকে শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থার নিমিত্ত নিযুক্ত করা উচিত । প্রতি কার্য্যে তাঁহাদের ব্যবস্থামত চলা কর্তব্য । তাঁহার জগন্নাথদেবের সেবা পূজাপদ্ধতি অনুসারে শাস্ত্রদৃষ্টে যেক্রপ ব্যবহা করিবেন, সুযোগ্য কর্ম্মচারী তদনুক্রম অনুষ্ঠান করিবেন ।”

ঠাকুর আরও বলিলেন, “মন্দিরের চারিদিকে দেওয়াল সংলগ্ন যে দোকান সকল রহিয়াছে, উহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত । পরিক্রমার দয়্যে ঐ সকল দোকানদার পসারীকেও প্রদক্ষিণ করিতে হয় ; এইরূপে শ্রীমন্দিরের দেওয়ালের গায়ে দোকানঘর প্রভৃতি থাকায় ভক্তেরা প্রাণে বড়ই ক্লেশ পান ।” ঠাকুর মাঝে মাঝে মন্দিরের বাহিরের রাস্তা ধরিয়া শ্রীমন্দিরে পরিক্রমা করিতেন ।

ঠাকুরের আকাশবৃত্তি

দাদাগোসাই ঠাকুরকে একদিন জানাইলেন, “অর্থের টানাটানি, এত কি করা যায় ? আমার ইচ্ছা রঙ্গপুর যাইয়া, আমাদের যে সম্পত্তি আছে

পঞ্চম অধ্যায়

১৩৩

তাহা বিক্রয় করি।” ঠাকুর বলিলেন, “ভগবান দাতা, তিনি না দিলে কিছুতেই কিছু হয় না। বিষয় বিক্রী করিয়া জোর দুই হাজার টাকা পাইবি, তাহাতে কয় দিন চলিবে? তাঁর উপরই নির্ভর কর, তবে ভগবানের দান যথার্থরূপে ব্যয় না হইলে, তিনি গুটাইয়া নেন, যদি না কুলায় ব্যয় সংক্ষেপ কর।” কান্দালীদের ভোজনের নিমিত্ত মাসিক যে ১২০ টাকা ব্যয় হয়, ইহা দাদাগোঁসাই কমাইতে চাহিলে বিধু মজুমদার ও মোক্ষদাকুমার বহু বলিলেন, “আজ অবধি এক মাসের খরচ আমরা দিব।”

ঠাকুরের আশ্রম বরাবর আকাশবৃষ্টি দ্বারা চলিত। আকাশবৃষ্টি শব্দের অর্থ, একান্তভাবে ভগবানের মুখপানে তাকাইয়া পড়িয়া থাকা, তিনি যাহা দিবেন তদ্বারাই আহাঙ্গাদি নিষ্পন্ন করা।

গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

অনন্তশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনা পশু্যুপাসতে।

তেবাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥

যে সকল মনুষ্য অনন্তচিন্ত হইয়া আমার উপাসনা করে, সে সকল নিত্যযুক্ত লোকদের ভরণ-পোষণের ভার আমি বহন করি।

ঠাকুর সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেন, তাই তাঁহার আকাশবৃষ্টি কখনও ভঙ্গ হয় নাই। গেণ্ডারিয়া আশ্রমে বাস করা কালে এক দিবস শ্রীযুক্তা দিদিমাতা ঠাকুরানী (ঠাকুরের শাশুড়ী) বলিলেন, “নবকুমারবাবু, আজ তো হাতে কিছু নাই, খাবার কি হবে?” তাহাতে নবকুমারদাদা চাউল ডাল প্রভৃতি কয়েক টাকার খাবার জিনিষ ধারে আনিলেন। সেই দিনই আহাঙ্গের পর ঠাকুর নবকুমারবাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি বাজার হইতে ধারে কিছু জিনিষ আনিয়াছেন?” তাহাতে নবকুমারবাবু বলিলেন,

“হাঁ, আমরা অনেক লোক এখানে আছি, তাহাদের কষ্ট হইবে, বুড়ো ঠাকুরাণীর হাতে কিছু নাই বলাতে—আমি ধারে জিনিষ আনিয়াছি।” ঠাকুর বলিলেন, “আপনি ভালর জন্তই করিয়াছেন, তবে আপনাকে আমার ব্রতের কথা জানাই। আমার আকাশবৃষ্টি, আমার আহ্বানও নাই বিসর্জনও নাই। এখানে যাহারা আছেন ভগবান যেদিন যাহা উপস্থিত করিবেন তাহাই সকলের সমানভাবে খাইতে হইবে। কিন্তু নিজে সে ভার নিলে আমার আকাশবৃষ্টি রক্ষা হয় না।” তাহাতে নবকুমারবাবু জোড়হাতে বলিলেন, “আমি জানি না, তাই এই অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন।”

বিশ্বাস মহাশয় (নবকুমার) আরও গল্প করিয়াছেন। ঠাকুর যখন কলিকাতায় ছিলেন তখন আটার রুটি খাইতেন। কলিকাতায় ভাল আটা মিলিত না। বিশ্বাস মহাশয় বাঁকিপুরের উকীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুকে কিছু আটা পাঠাইতে লিখেন, তিনিও কিছু পাঠাইয়াছেন। ঠাকুর ঐ আটার রুটি খাইয়া প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “এ আটা কোথায় পাইলেন?” যখন জানিলেন বিশ্বাস মহাশয় চিঠি লিখিয়া আনাইয়াছেন, তখন ক্ষুব্ধ হইয়া বিশ্বাস মহাশয়কে বলিলেন, “আর এরূপ করিবেন না। ভগবান যাহা দেন তাহাই আহাৰ করিব। গুরুজি আমাকে আকাশবৃষ্টি দিয়াছেন, আমি কাহারও মুখাপেক্ষী নহি।”

ঠাকুরের জীবনে অদ্ভুত নির্ভরতা

ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালে কিছুদিন মাসহারা সংকীর্ণ পাইতেন বটে, কিন্তু তাহাও অতি সামান্য। যখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রচারকের কার্য গ্রহণ করিয়া শূণ্যহস্তে কেবলমাত্র ভগবানের দিকে তাকাইয়া চলিতেন, তখন কেহ কেহ তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন “তোমার নিরাশ্রয় পরিবার অনাহারে শুকাইয়া মরিবে।” এই কথার উত্তরে তিনি বলিয়া

ছিলেন, “যিনি মরুভূমিতে তৃণশুল্ক রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর নীর মধ্যে প্রাণীপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, কোন্ অবস্থানী বলিবে যে, তিনি অনাহারে দুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন।” ঢাকার ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন, তিনি ঠাকুরের একখানা চিঠিতে দেখিয়াছিলেন, “আমি ভগবানের পবিত্র নাম প্রচার করিতে ত্রতী হইয়াছি, ইহাতে তিনি যদি এই নিরাশ্রয় পরিবারকে অনাহারে মারেন, তবে তাহাতে আমার আক্ষেপ নাই।”

তিনি ঢাকাতে যখন প্রচার করেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি করিতেন। কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না। রোগীর নিকট হাঁটিয়া বাইয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া আসিতেন। দর্শনী ইচ্ছা হইলে দিত, নচেৎ নহে। তিনি অনেক সময় পরিবারবর্গকে শূণ্যহস্তে রাখিয়া প্রচারে বহির্গত হইতেন। শিশুকাল হইতেই ঠাকুরের নির্ভরভাব খুব প্রবল ছিল। একজন কর্তা আছেন, তিনিই ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁহার উপরই সমস্ত অর্পণ করিয়া মুক্ত বিহঙ্গমের স্থায় বেড়াইয়া বেড়াইতেন। তিনি প্রচারক অবস্থায় একবার আসাম অঞ্চলে প্রচার করিতে যান। এক কপর্দকও সঙ্গে নাই, কেবলমাত্র জাহাজ ভাড়া সংগৃহীত হইয়াছে। উহা লইয়াই টিকেট খরিদ করিয়া জাহাজে চড়িলেন। দুই তিন দিন চলিয়া গেল, কিছুই আহার হয় নাই। জাহাজ কোন স্থানে থামিলে ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হইয়া তাড়াতাড়ি জাহাজ হইতে নামিয়া কতকগুলি পলি মাটি জল দিয়া গুলিয়া খাইয়া ফেলিলেন। যাত্রী মুনসেফ, ডেপুটী প্রভৃতির সহিত জাহাজে পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি করিলেন?” ঠাকুর বলিলেন, “ভগবান যাহা দিলেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলাম।” তখন তাঁহারা বলিলেন, “আমাদিগকেও ত জানাইতে পারিতেন?” ঠাকুর বলিলেন, “আপনাদিগের উপর নির্ভর করিয়া আর ত

বাহির হই নাই, বাহার উপর নির্ভর করিয়া বাহির হইয়াছি তিনি বাহা দিলেন তাহাই গ্রহণ করিলাম।”

শুনিয়াছি কাঁধে একটা ব্যাগ ও হাতে একটা মোটা লাঠি এইমাত্র অবলম্বন করিয়া পদব্রজে তিনি পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে প্রচার করিতেন। সঙ্গে কপর্দকও নাই, সামনে ছোট ছোট নদী পড়িয়াছে, অদম্য-উৎসাহে উহা সাঁতারাইয়া পার হইয়া যাইতেন। শরীরে অসীম শক্তি ছিল; কেবলমাত্র চাউল পাইলেন, তাহাই চিবাইয়া খাইয়া হাঁটিতেন। তাহার মুখে শুনিয়াছি, ঢাকা হইতে যখন চাঁটগা যান, তখন রাস্তায় দোপাটি ফুল খাইয়া দিনে ৪৮ মাইল হাঁটিয়াছেন।

প্রচারের সময় আহারাভাবে বহু ক্লেশ পাইতেন। ভাত হইয়াছে, ডাল নাই, কখন লবণ নাই, তাহাই সাদরে ভগবানের দান ভাবিয়া মাথায় ছোঁয়াইয়া গ্রহণ করিতেন। একদিন কেবলমাত্র গাঁদা ফুল ভাজা খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন।

এইরূপ ঘোর দৈন্ত্যাবস্থায়ও কাঙ্গালী দেখিলে বেহঁস হইয়া যাইতেন। কতদিন নিজের অন্ন কাঙ্গালীদের দিয়া উপবাস করিয়াছেন; পরিবার-দিগকেও তৎসঙ্গে ক্লেশ পাইতে হইত।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যখন প্রচারক ছিলেন, তখন তিনি ধর্মপিপাসু হইয়া নানা সম্প্রদায়ের ভিতর ধর্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেন। এই অবস্থায় ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি ১২৯০ সনের ভাদ্র মাসে মানস সরোবরের পরমহংসজীর নিকট গয়ায় আকাশগঙ্গা পাহাড়ে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি যখন গয়া হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছিদ্রাশ্রমী নববিধান সমাজের কোনও ব্রাহ্ম বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, গৌসাই গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও কয়েকটি মাসহারার টাকার লোভে নিজকে গোপন করিয়া চলিতেছেন। নবকুমার বিশ্বাস

মহাশয়ের নিকট এই কথা শুনিয়াই ঠাকুর তাঁহার জিনিষ-পত্র স্থানান্তরিত করিলেন এবং সিটি কলেজগৃহে এক সভা আহ্বান করিয়া প্রচারকের কাজ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় পড়েন এবং কলিকাতা হইতে বাগ-আঁচড়ায় যাইয়া কিছুদিন নির্জন বাস করেন; পরে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের মতের বৈলক্ষ্য্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে তাঁহাদের প্রচারক-পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মতের অনৈক্যেতু তাহাও ছাড়িয়া ঢাকার এক্রামপুরে বাস করেন। এইরূপে নিঃসম্বল অবস্থায় কোনও দিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া একমাত্র ভগবানেই নির্ভর করিয়া তিনি বিচরণ করিতেন।

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে দীক্ষার পর তাঁহার গুরুদেবের আদেশে এই আকাশবৃষ্টি পূর্ণভাবে অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন।

দাদাগৌসাই : সাধুসেবা

প্রথম: এই আশ্রমের ভার দিদিমাতা ঠাকুরাণীর হাতে ছিল, তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত নানারূপ অভাবের অবস্থায় পড়িয়াও দক্ষতার সহিত খরচ চালাইতেছিলেন। অতঃপর শ্রীবন্দাবনে কিছুদিন শ্রীযুক্ত ভারত পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে এবং প্রয়াগে কুস্ত মেলায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের হাতে ভার ছিল। কলিকাতায় শীতারাম ঘোষের স্ট্রিটের বাসায় ঠাকুর মহাপুরুষদের অহরোধে উহা শ্রীযুক্ত দাদা যোগজীবন গৌসাইয়ের হাতে গ্রস্ত করেন।

পূর্বে যখন দিদিমাতা ঠাকুরাণীর হাতে ভার ছিল, তখন তিনি বিবেচনা পূর্বক খরচ করিতেন, অর্থও কম আসিত। দাদাগৌসাইয়ের হাতে খরচ দেওয়া অবধি শ্রোতের স্রায় অর্থাগম ও ব্যয় হইতে লাগিল। যেমন ঠাকুরের আকাশবৃষ্টি, তাঁহার ভাণ্ডার ভগবানের ভাণ্ডার। যাহা

আনে সমস্ত ভগবানের প্রদত্ত, ইহাতে ভগবৎ-আশ্রিত ব্যক্তিমাঝেই অধিকার। তদ্রূপ যিনি ভাণ্ডারী হইয়া এ ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার স্বাভাবিক অহৈতুকী বিশ্বজনীন প্রেম ও ভালবাসায়, সমস্ত অর্থ সাধারণের প্রয়োজনে অকাতরে ব্যয় হইতে লাগিল। বস্তুতঃ মহাপুরুষেরা উপযুক্ত পাত্রেরেই এই ভগবানের ভাণ্ডার মহেন্দ্রক্ষেপে অর্পণ করিয়াছিলেন।

৬প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী, ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। তাঁহার শারীরিক গঠন অনেকটা ঠাকুরের আয় ছিল। ঠাকুর আদর করিয়া ইহার নাম যোগজীবন রাখিয়াছিলেন। ইহার বাল্যাবধি সংস্কে ও সংশিক্ষা প্রভাবে অন্তর্নিহিত পৈত্রিক ধর্ম্মভাব অল্পবয়সেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যিনিই তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন, “এ তো দেবতা, ইনি সংসারের লোক নহেন।” সংসারের বিষয় ইনি বড় কিছু বুঝিতেন না। ঠাকুর মাঝে মাঝে দাদাগোঁসাইকে “তুই এ বিষয়ে কি বুঝিস ?” বলিয়া মৃদু ভৎসনা করিতেন।

ঠাকুরের নিকট বসিয়া দাদাগোঁসাই মাঝে মাঝে তাঁহার ভজন সাধন দর্শনাদি সম্বন্ধে গল্প করিতেন। যখন ঠাকুর ঢাকা প্রচারক আশ্রমে ছিলেন, তখন অতি অল্পবয়সে একদিন তিনি রাজা রামমোহন রায়ের দর্শন পান এবং ঠাকুরকে ইহা বলেন। ব্রাহ্ম প্রচারক নগেন্দ্রবাবুর সহিত একদিন এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

একদিন শুনিলাম, দাদাগোঁসাই ঠাকুরের নিকট বসিয়া বালতেছেন “সমুদ্রে স্নানে বাইতেছি, যাই মান্দিরের কোণে গিয়াছি অমনি শ্রীবন্দাবনে কেশীঘাট রাস্তা, গলি প্রভৃতি দৃষ্টিতে পড়িল; ময়ূরগুলি “কঁাকা” “কঁাকা” করিয়া ডাকিতেছে সেই ধ্বনি পরিষ্কার কানে শুনিলাম।”

ব্রহ্মচারীর মুখে শুনিলাম, একদিন সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটের বাসায় ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া দাদাগোঁসাই বলিলেন, “দেখ, আজ বঃ

মজা হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে খুব জ্বল ক'রে দিয়েছি।" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি? কি করেছিস?" দাদাগোঁসাই কহিলেন, "আসনে বসিয়া আছি, অসংখ্য ঋষি মুনির সহিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হইল। আমি প্রণাম করিতেই তিনি আমাকে বলিলেন, "আমার দর্শন বুখা হয় না, তুই বর প্রার্থনা কর।" আমি কহিলাম, "আমাকে ৫০ লক্ষ কোটা টাকা দেও। যেমনি এই কথা বলা শ্রীকৃষ্ণ অমনি উর্দ্ধ্বাশ্বাসে দোড়, আর ফিরেও তাকালেন না।" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "তুই ত বড় বোকা দেখছি! তুই প্রেম ভক্তি চাইতে পারুলি না?" দাদাগোঁসাই বলিলেন, "তুমি বোকা না আমি বোকা; ও জিনিষ আমি চাব কেন? ওত আমার হাতের মুঠে।" ঠাকুর গুনিয়া একটু হাসিলেন।

দাদাগোঁসাই পরের দুঃখ কিছুমাত্রও সহিতে পারিতেন না, দুঃখী কান্দালদিগকে যাহাতে অভয় দান করিতে পারেন তজ্জগুই এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ দাদাগোঁসাই, সাধন ভজন, চিত্তের উদারতা, অনাসক্তি, সর্বজীবে প্রীতি, অর্থাদিতে নির্লিপ্ততা, আন্তরিক্য বুদ্ধি, দয়া, সাধুসঙ্গে অপরিসীম ভক্তি ইত্যাদি বহুগুণে ভূষিত ছিলেন। একরূপ একাধারে বহুগুণ ইহাতে বর্তমান ছিল। এক সময়ে আমার সেবা অভিমান আসিয়াছিল। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, ঠাকুর আসনে বসিয়া বলিতেছেন, "যোগজীবনই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক।" অপর এক সময়ে একটি সাধু আসিয়াছিলেন; দাদাগোঁসাইএর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে 'দাতাদের' গল্প করিলেন। ঘটনাক্রমে আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দাদাগোঁসাইএর চোখ দিয়া দরদরধারে জল পড়িতেছে। তিনি কিছু পরে আমাকে বলিলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, সাধুদিগকে আমার গায়ের এক এক টুকরা মাংস কাটিয়া দেই।"

বাবা গম্ভীরনাথ ১৬১৭ জন সাধু সঙ্গে একবার পুরীতে আসেন ও পাণ্ডার বাড়ীতে থাকেন। দাদাগোঁসাই ইহা জানিতে পারিয়া বাবাকে বিশেষ অনুনয় করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্রমে আনেন এবং একশত টাকা ধার করিয়া আনিয়া সেবা করেন এবং বাকীতে রেশমী ও কাঠিয়া-বস্ত্র আনিয়া উহাদের মৰ্য্যাদা করেন। বাবাজী দাদাগোঁসাইর ব্যবহারে খুব প্রীত হইয়া ছয় দিন কাল আশ্রমে ছিলেন। একবার মহোৎসবের সময় দাদাগোঁসাই একটি গুরুভাইকে গোপনে বলিলেন, “আশ্রমস্থিত সকলের চরণামৃত লইয়া আইস।” পরে উহা সংগৃহীত হইলে তিনি উহা পান করেন।

তিনি অনেক সময় নিজের কন্ডলে শুইয়া পড়িয়া নিঝুমে নাদ করিতেন। তাঁহার ভিতরে বিলাসিতার নামমাত্রও ছিল না। পরিধানে সামান্য সাদা বস্ত্র ও কোঁপীন, গায়ে মোটা একখানা মাত্র চাদর, শয়নে একটা বালিশ ও দুই একখানা মাত্র কাল কন্ডল ছিল, অথচ অজস্র অর্থ ইহার হাত দিয়া ব্যয় হইত। টাকা পয়সা বাহা কিছু আসিত সমস্ত তিনি নিজ আসনের নীচে ফেলিয়া রাখিতেন। তাঁহার বাক্স সৰ্বদা খোলা থাকিত। যে বাহা কিছু প্রার্থনা করিত, নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবিচারে দিয়া দিতেন। ইহার চিত্তের উদাসীন দেখিলে মনে হইত, কলির কাঠিগ্র ও মলিনতা যেন পদদলিত করিয়া ইনি ভগবানের নাম করিতে করিতে চলিয়া যাইবেন।

পুরীতে দাদাগোঁসাই একদিন ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, “গুরুতে প্রেম জন্মে কি প্রকারে?” ঠাকুর বলিলেন, “মায়িক সম্বন্ধের গন্ধ থাকিতে তাহার আভাষও পাওয়া যায় না।” শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র একদিন কথোপকথনের সময়ে দাদাগোঁসাইকে বলিলেন, “তোমার ভিতর যে সমুদ্রের (শক্তির) ঢেউ খেলে যাচ্ছে দেখছি, দৈন্ত্য করুছ কেন?” তাহাতে

দাদাগোঁসাই হাসিয়া বলিলেন, “এমন অবস্থায়ই গুরু রেখেছেন, বুকের উপর দিয়া গাড়ী চলে গেলেও টের পাই না।” মহেন্দ্রবাবু আরও বলিলেন, হারিসন্ রোডের বাসায় ঋণ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে একদিন দাদাগোঁসাই বলিয়াছিলেন, “আমার বৃদ্ধ পিতা, এই লোকগুলি না থাকিলে থাকেন না, তিনি মুখ শুকাইয়া বসিয়া থাকিবেন, এ কি আমি দেখিতে পারি? এজন্য যত ঋণ পাব তত ঋণ করবো। এতে যদি আমার নরকস্থ হইতে হয়, তাও রাজি আছি।” ঠাকুর যখন হারিসন্ রোডের বাসায় ছিলেন, তখন দাদাগোঁসাইকে বলিয়াছিলেন, “দীক্ষা নেওয়ার অনুমতি চাহিয়া কেহ চিঠি লিখিলে তুই যে রূপ ইচ্ছা উত্তর দিস্ সেইরূপই হইবে।” প্রেমে উভয় আত্মা এক হইয়া যায়। একজনের মনোগত অভিপ্রায় অপরে টের পায়। ঠাকুরকে দাদাগোঁসাই ভালবাসিয়া ক্রুরূপ আপন করিয়া ফেলিয়াছিলেন উপরোক্ত ঘটনা তাহার নিদর্শন।

দাদাগোঁসাইএর জন্মকালে ব্রাহ্ম জালালমিয়া বলিয়াছিলেন, “একজন মহাপুরুষ জন্মাইতেছেন, সংকীৰ্ত্তন কর।”

শ্রামল শাঁর গল্প

দাদাগোঁসাই ঠাকুরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া মাঝে মাঝে সেবার নিমিত্ত কিছু কিছু ঋণ করিতেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “তোমার যে বিষয় আছে তাহা বিক্রয় করিলে যত টাকা শোধ হইতে পারে তত পর্য্যন্ত ঋণ করিতে পার।” ঠাকুর শেষকালে ভক্তমাল প্রভৃতি হইতে শ্রামল শাঁর গল্প পাঠ করিয়া দাদাগোঁসাইকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রামল শাঁ সাধুদের সেবার জগু পুনঃপুনঃ ঋণ করেন। পরে ঋণ শোধ করিতে না পারায় মহাজনেরা তাঁহার নামে টাকার ডিক্রি করেন এবং ঐ ডিক্রিজারী দিয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিবেন ঠিক করেন। যেদিন জারী দিবার কথা তৎপূৰ্ণ

রাত্রে একটি লোক মহাজনদের নিকট যাইয়া সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া আসেন। পরদিন মহাজনেরা শ্রামল শাঁকে বলিল যে, তাহার সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইয়াছে। শ্রামল শাঁ কাদিয়া বলিলেন, “তোমরাই ভাগ্যবান, তোমরা ভগবানকে দর্শন করিয়াছ।” দাদাগোঁসাই মনে করিতেন ঠাকুর তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই (ভবিষ্যতে ঐরূপ লক্ষ্য রাখিয়া চলিবার নিমিত্ত) উহা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। একবার শ্রীবৃন্দাবনে অর্ধ কুস্তুর সময় বাজার ধার করিয়া প্রায় ৪৫ হাজার টাকা দান করিয়া ছিলেন, দোকানদারেরা টাকার জন্য তাঁহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন ও উৎপীড়ন করিয়াছিলেন।

কুস্তুর বিদায় : কন্ম

জ্ঞানযাত্রার কয়েকদিন পরে আমার খুব জ্বর হইয়াছিল। ঠাকুর নিজেই ঔষধের ব্যবস্থা করেন; ঐ ঔষধ খাইয়া আমি অবিলম্বেই সুস্থ হই। কুস্তুর দেখিয়া তাহার মাতার সহিত বাড়ী চলিল। বাড়ী যাইবার কয়েকদিন পূর্বে কুস্তুর ও সতীশ রাত্রিতে একদিন ঠাকুরে পদসেবা করিতেছিল। তখন সতীশ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমার কি কন্ম আছে?” তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, “না, তোমার আর কন্ম নাই। তবে যদি তোমার মা কিছু অর্থ চান, তাহা হইলে তাঁহাকে কিছু অর্থ দিতে পারিলে ভাল হয়।”

অতঃপর কুস্তুর জিজ্ঞাসা করিল, “আমার কি কন্ম আছে?” তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, “তোমার অল্প কিছু কন্ম আছে। কন্ম থাকিতে যদি কোন উচ্চ অবস্থাও লাভ হয় তাহা বিড়ম্বনামাত্র। দেখ ভূতানন্দ স্বামী ও জগন্নাথদাস বাবাজী এত বড় লোক হইয়াও কন্ম থাকাতে তাঁহার কেমন জড়াইয়া পড়িয়াছেন। দেশে যাইয়া বেশ করিয়া বিষয়কন্ম দেখ

এখন এই তোমার কৰ্ম্ম । তাহা হইলে ঝাঁ করিয়া কৰ্ম্ম কাটিয়া যাইবে । সাধন ভজন অপেক্ষাও এখন ইহাতে তোমার অধিক কল্যাণ হইবে । এক সময়ে কুঞ্জ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “কি নিয়মে চলিব ?” ঠাকুর কহিলেন, “এখানে যেরূপ দেখছ ?”

কুঞ্জ যেদিন যাইবে, দেখিলাম ৯টা ১০টার সময় আসিয়া সে ঠাকুরের নিকট বিমৰ্ষভাবে বসিল । ঠাকুর তাহাকে খুব আদর করিয়া বলিলেন, “কুঞ্জ দেখতো আমার জটায় কি হইয়াছে । ইহাতে একটু কপূর দিতে পার ?” কুঞ্জ তাহাই করিল এবং বামপার্শ্বে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বাতাস করিতে লাগিল এবং নানা কথাবার্তা বলিতে লাগিল । কুঞ্জের সহিত ঠাকুরের এই শেষ দেখা । যাইবার দিন কুঞ্জের সহিত ঠাকুর এমনই ব্যবহার করিলেন যে, চিরজীবন আর ভুলিতে না পারে । মহাপ্রসাদ দেশে লওয়া সম্বন্ধে ঠাকুর বলিলেন, “মহাপ্রসাদ খুব পবিত্র-ভাবে নিতে হয়, যেন যবন-স্পর্শ না হয়, যবন-স্পর্শে উহার গুণ নষ্ট হয় । উহা গলায় বান্ধিয়া নিতে পারিলেই সৰ্ব্বাপেক্ষা ভাল । পূর্বে ভারী দ্বারা উহা দূরদেশে লওয়া হইত ।”

কুঞ্জের স্বপ্ন : মহাবীরের কুপা

শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রথম বখন কুঞ্জ রাধাকুণ্ডে যাইবে, তাহার কিছু পূর্বে রাত্রে স্বপ্ন দেখিল, ঠাকুর ইহাকে কোলে লইয়া আদর করিয়া রাধাকুণ্ড দেখাইতেছেন । রাধাকুণ্ডের একটি বৃক্ষ, ভাঙ্গা দেওয়াল প্রভৃতি বিশেষভাবে চক্ষে পড়িল । রাধাকুণ্ডে যাইয়া দর্শনে বাহির হইয়াছে, দেখিল ঠিক সেই বৃক্ষ, সেই ভাঙ্গা দেওয়াল, সেই বিচিত্র দৃশ্য । এই স্থানটি দাস গোস্বামী ও কবিরাজ গোস্বামীর সমাধিস্থান ছিল । একদিন কলিকাতায় আমার সহিত আমাদের বামাপুত্রের বাসায় বসিয়া কথাবার্তা

চলিতেছে, কুঞ্জ হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, “ঐ একটি সুন্দর মন্দির, আহা উহাতে গণেশ বসিয়া পাঠ করিতেছেন।” একটু পরে আবার বলিল, “একটি বালগোপাল আমার পানে তাকাইয়া হাসিয়া অন্তর্ধান হইল।”

কুঞ্জ একদিন কালীঘাটের নিকট এক বাসায় স্বপ্নে অল্পভব করিতে লাগিল—কে শক্তি সঞ্চার করিতেছে। তখনই জাগিয়া উঠিয়া বসিল এবং চক্ষু মুদিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, “কে দয়া করিয়া শক্তি সঞ্চার করিতেছেন, কৃপা করিয়া প্রকাশ ইউন।” প্রার্থনা করামাত্র চক্ষু মুদিয়া দেখিল—একটি হুয়ান কপিলবর্ণ ছ’ তিন হাত শূণ্ণে অবস্থিত, শরীর হইতে কাঞ্চনবর্ণ তেজ নির্গত হইতেছে। সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়াছে ও জিনিষ-পত্রও তৎসঙ্গে দৃষ্ট হইতে লাগিল। চক্ষু মুদিয়াও চন্দ্র মেলা অবস্থার ত্রায় সুন্দর দৃষ্ট হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বানরবধ প্রসঙ্গ

শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ

বানরবধের বিরুদ্ধে আন্দোলন

পূর্বে বলা হইয়াছে যে পুরী সহরের সম্ভ্রান্ত লোক সকল বানরবধ অশাস্ত্রীয় বলিয়া উহা বন্ধ করিবার জন্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট একথানা দরখাস্ত করেন। অমৃতবাজার, মিরার প্রভৃতি পত্রিকায়ও এই বিষয়ের আন্দোলনের নিমিত্ত 'তার' করা হইয়াছিল। এই পুণ্যক্ষেত্রে এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে শুনিয়া পত্রিকা সকল খুব তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। একে স্থানীয় উড়িষ্যাবাসী কর্মচারিগণের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালীদিগকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, তাহাতে আবার ইহাদের কার্যকলাপ সংবাদপত্রে উঠাইয়া আলোচনা করা হইতেছে, ইহা দেখিয়া এ দেশীয় মিউনিসিপ্যাল কমিসনারগণ ও কতক লোক ঠাকুরের প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিলেন। আমাদিগকে নির্ধ্যাতন করিবার জন্ত ভিতর ভিতর নানারূপ চেষ্টা চলিল। ইহারা সংবাদপত্রে ঠাকুরের নামে কুৎসা রটাইতে লাগিল—ঠাকুর একজন ভণ্ড সন্ন্যাসী, দোতলা বাড়ীতে থাকে, সঙ্গে স্ত্রীলোক আছে। এই সব প্রচার করিতে আরম্ভ করিল।

একদিন আমরা সমুদ্র-স্নান হইতে বাসায় আসিয়া শুনিলাম, একটা চোরের সহিত একটি হেড্ কনেষ্টবল আমাদের বাসায় আসিয়া চোরাই-

মাল অহুসন্ধান করিতে লাগিল। চোর বলিল, “এখানে জটিয়া বাবার নিকট আমি ঘটা রাখিয়া গিয়াছি।” পুলিশ জিজ্ঞাসা করিল, “জটিয়া বাবাকে?” চোর ব্রহ্মচারীর মাথায় জটা দেখিয়া তাহাকে দেখাইয়া বলিল, “ঐ জটিয়া বাবা, এরই নিকট আমি ঘটা রাখিয়াছিলাম।” কনেষ্টবল আর জিনিষপত্র অহুসন্ধান না করিয়াই তাহাকে কয়েক ঘা মারিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত পান্নালাল ঘোষ এই সময়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থানীয় লোকদের সহিত মিশিয়া কে কি বলে খবর সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরকে জানাইত। একজন উড়িয়া কমিসনার পান্নার নিকট বলিল, “অমৃতবাজার পত্রিকা আমাদিগকে Timid Urias (ভীক উড়িয়া) বলিয়া গালি দিয়াছে, আচ্ছা দেখিব কি করিয়া তোমরা বানর মারা বন্ধ কর। এদিকে চেয়ারম্যান সাহেব দরখাস্ত পড়িয়া বানর মারা শাস্ত্রসঙ্গত কি না এ বিষয়ে স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে ব্যবস্থা সংগ্রহার্থ, একমাসকাল বানর মারা বন্ধ রাখিলেন।

মন্দিরের গাত্রে পায়খানা ভঙ্গ

শ্রীমন্দিরের গায়ে পায়খানা হইতেছে শুনিয়া সংবাদপত্রওয়ালারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন, কমিসনার সকল ও চেয়ারম্যান সাহেব বেগতিক দেখিয়া শীঘ্র শীঘ্র সভা আহ্বান করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতে স্থির করিলেন। একদিন ভাইস্-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জগবন্ধু পট্টনায়ক মহাশয় ঠাকুরের নিকট আসিয়া বলিলেন, “আমরা শীঘ্রই পায়খানা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, এ বিষয়ে আপনারা আর আন্দোলন করিবেন না।”

চেয়ারম্যান সাহেব পায়খানা ভাঙ্গিবার পূর্বে স্থানীয় ভদ্রলোকদের আবেদন পত্রের যে উত্তর দেন তাহার নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Copy of Magistrate's order on the memorial of the inhabitants of the Puri town about removal of the latrine which is now being built touching the southern wall of the temple of Jagannath, Puri.

I have considered the memorial and need hardly say that I am in no way desirous of hurting the feeling or offending the religious prejudices of the Hindus. I ordered the privies to be constructed because the Superintendent of the temple neglected to take measures for the prevention of what was a real nuisance and danger to the health of the town. I should be glad to know if the memorialists have any suggestion to make as to the manner in which the present insanitary condition of the temple can least be remedied. Perhaps the construction of privies near the temple gate would meet the difficulty though I am inclined to doubt it. I await any proposals the memorialists may desire to make. Meanwhile I have ordered the construction of the privies to be suspended, I should be glad of a reply by the 26th.

Sd/- W. N. Delvinge

14. 9. 98.

বানরবধের বিরুদ্ধে পাতি সংগ্রহ

এক মাসের জন্ত বানর মারা বন্ধ হইল। এ বিষয়ে শাস্ত্রবিধি চেয়ার-
ম্যান সাহেব জানিতে চাহেন, এই মর্মে সংবাদপত্রসমূহে তার করা
হইল।

এই সময়ে স্থানীয় জেলা স্কুলের হেড্‌ পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরের সহিত
একদিন সন্ধ্যাকালে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি জাতিতে উড়িয়া
ব্রাহ্মণ। ঠাকুর বানর মারা শাস্ত্রসঙ্গত কিনা এ বিষয় উত্থাপন করিলে
তিনি বলিলেন, “আমাদের দেশে বানর ত দূরের কথা, আরম্ভলা মারিলে
পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।”

স্বামী দেবপ্রসাদ ও সতীশচন্দ্র বানর মারা বন্ধ করাইবার নিমিত্ত ধূ
খাটিতে লাগিলেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় মত বানর মারা অশাস্ত্রীয় ও
অন্যায় উল্লেখ করিয়া আরও বহুলোকের স্বাক্ষর সহ আর একখান
দরখাস্ত করা হইল। স্বামী দেবপ্রসাদ মঠে মঠে যাইয়া নাম সংগ্রহ
করিতে লাগিলেন। সতীশও বহু লোকের নাম স্বাক্ষর করাইলেন। এই
সময়ে স্বামী দেবপ্রসাদ একখানা অতি সুন্দর পাতি (সংস্কৃত ব্যবস্থাপত্র)
তৈয়ার করিলেন। উহাতে শাস্ত্র হইতে বানরবধ অন্যায় এইরূপে ব
যুক্তি ও প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। স্থানীয় পণ্ডিতেরা উহাতে তাঁহাদের নিজ
নিজ নাম স্বাক্ষর করিলেন। এইস্থানে গঙ্গামাতার মঠে, রাজগোপাল
মঠে, গোবর্দ্ধন মঠে ও অপরাপর মঠে স্বামীজি পণ্ডিতদিগের মত সংগ্রহ
করিলেন। গঙ্গামাতার মঠের একজন ভাল পণ্ডিত ঠাকুরের সহিত
সাক্ষাৎ করিলেন। বহু বহু সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর
করিলেন।

একদিন সতীশকে ঠাকুর কটকের উকিল হরিবল্লভ বাবুর নিকটে

পুরীতে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইলেন। হরিবল্লভ বনু মহাশয় সমগ্র উড়িষ্কার মধ্যে একজন সম্মানিত ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তাঁহার কথা সকলে একবাক্যে গ্রহণ করে। ঠাকুর উকিল ছোট হরিশবাবুকে ও ভাইস্-চেয়ারম্যান জগবন্ধু পট্টনায়ককে বলিয়া-কহিয়া এ কার্য্য করাইতে পারেন কি না, এই অভিপ্রায়ে সতীশকে হরিবল্লভবাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। হরিবল্লভবাবুও বানর বধ অগ্ণায় বলিয়া দুঃখ করিলেন এবং এইজন্ত ভাইস্-চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করিবেন বলিলেন। কিন্তু মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে কেন পায়খানা হইবে না তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সতীশ হরিবল্লভবাবুর সহিত অনেক যুক্তি-তর্ক করিলেন। তাঁহার যুক্তি এমন পরিষ্কার এবং সুন্দর হইল যে, হরিবল্লভবাবু তাঁহার উত্তর দিতে পারিলেন না।

বানরবধের পক্ষে পাতিসংগ্রহ

ইতিমধ্যে দুই তিনজন প্রসিদ্ধ কমিসনার বানর বধ করিতেই হইবে, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্থানীয় লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। উল্লিখিত কমিসনারগণ জেলা স্কুলের হেড্‌ পণ্ডিতকে ধরিলেন, “তোমার এ বিষয়ে পাতি করিতে হইবে।” তিনি ১৬ পৃষ্ঠা ভরিয়া বানরবধের যৌক্তিকতা দেখাইয়া এক পাতি তৈয়ার করিলেন এবং ঐ পাতি শনিবারে স্কুলগৃহে সকলের নিকটে পাঠ করা হইল। শুনলাম উহার ঐ পাতির বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিল। কমিসনারগণের মধ্যে বিশেষ কোন ব্যক্তি অগ্ণায় পণ্ডিতদিগের নাম ঐ পাতিতে স্বাক্ষর করাইতে ব্যস্ত হইলেন; ভাল পণ্ডিত না পাইয়া কয়েকজন ছাত্র পণ্ডিতের নাম স্বাক্ষর করাইয়া কমিসনারগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন পূর্বে এই হেড্‌ পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরের নিকট যাহা বলিয়া

গিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সকলেরই স্বরণ আছে। একদিন পুনরায় ইনি ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ঠাকুর স্থানীয় বড় বড় পণ্ডিত সকল স্বামিজীর পাতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া উহাতে তাঁহাকেও স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় অম্লানবদনে আজ্ঞা করিলেন, “এ বিষয়ে আয়ায় নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, যথার্থই বানরবধ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কিনা।” ঠাকুর সমস্ত শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুদিন পরে শুনিলাম ঐ পণ্ডিত মহাশয়ের ভাত্য হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে এবং পরিবারে নানা উৎপাত বিপদ-আপদ উপস্থিত হইয়াছে। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “ব্রাহ্মণকে উৎকট পাপের ফল আঁত ভোগ করিতে হয়।”

মিউনিসিপ্যাল সভায় বানরবধের প্রস্তাব গ্রহণ

স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিসনার। সতীশ একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বানর-বধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিধুবাবু তাঁহার যুক্তি-তর্কে সন্তুষ্ট হইয়া বানর মারার বিপক্ষে সভাস্থলে প্রতিবাদ করিবেন স্বীকার করিলেন। বিধুবাবু একজন ভাল উকিল, সজ্জন লোক ও জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি অতঃপর এই বিষয়ে আমাদের শাস্ত্র সংক্রান্ত যৌক্তিকতা শুনিতে ২৩ দিন আমাদের বাসায় আসেন এবং ঠাকুরের নিকট আশীর্বাদ যাক্রা করেন। ঠাকুর তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং বানরবধ নিবারণের চেষ্টা করিলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ পাইবেন বলিলেন। ইনি ভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে বানরদের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত দুটা কথা বলে, এখন আর কেহই ছিল না।

শ্রীমান সতীশচন্দ্রও ও বহু যত্ন করিয়া শাস্ত্র হইতে বানরবধ অসম্ভব

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৫১

ও অহিংসাই পরম ধর্ম এ সম্বন্ধে নানাবিধ বাক্য সংগ্রহ করিয়া এক পাতি তৈয়ার করিলেন। উহা খুব উত্তম হইল। ঠাকুর এই পাতি শুনিয়া খুব সুখী হইলেন এবং তাঁহাকে ‘তত্ত্ববাগীশ’ উপাধি দিলেন।

ইতিমধ্যে স্বামী দেবপ্রসাদ সমুদ্রে ডুবিয়া দেহত্যাগ করিলেন। ইহা শুনিয়া বানরবধের পক্ষীয় দল উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল, “মরিবে না? আমাদের বিরুদ্ধে চেষ্টা? দেখ ধর্ম আছে কি না?”

যেদিন বানর মারা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যৌক্তিকতা লইয়া আলোচনা হইবে তাহার পূর্বদিন বিধুবাবু আমাদের বাসায় আসেন। বিধুবাবুকে পুরীর প্রসিদ্ধ সাতজন পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত স্বামী দেবপ্রসাদের ব্যবস্থাপত্র, সতীশের শাস্ত্রোদ্ধৃত কথা সকল ও মহাভারতের অহিংসা সংক্রান্ত হরগৌরী সংবাদ সভাস্থলে পাঠ করিবার জন্ত দেওয়া হইল। বিধুবাবু কাছারীতে যাইবার সময় ঐ সকল সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং অত্যাশ্চর্য উকিলদিগকে দেখাইলেন। ভুলক্রমে দেবপ্রসাদের পাতি টেবিলের উপরে রাখিয়া, তিনি মোকদ্দমা করিতে যান। আসিয়া দেখেন কে উহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

যথাসময়ে সভা বসিল, জনৈক কমিশনার একদল লোকসহ সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। “এই স্থানীয় পণ্ডিত সকল বানরবধের পাতি দিয়াছেন” এই বলিয়া তিনি পুনরায় বানরবধের জন্ত প্রস্তাব করেন। যেই প্রস্তাব করা অমনি বিধুবাবু ছাড়া সকলেই একবাক্যে বানরমারা সম্বন্ধে বলিয়া প্রস্তাবে ভোট দিলেন। তৎপর দিবস যুক্তি প্রকরিয়া যে প্রকারে অতি সম্ভব বানর বংশ ধ্বংস করা যায় তাহার উপায় স্থির করিয়া চারি পাঁচজন শিকারীকে বানরবধের জন্ত নিয়োগ করা হইল। পুনরায় বানরের রক্তে পুরীধাম কলঙ্কিত হইতে লাগিল।

পুনরায় বানরবধ আরম্ভে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন

সতীশ বিধুবাবুর নিকট যাইয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া আসিল। মেঘরগণ তাড়াতাড়ি প্রস্তাব করিয়াই উহা নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছেন। বিধুবাবুকে একটি কথাও বলিতে দেন নাই। এই ঘটনা শুনিয়া আমরা সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ঠাকুরের আদেশক্রমে সমস্ত ঘটনা তার করিয়া ‘অমৃতবাজার’, ‘মিরার’, ‘বেঙ্গলী’, ‘বঙ্গবাসী’ প্রভৃতি পত্রিকায় পাঠান হইল। সমস্ত বঙ্গদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এ বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল।

যেদিন এক মাস বানরমারা বন্ধ থাকার পরে পুনরায় মিউনিসিপ্যালিটি বানর মারিতে আরম্ভ করিল, সেদিন এক শোকাবহ ঘটনা ঘটিল। আদি ১১টার সময় বাহির হইতে আসিয়া দেখিলাম কতকগুলি বানর ঠাকুরের দক্ষিণপার্শ্বে সতরঞ্চির উপর বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছে। ছানাগুলিতে ছাড়িয়া দিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরও স্নানমুখে বসিয়া আছেন। বানরগুলি কোথাও স্থান পাইতেছে না; বানর বধ চলিতেছে তাই কোথাও উহারা লুকাইয়া রক্ষা পাইতেছে না। তাড়াইলেও আজ ইহারা বাহির হইতেছে না, আহার দিলেও খায় না। শিকারীরা বাহির হইতে ঠাকুরকে দেখাইয়া বন্দুক লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দিকে ধরিতে লাগিল।

একদিন আমাদের বাসার উপরের চালায় একটা বানরকে গুলি করিয়া মারিল, রক্তে রক্তাকার। কোলের বাচ্ছাটিগুচ্ছ গুলিতে মরিয়াছে। ঠাকুর মর্মান্তিক ক্লেশ পাইলেন এবং বাসার ভিতরে গুলি করা কে আইনী, এরূপ যেন আর না হয়, তজ্জন্ত দরখাস্ত করিতে বলিলেন।

নানা স্থানে সভা করিয়া বানরবধ অস্ত্রায় ও অশাস্ত্রীয় এই মর্মে ছোট

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৫৩

লাটের নিকট আবেদন হইতে লাগিল। কাশী হইতে পণ্ডিতগণ সভা করিয়া ছোটলাটকে জানাইলেন, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ঐ সভার একজন উদ্যোগী ছিলেন। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ও পণ্ডিতদিগের এক সভা করাইয়া ঐরূপ আবেদন করাইলেন। মাদ্রাজ হইতে, কলিকাতা হইতে, ও অত্যাশ্চর্য বহু স্থান হইতে ঐরূপ আবেদন পুরীতে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট করা হইল।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় উহাদের এই কার্যের জন্ত মিষ্টভাবে তিরস্কার করিয়া সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাম্পদ নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় 'মিরার' পত্রিকায় লিখিলেন, 'অমৃতবাজার' ও অত্যাশ্চর্য অনেক পত্রিকায় ইহার অর্থোক্তিকতা দেখাইয়া প্রবন্ধ লেখা হইতে লাগিল। এই বিষয়ে 'ষ্ট্রেটসম্যান' পত্রিকায়ও প্রবন্ধ চলিল। অপর পক্ষও ঠাকুরকে গালি দিয়া পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে আমাদের গুরুভ্রাতা 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এম.এ., বি.এল.) কলিকাতা হইতে বানরবধের অর্থোক্তিকতা দেখাইয়া পণ্ডিত সকলের স্বাক্ষরসহ পাতি পাঠাইলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত আর একখানা পাতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার ছাপাইয়া পাঠাইলেন। তিনি উপরি-উক্ত পণ্ডিতদের মতসহ আরও বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পাতি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া পুরীর মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং আমাদিগকে তাহার দুই চারি খণ্ড প্রেরণ করিলেন। ঐ গ্রন্থখানায় বহু দেশ ও নানা স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের মত ছিল। সকলেই একবাক্যে ইহার অর্থোক্তিকতা দেখাইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে গুরুভ্রাতৃগণ

১৫৪

আচার্য-প্রসঙ্গ

নানা স্থানে থাকিয়া পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।
কটক হইতে জেলা স্কুলের হেড পণ্ডিত এবং তথাকার গভর্ণমেন্ট
কলেজের অধ্যক্ষ ও সংস্কৃত অধ্যাপকের স্বাক্ষরযুক্ত ব্যবস্থাপত্র গুরুত্বাভি-
প্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন।

ছোটলাটের আদেশে বানরবধ বন্ধ

বঙ্গবাসী পত্র তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল।
বঙ্গবাসী বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আদৃত। ছোটলাট সাহেব এইরূপ নানা স্থানে
ভয়ানক আন্দোলন দেখিয়া কটকের কমিশনার সাহেবের নিকট তৎক্ষণাৎ
বানরবধ বন্ধ করিতে তার করেন। কমিশনার সাহেব এরূপ আদেশ
পুরীতে মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতির নিকট পাঠাইলেন, বানরবধ
এইরূপে বন্ধ হইল। ছোটলাট উডবার্ণ (Sir John Woodburn)
সাহেবের আদেশে পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে
নিম্নলিখিত চিঠি পাঠাইয়াছিলেন :—

No. 2000

PURI MAGISTRACY

The 4th November, 1898.

(১৯শে কার্তিক, ১৩০৫ সাল)

From the Magistrate of Puri.

To

The Chairman, Puri Municipality, Puri.

Sir,

With reference to para 1 of your No. 269 of the 15th
October last, I have the honour to state that L. G.
has directed that monkey killing should be stopped.

I have &c.

Sd/- Offy. Magistrate, Puri

ছোটলাটের পুরী আগমন

যখন উড্ড্বার্ণ সাহেব পুরী আসেন তখন ষ্টেশনে সম্ভ্রান্ত লোকদের নিকট বলিয়াছিলেন, “দেখুন, আমি যখন অযোধ্যার কালেক্টার ছিলাম তখন একদিন একটা বানর মারি, উহার মৃত্যুকালীন অবস্থা দর্শনে আমি এতদূর মর্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াছিলাম যে, তিন বৎসর পর্য্যন্ত উহা ভুলিতে পারি নাই। আমি তখনই প্রতিজ্ঞা করি আর কদাচ বানরবধ করিব না। এই স্থানের বানরবধ লইয়া বহু আন্দোলন হইয়াছে। সকলেরই ইচ্ছা বানরমারা বন্ধ হউক।”

পরদিন সকালবেলা যখন ছোটলাট সাহেব হাতীতে চড়িয়া শ্রীমন্দির দর্শন করিতেছিলেন তখন কতকগুলি লোক “মাকর মার”, “মাকর মার” (বানর মার) বলিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে চীৎকার করিতে লাগিল। পরে শুনিলাম বিরুদ্ধ দলের কর্তৃপক্ষদিগের কেহ কেহ পয়সা দিয়া লোক ভাড়া করিয়া একরূপ করাইয়াছিলেন। একজন সম্ভ্রান্ত লোককে মন্দিরের পশ্চিমের দরজায় ছোটলাট জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, বানরমারা উচিত?” ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন ‘না’। তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন “সাদ্ধা বলিয়াছ।” এইরূপে এই পুণ্যভূমি শ্রীক্ষেত্রে বানরবধ বন্ধ হইল।

ছোটলাটকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দান

উড্ড্বার্ণ সাহেব পুরীতে আসিয়া কালেক্টার সাহেবের বাড়ীতে ছিলেন। এই সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের কয়েকজন পাণ্ডা ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিলেন, “উড্ড্বার্ণ সাহেব অতি সৎলোক, তিনি বানরমারা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ তিনি

রাজপ্রতিনিধি, তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভাল ভাল মিষ্টি মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীমালা উপহার দেওয়া আপনাদের কর্তব্য।”

ইহা শুনিয়া কয়েকজন পাণ্ডা প্রসাদী মালা ও মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দিয়া আসিলেন। উড্‌বার্ণ সাহেব উহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া খুব আদরে গ্রহণ করিলেন এবং পাণ্ডাদের নাম লিখিয়া নিলেন। তাঁহাদিগকে বলিলেন, “আপনাদিগের কোন দরকার হইলে আমাকে জানাইবেন।” পাণ্ডারা পরদিন ঠাকুরের নিকট আসিয়া একথা বলিলেন। ঠাকুর আমাদিগের নিকট বলিলেন, “উড্‌বার্ণ সাহেব তাঁহার পুণ্যক্ষেত্রে এখন এই ভারতবর্ষে জন্মিবার অধিকার পাইলেন।” উড্‌বার্ণ সাহেব কিছুদিন পরে বঙ্গোপসাগরে আমাশয় রোগে জাহাজে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

ঠাকুরের জন্মোৎসব

ঝুলন পূর্ণিমা

১৮ই আষাঢ়, ঝুলন পূর্ণিমা। আজ ঠাকুরের জন্মতিথি। শ্রীযুক্তা দিদিমাতা ঠাকুরানী, দাদাগোঁসাই, বিধুভূষণ ঘোষ ও অগ্রাণ্ড গুরু-ভ্রাতাগণের ইচ্ছা হইল খুব উত্তমরূপে ঠাকুরের জন্মোৎসব করেন। ঠাকুরকে এ বিষয়ে জানান হইল। ঠাকুর বলিলেন, “তোমরা যদি কাদালীদিগকে ভাল করিয়া আহার করাইতে পার তবে আমি বড় প্রীত হই।” দাদাগোঁসাই টাকার জন্ত ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। বিধু ঘোষ বলিলেন, “আমি তোমাকে এই উৎসবের সমস্ত খরচ দিব, আমি ভার লইলাম।” দাদাগোঁসাই চারি পাঁচশত টাকা ব্যয় করিয়া কাদালীদিগকে উত্তমরূপে কানিকা, পিঠা, দধি ও নানারূপ উৎকৃষ্ট প্রসাদ আনিয়া ভোজন করাইলেন। অল্প কয়েকজন ব্রাহ্মণও ভোজন করিলেন। ঠাকুর কানিকার গন্ধ পাইয়া বলিলেন, আজ যথার্থই জগন্নাথদেব ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। দেখ, কানিকা হইতে কি আশ্চর্য্য সুগন্ধ নির্গত হইতেছে।” কাদালী সকল পরিপূর্ণভাবে উত্তম উত্তম প্রসাদ পাইয়া “জটিয়া বাবার জয়” বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। উহারা বলিতে লাগিল আমরাদিগকে আদর করিয়া ভাল ভাল প্রসাদ দ্বারা কেহ কোন দিন খাওয়ায় নাই। কত জম্বুর রাজা আসিল, এমন কেহ করবে না।”

আমের দিনেও খুব উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আম কান্দালীদিগকে আকাজ্জ-পূর্ণ করিয়া খাওয়াছিলেন।

জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

এবার ২৫শে শ্রাবণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথি, পরদিন নন্দোৎসব।

এই নন্দোৎসবের দিন প্রায় ২টার সময় ভূতানন্দ স্বামী, স্থানীয় একটি ৭।৮ বৎসরের “আকড়াপিলা” (নর্তক বালক) নিয়া আসিলেন। ঐ আকড়াপিলাটি ঠাকুর ও ভূতানন্দ স্বামীর নিকট নৃত্য ও গান করিতে লাগিল। ঠাকুর এই সময়ে দধি-হরিদ্রা-জলে নিশ্চিত করাইয়া আনাইলেন এবং গৃহের ভিতর একে অস্ত্রের অঙ্গে আনন্দ সহকারে নিক্ষেপ করিয়া বেশ উৎসব করিলেন। আকড়াপিলাকে ৫ টাকা দেওয়াইলেন। স্বামী দেবপ্রসাদ খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন এবং উৎসব শেষ হইতে নিজের গাত্রবস্ত্র দ্বারা ঠাকুরের গৃহ মার্জনা করিয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করিলেন।

দয়ালনিধি পূজারী অপর পাঁচজন পূজারী পাণ্ডা সহ আসিয়া ঠাকুরের জন্মাষ্টমীর সময়ে সুবর্ণপাতে অঙ্কিত যে বালক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীমন্দির পূজা হইয়াছিল, তাহা ও তৎসহ একখণ্ড গোলাকার রৌপ্যপাতে অঙ্কিত বিগ্রহ আনিয়া ঠাকুরের হাতে দিয়া বলিলেন, “ইহা সকলে পায় না, আপনাকে সুযোগ্য পাত্র জানিয়া দিলাম, প্রতিদিন পূজা করিবেন।” ঠাকুর উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং ছয়জন পাণ্ডাকে ১৬।১৭ টাকা এক একখান রেশমী বস্ত্র সম্মান সহকারে প্রদান করিলেন। এই সময়ে হইতে ঠাকুর সচন্দন তুলসীমঞ্জরী ঐ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির চরণে অর্পণ করিতে এবং অমরা কুন্দ ফুল দ্বারা উহা সুন্দররূপে সাজাইতেন।

হরিদাস ঠাকুরের উৎসব

১৫ই ভাদ্র ১৩০৫ সাল, আজ শ্রীশ্রী হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব দিন।

জগন্নাথ বল্লভ মঠের একজন বৈষ্ণব, নাম 'রায় মহাশয়' হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব উপলক্ষে বিগ্রহাদির বস্ত্র ও একখানা চন্দ্রাতপ প্রস্তুতের জন্ত কাপড় প্রার্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থানের কণ্টকপূর্ণ আগাছাদি কাটাইয়া পরিকার করাইতে ইতিপূর্বে তিনি আরও ২১৩ বার কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ প্রাতে ৮৯টার সময় গোবিন্দ দাস বাবাজী ৫৬ জন বাবাজী সহ সংকীর্্তন করিতে করিতে ঠাকুরের আসনঘরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর কীর্্তন শুনিয়াই 'হরিধ্বনি' করিয়া আসন হইতে উঠিয়া বিদ্যুৎবেগে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সমুদ্রের ঢেউয়ে তিনি দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার চলিতে খুব ক্লেশ হইত কিন্তু সংকীর্্তনকালে তিনি স্বাভাবিক মাত্রায়ই মত নৃত্য করিলেন। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব শক্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, অমৃত, শ্রীধর, বিধু ও সরলনাথও নৃত্য করিলেন। ঠাকুর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল নৃত্য করিয়া গলার ফুলমালা গোবিন্দ দাসকে পরাইয়া অবসর হইয়া আসনে বসিয়া পড়িলেন।

গোবিন্দ দাস ঠাকুরকে বলিলেন, "অন্ত শ্রীশ্রী হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাবের দিন, ভুবনপাবন হরিদাস ঠাকুর," এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

একটু পরে ঠাকুর, দাদাগোঁসাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "হরিদাস ঠাকুরের উৎসবে যা পার দাও। তিনি ৫ টাকা দিলেন। বাবাজীরা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীধরকে বলিলেন, "এই ছেলেটিকে

(দ্বারিক দাসকে) সঙ্গে নিয়া তুমি হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবে যাইবে ।” দ্বারিকদাস বাবাজী, ঠাকুরের কৃপা লাভের নিমিত্ত উৎকর্ষিত হইয়া ৪৫ দিন হইল আশ্রমে আসিয়া, জগন্নাথ বল্লভ মঠে আছেন, ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে দেখনা আমি ধৈর্য্য ধরিয়া এখন নৃত্য না করিতাম তাহা হইলে এতদূর কষ্ট পাইতে হইত না ।”

উপদেশ সংগ্রহ

“উপদেশ সংগ্রহ” নাম দিয়া ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত “বক্তৃতা উপদেশ” নামে গ্রন্থ ঠাকুরের অভিপ্রায় মত প্রকাশিত হয় । গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ ও রেবতীমোহন সেন এবং উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় যত্ন পূর্বক সংশোধন করিয়া ছাপাইয়া পুরীতে পাঠাইয়াছিলেন । ঠাকুর উহা পাইবামাত্র খুব আনন্দ করিলেন এবং আসনের পার্শ্বে নিত্য পুজি গ্রন্থের মধ্যে রাখিয়া দিলেন । কিছুদিন পরে উহা মুন্সেফ কিশোরীবাড়ী নিত্য পাঠের নিমিত্ত সাদরে প্রদান করিলেন । গ্রন্থখানা পাঠ করি কোন কোন গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে বলিলেন যে সংশোধনের সময় বক্তৃতার পরিবর্তন করা হইয়াছে । যেমন যে স্থানে চারিবার “মা”, “ধনি” করিয়াছেন সে স্থানে দুইবার দেওয়া হইয়াছে । ঠাকুর বলিলেন, “বক্তৃতার সময় যাহা কিছু বলা যায় তাহা আবেশে, ঐন্দ্রিয় অপরিবর্তনীয়, তোমরা পূর্বের সংস্করণই পাঠ করিও ।” পরবর্তী যখন ছাপা হইবে তখন বক্তৃতার অংশ পূর্ববৎ ঠিক ঠিক রাখিতে হইবে ।”

ব্রাহ্মসমাজে যখন তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তখন ঐ প্রদেয় শ্রামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন

ঠাকুরজী, মগ্নধনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্যারীবাবু লিখিয়াছিলেন, পরে উহা পুনরায় ঠাকুরকে শুনাইয়া সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

মনোরঞ্জনবাবুর এমন শক্তি ছিল যে, তিনি কথাগুলি অবিকল লিখিয়া যাইতে পারিতেন।

অমৃতের স্ত্রীর সদগতি

এই সময়ে শ্রীমান অমৃতের উপর তাহার স্ত্রীর পিণ্ডদান করিতে গয়ায় যাইতে ঠাকুরের অহুমতি হইল। অমৃতের স্ত্রীর অপমৃত্যু ঘটয়াছিল। ইনি স্বপ্নাবস্থায় ঠাকুরের নিকট মন্ত্র পাইয়াছিলেন। হারিসন রোডের বাসায় এই ঘটনা ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এক বৎসর অতীত হইলে আমাকে পুনরায় বলিও। অমৃতের নিকট শুনিলাম ঠাকুরের নিকট পুনরায় এ বিষয় নিবেদন করিলে ঠাকুর তাঁহাকে বিমলাদেবীর একটি বিশেষ নাম বলিয়াছিলেন এবং কহিলেন তুমি বিমলামায়ীর মন্দিরে যাইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তোমার স্ত্রীর কল্যাণ কামনায় এই মন্ত্র জপ করিবে। অমৃত তাহাই করিল। এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু-জনিত শোক তিরোহিত হইয়া গেল এবং প্রাণে শান্তি ও আরাম আসিল। ঠাকুরের নিকট ইহা নিবেদন করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “তোমার স্ত্রী শান্তিলাভ করিয়াছেন আর কিছু করার দরকার নাই। তোমার মন্ত্রজপকালে বিমলামায়ী তোমার স্ত্রীকে আনিয়া শান্তি দিয়াছেন, তথাপি গয়ায় যাইয়া পিণ্ড দিবে। শাস্ত্র ও ঋষি মুনিদের বাক্যে মর্যাদা করিলে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ হয়।”

এই সময়ে ঢাকার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুত চারুচন্দ্র দাস, দাদাগোঁসাইকে লিখিলেন “প্রতিদিন দুই প্রহরের সময় আমার মনে হয় যে আমি শীঘ্র মরিয়া যাইব। একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, আমি ১৫ই জাহ্নুয়ারী দেহত্যাগ

করিব। আপনি এ সকল ঠাকুরকে নিবেদন করিবেন এবং তিনি কি বলেন জানাইবেন। আমার চিত্ত এই ঘটনা লইয়া বড়ই অস্থির হইয়াছে। দাদাগোঁসাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে এক সপ্তাহকাল প্রতিদিন যেন একটি সং ব্রাহ্মণ দ্বারা মহাতারত পাঠ শুনে এবং এক হাজার তুলসীপত্র যেন শালগ্রামে সমর্পণ করা হয়।

মর্যাদা লঙ্ঘনে ঠাকুরের বিরক্তি

একদিন আমাদের তীর্থঙ্কর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া প্রসাদী তুলসী দিতে আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্ত পৃথক আসন প্রদান করেন। হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া মহাশয় উহাতে উপবেশন করিলে উহার গোমস্তা ভুবন ছড়িদারও যাইয়া ঐ আসনে বসে। এই মর্যাদা লঙ্ঘন দর্শন করিয়া ঠাকুর ভুবন ছড়িদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি ব্রাহ্মণ? তুমি পাণ্ডার আসনে বসিলে কেন?” ছড়িদার বলিল, “আমি শূদ্র।” ঠাকুর ইহা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তখনই উহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

স্বামিজীর দেহত্যাগ ও সমাধি

স্বামী দেবপ্রসাদ

স্বামী দেবপ্রসাদ ২১শে ভাদ্র সোমবার পঞ্চমী তিথিতে সমুদ্র-স্নানে যাইয়া, প্রায় আটটার সময়ে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

ব্রহ্মচারী ও স্বামিজী তীরের দিকে পেছন করিয়া স্নান করিতে-
ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা একটু দূরে গিয়া পড়িলেন। হঠাৎ জোয়ার
আসিল এবং একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া তাঁহাদিগকে ভাসাইয়া
লইয়া গেল, আর থাই পাইলেন না। তীরের দিকে চাহিয়া দেখেন
অনেক দূরে যাইয়া পড়িয়াছেন। তখন প্রাণপণে ফিরিবার চেষ্টা করিতে
লাগিলেন। স্বামিজীকে চক্রতীর্থের দিকে এবং ব্রহ্মচারীকে হরিদাসের
সমাধির দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। ব্রহ্মচারী অনেক কষ্ট করিয়াও
তীরে আসিতে না পারিয়া অবশেষে শরীর ভাসাইয়া দেওয়াতে ক্রমে
ক্রমে ঢেউয়ে ঢেউয়ে তীরে আসিয়া উঠিলেন। কিন্তু স্বামিজী আর
আসিতে পারিলেন না। কতবার জন হইতে হাত তুলিয়া তুলিয়া
দেখাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিল, “শেষকালে ‘জয়গুরু’, ‘জয়গুরু’, ‘জয়গুরু’ বলিয়া
তিনবার লক্ষ দিয়া অদৃশ্য হইলেন। তিনি সমুদ্রের ঢেউয়ের সহিত
লড়াই করিতে করিতে ডুবিয়া গেলেন।”

যোগজীবনদাদাকে ডাকিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শুনিতে পান নাই
এবং প্রথমে স্বামিজীর বিপদাপন্ন অবস্থাও বুঝিতে পারেন নাই। পরে

বুঝিতে পারিয়া, অমৃতবাবুকে ‘জ্যে’ প্রভৃতি ডাকিতে পাঠাইলেন। স্বামিজী এত দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন যে, জ্যেলে ভিন্ন আর কাহারও সে স্থানে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। জ্যেলেরা আসিয়াও টাকা পাইবে না ভয়ে প্রথমে নামিতে চাহিল না, পরে গিয়া তাঁহার মৃতদেহ সমুদ্র হইতে টানিয়া তুলিল।

প্রাতঃকালে ঠাকুর পাথরখানায় আছেন এমন সময় অমৃত সমুদ্র হইতে আসিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিল, “সমুদ্র ব্রহ্মচারী ও স্বামিজীকে ভাসাইয়া নিয়াছে। ব্রহ্মচারী উঠিয়াছে। স্বামিজীকে পাওয়া বাইতেছে না। জ্যেলে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে।” বিধুভূষণ ঘোষ শুনিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। ইতিমধ্যে দিদিমাতা আসিয়া বলিলেন, “এখন আর নাই, তবে শরীর গরম আছে, বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।” পরক্ষণেই বে আসিয়া বলিল, “স্বামিজী আর নাই। আগাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।” শুনিয়া ঠাকুর নিজেকে সামলাইতে লাগিলেন কিন্তু যেই জগবন্ধু বলিলেন, “স্বামিজী আর নাই।” অমনি তিনি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কঁাদিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই আত্ম-সম্বরণ করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্ত ধরা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের নির্দেশ মত জগবন্ধুবাবু ভূতানন্দ স্বামীর নিকট বাইয়া জানিয়া আসিলেন, স্বামিজীকে সমাধি দিতে হইবে। কপালে “নমঃ শিবায়ঃ” লিখিয়া সমাধির উপরে গোবরের শিব স্থাপন পূর্বক গুলা করিয়া আসিতে হইবে। জগবন্ধুবাবু, সরলনাথ, অমৃত, অশ্বিনী এবং আমি ক্রমে ক্রমে বাইয়া সমুদ্রের পাড়ে উপস্থিত হইলাম। দারোয়ান কিছু দড়ি ও পাঁচ সিকার লবণ মুকুন্দ চাকরের মাথায় দিয়া অনেকক্ষণ পরে তথায় পৌঁছিল। স্বামিজীর মৃতদেহ ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও স্পর্শ করিতে নাই। ভূতানন্দ স্বামী বলিলেন, “এখানে যাহারা আছেন সকলেই

ব্রাহ্মণ। আপনারা সকলেই শব স্পর্শ করিতে পারেন।” সমুদ্রতীরে
 বাইয়া স্বামিজীর মৃতদেহ বালির উপর পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলাম।
 মুখে স্থির ও গম্ভীর ভাব বিরাজ করিতেছে। কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই।
 তাঁহার মাথা মন্দিরের দিকে, পা সমুদ্রের দিকে, দেহ চিৎভাবে শয়ান।
 অদূরে পরিধেয় গৈরিক বস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে। স্নানান্তে উহা পরিবেন।
 মনে হইল পা ধরিয়া বাঁকাইয়া চেঁচা করিয়া দেখি, বাঁচেন কি না।
 গুনিলাম ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন দেহে আর প্রাণ নাই। এমনই
 শরীর অবিকৃত রহিয়াছে যে ঐ কথাও বিশ্বাস হইতে চায় না। কতক্ষণ
 পরে শরীর বিকৃত হইতে আরম্ভ হইল। রক্ত দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া হইয়া
 উঠিল। পুলিশ ইনস্পেক্টর আসিয়া শব পর্যবেক্ষণ করিয়া অত্মমতি
 দিলেন, মঙ্গলাঘাটে নিয়া সমাধি দাও। অনেক চেঁচার পরে শব মঙ্গলা-
 ঘাটে লইয়া চলিলাম। সরলনাথ গাড়ী আনিতে গেল, পাইল না! বাঁশ
 পাওয়া যায় না। নিকটে সমাধি হইতে দুইটি পুরাতন বাঁশ লইয়া বাঁধিয়া
 কাঁধে লইয়া চলিলাম। জগবন্ধুবাবু কিছুক্ষণ থাকিয়া লোক সংগ্রহার্থ
 বাসায় গেলেন। দারোয়ান, অমৃত, সরলনাথ, অশ্বিনী ও আমি বহিয়া
 লইয়া চলিলাম। বহুক্লেশে অনেকক্ষণে মঙ্গলাঘাটে আসিলাম। ডোম
 দ্বারা গর্ত খনন করা হইল। বিধুবাবু, বড় ললিত, ছোট ললিত প্রভৃতি
 এই সময় আসিলেন। স্বামিজীর কমণ্ডলুতে জল আনিয়া শব স্নান করান
 হইল। অতঃপর কপালে “ও নম শিবায়ঃ” এবং উহার উপরে ৬ চিহ্ন
 বিভূতি দ্বারা লিখিলাম। শব গর্তে স্থাপন পূর্বক কমণ্ডলু রাখিয়া বালি
 দেওয়া হইল। উপরে স্তূপ করিয়া বালি রাখা হইল। গোবরের শিবলিঙ্গ
 উহার উপরে স্থাপন করিয়া বিষপত্র ও ফুল দিয়া পূজা করিলাম এবং
 তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া নমস্কার করিলাম। শিবের মাথায়
 অশ্বিনীও ফুল বিষপত্র দিল। এইরূপে স্বামিজীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধার

পর মার্কণ্ডেয় সরোবরে স্নান করিয়া বাসায় ফিরিলাম। স্বামিজীর দেহ-
ত্যাগের ত্রয়োদশ দিনে ত্রিশটি লোককে মহাপ্রসাদ, ডাল ও পয়সা দেওয়া
হয়। স্বামিজীর জন্ত এই আমাদের শেষ কার্য।

স্বামিজীর সদগতি

দেহত্যাগের পূর্বরাত্রে স্বামিজীর নিদ্রা হয় নাই। সংস্কৃতে ভজ্ঞনাবলী
গান করিয়া রাত্রি কাটাইয়া ছিলেন। ইহার দুই চারিদিন পূর্ন
হইতেই স্বামিজীর একটা উদাস ও চঞ্চলভাব দেখা গিয়াছিল। “আমার
আর এ স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হয় না, কোথায়ই বা যাই?” এ সকল
কথা পুনঃপুনঃ বলিতেন। অশ্বিনী বলিল, “স্নানের পূর্বে স্বামিজী চুপ
করিয়া সমুদ্রের পাড়ে স্থিরভাবে চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিলেন। আমি
তাঁহাকে বলিলাম, “স্বামিজী, এভাবে রহিলেন কেন? স্নান করিবেন
না?” স্বামিজী বলিলেন, “আমার আর উঠিয়া স্নান করিতে ইচ্ছা হয় না,
এ স্থানে বড় আরাম লাগিতেছে। কাণের কাছে থিয়েটারের কনসার্টের
শ্রাব্য মধুর রাগ রাগিণী সমন্বিত গান শুনিতেছি।” আমি বলিলাম,
“শরীর দুর্বল ও বায়ু প্রবল হইলে কাণের কাছে এইরূপ আওয়াজ হয়।”
স্বামিজী বলিলেন, “তা নয়, অতি স্নমধুর শব্দ, আমার উঠিতে ইচ্ছা হয়
না। একটু পরেই স্নান করিব।” ঠাকুর এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,
“শাস্ত্রে আছে যে যোগী সন্ন্যাসীদিগের মৃত্যুকালে স্বর্গ-বিদ্যাদায়ী, কিম্ব
প্রভৃতির নৃত্যগীত করিয়া আনন্দ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এসব
শুনিতে শুনিতে চলিয়া যান। এই ঘটনা যে আকস্মিক নহে ইহাই
তাঁহার প্রমাণ। ইনি পরম পদ লাভ করিয়াছেন।”

স্বামিজীর দেহত্যাগের পর ঠাকুর একদিন বলিলেন, “পুরুষোত্তম-
ক্ষেত্রে এইরূপ সমুদ্র যাহাকে নিজে টানিয়া লইয়া যায় তাঁহার আর ভয়

অষ্টম অধ্যায়

১৬৭

হয় না। স্বামিজীকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। তিনি একেবারে বিরজা পার হইয়া গিয়াছেন। তিনি বাস্তবিক ক্ষেত্রবাসী এবং জগন্নাথদেবের সহচর হইয়া থাকিলেন। তাঁহার নির্মাণ মুক্তিনাভ হইয়াছে। তাঁহার বাসনা কামনা সমুদায় পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সমুদায় কৰ্ম ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল। নির্মাণের অবস্থাই তাঁহার হইয়াছিল। ভগবান তাঁহাকে এই উপায়ে লইয়া গেলেন।” যোগজীবনদাদা বলিলেন, “এইরূপ নির্মাণ অবস্থা লাভই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। বৌদ্ধ নির্মাণের কথা তিনি অনেক সময় বলিতেন।” ঠাকুর বলিলেন, “স্বামিজীকে যে দিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, মহাপ্রভুকেও ঐ দিকেই লইয়া গিয়াছিল। তিনি সমাধিস্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। জলে পড়িলে কুস্তক করিয়া থাকিতে পারিলে রক্ষা পাওয়া যায়। তাহা হইলে শরীর ভাসাইয়া রাখে, পেটেও জল ঢোকে না। বোধ হয় এ দু’জনের সমুদ্রে ডোবার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।” ব্রহ্মচারী বলিলেন, “স্বামিজী শেষ সময়ে তিনবার ‘জয় গুরু’ বলিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিলেন; পরে ডুবিয়া গেলেন।” যোগজীবনদাদা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তখন কি তুমি সেখানে গিয়াছিলে?” ঠাকুর কিছু উত্তর করিলেন না। যোগজীবনদাদা বলিলেন, “আমি দেখিলাম, ছায়ার মত একটি মনুষ্যাকৃতি জল হইতে উঠিয়া গেল।”

স্বামিজীর মৃত্যুতে শোক

২৪ ভাদ্র ১৩০৫।

আজ চারিদিন হইল স্বামিজী আমাদের কাছে ছাড়িয়া গিয়াছেন। সকলেরই মুখ তাঁহার শোকে স্নান। মৃত্যুতে এমন কাতরতা ও কানিয়া বড় দৃষ্ট হয় না। সরলনাথ সন্ধ্যাবেলা শোকে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

বহু কষ্টে তাঁহার চেতনা হইল। বিধুভূষণ ঘোষ, সরলনাথের নিকট বলিয়াছেন, “আমর বোধ হইতেছে, আমি পাগল হইয়াছি।” আর সকালে উঠিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কাল ঠাকুর বলিলেন, “বিধুর প্রাণ বড় কোমল, বড় লাগিয়াছে।”

স্বামিজীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ভূতানন্দ স্বামী পুনঃপুনঃ আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন। স্বামিজীর কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। স্বামিজীর গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। জগবন্ধুবাবু বলিলেন যে ভূতানন্দ স্বামী রাস্তায় জগন্নাথ দাস বাবাজীকে দেখিয়া বলিলেন, “স্বামিজী সমুদ্রে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; এমন ভক্তিমান লোক বড় দেখা যায় না। সেদিন শ্রীমন্দিরে পরীক্ষার জন্ত বলিলাম, ‘দেখুন, স্বামিজী! আপনি সন্ন্যাসী, জগন্নাথদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া অপরাধ করিয়াছেন।’ স্বামিজী ষোড়হাতে বলিলেন, ‘আপনারা উচ্চ অধিকারী, আমার তো ঐ অবস্থা হয় নাই, আমি কেবল পন্থায় প্রবেশ করিয়াছি মাত্র। আপনারা আমাকে শিক্ষা দিবেন ও রূপা করিবেন।’”

সেদিন গঙ্গামাতার মঠে একজন পণ্ডিত ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীর বিষয়ে ক্লেশ পাইয়া বলিলেন, “আহা! তিনি যেমন বিদ্বান, তেমন ভক্তিমান ছিলেন। সেদিন আমরা আপনার সমীপে কত আলোচনা করিলাম। মুখে কথাটি নাই। আমরা বাহিরে যাইতেই তিনি বাহিরে আসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। অথচ আপনার সমীপে কিছুই বলিলেন না। গুরুজনের এইরূপ মর্যাদাই প্রশংসনীয়।”

তাঁহার জন্ম ঠাকুর তিনবার শব্দ করিয়া কাদিয়াছিলেন। ভক্তবিচ্ছেদে যে ক্লেশ, ইহা মায়া নহে। জীবনে ধর্মবন্ধু বিহনে কে স্থস্থির থাকিতে

অষ্টম অধ্যায়

১৬৯

পারে ? ঠাকুরের যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদপ্রার্থী হইয়া তিনি পুনঃপুনঃ যাজ্ঞা করিতেন এবং ঐজন্ত রাত্রি ষাটটার সময় তুলসীতলায় বসিয়া থাকিতেন তাহা স্মরণ করিয়া এখনও মন শোকাভূর হইতেছে।

স্বামিজীর স্মৃতি-রক্ষা

ঠাকুর স্বামিজীর সমাধিস্থানটি একটু উঁচু করিয়া রাখিতে বলিয়া-ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, স্মৃতিধা হইলে উহাতে একটি তুলসীমঞ্চ করা হইবে। তিনি ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, “স্বামিজীর যে সকল জিনিষ আছে লইয়া আইস।” ব্রহ্মচারী পুস্তকাদি আনিতে বলিলেন, “ইহার একখানাও যেন নষ্ট না হয়। বস্ত্র সহকারে রক্ষা করিও। পুস্তকের ভিতর একখানা কাগজে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি ছিল :

কে দরদী ভাবের ভাবী, আপনার খেয়ে আমার হবে।

বিশুদ্ধ প্রেম সেই জেনেছে, নিহেঁতু যেজন ভাবে।

যে ছেড়েছে সুখের আশা, তার নিহেঁতু ভালবাসা।

নিষ্পৃহ তার নাইক আশা, সেই আশাতেই বসে রবে।

চাতক ধর্ম গৌসাই দোষে, চার মেঘের জল খায় সন্তোষে।

ব্যভিচারী ধর্ম হয় সে, গ্রন্থকারে কয় তবে।

কেপাটাদ বাউলে বলে, সে প্রেম, না মরিলে কি আপনি মিলে।

দরদিনীর হলে কৃপা জ্ঞান কবাট খুলে যাবে ॥

ঠাকুর এই সঙ্গীতটি লইয়া গান করিলেন। প্রথম দুই চরণ পুনঃপুনঃ গাইলেন। সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, “সতীশ, স্বামিজী না কোন দুইটি শ্লোক খুব ভাল বাসিতেন,—অবৈষম্যের লক্ষণ ? উহা লিখিয়া আনিয়া সম্মুখের দেওয়ালে লাগাইয়া দাও। এ তাঁহার চিহ্ন, ইহা দেখিয়া তাঁহার কথা মনে হইবে।”

সতীশ উহা লিখিয়া ঠাকুরের সম্মুখের দেওয়ালে লাগাইয়া দিল।
শ্লোক দু'টি যথা :

শুভচরিতমপি দ্বিষন্তি পুংসাং স্বয়মিহ দুঃচরিতানুবদ্ধচিত্তাঃ ।

মহদকুশলমপ্য বাপ্য স্নুস্থা ভগরস রসিকা অবৈষ্ণবাস্তে । (১)

পরম স্নুখ পদং হৃদমুজস্বং ক্ষণমপি নানু সজ্জন্তি মত্তভাবাঃ ।

বিতথ বচন জগন্নৈরজস্বং নিদধতি নাম হরেরবৈষ্ণবাস্তে । (২)

বানর মারার পক্ষে বাঁহারা ছিলেন তাঁহাদিগকে তাঁহার মৃত্যুতে উৎসুর
দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, “স্বামিজী দেহত্যাগে মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার
আর গর্ভবাস নাই।” এই বলিয়া শাস্ত্র হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক দু'টি
একখানা কাগজে লেখাইয়া, পূর্বোক্ত শ্লোকের পার্শ্বে লাগাইয়া রাখিলেন।

শ্লোক দু'টি এই :

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ক্ষেত্রং তৎপরমং মহৎ ।

পুরুষাখ্যং সক্রদৃষ্টা সাগরাস্তঃ সক্রৎমৃতঃ ।

ব্রহ্মবিদ্যাং সক্রৎ জপ্তা গর্ভবাসো ন বিদ্যতে । (৩)

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যহরন্মামুশরণ্

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং । (৪)

পরদিন প্রাতঃকালে স্বামিজীর বক্ষে হইতে আনীত ‘বিদ্বৎ সন্ন্যাস’
গ্রন্থখানা ঠাকুর অতি একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতে লাগিলেন। আমার মনে
হইল, ঠাকুর স্বামিজীকে ঐ অবস্থা দান করিলেন। স্বামিজী কান্দী হইতে
‘বিদ্বৎ সন্ন্যাস’ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

পুরীতে স্বামিজীর দৈনন্দিন কার্য্য

স্বামিজী ভোরবেলা সাড়ে তিনটা চারটার সময় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য
সমাপনান্তর শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া সমুদ্র-স্নানে

অষ্টম অধ্যায়

১৭১

রওনা হইতেন। পথে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া কানী মিশ্রের বাড়ী (মহাপ্রভুর বাড়ী), সিদ্ধবকুল প্রভৃতি স্থান দর্শনান্তে সমুদ্র-স্নান করিতেন। সমুদ্র হইতে আসিবার সময় শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া বাসায় আসিতেন। ব্রহ্মচারী বলিল, “স্বামিজী কখন কখন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া নীরবে অশ্রুজল বিসর্জন করিতেন। একদৃষ্টে ঠাকুরের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন।” প্রায়ই এইরূপ দাঁড়াইয়া কাঁদিতেন ব্রহ্মচারীর চক্ষে পড়িত। পরে বাসায় আসিয়া ঠাকুরের ‘চা’ প্রসাদ পাইতেন। তৎপরে ঠাকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে চক্ষু মুদিয়া এগারটা সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। অতঃপর গ্রন্থপাঠে সারাদিন অতিবাহিত করিতেন। ইতিমধ্যে কিছু পাকাল, দুধ ও অন্ন মহাপ্রসাদ পাইতেন। তিনি মৌনী হইয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন এবং ঠাকুরের প্রসাদের জন্ত বোগজীবনদাদা গোসাইর ঘরে অপেক্ষা করিতেন। এইরূপে পাঠাদিতে সময় কাটাইয়া স্বায়ংকৃত্য সমাধা করিতেন। সন্ধ্যার পরে পুনরায় ঠাকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শান্তভাবে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিতেন। ঠাকুরের ঔষধ ও জল খাওয়া হইলে তিনি কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া নিজের গৃহে যাইতেন। ঠাকুরের মত সারারাত্রি বসিয়া সাধন ভজন করিতে স্বামিজীর একটা প্রবল আকাজক্ষা ছিল। দুর্বল শরীরে বসিবার সুবিধার জন্ত তাকিয়ার পরিবর্তে একটা বড় মেটে হাড়ি আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলেন।

বানরবধ নিবারণে স্বামিজীর চেষ্টা

বানরবধের সময় এক একদিন তাঁহার নিদ্রা হইত না। শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কোথায় কি আছে, চিন্তা করিতেন। তাঁহার কোমল প্রাণ ইহাদের ক্রোশে গলিয়া গিয়াছিল। উহাদের জন্ত নিঃসর্জনে অশ্রু বিসর্জন করিতেন

এবং ভাবিতে ভাবিতে উন্নতের জায় হইতেন। “ইহাদের জন্ত পাগল হই না কি ?” একদিন এইরূপ বলিলেন। বানর বধ ও শ্রীমন্দিরের দেওয়ানে সংলগ্ন পায়খানা নির্মাণ বন্ধ করাইবার জন্ত অক্লান্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া তাঁহার দুর্বল শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এই দু’টি কার্য্যই তাঁহার জীবনের শেষ ও মহত্তম কার্য্য। তিনি আহার নিত্যা অগ্রাহ্য করিয়া রুগ্ণশরীরে যেরূপ খাটিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কখনও সন্ধ্যাবেলা কখনও বা সন্ধ্যার পর বাসায় আসিয়া আহার করিতেন। বাড়ী বাড়ী, মাঠে মাঠে যাইয়া নাম স্বাক্ষর করাইতেন। সতীশ বলিতেন, “তিনি এমনি তেজের সহিত শাস্ত্রীয় কথা বুঝাইয়া বলিতেন যে, কেহ তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। তাহাদের ভিতর একটা ‘ছাপ’ পড়িয়া যাইত।” কোথায় কোন্ পণ্ডিত আছে, তাঁহাদের অনুসন্ধান, বানরবধ সম্বন্ধে আলোচনা, নাম স্বাক্ষর প্রভৃতি কার্য্যে বহু সময় কাটাইতেন। তাঁহার চেষ্টায় বানরবধের বিরুদ্ধে ৪২২ ৬ পায়খানা নির্মাণের বিরুদ্ধে ৫০০ নাম সহি হইয়াছিল। এ সকলের ফলাফল তিনি দর্শন করিয়া যান নাই। ঠাকুর স্বামিজীকে ঐ পাতিতে নাম স্বাক্ষর করিতে বলেন। তাহাতে তিনি অত্যন্ত বিনয় সহকারে, যেন নাম স্বাক্ষর করিতে না হয় তজ্জন্ত প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর তাঁহার ভাব দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং “ঐরূপই হউক বলিয়া” তাঁহার ভাবে অনুমোদন করিলেন। তাঁহার ভিতরে প্রতিষ্ঠার ভাব মোটেই ছিল না।

স্বামিজীর অবস্থা : দূরদর্শন

বানরবধের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্বামিজী একখানি পাতি লিখেন। উহা এখন বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতেছিলেন। প্রায় অর্ধেক অনুবাদ করা হইলে, “আর লিখিতে পারি না” বলিয়া স্বামিজী

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে উহা লিখিতে উৎসাহিত করিবার জন্ত আমি বলিলাম, “ঠাকুর যখন লিখিতে বলিয়াছেন, অথচ আপনি লিখিতে চাহেন না, তাহাতেই বুঝিতেছি আপনার আমিষ রহিয়াছে।” তিনি বলিলেন, “আমি টামি কিছু নাই, একমাত্র পরব্রহ্মই সব।” তিনি দৈবতাদ্বৈতবাদ বিশ্বাস করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই তাঁহার উপাস্ত। তিনি যে উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই বিশ্বাসী। তিনি বলিতেন, “গুরুই সর্বস্ব, গুরুই পরব্রহ্ম, গুরুই সব। এক গাছা তৃণও তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন উত্তোলিত হয় না, জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তাঁহার হাত দেখিয়া ধন্ত হইয়াছি।”

স্বামিজীর ভিতরের অবস্থা বড়ই সুন্দর ছিল। সতীশ বলিলেন, “এমন সরল বিশ্বাসী লোক প্রায় দেখা যায় না। কোন কথা বলিলেই হেলে পেলের মত বিশ্বাস করিয়া লইতেন। তাঁহাকে ইদানীং কখনও রাগ করিতে দেখি নাই। অনন্ত চাকর সেদিন রাত্রে জল দেয় নাই। পরদিন সকালে হুঃখ করিয়া দাদাগোসাইকে বলিলেন, “আমার জন্ত এরা এত ক্লেশ পায়।”

কাহাকে কোনও বিষয়ে ক্লেশ দিতে, বুঝা আলোচনা করিয়া সময় যাপন করিতে, কি নিজের সুখসাধন করিতে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। নিজে একটা ভিজা ঘরে থাকিতেন। কতদিন বলিয়াছি বিছানাগুলি রোদ্রে দিন। কিছুতেই তাঁহার দৃকপাত নাই। সর্বদাই উদাসীন। স্বামিজীর মূর্তি এমনি শান্ত ও গম্ভীর লক্ষিত হইত যে তিনি যেন সমস্তই জয় করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন। কখনও তিনি কাহাকে কুবাক্য বলিয়াছেন শুনি নাই। সেদিন কেবল বানরবধের পক্ষে শাস্ত্রের কুব্যাখ্যা শুনিয়া বলিয়াছেন, “এ চণ্ডালের ঝায় ব্যাখ্যা।” তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা বড়ই চমৎকার। বানরবধের বিরুদ্ধে নাম স্বাক্ষর করাইতে যাইয়া

একদিন এমন তেজের সহিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, তাহা শুনিয়া কয়েকটি ভদ্রলোক বলিলেন, “আচ্ছা দিন নাম স্বাক্ষর করিয়া দিই।”

স্বামিজীর সাধন জীবনের অবস্থা অতীব সুন্দর। একদিন শ্রীবৃন্দাবনে নরহরি দাসের কুঞ্জে শ্রীযুক্ত দাদাগৌসাইয়ের ঘরে আমি, দাদাগৌসাই ও স্বামিজী দুপ্রহরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটু মৃদু হাসিয়া স্বামিজী বলিলেন, “আজ রাখালবাবু আসিবেন।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি রূপে জানিলেন?” তিনি উত্তর করিলেন, “তঁাহাকে আসিতে দেখিতেছি।” পরে সন্ধ্যার একটু পূর্বে রাখালবাবু সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তঁাহার সেইদিন আসিবার খবর আমরা কিছুই জানিতাম না।

শ্রীযুক্ত শ্রামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি স্বামিজীর দূরদর্শনের ক্ষমতা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমবার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার সময়ে কানপুরের মন্মথবাবুর বাসায় উঠেন। তখন স্বামিজী কানপুরে তাহার পিতার সঙ্গে ছিলেন। বৈকালবেলা মন্মথবাবু পণ্ডিত মহাশয়কে লইয়া স্বামিজীর নিকট যান। স্বামিজীর এইরূপ শক্তির পরিচয় মন্মথবাবু অনেকবার পাইয়াছিলেন। তাই পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন, “পণ্ডিত মহাশয়, আপনাকে দেবেন্দ্রবাবুর (স্বামিজীর) একটু শক্তির পরিচয় দিই।” স্বামিজী বাড়ীর ভিতর ছিলেন। মন্মথবাবু বাহির হইতে স্বামিজীকে ডাকিয়া বলিলেন, “আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আর একটি লোক আসিয়াছেন, বলুন তিনি কে?” স্বামিজী ভিতর হইতে উত্তর করিলেন, “পণ্ডিত মহাশয় আপনার সহিত আসিয়াছেন তাহা আমি জানি।”

স্বামিজীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

স্বামিজীর নাম দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জন্মভূমি চন্দননগর, পিতা ৬রামতারক চক্রবর্তী। তিনি বি. এল. পাশ ছিলেন কিন্তু ওকালতী

করেন নাই। জীব দেহত্যাগের পর ইনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া কাশীতে 'বিদ্যৎ সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কাশী হইতে হরিদ্বার, বদরিকাশ্রমাদি দর্শন করিয়া পুরীতে আসেন। তিনি অত্যন্ত কৰ্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। জীব মৃত্যুর পরে ছেলে কোলে করিয়া ও তাহার দুধের বাটী নিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। অতঃপর ছেলে মরিলে উহার শ্রাক্ড়াগুলি ও জীব চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার বস্ত্রাদি একটা গাঁটরি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহাদের বাটীতে বহুদিনের পালিত জীব একটি টিয়া পাখী ছিল। তাহাও সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন। ১৩০০ সালের কুম্ভমেলার সময়ও তিনি সেই টিয়া পাখীটি নিয়া প্রয়াগধামে গিয়াছিলেন। টিয়াটি সহরের বাসায় থাকিত। (১) এই বিষয় কেহ কেহ কটাক্ষ করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "আশ্রিতকে ত্যাগ করিতে নাই। তাহাদের রক্ষাই ধর্ম। এখন ইহাকে কোথায় ফেলিয়া দিবে।" ইদানীং স্বামিজীব অবস্থা অগুরুপ হইয়াছিল। সঙ্গে কেবলমাত্র কমণ্ডলু ও যৎকিঞ্চিৎ অত্যাবশ্যক বস্ত্রাদি থাকিত।

ঠাকুরই যেন স্বামিজীব প্রাণ ছিলেন। তিনি কখন কি করেন, কি ভাবে চলেন তাহা অনুসন্ধান করিয়া নিজেও তদ্রূপ চলিতে প্রয়াস পাইতেন। ঠাকুর জটা রাখিয়াছিলেন। স্বামিজীব তাহা রাখিয়াছিলেন। তিনি বি. এ. মাত্র পাশ ছিলেন কিন্তু তাঁহার বিদ্যা অত্যন্ত প্রগাঢ় ছিল। বিজ্ঞানে, দর্শনে, সংস্কৃত, হিন্দি, গুরুমুখী ও প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল।

(১) বাসায় এই পাখীটিকে ঠাকুরের কন্যা কুতুবুড়ি (প্রেমসখী) আহাৰ দিতেন ও সেবা করিতেন। দিদিমা বলিলেন, "একদিন ভোরে দেখিলাম, পাখীটি ঠিক মানুষের মত পড়িতেছে "কালী কল্লভর, শিব জগৎগুরু, শিব, শিব, শিব, শিব রাম।" কুতুবুড়ি নিকটে দাঁড়াইয়া আছে, উহা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

কঠিন কঠিন দার্শনিক গ্রন্থ সমূহ ঠাকুর তাঁহাকে পাঠ করিতে দিতেন। সতীশ সেদিন বলিল, “আমাদের সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজীর থাকা ভাল, এমন (mystic) বৈজ্ঞানিক কূট কথা বলেন যে, কেহ বুঝিতে না পারিয়া থাকিয়া থাকে।” পরে স্বপ্নে এক-আধটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত। স্বামিজী অত্যন্ত হুমিষ্টস্বরে পাঠ করিয়া পারিতেন। তিনি “শিবোহং, শিবং কেবলোহং” স্বপ্নে আবৃত্তি করিয়া যে গান করিতেন তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইত। পাহাড়ী বাবা তাঁহার নাকি মহাপ্রভুর সময়ের প্রসিদ্ধ প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠের সময়ে তিনি একখানা শঙ্করাচার্য রচিত গ্রন্থ উপহার পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া খুব গৌরব করিতেন।

তাঁহার জীবন বড় ক্লেশময় ছিল। লোকের নিকট সহানুভূতি পাওয়া দূরে থাকুক, অনেকের নিকট প্রাণের কথা বলিয়া আঘাত পাইতে পাইতে উহা বলিবার প্রবৃত্তিও যেন লুপ্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিয়া দরুণ পিতা রুষ্ট হইয়া মাঝে মাঝে প্রহার পর্য্যন্ত করিতেন। স্ত্রী, পুত্র মাতা মৃত। খুব শাস্ত, ধীরভাবে সমস্ত সহ্য করিতেন। ঠাকুর ফকির কলিকাতা সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাসায় ছিলেন, তখন মাঝে মাঝে স্বামিজী মনের ক্লেশে ছটফট করিয়া সারা ঘর গড়াগড়ি দিতেন। ভয়ানক স্মরণ করিয়া এখনও অধীর হইতে হয়।

দাদাগোঁসাই ঠাকুরের নিকট বলিলেন, “ইদানীং স্বামিজী বেশ একটা শান্তির অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। আমি একটু খোঁচাইয়া দেখিয়াছি। বস্তুতঃই তাঁর ভিতরে ঐরূপ একটা অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পৃথিবীর কি দুর্গতি! যেই একটা লোক তৈয়ারী হইতেছে আর ভগবান লইয়া যাইতেছেন।” ঠাকুর বলিলেন, “বৃক্ষে ফল পক হইলে পড়িয়া যায়। ভগবান তাঁহাকে

অষ্টম অধ্যায়

১৭৭

সংসারের ক্লেশ ও যন্ত্রণায় আর রাখিলেন না। জন্মগত হইয়া মৃত্যু না হইলেও কোন উৎকট ব্যাধি হইয়া মারা যাইতেন। ‘ডকে’ জাহাজ তৈয়ারী হইলে আর কি থাকে? চলিয়া যায়।”

অগ্নিনী খুঁজিতে খুঁজিতে স্বামিজীর জিনিষ-পত্রের মধ্যে একটি সিন্দুরের কোটা পায়। উহা তাঁহার স্ত্রীর বলিয়া বোধ হইল। ঠাকুর একথা শুনিয়া বলিলেন, “বিশুদ্ধ প্রেমের এইরূপই লক্ষণ। স্বয়ং মহাদেবও সত্য-দেহ স্বন্ধে করিয়া দেশে দেশে ফিরিয়াছিলেন।” বহুদিন পরে স্বামিজীর জিনিষ-পত্র সমুদ্রে দেওয়ার জন্ত এই কোটাটিও লইয়া যাওয়া হয়। হঠাৎ এই কোটাটি খুলিয়া উহার মধ্যে ঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত তিনখানা পত্র পাওয়া যায়। স্বামিজী নানা স্থানে, নানা অবস্থায় অত্যন্ত দরদের সহিত এতকাল উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। পত্র তিনখানা নিম্নে দেওয়া গেল :

ঠাকুরের প্রথম পত্র

ওঁ হরি

সবিনয় নিবেদন,

চৈত্র। ঢাকা।

আপনার পত্র পাইলাম। আপনার পরিবার ইচ্ছা করিলেই সাধন পাইবেন। যতদিন অর্থের প্রয়োজন আছে, অর্থোপার্জন করিবেন। কর্ম দ্বারা কর্ম কাটিয়া যাইবে। সাধনে অধিক সময় দিলে শীঘ্র শীঘ্র ফল পাইবেন।

যেখানেই থাকুন না কেন, সময়ে সময়ে সাহায্য করিতে বাধ্য হইতে হয়। প্রাণের যোগে দূর নাই, নিকট। আপনার তপস্শ্রাব কুশল হউক।

শুভাকাজী

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১৭৮

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

ঠাকুরের দ্বিতীয় পত্র

ও হরি

ঢাকা।

সবিনয় নিবেদন,

অনেক দিন পরে আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। অর্থোপার্জন করিতেই হইবে। স্কুলের কার্য্য সুবিধা না হইলে অন্য কার্য্য গ্রহণ করিলে হয়। সকল বিষয়েই সময় আছে। সময় হইলে ঘরে বসিয়া কৰ্ম্ম হইবেক। সময় না হইলে সহস্র চেষ্টাতেও কিছু হয় না।

তথাপি চেষ্টা করিতে হয়, কারণ ইহারই নাম কৰ্ম্মভোগ। কৰ্ম্মভোগ না করিলে শুভ সময় আসে না। সাধনে অগ্রসর হইতেছেন ইহাই প্রকৃত লাভের কথা। যত আত্মহারা হইয়া নির্ভর করিবেন ততই উন্নতি।

যেখানে থাকুন আমরা সৰ্ব্বদা নিকটেই আছি। গুরু কৃপাতে আপনি সপরিবারে সুখে থাকিয়া সাধনে দিন দিন উন্নতি লাভ করুন।

নিবেদক

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ঠাকুরের তৃতীয় পত্র

ও হরি

পৌষ, ১৮০২ শ

ঢাকা, একাদশ

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পূর্ব পত্র আমার হস্তগত নাই। নিষ্ঠাপূর্বক সাধন করিলে নিশ্চয়ই ফললাভ হয়। ধর্ম্ম

অষ্টম অধ্যায়

১৭৯

কথার ব্যাপার থাকে না। কোন বিষয় অনুমান করিয়া লইতে হয় না।
সকলই প্রত্যক্ষ।

পত্র লিখুন বা না লিখুন ক্ষতি নাই। যাহারা সাধন গ্রহণ করিয়াছেন,
তাঁহারা নিকটে। সম্ভ্রতি ঢাকাতেই আছি। শীঘ্র কোন স্থানে যাওয়া
হইবে বোধ হয় না।

শুভাকাজী
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

নবম অধ্যায়

ঠাকুরের স্বপ্ন : মহাবিষ্ণুবাবুর নামামৃত পান

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গণপুর নিবাসী আমাদের শ্রদ্ধাভাজন গুরুভাতা শ্রীযুক্ত মহাবিষ্ণু বতি মহাশয় এ সময়ে পুরী আসিলেন। তিনি মুন্সেরে কাজ করিতেন। গুরুভাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয়ও এ সময়ে মুন্সেরে কাজ করিতেন। তিনি লিখিয়াছিলেন “মহাবিষ্ণুবাবু মধ্যে মধ্যে মুন্সের হইতে জামালপুর যাইয়া কয়েকটি বৈষ্ণবের সঙ্গে রাত্রি কাটাইতেন। আমি গুরুপ করিতে বিষ্ণুবাবুকে নিবেদন করিতাম, কারণ আমাদের সাধন গোপনীয়। তদন্তরে বিষ্ণুবাবু বলিতেন ‘দীক্ষা গোঁসাইজীর নিকট পাইয়াছি, শিক্ষার আবশ্যক, তাই অমুক বাবুর নিকট যাই।’ আমি বলিলাম, “আমাদের শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন নাই।” এক গুরুদত্ত নাম সাধনে সমস্ত হইবে। বিষ্ণুবাবু বলিলেন, “শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দীক্ষা গুরু ও শিক্ষাগুরুর প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছে।” এই সময় একদিন তিনি বলিলেন, “আমার ভারি রোগ হইয়াছে, ক্ষুধা মাত্রই হয় না।” তখন বিষ্ণুবাবুর চেহারা খুব লাভণ্যযুক্ত ছিল তাই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি ব্যারাম করিয়াছে?” বিষ্ণুবাবু বলিলেন, “মুখে একরূপ মিষ্ট রস জন্মিত তাহাই খাইয়া আমার নেশা হয় আর ক্ষুধা হয় না।” আমি বলিলাম, “এরূপ কেন হয়?” বিষ্ণুবাবু বলিলেন, “হরেকৃষ্ণ নাম জপ করিয়া এইরূপ হইয়াছে।” আমি তখন বলিলাম, “আপনি হরেকৃষ্ণ নাম জপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, সেইজন্ত নামামৃত পান করিয়া এইরূপ হইয়াছে, ইহা ব্যারাম বলে না। কিন্তু আপনি ‘হরেকৃষ্ণ’ নাম জপ করেন কেন?”

নবম অধ্যায়

১৮১

আপনাকে ইহা জপ করিতে বলিল ?” বিষ্ণুবাবু তত্বতরে বলিলেন, “কেন, মহাপ্রভু আপামর সাধারণকে ঐ নাম জপ করিতে বলিয়া গিয়াছেন।” আমি বলিলাম, “তাহা অদৌক্ষিতেৱ জ্ঞাত, দৌক্ষিতেৱ জ্ঞাত নহে।” আপনি দীক্ষা পাইয়াছেন, আপনাকে গুরুদত্ত নামটী জপ করিতে হইবে। এখনও গোঁসাই বর্তমান আছেন। আপনি সত্বর পুরীতে চিঠি লিখুন।” তদন্ত-সারে বিষ্ণুবাবু পুরীতে চিঠি লিখিলেন। বিষ্ণুবাবুর প্রথম পত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত দাদাগোঁসাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানাইলেন। আমাদের শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন নাই, গুরুদত্ত নামেই সব হইবে। গুরুদত্ত নাম জপ করিবেন। মহাপ্রভুর প্রদত্ত নামও জপ করিতে পারেন। তাহাতে আমি বলিলাম যে আপনার পক্ষে কি করা উচিত তাহার উত্তর জানিতে চাহেন। বিষ্ণুবাবু তাহাই করিলেন। তদন্তরে দাদাগোঁসাই পূর্ববৎ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিলেন “তোমার পক্ষে গুরুদত্ত নাম জপ করাই উচিত।”

মহাবিষ্ণুবাবু গোড়িয় বৈষ্ণবদের সহিত খুব মিশিতেন এবং তাহাদের ভাব, আচার-ব্যবহারও তাঁহাতে খুব সংক্রামিত হইয়াছিল। তিনি পুরী আসিলে দেখিতে পাইলাম, তিনি একটি ‘হরিনামের বোলা’ লইয়াছেন। ঐ বোলা বুকে ঝুলাইয়া ঠাকুরঘরে আসিতেন এবং দক্ষিণ হস্ত উহার মধ্যে গুহিত করিয়া, আমাদিগকে যেন দেখাইয়া দেখাইয়া মালাজপ করিতেন। সতীশ উহা দেখিয়া সহ্য করিতে পারিল না। চটিয়া মহাবিষ্ণুবাবুকে বলিল, “দেখুন, এই বোলা সমুদ্রে ফেলিয়া না দিলে আপনার কিছুই হইবে না।” মহাবিষ্ণুবাবু এ কথা শুনিয়া ঠাকুরের নিকট গিয়া বলিলেন, “দেখুন, সতীশবাবু বলেন আমার হরিনামের বোলা সমুদ্রে না ফেলিয়া দিলে কিছুই হবে না। আপনি কি বলেন ?” ঠাকুর বোলা রাখিতে বলিলেন। ঐ সঙ্গে আরও কি কি যেন বলিয়া দিলেন।

মহাবিশুবাবু খুব সুন্দর গান রচনা করিতে ও গাহিতে পারিতেন। পরদিন সকালে পাঠের পর তিনি নানারূপ রাগিণী ভাঁজিয়া ও ওহাদ গায়কের মত গান ধরিলেন কিন্তু কিছুতেই গান জমিল না। তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া ঠাকুরকে বলিলেন, “আজ গান জমিতেছে না কেন?” তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, “ভগবানের দিকে তাকাইয়া গান করুন, তাহা হইলেই গান ভাল হইবে।” পরে তিনি তাহাই করিলেন এবং গানও বেশ জমিল। তিনি মনের আবেগে গান গাহিতে লাগিলেন :

যিন্কা দেল্‌মে হরিনাম বসুতে হায়।

আউর সাধন সো করে না করে ॥

ভুতে দয়া যিন্‌কো দেল্‌মে হায়।

কোটা দান সো করে না করে ॥

সাধু চরণরজঃ যো পরশ পায়া হায়।

ভীরথ নীর সো পিয়ে না পিয়ে ॥

এই গানটি যখন তিনি স্নমধুরস্বরে ঠাকুরের ঘরে বসিয়া গাহিতে ছিলেন, তখন সরলনাথ স্নানে যাইতেছিল। সে দেখিল, আমাদে পরিচিত নেংটা ছেলেটি করযোড়ে দাঁড়াইয়া উহা শুনিতেছে এবং দরদর ধারে তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রুজল পড়িতেছে।

মহাবিশুবাবুর দীক্ষা

মহাবিশুবাবু যখন ভাগলপুরে আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় স্কুল ইন্সপেক্টর মহাশয়ের কেরানী ছিলেন, তখন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু, সচ্চিদানন্দ স্বামী, লালজী, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, দাদাগোসাইজী প্রভৃতির সহিত ঐ বাসায় তাহার পরিচয় হয় এবং বিশেষ আশ্রয়িতা জন্মে। ঠাকুরের কথা তিনি উহাদের নিকট শুনিয়াই তাঁহা

প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। দোল পূর্ণিমার দিন তিনি সাধন পাইবার জন্য সন্ধ্যার সময় গেণ্ডারীয়া আশ্রমে উপস্থিত হন। তখন গান হইতেছিল, ঠাকুর মগ্ন ছিলেন, ব্রহ্মচারী তখনই মহাবিষ্ণুবাবুকে গান করিবার জন্য কুটারে ঢুকাইলেন। একটু পরে তিনি গান ধরিলেন, “চললো বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দে……” (১) গান খুবই জমিয়া গেল। বহুক্ষণ ধরিয়া গান হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে

চললো বৃন্দে শ্রীগোবিন্দে যুগমদে আজি সাজাব লো ;—

(আজি আবির্ চন্দনে সাজাব লো, আজি আবির্ কুন্ডমে সাজাব লো
আজি মনোমাধ সব পুরাব লো, আজি প্রাণে প্রাণে বন্ধু বাসিব লো)

১। আয়লো ললিতে, চল চম্পকা—ডাকে প্রাণসখা আয়লো বিশাখা।

আয় শুক সারি, সব পরিহরি, হরিসনে হরি খেলিব লো ॥

২। হাঁসি হাঁসি জ্যোছ্‌না রাশি, চালে শশি প্রেমভিলাষী।

পিক্‌ কুহ বলে, পবন দোলে, ঐ শোন্ বাঁশী ডাকিছে লো ॥

(রাধা বলে ঐ শোন্ বাঁশী ডাকিছে লো)

৩। বকুল বেল যুথি মালতী, চামেলি চাঁপা কনক জ্যোতি।

তুলি অতুল তমাল ফুল, বনমালী গলে দিব লো ॥

(গাঁথি মালা ফুলে বনমালী গলে দিব লো)

৪। আয় আয় যত আভীর পিয়ারী আবির্ চন্দনে নে লো থালা ভরি।

ক্ষীর, সর, ননী বেঞ্জে নে যতনে, গোপনে সে ধনে খাওয়াব লো ॥

৫। হাতে ধরি ধরি, নাথে ঘেরি ঘেরি, নাচিব গাইব সব সহচরী।

মনপ্রাণ ভরি, হেরিব মুরারি, গলা ধরি বামে দাঁড়াব লো ॥

(মোদের প্রাণ বঁধুয়ার গলা ধরি বামে দাঁড়াব লো)

৬। হরিদাস ভালে নয়ন জলে, লুটাইয়ে গোপীর চরণতলে।

বলে ব্রজবালা সে চিকনকাল, কৃপা করি মোদের দেখাবি লো ॥

(তোদের প্রাণ বঁধুয়ার মনচোরায়, কৃপা করি মোদের দেখাবি লো)

বেহুঁস অবস্থায় তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। গানটি শুনিয়া সৰ্কেই এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, গুরুকণ্ঠা কুতুবুড়ি, পাড়ার মেয়েরা আরও অনেকে উহা লিখিয়া লইল এবং গাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল।

তিনি পরদিন সাধন পাইলেন। আশ্রমের দক্ষিণে অনতিদূরে একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া সেই স্থান হইতে একটি সুন্দর গোলাপ ফুল লইয়া আসিয়া ঠাকুরকে উপহার দিয়া প্রণাম করিলেন। বিষ্ণুবাবুর ও আমার ভাতৃপুত্র শ্রীমান্ সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সঙ্গে কুটীরে দীক্ষা হইল।

মহাবিষ্ণুবাবুর স্বপ্ন : যুগলরূপ দর্শন :

পাপপুরুষের শ্রাদ্ধ

দীক্ষার পর একদিন সকালে পাঠের পর দেখিলাম তিনি ঠাকুরের সহিত নিজের ভজন-সাধন সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছেন। বিষ্ণুবাবু বলিলেন, “দীক্ষার পর একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। স্বপ্নটি এই : প্রভুগাদ কোন একটি উত্তরদ্বারী বাড়ীর বহির্দরজায় বসিয়া যেন কি করিতেছেন। নিকটে কতকগুলি পত্রপুষ্প ও আরও কি কি রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “গোসাই কি করিতেছেন?” আপনি বলিলেন, “শ্রাদ্ধ করিতেছি।” আমি বলিলাম, “শ্রাদ্ধ করিতেছেন, কুশ কৈ?” আপনি বলিলেন, “সব সময় কি কুশ পাওয়া যায়?” আমি বলিলাম, “আমার সঙ্গে আসুন, আমি কুশ দেখাইয়া দি।” এই কথা বলিতে আপনি আমার পেছনে পেছনে আসিতেছেন। আমি আপনাকে লইয়া একটি বিল কি বাদাবনের মধ্যে যাইতে লাগিলাম, যাইয়া বলিলাম, “এই কুশ লউন।” অতঃপর নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঠাকুর বলিলেন, স্বপ্নটি সত্য ঘটনা। সঙ্গুরু যখন কৃপা করেন, তখন শরীরস্থ পাপপুরুষের মৃত্যু হয়, গুরু

তাহার শ্রদ্ধ করেন।” বিষ্ণুবাবু আরও বলিলেন, “একদিন স্বপ্নে দেখিলাম : আমাদের বাড়ীর পুরুষাণ্ড্রমে পূজিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ জীবন্তভাবে আমাকে দর্শন দিলেন। রাধাকৃষ্ণ একত্র একদেহে স্থিত— স্বপ্নে দেখিলাম। শ্রীমূর্তির সমস্তই দর্শন পাইলাম কিন্তু চরণ দর্শন হইল না। তাতে মনে হইল বাড়ীর ঠাকুরদেরও দূর হইতে দর্শন করিলে চরণ দর্শন হয় না। তাই বোধ হয় চরণ দর্শন পাইলাম না। এই ভাবিয়া সিংহাসনের সম্মুখের রেলিং তুলিয়া দিলাম। যথার্থই কি রাধাকৃষ্ণ আমাকে এইরূপ কৃপা করিলেন?” ঠাকুর গুনিয়া বলিলেন, “যাহা দর্শন পাইয়াছেন সমস্তই সত্য। আপনার আর জন্ম হবে না।” মহাবিষ্ণুবাবু অল্প দুই একদিনের মধ্যেই গোপারিয়ার সকলের নিকট সুপরিচিত ও আদরণীয় হইলেন। সাধন পাওয়ার পর তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর গান রচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ ভক্তিমান ছিলেন। একবার ভগবানের রূপ বর্ণনা করিয়া একটি গান রচনা করেন। তিনি বলিলেন যে, ঐ গান রচনা করিয়া দিবা সাড়ে দশটা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত ভাবাবেশে কাঁদিয়া কাটাইয়াছিলেন।

ঠাকুরের প্রথম স্বপ্ন : ভগবানের প্রকাশ

একদিন ঠাকুর আমাকে বলিলেন, “আমার কতকগুলি স্বপ্ন লেখা আছে, উহা কোথায়?” আমি কহিলাম, “আমি অল্পসন্ধান করিয়া দেখি।” অল্পসন্ধানে জানিলাম ঐ সকল জগবন্ধুবাবুর নিকটে আছে। তিনি উহা পুরীতে লইয়া আসেন নাই। ঠাকুরকে ইহা জানাইলাম। ঠাকুর বলিলেন, “উহা ছাপাইতে পারিলে ভাল হয়।” ঐ স্বপ্নের মধ্যে দুইটি সম্প্রতি সংগ্রহ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। প্রথম স্বপ্নটি যথা :

“আমি একটি প্রকাণ্ড নদীতীরে বসিয়া আছি। লক্ষ লক্ষ লোক সহস্র সহস্র নৌকায় পার হইতেছে। আমাকে কেহ ডাকিতেছে না। একজন

আমাকে হঠাৎ ডাকিয়া নৌকায় উঠাইল। নৌকাযোগে পরপারে উপস্থিত হইয়া কতিপয় পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার আমাকে একটি বাগানে লইয়া গেলেন। বাগানে বিবিধ সুন্দর ফুল-পুষ্পবৃক্ষ আছে। তথাকার প্রাচীরে লতায় এক অপূর্ব পুষ্প দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। ক্রমে আমি অচেতন হইলাম। তখন ঐ পুষ্প সকল পরমাসুন্দরী জীবন ধারণ করিয়া আমাকে বলিলেন, “ও ভদ্র ! তোমার হৃদয়নাথকে অব্বেষণ কর।”

আমি অব্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ উদ্ভানের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে একটি কুকুর উর্দ্ধ্বাঙ্গে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলিল, “আতিথ্যস্বরূপ এই ফল ভক্ষণ কর।” আমি ফলটি ভক্ষণ করিবার কুকুরটি চলিয়া গেল। একটি জটাধারী ঋষি আমার নিকট আসিল বলিলেন, “বৎস ! আমার হস্ত ধারণ কর।” আমি তাঁহার হস্ত ধারণ করিলাম। উভয়ে আকাশপথে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। কত গ্রহ প্রকাণ্ড গ্রহ উপগ্রহ অতিক্রম করিয়া এক জ্যোতির্ময় ধামে উপস্থিত হইলাম। সেস্থানের জ্যোতি এত অধিক যে আমাদের চক্ষু যেন বলহীন গেল। ক্রমে যাইতে যাইতে একটি সুন্দর স্থানে যাইয়া দেখি, কতকগুলি মহর্ষি উজ্জল তারার ন্যায় যোগাসনে বসিয়া আছেন। আমার পথ-প্রদর্শন মহর্ষি আমার হস্তত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে উপবেশন করিলেন। ঐ সাধুগণের মধ্য হইতে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কহ ! আমি উত্তর করিলাম, “অস্তি পৃথিব্যাং ভাগীরথী তীরে শান্তিপুর নগর কশিৎ জনপদঃ। তস্মিন্ পুরে শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য নামা প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ পুরুষোত্তমঃ। তস্মৈ কুলে জাতো বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামঃ অকিঞ্চিনো ভবতাম সমীপে সমাগতঃ। ভগবদ্দর্শন লালসয়া কাতরতয়া মম প্রাণং বিদীর্ঘ্যন্তে। হে সন্তমা ! মাং কৃপাং কুরু।”

আমার কথা শুনিয়া কৃপালু সাধু বলিলেন, “বৎস! তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, উপবিশ।” আমি প্রণাম করিয়া বসিলাম। সাধুগণ সমস্বরে “ও নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়” স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব পাঠ করিতে করিতে তাঁহারা নৃত্য করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভগবানের প্রকাশ হইল। সে শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি অচেতন হইলাম। চেতন হইয়া দেখি, আমি পৃথিবীর সেই উজ্জানে রহিয়াছি। তখন উঠেঃস্বরে রোদন পূর্ব্বক দৌড়িতে লাগিলাম। হায়! কেন আমি প্রভুকে দেখিয়া অচেতন হইলাম। হে প্রাণ! তুমি কেন সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলে? তখন আমাকে উঠেঃস্বরে বলিলেন, “বৎস! স্থির হও। প্রভুর চরণ ধ্যান কর। আশা পূর্ণ হইবে। প্রভু তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন।” ইহার পরই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

ঠাকুরের দ্বিতীয় স্বপ্ন : মহাবীর দর্শন : ব্রহ্মের প্রকাশ

১৮০৩ শক। ২রা আষাঢ়, রবিবার। সাহেবগঞ্জ। গয়া।

মধ্যাহ্নে আহাৰাস্তে গ্রীষ্মাধিক্য প্রযুক্ত শরীর কিছু কাতর হইল, শয়ন করিলাম। অনেকক্ষণ নিদ্রা আসিল না। চারটার পর হঠাৎ নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রিতাবস্থায় দেখিলাম, কোথাকার একটি ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উৎসব। উৎসবের আয়োজন হইতেছে। একজন বলিল, “সাধারণ সমাজকে নিমন্ত্রণ না করিলে নিন্দাতাজন হইতে হইবে।” এই কথা শুনিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। পথের মধ্যে কতকগুলি ভক্তলোক দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন দীনবেশ পণ্ডিত আমার সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র বিচার আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ বিচার করিয়া তুষ্ট হইলেন। এমন সময় একজন বলিল, “ইনি ব্রহ্মজ্ঞানী।” এই কথা শুনিয়া একটি পণ্ডিত ক্রোধ পূর্ব্বক আমার একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেন।

আমি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলাম। সম্মুখের পথ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের প্রশস্ত পথে দেখি অসংখ্য বানর। প্রথম অনেক বানর দেখিয়া মনে একটু ভয় হইল। তথাপি সেই পথে চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ “জয়রাম, শ্রীরাম” বলিতে বলিতে যাইতেছেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ “ওঁ তৎসং”, “ওঁ তৎতৎ” উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে চলিলাম। আমাকে পশ্চাতে দেখিয়া সে বৃদ্ধ এক বীরপুরুষ হইলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, “আমাকে চেন?” আমি কোন উত্তর না দিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ক্রমে আমরা উভয়ে একটি ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে উদ্ভান, সরোবর এবং মধ্যে ৪৫টি মন্দির। ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে চেন?” আমি বলিলাম, “আজ্ঞা না।” তিনি বলিলেন, “আমি বীর হুমান।” একথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমাকে বলিলেন “কি জন্ত আসিয়াছ?” আমি বলিলাম, “আমি ব্রহ্মজ্ঞানী।” তিনি বলিলেন, “আমি কি ব্রহ্মজ্ঞানী নহি! আমি রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রকে পূজা করি না। আত্মারাম পরব্রহ্মকে পূজা করিয়া থাকি। রমতি ইতি রামঃ, আত্মারাম, প্রাণারাম।” এই বৈ বলিয়া বক্ষঃস্থল চিরিয়া ফেলিলেন। দেখিলাম হৃদয়ে, “ওঁ রাম”, “ওঁ রাম” এইরূপ স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, “আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।” তিনি বলিলেন, “তোমাকে যোগ শিক্ষা দিব, চল যাই।” এই বলিয়া তিনি হস্তে একটি কোদালি লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছুদূর গিয়া সরোবরের তীরে একটি বৃক্ষতলে ছোট একটি কুটির দেখাইয়া বলিলেন, “এই কুটিরে তোমার তপস্তা হইবে। কেমন, হইবে না?” আমি বলিলাম, “আচ্ছা হবে।” তিনি বলিলেন, “দেখ, আমি মনে করিলে এক মুহূর্তে

অট্টালিকা নির্মাণ করিতে পারি। যদি প্রয়োজন থাকে, বল।” আমি বলিলাম, “আজ্ঞা ইহাতেই যথেষ্ট হইবে, আর প্রস্তুত করিতে হইবে না।” তিনি বলিলেন, “তবে এস, উপদেশ গ্রহণ কর। ‘ওঁ রাম তৎসং’ এই নামের ভাব ধারণা কর ও ইহা জপ কর। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কৰ্ত্তা ব্রহ্ম, তিনি প্রাণারাম, হৃদয়-রমণ, তিনিই সত্য—এই মন্ত্রের অর্থ।” এই মন্ত্র সাধন কর। আমি সাধন করিতে করিতে, অনেক দিন গত হইল, একদিন বীর হনুমান আসিয়া বলিলেন, “তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। তোমার শরীরের লোমকূপ দিয়া আনন্দশ্রোত বহিয়া বাইতেছে। আনন্দাশ্র, রোগাঞ্চ অবিশ্রান্ত হইতেছে। কেমন আত্মপূর্ণ হইয়াছে তো?” আমি বলিলাম, “সম্পূর্ণ পূর্ণ হইয়াছে।” তিনি বলিলেন, “তবে উঠ, অগ্নি সাধনের উপদেশ গ্রহণ কর।” আমি বলিলাম, “অগ্নি সাধন কি?” তিনি বলিলেন, “ব্রহ্মে প্রবেশ। ইহাকেই সন্ন্যাস বলে।” আমি বলিলাম “ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে হইবে। দেশেও ধর্মের অভাব।” তিনি বলিলেন, “এখন কিছুদিন আনন্দ ধর্ম প্রচার করিয়া সর্বদেশে ব্রহ্মানন্দ বিস্তার কর। সংকীৰ্ত্তন কর।” ইহা বলিয়া প্রকাণ্ড বানরদেহ ধারণ করিলেন, মস্তক ও লেজ আকাশে উঠিয়াছে। চক্ষু দু’টি চন্দ্র ও সূর্য্য। দেখিলে ভয় হয়। তাঁহার লোমে “ওঁ রাম”, “ওঁ রাম”। মস্তকে, চক্ষুতে, কর্ণে, সর্বশরীরে “ওঁ রাম”, “ওঁ রাম” অঙ্কিত। এত উজ্জ্বল যেন ছোট ছোট ফুঁকো শিশির আলোর মত বোধ হইতে লাগিল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমার বানরদেহের মুখখানি, কি জ্ঞান?” আমি বলিলাম, “না।” তিনি বলিলেন “আমার মুখখানি ‘ওঁ’। এই ‘ওঁ’ পুরুষ ও আমার লেজ প্রকৃতি। এইজন্ত লেজ দ্বারা রাবণের সর্বনাশ করিয়াছি। আমার শরীরটা পুরুষ প্রকৃতি। সাধন করিলে, অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রবেশ করিলে তুমিও বানরদেহ লাভ করিবে। কারণ বানর না হইলে মুখ ‘ওঁ’ হয় না।” আমি বলিলাম,

“মহাশয়, আমারও কি লেজ হইবে?” তিনি বলিলেন “অবশ্য। পুরু প্রকৃতি এক না হইলে ব্রহ্মে প্রবেশের অধিকার হয় না। এস কীৰ্ত্তন করি।” ইহা বলিয়া দুই বাহু উর্দ্ধে বিস্তার করিয়া, “ওঁ রাম তৎসৎ” এই নাম গান করিতে করিতে উন্নত হইলেন। স্বৰ্গ হইতে দেবগণ আসিয়া এই কীৰ্ত্তনে যোগ দিলেন। গণেশ খোল করতাল চারি হাতে বাজাইতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে শিবের জটা খসিয়া পড়িল। পার্শ্বতী জটা ধরিয়া নাচিতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই। ইহার মধ্যে এক জ্যোতি প্রকাশিত হইল। সকলেই করঘোড়ে ব্রহ্মের জ্ঞান করিতে লাগিলেন। আমি ব্রহ্মের জ্যোতির মধ্যে লুটাইতে লাগিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি করিতেছ?” আমি বলিলাম, “মাখিয়া লইতেছি।” তিনি বলিলেন, “খুব মাখ, খানিকটা কাপড়ে বাঁধিয়া লও।” আমি বলিলাম, “নিরাকার কিরূপে বাঁধিব।” তিনি বলিলেন, “সে কাপড় জড় নহে, হৃদয় কাপড়।” ক্ষণকাল পরে জ্যোতিৰ্ম্ম ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন। দেবতাগণ কিছুকাল কীৰ্ত্তন করিয়া উঠ হনুমানকে আলিঙ্গন পূর্বক চলিয়া গেলেন। হনুমান আমাকে বলিলেন, “এ স্থানে প্রতিদিন একরূপ হয়। এত দিন তপশ্চায় ছিলে, কিছুই জানিতে পার নাই।” আমি বলিলাম, “আমার নিতান্ত অভিলাষ আমি এখানে বাস করি; কিন্তু কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজের বড় অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা নিবারণের জন্ত যাইতেই হইবে।” হনুমান বলিলেন, “কেশববাবু ছিলেন ভাল কিন্তু এখন তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন। নিজে অন্ধ হইয়া অন্ধকে অন্ধরূপে ফেলিতেছেন। আমি যদি ব্রহ্মে প্রবেশ না করিতাম, তবে কেশববাবুকে সংশোধন করিয়া আসিতাম। মহাভারত পড়িয়াছ ও? ভীমের অহঙ্কার কেমন নির্বিন্যাসে নষ্ট করিয়াছিলাম।” আমি বলিলাম, “আমি তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব?” তিনি বলিলেন, “অসম

নষ্ট কর, আর প্রেম কর ; প্রেম, প্রেম, প্রেম।” ইহার পর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

দুর্গাপূজার ছুটিতে ভক্তগণের আগমন

এবার এই কার্তিক দুর্গোৎসব আরম্ভ। শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার ছুটিতে বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ দাস, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচরণ সেন, কলিকাতা হইতে শ্রীমান ভূতনাথ গোপ এবং ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দে প্রভৃতি আসেন।

ভোলাদাদা ঠাকুরের সেবাকার্য্যে লাগিয়া গেলেন। ঠাকুরের বজ্রাদি ধুইতেন ও কিছু কিছু অল্প সেবার কার্য্যও করিতেন। কিন্তু বাহা করিতেন অতি নিষ্কিঞ্চন ভাবে। ঠাকুর ভোলাদার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। অতি সাত্ত্বিক লোক। যে স্থানে বসে যে স্থানে যেন সম্বৎসর বিকীর্ণ করে। পূর্বে ইনি যখন হারিসন রোডের বাসায় প্রথম আসিয়াছিলেন, তখন একদিন ইনি ঠাকুরের ঘরের একটি কোণে বসিয়া ছিলেন। উহাকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর মোহিনীবাবুকে বলিলেন, “ঐ লোকটি যে ওখানে বসিয়া আছেন, তাহাতে যেন সমস্ত প্রাণ শীতল হইয়া যাইতেছে। উহাকে বুকে ধরিলেও বুক শীতল হয়।”

বরিশালের উকীল গোরাচাঁদবাবু একদিন ঠাকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া করঘোড়ে ঠাকুরকে বলিলেন, “আমার যাহা কিছু সমস্তই আপনার।” তাঁহার বিনীত ভাব দেখিয়া খুব ভাল লাগিল।

শ্রদ্ধেয় লক্ষ্মীচরণ সেন আমাকে বলিলেন, “আমি বাড়ী হইতে ভাবিয়া আসিয়াছিলাম, ঠাকুরকে প্রশ্ন করিব, আমাদের কোন কর্তব্য আছে কিনা? আমাকে আর প্রশ্ন করিতে হইল না। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, “চাষী যেমন ক্ষেতে হাল দেয়, মই দেয়, বীজ বপন করে, আরও

সমস্ত করে, পরে জলের নিমিত্ত আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে ; তদ্রূপ তোমাদিগকেও ভজন সাধনাদি সমস্ত করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে, তৎপরে ভগবানের রূপার নিমিত্ত তাঁর পানে তাকাইয়া থাকিতে হইবে।

ভূতনাথের প্রতি ঠাকুরের ব্যবস্থা

শ্রীমান ভূতনাথ গোপ পথে অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিয়া পুরীতে আসিল। ঠাকুরের আদর ও সম্মেহদৃষ্টিতে তখনই তাহার তাপিত প্রাণ জুড়াইয়া গেল। তিন চার দিন অবস্থানের পর একদিন ভোরে ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভূতনাথ, কোথায় কি কি দর্শন করিলে?” ভূতনাথ বলিল, “আমি কেবল সমুদ্র-স্নান করিয়াছি, কোথাও দর্শনে যাই নাই।” ঠাকুর কহিলেন, “গিয়ে জগন্নাথদেব দর্শন কর ; আর আর ঠাকুর দর্শন কর। আর এখানে মহাপ্রসাদ দিয়া পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহাও করিও।”

ভূতনাথ পরদিন এ স্থানের সমস্ত বিগ্রহাদি দর্শন করিল। ভূতনাথ পরদিন ভোরবেলায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া বসিলে ঠাকুর বলিলেন, “ভূতনাথ, কি কি দর্শন করিলে?” ভূতনাথ কহিল, “সমস্ত দর্শন হইয়াছে।” তখন ঠাকুর বলিলেন, “আজ সাক্ষীগোপাল গিয়েছিলে?” ভূতনাথ কহিল, “না।” ঠাকুর বলিলেন, “আজ সাক্ষীগোপাল যাও। দর্শন করে শীঘ্র বাড়ী চলে যাও।” তাহাতে ভূতনাথ বলিল, “আমি এখানে এক মাস থাকিব বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি।” ঠাকুর বলিলেন, “দর্শন শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সব হ’ল ; সংসারী লোক শীঘ্র বাড়ী যাওয়াই ভাল।” ভূতনাথ বলিল, “আপনি এ কথা বলছেন কেন? শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্ব ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছিলাম, তাতেও আপনি খুব আনন্দ প্রকাশ করে থাকতে বলেছিলেন। আর এখন সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি

তথাপি এত শীঘ্র যাইতে বলিতেছেন কেন ? ঠাকুর বলিলেন, “সংসারী লোক ; সংসার ছেড়ে এসেছ। দর্শনাদি হলো, আবার সংসারে যেয়ে কাজকর্মাদি দেখ।” ভূতনাথ কালবিলম্ব না করিয়া বাড়ী রওয়ানা হইল। বাড়ী পৌছিয়া দেখিল এক বৎসরের একটি ছেলের ডবল নিউমোনিয়া হইয়াছে। যাহা হউক, কোন প্রকারে ছেলে রক্ষা পাইয়াছিল।

বানরগণ ও কচুর মিঠাই

বরিশাল হইতে যাহারা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ঠাকুরের নিমিত্ত ‘কচুর মিঠাই’ আনিয়াছিলেন। বরিশালে উত্তম কচু পাওয়া যায়। কচু ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া মিষ্ট দ্বারা উহা পাক করিয়া ঠাকুরকে উপহার দিবার জ্ঞাত অতি যত্নের সহিত লইয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুরের ভাণ্ডারে উহা দিলে, ঠাকুর আমাকে বলিলেন, “এই মিঠাইয়ের কিছু বানরদের দেও।” আমি তাহাই করিলাম। বানরেরা উহা পাইয়াই খুব ত্রস্ত হইয়া আহার করিল কিন্তু একটু পরেই একটা বানর ঠাকুরের মুখের পানে কটুমটু করিয়া তাকাইয়া নখ দিয়া গলা আঁচড়াইতে লাগিল। ঠাকুর তখনই ডাকিয়া বলিলেন, “শীঘ্র মিষ্ট ও তেঁতুল দিয়া সরবৎ করিয়া দেও। কচুর মিঠাই খাইয়া ইহার গলা ধরিয়াছে।” ইনি কটুমটু করিয়া তাকাইয়া ইহাই বলিতেছেন, “তোমাকে বিশ্বাস করিয়া খাই, এ কি দিয়াছ ?” বানর সরবৎ খাইয়া শান্ত হইল।

দশম অধ্যায়

সতীশচন্দ্র

সতীশের দেহত্যাগ ও সংকার

নিশাবসানে উজ্জল নক্ষত্রবন্দ যেমন একে একে অদৃশ্য হয়, তেমনি করিয়া আমাদের প্রাণের প্রিয়তম বন্ধুগণ ধীরে ধীরে অন্য পবিত্র লোকে প্রস্থান করিতেছেন। ইহলোকে অনেকের ভ্রায় বিচরণ করিতেছি, তাই দুঃখ। এই সকল লোকের চিরাভিলষিত নিত্যধাম লাভেও আমরা অশ্রমোচন করিতেছি। ভগবানের কার্যের গূঢ় তাৎপর্য কে স্বপ্নময় করিবে? কেনই বা (মল্লম্ভ চক্ষে) অসময়ে এই সুন্দর কুসুমগুলি ফি করিয়া তিনি গ্রহণ করিতেছেন? কয়েকদিন হইল ভাই সতীশচন্দ্র দেড় দিন মাত্র জ্বর ভোগ করিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিলেন। তিনি ১৩০৪ সালের, ২ই অগ্রহায়ণ, একাদশী তিথিতে ৬ জন দ্বাত্রী পূজা দু'দিন পরে আমাদের কাছে ছাড়িয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন।

৮ই অগ্রহায়ণ, সোমবার সমুদ্র-স্নান হইতে আসিয়া জ্বর পড়িল। মঙ্গলবার বৈকালে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন নাড়ী নাই; অথচ কেন যে নাড়ী পাওয়া যায় না, বুঝিতে পারিলেন না। সাধারণতঃ শরীরের কোন বিশেষ যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হয়, কিন্তু সতীশের তদ্রূপ কিছু পরীক্ষা করিয়া পাওয়া গেল না। সরকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ভ্রাতার বাসায় বাইয়া ঔষধ দিলেন কিন্তু উহা খাইতে না পারায়

পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করা হইল। সতীশ ডাক্তারী ঔষধ একেবারেই খাইতে চাহিত না।

রাত্রি দুইটার সময় ব্রহ্মচারী ও সরলনাথ আসিয়া ঠাকুরের নিকট বলিল, “সতীশের শ্বাসকৃচ্ছ্রতা হইয়াছে, চক্ষু টানিতেছে, আর কেমন করিতেছে।” ঠাকুর বলিলেন, “সতীশকে এখনও তোমরা ঘরে রাখিয়াছ ? শীঘ্র বাহির করিয়া ফেলো। সে যে অনেকক্ষণ হয় আমার নিকট আসিয়াছে।” ইহা শুনিয়া সরলনাথ কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু অবিলম্বেই ঠাকুরের বাক্যে ধৈর্য ধরিল। উহার পরেই ব্রহ্মচারী, সরলনাথ ও জগবন্ধুবাবু আসিয়া সতীশকে বাহির করিয়া সম্মুখের রোয়াকের উপর রাখিলেন, মৃত্যুকালেও সতীশের মুখ প্রশন্ন। পরদিন সকালে শান্তিদিদি দেখিয়া বলিলেন, “উহার মুখ যেন স্বাভাবিক প্রশন্নতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে।” ব্রহ্মচারী, সরলনাথ ও শ্রীমতী ভূষণ শেষকালে বিশেষ পরিশ্রমের সহিত সতীশের সেবা করিয়াছিলেন।

সতীশ যে এত শীঘ্র দেহত্যাগ করিবে ইহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। দিদিমাতা তখন নিদ্রিতা ছিলেন। স্বপ্নে দেখেন, বিমলাময়ী সতীশকে কোলে করিয়া কঞ্চল জড়াইয়া লইয়া গেলেন। দাদাগোঁসাই সন্ধ্যাকালে আমাকে বলিলেন, “দেখ, সতীশ আর বাঁচবে না ; কয়দিন বাবৎ আমার বোধ হচ্ছিল, সতীশের আয়ু নাই।” তিনি পরে বলিলেন, “মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই সতীশ আমার নিকটে আসিয়া বলিল, ‘ঠাকুর আমাকে অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন।’”

সতীশ সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিল, অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উহার মৃত্যুতে কাহারও মুখে শোকের ছায়া দৃষ্ট হয় নাই। মৃত্যুর পরে আমি ভাবিতে লাগিলাম, কি আশ্চর্য্য, স্বামিজীর মৃত্যুতে এত ক্লেশ পাইয়াছি, ইহার মৃত্যুতে হৃদয়ে কোন উদ্বেগ আসিতেছে না কেন ?

অশ্বিনী, জগবন্ধুবাবু ও এখানকার সকলের মুখেই ঐ একই কথা। ইহা অদ্ভুত বটে।

মৃতদেহ দাহ করিবার জন্ত উত্তোগ চলিল। বাঁশের মাচায় করিয়া অশ্বিনী, ব্রহ্মচারী, নবকুমার বিশ্বাস মহাশয়, পণ্ডিত মহাশয়, সরলনাথ প্রভৃতি শব লইয়া স্বর্গদ্বারঘাটে গেলেন; ব্রহ্মচারী সতীশের দেহ সমুদ্র-জলে দ্বীপ করিয়া গব্যঘৃত সর্ষাপে লেপন পূর্বক ঠাকুরের অভিপ্রায়ানু-রূপ মস্তপূত করিয়া পবিত্র দেহ হোমাগ্নিতে আহুতি দিলেন। শুনিলাম সংস্কারায়ির অপূর্ব একপ্রকার রং হইয়াছিল।

বিশ্বাস মহাশয় বাসায় আসিয়া বলিলেন, “সতীশের দাহ সময়ে সকলেই আমরা একটা আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। মুর্দ্দফরাশ পর্য্যন্তও আনন্দ করিতে করিতে কাষ্ঠ বহিতে লাগিল।”

শবদাহ চলিতে লাগিল। অশ্বিনী ব্রহ্মচারীকে বলিল, “চল, একবার নিকটে গিয়া, কিরূপ দাহ হইতেছে, দেখিয়া আসি।” উহার চিতায় শব চাপাইয়া রৌদ্রের জন্ত দূরে বিশ্রাম করিতেছিল। উভয়ে নিকটে যাইয়া চিতাধূমে অপূর্ব সুগন্ধ পাইয়া মোহিত হইল। জগবন্ধুবাবুও এক অপূর্ব সৌরভ দিগ্‌মণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে অহুত করিলেন। অশ্বিনী বলিল, “তাহার হৃদয়ে এক অপূর্ব আনন্দ আসিল। ভগবানের ‘নাম’ ও গুরুদত্ত ‘শক্তি’ আপনা আপনি প্রবলভাবে খেলিতে লাগিল।” ঠাকুরের নিকট আসিয়া অশ্বিনী, ব্রহ্মচারী ও জগবন্ধুবাবু এ সকল কথা বলিলেন।

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “যাহাদের দেহ ভগবান স্পর্শ করেন, তাহাদের শব দাহ হইলে ঐরূপ সুগন্ধ নির্গত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুতনার ঘে স্পর্শ করিয়াছিলেন। তাহার শবদাহকালে গোপ সকল উহা হইতে ‘চতুঃসনের’ গন্ধ পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সতীশের দেহও

ভগবান স্পর্শ করিয়াছিলেন, এই চিতাধূমের স্মৃগন্ধই তাহার একটি নিদর্শন।”

মাঠাকুরাণী বোগমায়া দেবী ইহাকে আদর করিয়া একটি কোর্তা দিয়া গিয়াছিলেন। সতীশ কদাচ ওটিকে সঙ্গছাড়া করিত না। দেহ-ত্যাগের কালেও উহা গায়ে ছিল—যেন জানিয়া-শুনিয়া উহা গায়ে পরিয়াই দেহ রাখিয়াছিলেন।

সতীশের কামনা : ভাগবতী তনু লাভ

বাহার যে আন্তরিক কামনা ভগবান তাহাই তাহাকে প্রদান করেন, বিশেষত ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনি কখনও অপূর্ণ রাখেন না। সতীশের মনোগত অভিপ্রায় এই ধামে ঠাকুরের সমীপে দেহত্যাগ হয়। ঠাকুর তাহার সেই অভিলাষই পূর্ণ করিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সতীশ ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়া পুনঃপুনঃ বলিয়াছিল, “আপনার এইরূপ শরীর, প্রায়ই জ্বর হয়। কখন যে আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন বলা যায় না। স্বামিজীর পরম সৌভাগ্য পূর্বেই তিনি এই ধামের কৃপা লাভ করিয়াছেন। আমারও তাহাই ইচ্ছা হয়।”

জগন্নাথ বল্লভ মঠের পণ্ডিত বলিলেন, “সতীশ পুনঃপুনঃ তাঁহার নিকটে এই পরম পবিত্রধামে দেহপাত হয়, এইজন্ত আশীর্বাদ চাহিতেন। বলিতেন, ‘এই ধাম পরম পবিত্র, ইহার রজের অসীম পাবনীশক্তি, আপনারা কৃপা করিয়া আশীর্বাদ করুন যেন এই ধামে স্থান পাই।’ একদিন তিনি দেখিলেন, শ্রীমন্দিরে সতীশ জগন্নাথদেবের অগ্রে ষোড়হস্তে সজ্জননয়নে প্রার্থনা করিতেছেন, ‘যেন এই পবিত্রধামে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।’

সতীশ আমার নিকটও বলিয়াছিলেন, “তোমরা যে আমাকে এই স্থান হইতে আর ফিরাইয়া নিতে পার, বোধ হয় না।”

অশ্বিনী সতীশের মৃত্যুর পর শয়ন করিল, সে তন্দ্রাবস্থায় দেখিতে পাইল, সতীশ কুপের জলে স্নান করিয়া উহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। অশ্বিনী বলিল, “তোকে বেরু করে আসলাম, তুই মরা মানুষটা আমার কাছে আসলি কেন?” সতীশ বলিল, “যা বেটা, আমরা যদি নাই। আমার এই ক্ষমতা আছে যে, আমি সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারি।” অশ্বিনী বলিল, “আয়, তোকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া শ্রমশানে লইয়া যাই।” সে বলিল “ঐ মৃতদেহটা নিয়া সংকার করিয়া আয়।” অশ্বিনী আমাদিগকে বলিল, “অতঃপর সতীশ আমার সহিত হাতাহাতি করিতে লাগিল।” আমি বলিলাম, “তোকেই নিয়া যাই।” সতীশ বলিল, “আমার হাত ছাড়িয়া দে, চল ঠাকুরের ঘরে বেয়ে বসি।” সতীশ বেয়ে ঠাকুরের আসনের সম্মুখে বসিল। ঠাকুর উহাকে রাধাকুণ্ডের মৃত্তিকা দিয়া কপালে তিলক করিয়া সাজাইলেন। পরে আর কিছু মনে নাই।”

ঠাকুর এই স্বপ্ন শুনিয়া বলিলেন, “আমি বলিলে তোমরা বিশ্বাস করিতে না। মৃত্যুর পরে সতীশ টক্ করিয়া আমার কাছে আসিল। আমি কোলা হইতে রাধাকুণ্ডের রজঃ দ্বারা কপাল সাজাইয়া দিলাম। সতীশ অপ্রাকৃতিক ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছেন। এক বৎসর পরে শ্রীবন্দাবনে নিত্য রাসস্থলীর এক কোণে দাঁড়াইয়া উহা দর্শন করিতে অধিকার লাভ করিবেন। সতীশ ব্রজাঙ্গনা হইয়াছেন, কর্ণে কুণ্ডল হুলিতেছে, ষাণ্ণরা পরিয়াছেন। আমি বলিলাম, ‘বেশ একটু নৃত্য কর দেখি?’ সে অমনি হাত তুলিয়া নৃত্য করিয়া দেখাইল।”

দাদাগোসাই বলিলেন, “মৃত্যুর পরক্ষণেই সতীশ হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিয়া বলিল, ‘কর্ত্তা, চল্লাম।’”

জগন্নাথ বল্লভ মঠের পণ্ডিতজী বলিলেন, “রাত্রে, আমাকেও স্বপ্ন দিয়া

গিয়াছে, “দেখুন, এতদিন প্রসাদ দিয়াছি, এখন আর পারুব না, কুপা করিবেন।” এই পণ্ডিতটিকে ঠাকুরের আদেশক্রমে সতীশ রোজ মহাপ্রসাদ দিয়া আসিতেন।

পুরীতে সতীশের দৈনন্দিন কার্য্য

সতীশের প্রতিদিনের জীবনী অতি সুন্দর। ইনি কদাচ বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। কখন পাঠে, কখন শাস্ত্রালোচনায়, কখন সংপ্রসঙ্গে, কখনও বা অন্নের সেবায় দিন কাটাইতেন।

আজকাল সতীশ খুব ভোরে চারিটার সময়ে উঠিয়া ঠাকুরের ভোর কীর্ত্তন শুনিতেন। সকালবেলা ঠাকুর যখন সমুদ্র-স্নান করিতে যাইতেন, সতীশ ঠাকুরের বসিবার জন্ত কয়ল, ঘটি, গামছা লইয়া পিছনে পিছনে দৌড়িতেন। পথে প্রতিদিন দশ পয়সা কবীরপন্থী বাবাজী ও আর একটি সাধুকে দিয়া সমুদ্রপারে পৌঁছিতেন। সমুদ্র-স্নান করিয়া বাসায় ফিরিবার সময়ে সতীশচন্দ্র অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া মন্দিরে যাইতেন। তথায় শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া, এক অধ্যায় গীতা পাঠ করিতেন। পরে এক পয়সার মুড়কি প্রসাদ কি কখন আম খাইয়া বাসায় আসিতেন।

স্নানান্তে আসিয়া আনন্দ-কলহযোগে মুড়কি ও কখন কখন ক্ষীর প্রসাদ পাইতেন। সমুদ্রের পারে যাইয়া ব্রহ্মচারী অশ্বিনীর সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া কলহ করিতেন। ‘পাকাল মহাপ্রসাদ’ পাইয়া ঠাকুরের জন্ত ‘পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য’ নকল করিতেন, কখনও মুনসেফবাবুর বাড়ী ছেলেপিলে পড়াইতে যাইতেন। ছেলে পড়াইয়া যে অর্থ পাইতেন তদ্বারা মাতৃসেবা ও ধার শোধ করিবেন, এই অভিপ্রায় ছিল। বানরের জন্ত ছোলা, কলা, পেয়ারাও ঐ পয়সা হইতে দিতেন।

একদিন সতীশ আমাকে বলিলেন, “দেখ, চরিতামৃত পাঠ শুনিলে

আমার গরম মাথা স্নিগ্ধ হয়, নচেৎ অস্থিরতার সীমা থাকে না, তাই শত প্রযত্নে পাঠের সময় উপস্থিত হই।”

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতির পাঠ শুনিয়া সতীশ পুনরায় পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য নকল করিতেন। পরে এগারটার সময়ে আমরা উভয়ে জগন্নাথ বল্লভ উদ্ভানে স্নানার্থে যাইতাম। নির্জনে এই সময়ে আমরা পরস্পরের ভজন সংক্রান্ত অনেক কথাবার্তা বলিতাম। একদিন সতীশ বাগান হইতে কুড়াইয়া কতকগুলি চন্দনবীজ, ধানের শীষ, বগ্নফুল আনিয়া ঠাকুরকে উপহার দিলেন, তিনি উহা অতি সাদরে গ্রহণ করিলেন।

সতীশ স্নান করিয়া কিছুক্ষণ গায়ত্রী জপ করিতেন। “হুর্গা”, “হুর্গা” বলিতেন। নিদ্রা হইতে উঠিবার সময়ে এবং অল্প সময়েও মধ্যে মধ্যে “হুর্গা” নাম আওড়াইতেন, স্নানের সময় আমরা বড়ই আনন্দ করিতাম, জলে পা ধরিয়া টানিতাম ও নানারূপ কৌতুক করিতাম।

এদিকে ঠাকুরের মধ্যাহ্ন আহার শেষ হইলে শ্রীযুক্ত পান্নালাল ঘোষ আসিয়া মহাভারত পাঠ করিত। সতীশ ঠাকুরের কিছু প্রসাদ পাইয়া পাঠ শুনিতে বসিতেন। সতীশ এই সময়ে মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের সহিত ধর্ম-লোচনাও করিতেন, ইহা বড়ই মধুর লাগিত। একদিন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন “সতীশ, কেমন আছ?” সতীশ আবদার করিতে করিতে বলিলেন, গুরু যদি কৃপণ হন, তবে আর আনন্দ কোথায়?” ঠাকুর শুনিয়া হাসিলেন। সতীশ বলিল “অতঃপর সারাদিন আনন্দে কাটাইলাম।”

অপরাত্নে প্রসাদ পাইয়া সতীশ জগন্নাথ বল্লভ উদ্ভানের পণ্ডিতজীকে ও নরেন্দ্রের পারের গৌসাই প্রভুকে মহাপ্রসাদ দিয়া আসিতেন। গৌসাই প্রভু বলিতেন “আহা! এমন লোক, প্রসাদ দিয়াই নমস্কার করিয়া বোড় হস্তে দাঁড়াইয়া থাকে, চরিত্র ও ব্যবহার কি স্নন্দর!”

ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া হইলে তাঁহার সমীপে বসিয়া সতীশ গর

করিতেন ও শুনিতেন। অতঃপর সন্ধ্যা হইলে মুন্সেফবাবুর ও ইন্সপেক্টর-বাবুর ছেলেদিগকে পড়াইতে বাইতেন। আটটা সাড়ে আটটার সময়ে আসিয়া কিছু মুড়কি প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতেন। পরে দশটার সময়ে তাহাকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া দিতাম। তখন ঠাকুরের নিকটে 'বট্‌সন্দর্ভ' 'বৃন্দাবন বিহার' ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। আমরা শয়ন করিয়া ইহা শুনিতাম। ঐ সময়ে ঠাকুরের সহিত যেরূপ কৌতুক ও আশ্রয়-প্রমোদ সহকারে ভগবলীলা চর্চা করিতেন উহা শুনিয়া বড়ই আনন্দ পাইতাম।

ঠাকুর রাত্রিতে কখন কখন সতীশের লিখিত 'শ্রীবৃন্দাবন-পরিজ্ঞাপন' শুনিতেন। শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। শাস্ত্রের কথা আলোচনায় সতীশ বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন। এইজন্ত ঠাকুর নিজে শাস্ত্রোদ্ঘাটন না করিয়া সতীশের দ্বারা করাইতেন। সতীশের প্রণীত 'বৃন্দাবন-পরিজ্ঞাপন' আসনের গ্রন্থের মধ্যে যত্ন সহকারে রাখিয়া দিয়াছিলেন; বানরবধের বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রবন্ধগুলি ছাপাইয়া দিতে প্রোৎসাহিত করিতেন।

শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া সতীশ কিছুদিন সকলের সেবার উদ্দেশ্যে পায়খানা পরিষ্কার করাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেথর ডাকিয়া পুনঃপুনঃ উহাদের দ্বারা পায়খানা পরিষ্কার করাইয়া লইতেন, চূণ দেওয়াইতেন, ফিনাইল দেওয়াইতেন।

সতীশের প্রতি মহাপ্রসাদের কৃপা

সতীশ পাকালের ভিতর ডাল, তরকারী, টক প্রভৃতি একত্র করিয়া রাখিতেন। সতীশের মুখ হইতে খুব লাল পড়িত। কিছু কিছু খাইয়া উহা আবার পুনরায় খাইবেন বলিয়া রাখিয়া দিতেন। ঘৃণাতে উহা অপর কেহ খাইত না, যখনই ক্ষুধা লাগিত সতীশ অমনি দুই গ্রাস খাইয়া আসিতেন। তাঁহার পাকাল প্রসাদ সর্বদাই থাকা চাই; দুইদিনের বাসিই বা

কে জানে আর চারদিনের বাসিই বা কে জানে। একদিন তাঁহার ঐ রূপণের ধনের ত্রায় গলিত মহাপ্রসাদে পোকা দেখা দিল। সতীশ ঐ পোকা বাছিয়া বাছিয়া পরম আদর ও শ্রদ্ধার সহিত ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিলেন “সতীশকে মহাপ্রসাদ রূপা করিয়াছেন।”

একদিন পচিয়া ও পোকা পড়িয়া পাকাল এমনি খারাপ হইয়াছিল যে, সতীশ ঠাকুরের নিকটে দুঃখ করিয়া বলিলেন “আজ আর পারলাম না।” কিন্তু সতীশ ঐ প্রসাদই পরম শ্রীতির সহিত প্রণাম করিয়া কিছু কিছু খাইতে লাগিলে দুই একদিন পরে দেখা গেল কি আশ্চর্য্য ঐ প্রসাদে আর পোকা নাই। সতীশ বলিত, “মহাপ্রসাদ খাইলে মন প্রশান্ত হয়।” আদি একদিন উহাকে বলিলাম, “তাই প্রসাদ তো খাইতে পারি না, কি করব।” সতীশ বলিল, “জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ পাস্। তাহলে আর অরুচি থাকিবে না।” সতীশকে দেখিতাম প্রতি গ্রাসে নমস্কার করি প্রসাদ পাইতেছে। একদিন বলিল, “স্বভদ্রা মায়ীর কি রূপা; তিনি আজ প্রকাশিত হইয়া আমাকে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন।” বহুদূর মহাপ্রসাদে সতীশের বৈরাগ্য শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়াছি, এমন আর কাহারও দেখি নাই।

শুধু মহাপ্রসাদ পাইতে পাইতে সতীশের শরীরে একরূপ অপূর্ণ সৌন্দর্য্য হইয়াছিল। মহাপ্রসাদ মাত্র খাইয়া এইরূপ অপূর্ণ সুস্থতা ও সতেজতাব কাহারও দেখি নাই। তাঁহাকে সর্বদা আনন্দে প্রফুল্ল দেখিয়াছি। রথের সময়ে মহাপ্রসাদ পাওয়া যায় না; ঐ কয়েকদিন ঠাকুরের জন্ত ব্রহ্মচারী ও দিদিমাতা রান্না করিতেন। সতীশ ঠাকুরের প্রসাদ পাইতেন, এই নিয়মের কদাচ লঙ্ঘন করিতেন না। প্রথমবার জ্বরে বেগ পাকালের জল খাইতে খাইতে আরোগ্য হইলেন। অতঃপর আবার কান্না আসিয়া গ্রাস করিল। আর আমাদের প্রাণের বন্ধু নীরবে চলিয়া গেলেন।

সতীশের শাস্ত্র-বিশ্বাস : ব্রহ্মচারীর সহিত কলহ

সতীশ শাস্ত্রে অত্যন্ত দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। শাস্ত্রে বাহ্য আছে, তাহা বেদবাক্য, নিজের প্রত্যক্ষ হইতেও শাস্ত্র অধিক প্রামাণ্য, এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। একদিন ঠাকুরের নিকট বলিলেন, “শাস্ত্রে যে আছে, ‘যুক্তি-হীন বিচারেণ বুদ্ধিনাশঃ প্রভায়তে’ এখানে যুক্তি অর্থ শাস্ত্রীয় যুক্তি। নিজের বুদ্ধি বিঘ্না কিছু নহে, বজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ। আজ বাহ্য সিদ্ধান্ত করিলাম, কাল তাহার পরিবর্তন হইতেছে। শাস্ত্র সৎ, অপরিবর্তনশীল, সত্য,—যোগী ঋষিরা উহা দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন। বিচারের সময়ে শাস্ত্রবাক্যই প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইবে।”

সতীশ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কথা কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। একদিন একটি ঘটনা ঘটিল। ব্রহ্মচারী, সতীশ প্রভৃতি সমুদ্র-স্নান করিয়া আসিতেছেন। শ্রীমন্দিরের নিকটে আসিয়া সতীশ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, “চল ভাই, জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া আসি।” ব্রহ্মচারী ত্রস্ত হইয়া আসিতেছেন, ঠাকুরের ‘চা’ খাইবার সময়ে বাতাস করিবেন। তাঁহার ঐ কথা ভাল লাগিল না; বলিলেন “যা, যা, আমাদের ওসব কিছুর প্রয়োজন নাই। আমাদের যিনি লক্ষ্য তাঁহার চতুর্দিকে কত জগন্নাথ, বলদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণ, গৌর নিতাই, ঘুরিতেছেন।” সতীশ উহা শুনিয়া রাগিলেন এবং তখন চুপ করিয়া দর্শনে গেলেন। বাসায় আসিয়া ঠাকুর যখন আহ্বারান্তে বসিয়াছেন, তখন বলিলেন “দেখুন, কৃষ্ণ কি ভগবান নন?” ঠাকুর বলিলেন, “একথা বলছ কেন? আমি কি কখনও এ রকম বলিয়াছি।” তখন সতীশ বলিলেন “ব্রহ্মচারী বলিল, ‘আপনি নাকি এরূপ কথা বলিয়াছিলেন।’” ঠাকুর তখন ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, “কি ব্রহ্মচারী, রাধাকৃষ্ণ ভগবান নন এরূপ কথা আমি তোমাকে বলিয়াছি বলিয়া তুমি

নাকি সতীশকে বলিয়াছ ?” ব্রহ্মচারী বলিলেন, “আমি ওরূপ কথা কিছু বলি নাই।” এই সময়ে সতীশ ও ব্রহ্মচারীতে ঝগড়া বাধিল। অনেক তর্কাতর্কি হইল ; তখন ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে বলিলেন, “আমাদের যিনি লক্ষ্য তাঁর চারিদিকে কত জগন্নাথ, বলদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি ঘুরিতেছেন, এরূপ কথাই আমি বলিয়াছি। গেণ্ডারিয়াতে আহা করিতে করিতে আপনি ভাবাবেশে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন ; তাহা এখনও আমার ডায়েরী হইতে দেখাইতে পারি।” ঠাকুর বলিলেন; “তুমি বল তোমাদের লক্ষ্য কি ?” ব্রহ্মচারী বলিলেন, “সদগুরুই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর তাঁহার আদেশ প্রতিপালনই আমাদের জীবনের কর্তব্য। এই সদগুরুর চতুর্দিকে কত দেব, দেবী, ঋষি, মুনি এমন কি স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইলেও না ঘুরিয়া নিস্তার পান নাই।” ঠাকুর আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন, “আমার ভাবাবেশের অনেক কথা তোমার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছ। এই সমস্ত পোড়াইয়া ফেল। কোন্ সময়ে কি ভাবে আমি কি বলি তাহা লোকে বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার গোলমাল করিবে।” এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারীর খুব ক্লেশ হইতে লাগিল। পরে রাত্রি ২টার সময়ে ঠাকুর ব্রহ্মচারীর অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, “যেমনটি লিখে যাচ্ছ, লিখে যাও, তোমাকে বলা শুধু আমার উদ্দেশ্য নয়।”

বিদেহমুক্ত অবস্থা : মহাত্মা ক্ষেপাটাদ

একদিন জগন্নাথ বল্লভ উদ্ভানে সতীশ আমাকে বলিলেন, “পূর্বে আমাদের সাধনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিত। কেহ কেহ মন্ত্র জপ করিয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে পারিতেন।

দশম অধ্যায়

২০৫

লালজী (আমাদের গুরুভাই, শাস্তিপুরে বাড়ী ছিল) এক একটি মন্ত্র একদিনে সাধন করিতে পারিতেন। সকালবেলা হইতে সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত একখানা কপাটের উপর একভাবে শয়ন করিয়া ‘গোপাল মন্ত্র’ সাধন করিয়াছিলেন। অনেকে লালকে গুরুর মত দেখিত। আমি ঐরূপ করিতাম না, তার কাছেও বৈসিতাম না। মনে করিতাম একজনের আবার দুই গুরু, ব্যভিচার। একদিন দাঁড়াইয়া আছি, দেখিলাম লালজী আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কান দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম, লাল আমাকে আয়ত্ত করিতেই একরূপ করিল।”

আমি বলিলাম, ঠাকুর বলিয়াছেন, প্রয়াগে কুম্ভমেলায় সময়ে তিনি একদিন রাত্রিতে প্রস্রাব করিবার জন্ত, গঙ্গার চড়ায়, তাঁবুর বাহিরে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে ফেপাটাদও তাঁবুর বাহিরে যান এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় মত তাঁহাকে সশরীরে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান দর্শন করাইয়া আট দশ মিনিট মধ্যে আবার তাঁবুর কাছে লইয়া আসেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, “ইহার বিদেহযুক্ত, ইহার নিজে সশরীরে তো যথা ইচ্ছা যাইতে পারেনই, অধিকন্তু ইচ্ছা হইলে অপরকেও সশরীরে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন।” সতীশ বলিলেন, “এসব খুব সত্য। একদিন গুরুজী কৃপা করিয়াছিলেন। দেখি শরীর হইতে বাহির হইয়া রাস্তা, ঘাট, বাগানগুলি পরিষ্কাররূপে দর্শন করিতেছি। দিব্য নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী, ঐ রাস্তা, ঐ গুবাক্ষ বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।”

আমি বলিলাম, “দেখ, কুতু (ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা) যেদিন দেহ-ত্যাগ করে, সেদিন জামালপুরে উহাকে স্বপ্নে দেখি; বলিলাম, “কুতু আমার কি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে?” কুতু বলিলেন, “হঁ।” সতীশ বলিল, “আমি ময়মনসিংহে থাকিয়া স্কুলে পড়াইতেছিলাম, এমন সময় উহার জন্ত

হঠাৎ এমন একটা টান অনুভূত হইল যে আর পড়াইতে পারিলাম না, বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, কুতূ দেহত্যাগের সময়ে আমাকে কৃপা করিয়া জানাইয়া ছিলেন “তোমার ব্রজ প্রেম লাভ হইবে”। ইচ্ছিতে জানাইলেন তাহারও উহা লাভ হইবে।

একদিন আমি বলিলাম, “চন্দ্রাবলী ও রাধারাণীর সহিত বাগড়া হইল তাই বোধ হয় চন্দ্রাবলীর প্রেম সকাম বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রজে সফল প্রেম নাই।” সতীশ বলিল, “আরে থু, থু, থু! চন্দ্রাবলী শ্রীমতীর দাসীর উপযুক্তাও নহে।” এই বলিয়া কণ্ঠে অঙ্গুলি দিতে উদ্বৃত্ত হইল।

সতীশ বলিল, “একটু ভাব হইল, চক্ষের জল পড়িল, উহাতে কিছু হয় না। আমারও ঐরূপ চের হইয়াছে, সাধন যখন পাই একটি ধর্মের কথা শুনিলেই অনর্গল চক্ষে জল পড়িত। চারি পাঁচ মিনিট এত চলিত, নাক দিয়া পোঁটা পড়িত; ঠাকুর একবার সমুখস্থ এক ব্যক্তির নাকের কফ মুছাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন।”

সতীশের পরিচয়

সতীশচন্দ্র ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বিক্রমপুর, বাখরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় ইনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, আর্থিক অসচ্ছন্দে সত্ত্বেও নানারূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়া পড়াশুনা করিয়াছিলেন। এন্ট্রান্স এবং এফ. এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া উচ্চবৃত্তি পাইয়াছিলেন কিন্তু কোনও আকস্মিক কারণে বি. এ. পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রথম জীবনে তীব্র ধর্মলাভের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সতীশচন্দ্র উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে থাকা কালীন ১২৯৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার নিকটে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি সমষ্টিপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন।

দশম অধ্যায়

২০৭

সমস্তিপুরে স্কুলে থাকা সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। উহা শুনিয়াই কাজকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক একবস্ত্রে ঠাকুরের নিকট শ্রীবৃন্দাবনের দিকে রওনা হইলেন। পথে রাইতে বাইতে একটি সাধু দর্শন করেন। তাঁহার প্রতি সতীশের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ঐ সাধুটি সতীশকে শিষ্য করিবার অভিপ্রায়ে নানারূপ বুজঝুকা দেখাইল। সতীশকে দিয়া তাহার বোঝা টানাইতে লাগিল। একদিন পথে যাইতে যাইতে ঐ সাধুটি বলিল “এই বোঝা ভুতে টানিত।” সতীশ ইহা শুনিয়া এবং ইহার অভিপ্রায় ভাল নহে অবগত হইয়া, বোঝা ফেলিয়া দৌড় দিলেন। ঐ সাধুটিও পিছনে পিছনে ছুটিল এবং সতীশকে চিমটা দিয়া খুব প্রহার করিতে লাগিল। সতীশ একটা কূপে লক্ষ্য দিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। কয়েকটি রাখাল সতীশকে বহুক্রমে উঠাইয়া একটি বৃক্ষতলে রাখিয়া গেল। সতীশও ঐ সময়ে প্রহারের আঘাতে অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থায় ঐ বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিলেন। সতীশ বলিয়াছেন, ভগবানের বিশেষ রূপা তখন তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া ঐ বৃক্ষের নিকটে আহারের জন্ত প্রার্থনা করিলেন। হঠাৎ ঐ বৃক্ষ হইতে একটি সুপক্ক ফল সতীশের সম্মুখে পড়িয়া দ্বিধা হইয়া গেল। সতীশ উহা খাইয়া সুস্থ হইলেন। পরে অনুসন্ধান করিয়াও ঐ বৃক্ষে কোন ফল দেখিতে পাইলেন না। সতীশ ঐ বৃক্ষমূল হইতে উলঙ্গ অবস্থায় চলিলেন, পরিধেয় বসন কূপে পড়িয়া গিয়াছিল। অনন্তর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিলেন, অঙ্গের বস্ত্র নাই, ছেলেরা গায়ে ধূলা দিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই জক্ষেপ নাই। একদিন একটি স্ত্রীলোক ইহার এই অবস্থা দর্শনে দয়ার্জ হইয়া একখানা পরিধেয় বস্ত্র দিল ও কিছু আহার করাইয়া ইহাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিল। এই স্থান হইতে রওনা হইয়া সতীশ শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুরের নিকট পৌঁছিলেন।

এই সকল ঘটনা শুনিয়া আমরা উহাকে আদর করিয়া 'পাগল' বলিয়া ডাকিতাম। সতীশের চরিত্র ঠিক একটি বালকের মত ছিল। অসময় তাহার বালকোচিত চাঞ্চল্য বড় মিষ্ট লাগিত। একদিন মোহিনী বাবুকে দেখিয়াই তাঁহার তিলক চাটিয়া নিল। সরলনাথ ঐমনি হইতে সকলের জ্ঞাত খাওয়া লইয়া আসিতেছে; হাতে এক কানড় ঘায়াই উহা পড়িয়া গেল উহা লইয়া দৌড়িল। কোনও সময়ে পাঁচ মাসাত মাস পর্য্যন্ত কেবল জল ভাত আহার করিত। মিষ্ট খাইবেন কয়েক মাস পর্য্যন্ত এই ব্রত পালন করিল।

ইলিস মাছ খাইতে ইচ্ছা হইল, কয়েক মাস কেবল ভাত আর ইলিস মাছ আহার করিত। এইরূপ কিছুদিন কেবল বেগুন, কেবল ঘৃত আর কেবল পিঠা খাইত। এখানে আসিয়া জগন্নাথদেবকে নারিকেল জল দান করিয়াছিল, কিন্তু সে নারিকেল খাইতে ছাড়িবে না। জিজ্ঞাসা করিলে, "হঁ। বেটা, আমি তো নারিকেল জল দান করিয়াছি, নারিকেল কি?" একবার চশমার টাকার জ্ঞাত উহাকে চিঠি লিখিয়াছি, চিঠি চশমা আঁকিয়া দিল। মোহিনীবাবুকে বড় ভালবাসিত; তাহার কাঁচ চুরি করিবে, গাত্রবস্ত্র নিবে। মোহিনীবাবুও উহাতে খুব সন্তুষ্ট। ঠাকুর বৃন্দাবন-পরিক্রমার সময় প্রায়ই বৃষ্টি হইত এবং তাহাতে তাঁহার বস্ত্র কল্লাদি ভিজিয়া যাইত। সতীশ ঠাকুরের সিন্ধু বস্ত্র ও কল্লা মিষ্ট ওয়ালার দোকান হইতে আগুনে সঁকিয়া শুকাইয়া আনিয়া দিতেন। ঠাকুর কতবার গল্প করিয়া বলিতেন, "সতীশ বড় যত্ন করিয়া শুকাইয়া আনিয়াছিল।"

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত জামাল মহকুমার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সতীশ গুরু পরিবারকে নিজ পরিবার হইতেও আপন মনে করিতেন।

দশম অধ্যায়

২০৯

কার্যস্থান হইতে তৈল, ঘৃত, বেগুন প্রভৃতি ভাল জিনিষ ঠাকুরের জন্ত লইয়া আসিতেন। পার্শ্বেলৈ জিনিষ পাঠাইবার জন্ত খালি টিনগুলি লইয়া যাইতেন; হারিসন রোডের বাসায় এক সময়ে বড়ই অর্থাভাব হইয়াছিল, সতীশ তিন শত টাকা ধার করিয়া পাঠাইয়া দেন। এখানে আসিয়া ছেলে পড়াইয়া উহা শোধ করিতে যত্নবীল হইয়াছিলেন।

অকস্মাৎ ঠাকুর পুরুষোত্তম যাত্রা করিবেন শুনিয়া সতীশ পাগলের মত হইলেন। তখনই কোর্ট প্যান্ট লেন পরা অবস্থায় পদব্রজে জামালপুর হইতে হাঁটিয়া মৈমনসিংহে আসিলেন। ওখানে তাঁহার ছোট ভাই শ্রীশ প্রভৃতি তাঁহাকে ঐ বেশে দেখিয়া খুব আশ্চর্যান্বিত হইলেন। সেস্থান হইতে কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরের সহিত পুরী যাত্রা করেন।

সতীশ তাঁহার ছাত্রদিগকে পিতামাতার স্থায় যত্ন করিয়া পড়াইতেন। কলিকাতা হারিসন রোডের বাসায় দেখিয়াছি, নিজের অর্থে ছেলেদের জন্ত নানারূপ সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ কিনিয়া দিতেন। তাঁহাকে ছেলেরা অত্যন্ত ভালবাসিত। মুসেফবাবুর ছেলেরা বলিত, “আমাদিগের এত মাষ্টার হইয়াছে, কিন্তু এমনটি আর হয় নাই।” তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীতে হেড্ মাষ্টার প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

একদিন সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটের বাসায় দেখিলাম, ঠাকুর দোতলায় হাত মুখ ধুইয়া স্নান করিতেছেন। ঐ জল নর্দমা দিয়া পড়িতেছে। সতীশ ঐ নর্দমার নীচে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ জলেই সতীশের স্নান হইয়া গেল। সতীশ আমাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া অহুনয় করিয়া বলিলেন, “দেখিস, এই কথা কাহাকেও বলিস্ না।”

শ্রীক্ষেত্রে বাসকালে সতীশের বানরমারার বিরুদ্ধে ও বল্লিরের গায়ে পায়খানা ভাঙ্গার জন্ত পরিশ্রম বড়ই অদ্ভুত। স্বামিজী ও সতীশ উভয়েই প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন বটে, কিন্তু সতীশ স্বামিজীর অভাবে,

তাহারও ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর বানরের চিন্তায় ঘুম হইত না; সতীশ উহাদের ক্রেশে জ্বর হইয়া দশ বার দিন ভুগিয়াছিলেন। আমি একদিন বলিলাম, “সতীশ, তুই যে বানরের জন্ত খাটিয়া খাটিয়া হইয়া পড়িয়াছিলি, তুই যদি মরিস্ তবে তোরা চরিত্র লিখিলে ইহা লিখিব।” সতীশ বিনয় সহকারে বলিল, “স্বামিজী আমার চেয়ে জে পরিশ্রম করিয়াছেন।” সতীশ প্রায় সমস্ত বড় বড় চিঠি টেলিগ্রাম প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন। প্রায়ই এই সম্বন্ধে কোথায় কি আলোচনা হইতের খবর রাখিতেন।

একদিন উকিল বড় হরিশবাবু, মালা তিলকাদি বৈষ্ণব লক্ষণ ধারণ করিলেই ধর্মজগতে বিশেষত্ব লাভ করা যায়, এরূপ বলিলে ইহার বিরুদ্ধে সুন্দর শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়া সতীশ বলিলেন যে, ধর্ম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, শাস্ত্রেও আছে :

নারিরতো দুশ্চরিতান্ না শাস্তো না সমাহিতঃ ।

নাশাস্তো মানসো বাপি প্রজ্ঞানে নৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

দুষ্কর্ম হইতে ক্ষান্ত না হইলে, প্রাণ অপবিত্র থাকিলে, কেবল জ্ঞানে দ্বারা তাহাকে পাওয়া যায় না।

সৃষ্টিতত্ত্ব

একদিন কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ঠাকুর অবস্থিতি করিতেছিলেন। সমস্ত দিন ঘরটি লোকে পরিপূর্ণ ছিল। রাত্রিতে ভক্তগণ অনেকেই চলিয়া গেলে পর, সতীশ, শ্রীযুক্ত হরিমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার এবং আরও দুই চারিজন ঠাকুর কাছে রহিয়া গেলেন। রাত্রি গভীর হইলে সতীশ, হরিমোহনবাবু বিধুবাবু ব্যতীত আর সকলেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঠাকুর বলিলেন

লাগিলেন, “মা আমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমার আর অভাব নাই, আর হইবেও না। পরিবারের লোকেরা কেন বলে, ইহা নাই, উহা নাই। মা বলেছেন, সব অভাব পূর্ণ হইবে, আর চিন্তা নাই।” সতীশ ও অগ্র দু’টি ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিলেন, “তোমরা বড় অজ্ঞ। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকজন মানস পুঞ্জের উৎপত্তি করিলেন। কিন্তু দেখিলেন তাহারা জন্মমাত্র বিষয়ে অনাসক্ত ও ধ্যান-পরায়ণ। তখন বিন্দুপাত দ্বারা প্রচলিত প্রণালীতে সন্তান উৎপাদন করিলেন। সেই হইতেই এক লোক সৃষ্টি। সেই বিন্দু আমাদের শরীরেও আছে। এই বিন্দু রক্ষা করিতে পারিলে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।” তাহার পর উহা রক্ষা করিবার উপায় বলিলেন ও একটি মন্ত্র বলিয়া দিলেন। দুই একবার উচ্চারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “দেখ দেবর্ষি নারদ এই গুহ্য বস্তু প্রকাশ করিতে বাধা দিতেছেন। দেবর্ষিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন নারদ, বীণাযোগে হরিগুণ গান করিয়া তুমি পরমানন্দে দিন কাটাও, তুমি জীবের হৃৎকি বুঝিবে? মা আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি এই গুহ্য তত্ত্ব বলিলাম।”

একাদশ অধ্যায়

পুরী অবস্থান

জগন্নাথদেবের আগমন ও কৌতুক

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৫ সাল।

আজ বেলা ২টার পর ঠাকুরের নিকট বসিয়া আছি। ঠাকুর বলিলেন, “জগন্নাথদেবের কত কৃপা। তিনি বলিলেন ‘আমিই তে আসিয়া তোকে দেখা দি, তোর যাওয়ার দরকার কি?’ জগন্নাথদেব সকালে পূজার পর প্রায়ই আসেন। কখন আচারীদের দ্বারা তিলক, কখনও ছেলেপিলের মত, কখনও অশ্রুপূর্ণ। কাল রাত্রে তোমার পাঠে সময় আসিয়াছিলেন। আমি তাতে এত বিব্রত হইয়া পড়িলাম যে তোমার পাঠ শুনা হইল না। তিনি কত কৌতুক করেন, পাগলের মত কত বলেন। তিনি বলিলেন, ‘তুই বৃন্দাবনে মাড়োয়ারীদের সেই ঠাকুর দেখেছিস্?’ আমি বলিলাম, ‘হাঁ কেন?’ তিনি বলিলেন, ‘আমরা তোর মুখ দেখেছিস্ তো? আমি সেখানে তুই হয়ে বসে আছি।’

ঠাকুর বলিলেন, ‘মাড়োয়ারীরা কতবার ফরমাইস দিল, কিন্তু প্রতিবারেই বিগ্রহ একরূপই হইল।’ শুনিলাম বিগ্রহের মুখশ্রী ঠিক ঠাকুরের দ্বারা। উহা শেঠদের মন্দির হইতে মিঠায়ের দোকানগুলি যে গলির দ্বারা গোবিন্দবাজারের নিকট তীর্থমণির কুঞ্জের পথে। ঠাকুর ঐ বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর আবার বলিলেন “জগন্নাথদেব রাজরাজেশ্বর, তাঁহার দরবার

যাইয়া মাথা ঠুকিয়া আসিতে হয়। জগন্নাথ আরও বলিলেন, তোকে এত বুঝাই, তবু বুঝিস না। ঢেউ কাটাইয়া কাটাইয়া যাইতে হয়। সতীশের উপর দিয়াই বুঝি কাটিয়া গেল। কিছু বুঝিও না, পাগলের মত কত বলেন। আমাকে এই কয়মাস ঘরে বসাইয়া রাখিলেন বোধ হয় এই জন্য।”

মিষ্টবাক্য ও ভক্ত হনুমান

ঠাকুর বলিলেন, “মিষ্ট বাক্য বলা অতি প্রয়োজন। শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন, হনুমানকে ভাণ্ডারী রাখিলেন; হনুমান প্রাণ ভরিয়া দান করিলেন। হনুমান, যে ব্রাহ্মণ বাহা চাহিতেন, তাহাই দিতেন। তবে মুখে ভেঙুচি দিতেন। খেচর-মেচর করিতেন। উহাতে ব্রাহ্মণেরা ভয় পাইতেন। সর্বদর্শী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ইহা জানিতে পারিলেন। তিনি হনুমানকে বলিলেন, “তুমি নীলপদ্ম আহরণের নিমিত্ত হিমালয়ে যাও।” হনুমান অমনি তথায় যাইয়া উপস্থিত। দেখিলেন, সর্বাদ্ভুন্দর একটি স্বর্ণকায় পুরুষ বসিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার মুখ শূকরের মত। ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হনুমান জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এমন সুন্দর, সর্বাদ্ভু স্বর্ণময় কিন্তু মুখ শূকরের মত কেন?” তদন্তরে তিনি বলিলেন :

নানা দানং ময়া দত্তং রত্নানি বিবিধানি চ।

ন দত্তং মধুরং বাক্যং তেনাহং শূকরমুখঃ ॥

হনুমান বুঝিলেন, তাঁহার শিক্ষার নিমিত্তই শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ করিয়াছেন। তখন সমীপে যাইয়া বলিলেন, “ঠাকুর, মুখে বলিলেই তো চলিত, তজ্জন্তু আর পাহাড়ে পাঠাইলেন কেন? শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন “চাক্ষুষ এ ঘটনা দেখিয়াছ, তাহাতে যেরূপ প্রতীতি জন্মিল, কথায় ততটা হয় না।” পরে হনুমান দর্শন করিলেন, শ্রীরামের গলায় মালা অর্পিত হইবামাত্র উহা নিজের গলায় ছলিতেছে।

মন্দিরে দর্শন : শতস্কন্ধ রাবণ

২১শে পৌষ, ১৩০৫ সাল ।

আজ ঠাকুর প্রায় চার পাঁচ মাস পরে বাহির হইলেন । সরলনাথে স্বন্ধে ভর দিয়া চলিলেন । আমিও কিছু সাহায্য করিলাম । ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন । তিনি চার পাঁচ দিন পূর্বে বলিয়াছিলেন, “বুধবার বাহির হইও ।” পথে যাইতে যাইতে ‘হরেকৃষ্ণ’ বাবাজীকে কিছু পয়সা ও মন্দিরের সম্মুখে গরুকে ঘাস কিনি দিয়া অরুণস্তুতের নিকট দাঁড়াইলেন । উহা অষ্টধাতুদ্বারা এক্রপ উৎকৃষ্টরূপে নিশ্চিত, যেন অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে । ‘ফতে মহাবীর’ পূজারীকে বলিলেন, “আমরা বানরবধ বন্ধের নিমিত্ত মহাবীরের নিকট দশ টাকার ভোগ মানস করিয়াছি । আপনাদের এখানে কিছু দেওয়া হইবে । জগন্নাথ বল্লভ মঠে পাঁচ টাকা ও অন্যান্য স্থানে পাঁচ টাকা জো দেওয়া হইবে । ভূতানন্দ স্বামী এখন এখানে নাই বলিয়া অপেক্ষ করিতেছি, কিন্তু মহাবীর এখনই ভোগ পাইতে চান । এজন্য অচিরে উহা দেওয়া হইবে ।” মন্দিরে প্রবেশকালে বামদিকে পতিতপাবন দর্শন ও নমস্কার করিলেন । পরে মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন ও চরণামৃত লইলেন ।

মহাদেবের নিকট হইতে সাদ্ধোপাস্ত্র শ্রীরামসীতার বিগ্রহ দর্শন করি ঠাকুর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন । বলিলেন “আজ প্রত্যেক বিগ্রহই প্রসন্ন দেখিতেছি । সীতাঠাকুরাণী বীরাসনে বসিয়াছেন, হস্তে ধনুর্কাণ । শ্রীরামচন্দ্রের হস্তেও ধনুর্কাণ । সীতাঠাকুরাণীর আসন দর্শনে ঠাকুর বলিলেন, “অদ্ভুত রামায়ণে আছে শ্রীরামচন্দ্র শতস্কন্ধ রাবণকে ধ্বংস করিয়া গিয়াছিলেন । তাহার এমনি অদ্ভুত শক্তি যে, যে অস্ত্রে শ্রীরামচন্দ্র দর্শন

রাবণকে বিনাশ করেন, তাহা নিষ্ক্ষেপ করিলে শতস্কন্ধ উহা এক হাতে লুফিয়া অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলে। ‘আমাকেও কি দশস্কন্ধ পাইয়াছ’ বলিয়া অজ্ঞাধাতে শ্রীরামচন্দ্রকে মূর্ছিত করে। ঐ সময় সীতাঠাকুরাণী কালীমূর্তি ধারণ করেন। তাঁহার লোমকূপ হইতে কত শত ডাকিনী যোগিনী বাহির হইয়া মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত সৈন্ত বিনাশ করে ও তিনি শতস্কন্ধকে বধ করিয়া আকাশ-পাতাল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন। এমন সময়ে ভগবতীর স্পর্শে শ্রীরামচন্দ্র সংজ্ঞালাভ করিয়া উত্তিত হইলেন। সেই ভীষণ মূর্তি দর্শনে শ্রীরামচন্দ্র বিচলিত হইলে পুনরায় সীতা নিজ মূর্তি পরিগ্রহ করেন। ‘যিনি কালী তিনিই সীতা।’ অতঃপর ঠাকুর নৃসিংহ মূর্তি দর্শন করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিদিন ইহাকে দর্শন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। তাহার পরে একটু অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া মহাবীর দর্শন করিয়া ঠাকুর বলিলেন, “এ কোন্ মহাবীর?” একজন সেবক বলিল, “ইনি অষ্টপালের একজন।” তৎপরে বামপার্শ্বস্থ শিবলিঙ্গ দর্শনানন্তর সত্যনারায়ণের বিগ্রহের সমীপে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। তৎপরে বর্দ্ধমানের রাজাদের রাধাকৃষ্ণ দর্শন করিয়া ‘বটকৃষ্ণ’ ও ‘অক্ষয়বট’ দর্শন করিলেন, এবং বলিলেন “এই সেই বটকৃষ্ণ যাহার পত্রে ভগবান ভাসিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় উহা দর্শন করিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করেন। লোকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক এই সেই বটকৃষ্ণ। তাহার পরে দক্ষিণ দরজার নিকট দিয়া মুক্তিমণ্ডপের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানের ব্রাহ্মণেরা কিছু ভোজন প্রার্থনা করিলে দোকান হইতে ধার করিয়া ৬ ও সরলনাথের নিকট হইতে ৪ এই দশ টাকা দিলেন। পরে আবার চারি টাকার সিকি ছয়ানি ধার করিয়া আনিতে বাহির হইলাম। ইত্যবসরে

জগবন্ধুবাবু ও সরলনাথ ঠাকুরকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করাইয়া আনিলেন।

পাণ্ডারা, ছড়িদারেরা, রাজার কর্মচারীরা, ব্রাহ্মণেরা ও দীনহীন নানারূপ প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। অতঃপর ঐ স্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজারীদিগকে ৫ টাকা দিবেন স্বীকার করিয়া নিকটস্থ লোকদিগের মধ্যে কাহাকেও আট আনা, কাহাকেও চারি আনা ও কাহাকেও দুই আনা দিয়া সকলকে মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎপরে রোহিণীকুণ্ড ও চতুভূজ কাক দর্শন করিয়া ঐ স্থানে পাণ্ডাকে দুই টাকা দিবেন বলিয়া, বিমলাদেবীর মন্দিরের দিকে চলিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া সাড়ে সাত আনার মালা ও এক টাকা দক্ষিণা দিয়া সেবার্ধ পূজারীকে পাঁচ টাকা ও আর এক ব্যক্তিকে এক টাকা দিবে বলিলেন। ঐ লোকটি ঠাকুরকে বিমলাদেবীর কণ্ঠ হইতে মালা আনিয়া দিলেন এবং পূজারী চরণ দর্শন করাইলেন। ঠাকুর এই সময় বিমলাদেবীকে সোণার পাগড়ী পরিয়া বসিয়া আছেন দেখিতে পাইলেন। ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন, “পাগড়ী পরিয়া দেখাইলেন তিনি বিগ্রব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা; শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও তাঁহাতে কোন ভেদ নাই।”

পরে ঠাকুর গোপীনাথের পাণ্ডাদের দুই টাকা দিবেন বলিয়া অগ্নিদেবমন্দিরের পাণ্ডাদিগকে বলিলেন “আমার অন্তরের অভিপ্রায় প্রত্যেক বিগ্রহের নিকট একটি করিয়া টাকা প্রণামী দেই। আপনারা জগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা করুন, অর্থ আসিলেই আপনাদের সেবা করিতে পারি।” অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শন করিয়া বাসার দিকে চলিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহের শৃঙ্গারের প্রশংসা করিলেন। ইতিমধ্যে ঠাকুরের হাতে ও পায়ে খিঁচুনি (spasm) হইতেছিল। সরলনাথ টানিয়া দিল। পরে বাসায় আসিয়া সরবৎ ও শাক আলু সেবন করিলেন।

গরম তৈল দিয়া পা রগুড়াইয়া দেওয়া হইল। ইহাতে বিশেষ উপকার পাইলেন। বাসায় আসিতে বারোট্টা বাজিল।

পশুপক্ষীদিগকে আহাৰ দান

৩২শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

ভোরবেলা পায়খানা হইতে আসিয়া ঠাকুর কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর ঠাকুরকে ঘি গরম করিয়া দিলাম। শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ এখন তিনি গরম ঘি সেবন করেন। অনন্তর কাক, পায়রা, শুক প্রভৃতির জন্ত চাউল ও জল বড় রাস্তার পাশে দেওয়া হইল। প্রতিদিন দেড় সের চাউল পাখীদিগকে দেওয়া হয়। বারেন্দ্রায় বানরদিগকে গামলা ভরিয়া জল দেওয়া হয়। দুপ্রহরের সময়েও পাখীদিগকে চাউল ও জল দেওয়া হয়। পূর্বে কিছুদিন উহাদিগকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইত।

একটু বেলা হইলে রোজই বানরেরা আইসে। তাহাদিগকে কলা, ছোলা, চাউল ও মুড়কি দেওয়া হয়। বানরদের মধ্যে ‘সরলচিত্ত’, ‘পাকাটা’, ‘ভাল্লুকীগোদা’, ‘দাদামহাশয়’ প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের মধ্যে দাদামহাশয়ের একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি কোন দলভুক্ত ছিলেন না। একাকী থাকিতেন। বড়ই সংযমী—নিকটে বানরী দেখিলে চাপড় মারিয়া তাড়াইয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন ‘লেজকাটা’, ‘কানকাটা’, ‘লালমুখ’, ‘কাণী’, ‘হুংখিনী’, ‘বুড়ি’ প্রভৃতি অগাণ্ড বহু বানর দলে দলে এখানে আসে। এই সকল নাম ঠাকুর তাহাদিগকে দিয়াছিলেন। উহাদের জন্ত ১০ কি ১০ আনার কলা ও এক সের ছোলা রোজ আসে। চাউলও প্রতিদিন এক সের আন্দাজ দেওয়া হয়। অধিকন্তু মুড়কি, মহাপ্রসাদও দেওয়া হয়। ইহারা প্রায় সারাদিনই আসে। রাত্রে আসিতে আরম্ভ

করিয়াছিল। কিন্তু রাত্রিতে আর খাওয়া হইত না। সেজন্য এক
আর আসে না। একদিন 'সরলচিত্ত' রাত্রি ৮টা ও অন্তর্দিন রাত্রি ১১
এবং কখন কখন প্রদীপ জালিলে আসিত। এই সকল বানর হাত হইতে
খাওয়া যায়। ঠাকুর প্রতিদিন হরির লুটের বাতাসা ইহাদের জু
রাখেন। ঠাকুরের পার্শ্বে আসেনই কোন কোন বানর বসিয়া থাকে।
নিঃসঙ্কোচে গ্রন্থ রাখিবার চৌকীর নীচে বাইয়া উহার মুড়কি ও বাতাস
নেয়। কখন কখন ঠাকুরের হাত হইতেও নিয়া খাইতে থাকে।
'সরলচিত্ত' কলা খাওয়ার সময় এক একটি করিয়া হাত হইতে লইবে এবং
আমরা কলা হাতে করিয়া কাছে দাঁড়াইয়া থাকিব। 'দাদামহাশয়'
তাহাই। সেদিন 'দাদামহাশয়' শ্রীধরবাবুর খাওয়ার সময় তাঁহার সঙ্গি
একজু যাইয়া বসিল। শ্রীধরবাবু হাত তুলিয়া বসিলেন। 'দাদামহাশয়'
খাইয়া চলিয়া গেলে, পুনরায় আহা করিলেন। আমার ও অধিকার
আহারের সময়ও একদিন ঐরূপ হইয়াছিল। তবে ডাউলের বাটী উহার
সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইয়াছিলাম বলিয়া রাগিয়াছিল। 'সরলচিত্ত'
'দাদামহাশয়ের' প্রকৃতি একরূপ;—তবে 'সরলচিত্ত' অধিক বলবান
অনন্তর একদল ভেড়া (চৌদ্দ পনেরটা হইবে) দরজায় বারান্দার নীচে
আসিয়া 'ভ্যা', 'ভ্যা' করিতে আরম্ভ করিত। বতস্কণ খাবার না পাইলে
ততক্ষণ ক্ষান্ত হইবে না। উহাদিগকে প্রথমতঃ চাউল, পরে বানরে
খাদ্যাবশিষ্ট ছোলা, কলার খোসা দেওয়া হয়। ফুলের মালাও থাকে।
অতঃপর ঘর ও বারান্দা পরিষ্কার হইলে ঠাকুর পায়খানায় গিয়া থাকেন।
সেই সময় আমরা ঘর দরজা ও আসনাদি পরিষ্কার করি এবং ফুল চন্দ্র
ঘষিয়া পূজোপকরণ ঠিক করিয়া রাখি।

অথ বৈকালে শ্রীবৃন্দাবনের একটি বাবাজী সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।
তাঁহার নিকট হইতে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের রজঃগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার

একটিন 'চাঁ' দিলেন। অর্থাৎ পাথের খরচ দিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বাবাজীর সংসর্গে একটা সম্ভাব বিকীর্ণ হইল।

অল্প মাদ্রাজ হইতে মেদিনীপুরের উকিল গুরুভাতা শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ঘোষ আসিলেন এবং ঠাকুরের সহিত নির্জনে কথাবার্তা বলিলেন। খালিয়ার একটি উকীল রাজিকালে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে চাহিলে লণ্ঠন মুখের নিকটে লইয়া দর্শন করান হইল। ইহার মাদ্রাজ কংগ্রেস হইতে দেশে ফিরিবার পথে পুরী আসিয়াছিলেন। প্যারীবাবু সমুদ্র-স্নান ও জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া গেলেন। আজ রাত্রে নূতন ডেপুটী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ডেপুটী কালীবাবু, ডেপুটী জগৎবাবু এবং মুন্সেফ বাবুও আসিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “বহুজন্মের স্বকৃতিতেই জগন্নাথদেবের দর্শন হয়। সমুদ্র-স্নান, মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি ও জগন্নাথদেব দর্শনে পুনর্জন্ম হয় না।”

চন্দনতালাওয়ার পরমহংসজী

২৩শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ বাহির হইয়া প্রায় ১০টার সময় চন্দনতালাওয়ার পরমহংসজীর আশ্রমে গেলেন। আশ্রমটি বেশ সুন্দর। পরমহংসজী, ব্রহ্মচারী কাহাকে বলে, সন্ন্যাসীর লক্ষণ প্রভৃতি সংস্কৃতে আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন ‘সর্বভূতেই ভগবান’, ‘সকলই ভগবান’ সন্ন্যাসীর নিত্য দর্শন করিবেন।” ঠাকুরের বিনয়বাক্যে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন। পথে আসিতে আসিতে চন্দনতালাও গুরুর দর্শনে ঠাকুর বলিলেন “এখানে চন্দনষাত্রাতেই বিশেষ আনন্দ হয়। এটি উড়িয়া-বাসীদের জাতীয় উৎসব। উহাতে পাণ্ডারা নিজে অর্থব্যয় করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। ঐ সময়ে নরেন্দ্রে ‘গঙ্গা’, ‘যমুনা’ ও ‘সরস্বতী’

তিনটি ধারা প্রবাহিত হয়।” আগরাও চন্দনযাত্রার সময়ে ঠিক নীলময়
যমুনার জল ও পরিষ্কার সাদা গঙ্গার জলের ভ্রায় দুইটি ধারা দেখি-
ছিলাম। অতঃপর চন্দনতালাওয়ার কোণে রাধাকৃষ্ণ দর্শনে ও চরণামৃত
গ্রহণ করিয়া জগন্নাথ বল্লভ মঠে নূতন ছোট মহাবীরের মন্দির দর্শনানন্দ
কিরিলেন।

নেংটা ছেলে

২৫শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

গতকল্য পায়ের বেদনার জন্ত ঠাকুর বাহির হয়েন নাই। স্বা-
নিয়মিত কার্য ও জগবন্ধুবাবুর পাঠ শেষ হইলে দশটার সময়ে
রাস্তা দিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। রাস্তায় বাইরা
মন্দির দর্শন করিয়া নমস্কার করিলেন। পথে সিংহদ্বারে গুরুদেব
কিনিয়া দিয়া, টিনওয়ালা সাধুর সহিত আলাপ করিয়া অগ্রসর হইলে
দক্ষিণ দরজার সমীপে মন্দিরের গায়ে ঠেস দিয়া যে পায়খানা ভৈরব
হইতেছিল, তাহার দাগ দু’টি এখনও মন্দিরের গায়ে আছে দেখিতে
পাইলেন। তখন বলিলেন “এই পায়খানা নিৰ্ম্মাণের কথা শুনিয়া
জগন্নাথদেবকে বলিলাম ‘ঠাকুর, তুমি সব সইতে পার। এই
পায়খানা যদি ভাঙ্গা না হয় তবে আর মন্দির দর্শন করিব না।
ঠাকুরের সকলই সমান। কিন্তু ভক্তেরা তাঁহার অনাদর সহিত
পারে না।’ তৎপরে অগ্রসর হইতে হইতে একটি বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা
করিলেন, “বয়স কত?” ঠাকুর বলিলেন, “অনন্তকালের মধ্যে আমার
এক একটি বৃদ্ধবৃদ্ধমাত্র। বাহাত্তর যুগে এক মন্বন্তর। চতুর্দশ মন্বন্তর
ব্রহ্মের একদিন হয়। সকলই নষ্ট হইয়া যায়। কেবল গুরুপাদপরে
বাহার মতি তিনিই জীবিত।” অনন্তর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাহা

একাদশ অধ্যায়

২২১

দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে দু'টি ডাব সরলনাথ কিনিয়া লইল। পথে জগন্নাথ দাস বাবাজীর আশ্রমের সমীপে আসিয়া নত হইয়া নমস্কার করিলেন। জগন্নাথ দাস বাবাজী আস্থান করিলেন, কিন্তু সময় নাই বলিয়া ঠাকুর বাসার দিকে চলিলেন। পথে নেংটা ছেলোটর সহিত সাক্ষাৎ হইল। নেংটা ছেলোট হাসিতে হাসিতে রাস্তায় গড়াইতে লাগিল। ছেলোটি বড়ই অদ্ভুত। বয়স ১২।১৩ বৎসর। প্রায়ই হাসিখুসি ভাব। চাহনিতে একটু নূতনত্ব আছে, অতি মিষ্ট। একটু হাসিতে হাসিতে যখন আমাদের দিকে চায় তখন হৃদয়ে আনন্দ খেলিতে থাকে। বাহে করিয়া মল গায়ে মাখে। বাহে করিতে করিতে দৌড়িতে থাকে। এখানে প্রতিদিন উহাকে পাকাল প্রসাদ ও গরম মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়, কিন্তু তজ্জন্ত কোন বন্ধন নাই। আহারের সময় অনেক দিন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একদিন ঠাকুর উহাকে একখানা লাল কঞ্চল দিলেন, কতই আদর করিয়া কতভাবে উহা গায়ে দিল। কিছুদিন পরে উহা আর নাই। রাত্রে খালি গায়ে এই ভয়ানক শীতে বুকে হাত দু'খানা দিয়া রাস্তায় ঘুমাইয়া থাকে। আমাদের বাসা হইতে রড় রাস্তায় যাইতে প্রশস্ত ড্রেনের উপরে ছিদ্রযুক্ত একখানা বড় লোহার পাত আছে। মাঝে মাঝে এই নেংটা ছেলোটি উহার ভিতরে লুকাইয়া থাকিত এবং ঠাকুরের চলাফেরার সময়ে উহার ভিতর দিয়া অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিত। ইহাকে দেখিলে শুকদেবের কথা মনে হয়। ঠাকুর বলিয়াছেন, “ইনি একজন মহাপুরুষ। এই বেশে এই স্থানে ঘুরিতেছেন। কাহাকে কাহাকে কখনও টিল ছোড়ে কিন্তু উহা কাহারও গায়ে লাগে না।” প্রায়ই মেথরের গাড়ী হাঁকাইয়া লইয়া যাইতে দেখা যায়। নেংটা ছেলোটিকে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন “ছেলেটির এই রাস্তায়ই ঘর, ইহাই তাহার বাড়ী, গড়াগড়ি দিয়া ইহাই বুঝাইয়া দিলেন।” ছেলোটি বোবা, মারিলে

চীংকার ও আনন্দে একরূপ শব্দ করিয়া থাকে। চাকর বুধিয়া উঠায় 'ভেলৌ' বলে।

শশীবাবুর সহিত বানরবধ প্রসঙ্গ

ঠাকুরের বাসায় আসিবার পরে শশীবাবু সস্ত্রীক সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। ঠাকুর অনেক কথা বলিলেন—“বানরবধ অশাস্ত্রী লেফটেন্যান্ট গভর্নর অযোধ্যায় একটি বানরবধ করিয়া তিন বৎসর জঙ্গ অনুতাপ ভোগ করিয়াছিলেন এবং আর বানরবধ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বানরদিগকে তাঁহার বন্ধু, ভ্রাতা এমননি নিজের স্বরূপ বলিয়াছিলেন; ইন্দ্রের নিকট তাহাদের জন্ত বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।” আরও বলিলেন, “শ্রীরামচন্দ্র শিশুকালে, ‘আমায় বানর দাও’, ‘আমায় বানর দাও’ বলিয়া কঁাদিলে বশিষ্ঠদেব ধ্যান প্রকৃত রুদ্রদেবকে স্মরণ করিলে, তিনি বানর হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের জীড়নকা হইয়া কোলে বসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ননী চুরি করিয়া গোপাল বানরদিগকে স্বচ্ছন্দে খাওয়াইতেন।” আমার এখানে বানরকে কিরূপ সম্ভাবে মিশিতেছে তিনি উহা দেখিয়া আনন্দিত হইলে ‘সরলচিত্ত’ ঐ সময় গৃহের ভিতরে শয়ন করিয়া নিশ্চিন্তভাবে আশ্রয় করিতেছিল এবং অস্ত্রাত্ম বানরেরাও গৃহমধ্যে স্বচ্ছন্দে ছোলা প্রভৃতি খাইতেছিল।

অতঃপরে ঠাকুরের নিকটে ভোরে একটি স্বপ্ন দেখিলাম। কিন্তু ভুলি গেলাম। বহু চেষ্টা করিয়াও স্মরণ করিতে পারি নাই। পরে নবম মন্দিরে নমস্কার করা মাত্র উহা স্মরণ হইল। স্বপ্নে দেখিলাম এক মহাপুরুষ বলিতেছেন “বহু লোক এক কথা ও গুরু অতীত কথা বাক্য গুরুবাক্যই গ্রহণীয়।”

এ দেশের ছুরবস্থা

২৬শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর গুপ্তবাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে এদেশের ছুরবস্থার কথা শুনিলাম। মঠের পাশের ঘরেই বেণ্ডার বাস। ঐ সকল ঘর মঠধারীরাই ভাড়া দিয়াছেন। রাত্রিকালে যুগ্মফবাবু আসিলেন, “শক্তি ও ভগবান এক” এই বিষয়ে ঠাকুর বলিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন গুপ্তবাড়ী যাওয়ার সময় সরলনাথ ঘুমাইয়াছিল। আমরা ডাকিলাম। ঠাকুর নিকটে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া বলিলেন। “সরলনাথ, আগে ছিলে সরলনাথ, আজি হইতে আমার ‘নাথ’ আমারই হইলে।” সরলনাথ পরে বলিয়াছে, তাহার ভিতর একটা যন্ত্রণা ছিল, উহার পরে তাহার শান্তি হইল।

ব্রজবাসী

২৭শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

অন্য ঠাকুর মন্দিরে গেলেন। বাসার বাহিরে আসিয়া মন্দির দর্শন করিয়াই প্রণাম করিলেন এবং অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ফিরিবার সময় জগন্নাথ দাস বাবাজীর আশ্রমে গেলেন এবং পায়ে বেদনাহেতু নীচের আঙ্গিনাতেই রোদ্রে বসিলেন। এসময় তথায় একটি ব্রজবাসী ও তাহার সঙ্গে আরও দু’টি লোক ও কালীয় হ্রদের নিকটবর্তী সেই সীতারামোপাসক বাবাজীটি ছিলেন। ব্রজবাসী কেবল ‘চকাচক’, ‘চকাচক’ উচ্চারণ করিয়া থাইতে চাহিল এবং নিজের খাওয়ার ব্যাখ্যা পুনঃপুনঃ করিতে লাগিল। একটি রাখাক্ষের মন্দির করিবে তাহাতে ‘ঝাকি’ দর্শন হইবে। বলিল, শ্রীবৃন্দাবন হইতে বহুদিন যাবৎ

আসিয়াছে, তথায় যাইবার খরচ নাই। লোকটি একপ উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলিতে লাগিল যেন নেশা করিয়া আসিয়াছে।

অপর ব্রজবাসী বৈষ্ণবটি অতি যত্নস্বভাব। ঠাকুর তাঁহাকে নি আসনের উপর বসিতে অস্বস্তি করিলেন কিন্তু তিনি বসিল না। জগন্নাথ দাস বাবাজী তাহার ‘জমায়েৎ’ সহ নানাস্থান ভ্রমণকাহিনী বলিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ গত হইলে ঠাকুর বিদায় হইলেন। পথে নানা লোকে নানারূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল।

শ্রীমতীর মানরক্ষা : পুরীবাসীর কর্তব্য

২৮শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর ‘চা’ সেবার পর দশটার সময় গুণ্ডিচার দিকে চলিলে রেলওয়ে স্টেশনে যাইতে সোজাসুজি যে রাস্তা আছে ততদূর যাই ফিরিলেন।

রাস্তায় বলিলেন, “শ্রীশ্রীরাধারাণী সহস্র ছিদ্রযুক্ত কলসীতে পানিতে যাইয়া ভগবানকে একান্তমনে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্ত সহস্র মূর্তি হইয়া ছিদ্র সকল বন্ধ করিয়া রহিলেন। এক মূর্তিতে শ্রীমতীর চরণ মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিলেন। এইরূপে শ্রীমতীর মানরক্ষা হইল।”

ঠাকুর বলিলেন, “এখানে মহাপ্রসাদ পাওয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সমুদ্র-স্নান, পঞ্চমহাদেব দর্শন ও বিমলামায়ী দর্শন অবশ্য কর্তব্য। এই কার্য করিলেও হয়, না করিলেও হয়। এখানকার রজের প্রভাব অত্যধিক।” আজ বিধুবাবু, দেবেন্দ্রের মামী ও অমৃত কলিকাতা হইয়া আসিলেন।

একাদশ অধ্যায়

২২৫

জগন্নাথদেবের মকরবেশ

২২শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

আজ প্রায় দশটার সময় অসুস্থতা নিবন্ধন ঠাকুর বিধুবাবুর সাহায্যে বাহির হইলেন। পুনরায় ৩টা ৪টার সময় বাহির হইবেন ইচ্ছায়, মন্দিরের সিংহদরজার নিকট হইতেই ফিরিলেন। পথে পুরুষোত্তম সংক্রান্ত একখানা বই ও একখানা উড়িয়া শিক্ষার বহি খরিদ করিয়া লইলেন। বিধুবাবুকে বলিলেন “একদিন জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া বলিলাম, ‘ঠাকুর পায়খানা ও বানরবধ বন্ধ না হইলে, আর তোমার মন্দিরে যাইব না।’ অতঃপর অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধের হুকুম আসে।”

আজ মকর সংক্রান্তি। তাই ঠাকুরের মকরবেশ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মকরবেশের টোপর (মুকুট) ও মালা সেবকেরা ঠাকুরকে দিয়া গেল। ঠাকুর দেখিয়া আনন্দ করিলেন। এই মুকুট রক্ত-গাঁদা, তুলসীপত্র ও হরিদ্রাবর্ণ গাঁদা দ্বারা তৈয়ারী। আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব চৌরাসী রকম ব্যঞ্জন আহার করেন। রাত্রিকালে গণেশ পাণ্ডা ও পান্নাদের পাণ্ডা এক রকম স্নানাহ প্রসাদ লইয়া আসিল। উহার নাম ‘মকর চাউল’। উহা চাউল, কন্দ, লবঙ্গ, আদা, এলাচি, কর্পূর প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত। ঠাকুর কণিকামাত্র গ্রহণ করিলেন। অবশিষ্ট আগামী কল্যের জন্ত রহিল।

আফিংখোর বানর

৩০শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

আজ সংক্রান্তি। ঠাকুর গুণ্ডিচাবাড়ী গেলেন। পথে শান্তিপুরের আফিংখোর বানরের গল্প করিলেন। আমাদের শান্তিপুরে একটি বানর ছিল। সে একটি আফিংখোর ভদ্রলোকের নিকট আফিং খাইতে শিখে।

সময় মত আফিং না পাইলে কোন ভদ্রলোককে রাস্তায় যাইতে দেখিলে পয়সার জন্ত কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিত এবং পয়সা পাইলে আফিংএর দোকানে যাইয়া পয়সাটি দিয়া আফিং কিনিয়া খাইত।

শ্রীবৃন্দাবনে মাধুকরী করিয়া একটি গাভী দ্বারে দ্বারে ফিরিত আমাদের তীর্থগণির কুঞ্জে তাহাকে সন্ধ্যার পর অনেকদিন দাঁড়াই থাকিতে দেখিয়াছি। আর একটি গরুকে পুরাণ পাঠকালে একদা দাঁড়াইয়া পুরাণ শ্রবণ করিতে দেখিয়াছি।

অন্য একজন পাণ্ডা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মকরবেশ কালীন কর্ণাল আনিয়া ঠাকুরকে দিলেন। ঠাকুর তাহা দেওয়ালে জগন্নাথদেবের বিগ্রহের উপরে পেরেক দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন।

আমার মৃত পুত্র দর্শন

ইতিমধ্যে একদিন ভোর চারটার সময় ঠাকুর হোম কীর্তন নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে আসনে ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। আমি নিঃবসিয়া “নাম” করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূণ্য হইয়া পড়িয়াছি। হঠাৎ দেখিলাম, আমার ৮।১০ বৎসর বয়স্ক মৃত পুত্রটি * শূন্যে প্রকাশিত হইল।

* এই ছেলেটি ৭।৮ বৎসর বয়সের সময় গেণ্ডারিয়ায় ঠাকুরের নিকট সাধন পূর্ণ গত বর্ষাকালে ওলাউঠা রোগে মেহত্যাগ করে। দেহত্যাগের সংবাদ পূর্ণ আসিলে ব্রহ্মচারী আমাকে না বলিয়া ঠাকুরকে জানায়। ঠাকুর ব্রহ্মচারীকে বলেন, “এ সংবাদ সারদাকে বলিও না। আমি বলিলে তখন জানাইও।” পরে ঠাকুরের ঘর লইয়া এ সংবাদ আমাকে জানায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রিয় পুত্রমৃত্যুজনিত মোটেই আমাকে স্পর্শ করিল না। চিত্ত শোকে আচ্ছন্ন হইল না বটে, কিন্তু মন মেঘাবৃত আকাশের স্থায় ভার ও মলিন হইয়া রহিল। কিছু পরে ৬জগন্নাথদেবকে কহিলাম। জগন্নাথদেবের কি অপার মহিমা—তাহাকে দর্শনমাত্রে চিত্তের সমস্ত তৎক্ষণাৎ মুছিয়া লইলেন।

একাদশ অধ্যায়

২২৭

আমি উহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ছেলেটিও দেখিতে দেখিতে অন্তর্ধান হইল। তখনই ঠাকুরকে বলিলাম, “আমার ছেলেটিকে দেখিলাম।” ঠাকুর বলিলেন, “হাঁ এসেছিল।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ছেলেটিকে নেংটা দেখিলাম কেন?” ঠাকুর উত্তর করিলেন, “ইনি তোমাকে বলিয়া গেলেন, ‘সঙ্গে কিছুই যায় না। নেংটা আসিয়াছিলাম, নেংটাই চলিয়া গেলাম।’”

ঠাকুর আরও বলিলেন, “এই ছেলেটি খুব স্বকৃতিবান, যোগভ্রষ্টের আশ্রয় ছিলেন। মৃত আত্মার এখানে আসা তো দূরের কথা, বিরজাই পার হইতে পারে না। ইহার উদ্দেশ্যে কিছু সোণা দান করিয়া গয়াতে প্রেতশিলায় পিণ্ড দিও, পরে বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিবে।”

জগন্নাথদেবের অযত্নে ঠাকুরের ক্লেশ

১লা মাঘ, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ নিয়মিত সময়ে বাহির হইয়া দর্শনে গেলেন। গুরুকে ঘাস দিয়া নিয়মিত পতিতপাবন, মহাদেব, শ্রীরামচন্দ্র, নৃসিংহদেব প্রভৃতি দর্শন করিয়া অগ্রসর হইলেন। মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া উঠেঃস্বরে “হরিবোল”, “হরিবোল”, “জয় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ” ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। পরে অস্ত্রাস্ত্র দেবতাদি দর্শন করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। তিনি পথে আসিতে আসিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ, অযত্নহেতু ইহর তেলাপোকায় কাটিতেছে বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমাদের গঙ্গাধর পাণ্ডা প্রথমতঃ গোপন করিতে চেষ্টা করিয়া পরে উহা স্বীকার করিলেন এবং ইহার জন্য রাজ-সরকার হইতে বিশেষ বন্দোবস্ত আছে বলিলেন। ছয় হাণ্ডি গুড় উহার জন্য ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যিনি উহার সেবক তিনি ঐ সকল মিষ্ট আত্মস্বাদ করেন।

ঠাকুর আরও বলিলেন, “জগন্নাথদেব দারুব্রহ্ম । যেমন সূর্য্যরশ্মি জমাট হইয়া সূর্য্য, তদ্রূপ ইনি দারুরূপে জমাট ব্রহ্মপদার্থ । অতঃপর বাসায় ফিরিলেন । ‘দাদামহাশয়’ কলা, খাজা, চাউল প্রভৃতি পাইলেন ।

আজ রাত্রিকালে সতীশকে স্বপ্নে দেখিলাম । সতীশ বলিল “তুই পরলোক সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিয়াছিলি, তাহা সবই সত্যি । আমি বলিলাম, “তোমার নাম কি সতীশ আছে ?” সে যেন নাদ পরিবর্তন হইয়াছে বলিল ।

পুরীর সমুদ্র-স্নানের ফল : কৃষ্ণানন্দ স্বামী

২১৩ মাঘ, ১৩০৫ সাল ।

আজ নিয়মিত সময়ে বাহির হইয়া ঠাকুর সমুদ্রের দিকে বাইরে লাগিলেন । ‘পুরী’-নামে ও অল্প দুখানা জাহাজ যাত্রী ভরি বন্দোপসাগর হইয়া এখানে আসিয়াছে । আমরা যাইতে বাইরে সেই সকল যাত্রীর বিভিন্নরূপ বেশভূষা ও অবস্থা দর্শন করিলাম । যাত্রী আসিয়াছে । মন্দির হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত রাস্তা প্রায় ভরিয়া গিয়াছে । যাত্রীদের সংখ্যা ৪১৫ হাজারের কম নহে । ঠাকুর তাহাদিগকে ঘেঁষে বলিতে লাগিলেন, “এ সকলকে দর্শন করিলে পুণ্য হয় । ইহারা উদ্ধার হইয়া গিয়াছে । গঙ্গাদেবী সগর রাজার ভ্রাতৃত্ব সন্তানদিগকে পর্যাট উদ্ধার করিয়াছিলেন ।”

জগবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ স্থানের সমুদ্র-স্নান অপেক্ষা বিসাগর-স্নানের (গঙ্গাসাগর) মাহাত্ম্য অধিক ?” ঠাকুর বলিলেন, “জগদীশ নহে, এ স্থান মহাতীর্থ । সপ্ত নদী—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, কাবেরী, গোদাবরী ও নর্মদা এ স্থানে প্রবাহিত হইতেছেন । এ স্থানে বিশেষ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কথিত আছে । দেখ, গঙ্গাসাগর-স্নান করিলে

একাদশ অধ্যায়

২২৯

এ স্থানে আইসে।” ব্রহ্মচারীর প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, “বিশেষ বিশেষ বোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে যে ফল, মহোদধিতে স্নানে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে।”

অতঃপরে শ্রীধরবাবুদের দেশের তিনটি লোক আসিয়াছেন। উঁহার ঠাকুরের জন্ত পেয়ারা, কুল, বেদানা, কমলালেবু প্রভৃতি আনিয়াছেন। অতঃপরে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ নাগ আমাদের বাসাতে উঠিয়াছেন। ঠাকুর স্বামিজীর বিস্তর প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “দেখ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়কে কত লোক কত গালাগালি দিতেছে, কত কি বলিতেছে। কিন্তু ইঁহার নিষ্ঠা কি চমৎকার, ইনি অনায়াসে সে সকল সহ্য করিয়া লইয়া আশ্রমটি রক্ষা করিতেছেন। একালে এরূপ লোক বড় দেখা যায় না।”

রাত্রিকালে মুসেফবাবু ছেলে ও স্ত্রীর সাধনের জন্ত ঠাকুরকে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “আপনি যাহাদিগকে আনিবেন, তাহারাই সাধন পাইবে।” আজ ঠাকুর গুজাবাড়ীর দিকে গেলেন। কামাখ্যাবাবুর সহিত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীর সম্বন্ধে আলোচনা হইল। কামাখ্যাবাবু স্বামিজীর বিরুদ্ধে প্রচারিত ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেন। সক্রিটিস, গ্যালিলিও মিথ্যা অপবাদে প্রাণ হারান।

নানক সাহেবের কথা

৪ঠা মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। পথে একজন বাঙ্গালী ঠাকুরের যাতায়াতে বড়ই ক্লেশ হইতেছে দর্শন করিয়া বলিলেন, “পান্ডী চড়িয়াও তো যাইতে পারেন।” ঠাকুর বলিলেন, “এ স্থানের বালুকা স্তব্ধ বালুকা, ইহা দ্বারা সমস্ত শরীর পবিত্র হইয়া যায়। বরং শরীরপাত

করিয়া ইহার সহিত মিশিয়া যাওয়া ভাল, তবু পাকীতে চড়িয়া যাওয়া উচিত নয়।” বিশ্বাস মহাশয় ঘটীতে করিয়া জল লইয়া স্নান করাইয়া দিলেন। বিধুবাবুকেও চারি ঘটী জল দিতে বলিলেন। স্নানের সময় বিধুবাবু ঠাকুরকে ধরিয়া রহিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকেও স্নান করাইয়া দেওয়া হইল।

আজ রাত্রিকালে মুসেফ্‌বাবু, জগৎবাবু, কলিকাতার ও অগ্ন্যস্ত্র স্থানের বাদ্দালী ভদ্রলোক ও হরিদ্বার হইতে আগত কয়েকজন সাধু ঠাকুরের দর্শন করিতে আসিলেন। একজন বাদ্দালী ভদ্রলোক তাঁহার রচিত পদাবলী ও সঙ্গীত শুনাইলেন, এবং উহা ছাপাইবার অনুমতি চাহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “পদগুলি বেশ হইয়াছে ; ছাপাইতে পারেন।” আর একজন লোক গোপাল পাণ্ডার হাতে পড়িয়াছে। এখানে গোপাল পাণ্ডা কেহ নাই, সে ছড়িদার। একদল লোক এরূপ পাণ্ডা ও তাহার কর্মচারী সাজিয়া অর্থোপার্জন করে। ঠাকুর বলিলেন, “হরিদ্বারে সাধুদিগকে সেদিন সমুদ্র-স্নানের সময় দেখিলাম। পুনরায় তাঁহাদের দেখিবার একটা আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। ভগবান কাহারও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না। তাঁহারা আসিয়া ১১টার সময় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। পুনরায় অপরাহ্ন ৪।৫টার সময় আসিয়া দর্শন দিলেন।”

জগৎবাবু প্রভৃতির নিকট নানক সাহেব ও তাঁহার শিষ্যদের সম্বন্ধে অনেক গল্প করিলেন। “গুরু নানক এক দিবস পথে যাইতে যাইতে একটি মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া নিজের সম্মান স্রীচাঁদ ও লক্ষীচাঁদকে বলিলেন, ‘ইহা অতি অপূর্ণ পদার্থ, ইহা খাও।’ তাহারা বলিল, ‘এ মরা মানুষ, কি করিয়া খাইব?’ নিজেরা বলাবলি করিতে লাগিল, ‘বাবার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, নচেৎ এরূপ মরা মানুষ খাইতে বলেন কেন?’ অতঃপর নানকজী শিষ্য অঙ্গদকে বলিলেন, ‘অঙ্গদ ইহা

একাদশ অধ্যায়

২৩১

আহার কর ।’ তখন অঙ্গদ করযোড়ে বলিলেন, ‘সত্যি মহারাজ, কোন্ দিক্ হইতে আহার করিব ? মাথার দিক্ কি পায়ের দিক্ হইতে ?’ গুরু নানক বলিলেন, ‘ইহার উপর তোমার অঙ্গ-বস্ত্র বিছাইয়া দাও ।’ কিছু পরে বস্ত্র উঠাইয়া দেখেন উৎকৃষ্ট কড়াপ্রসাদ (মোহনভোগ) রহিয়াছে । নানকজীর পাঞ্জার ছাপ উহার উপর পড়িয়াছে । ঐ প্রসাদ অঙ্গদ পাইলেন ।’

“এক দিবস অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছে ; শিষ্যগণ ক্ষুধায় পীড়িত । কিছুই আহার করিবার নাই । কাহারও অন্ত্র যাইয়া আহার সংগ্রহের ক্ষমতা নাই । ঐ সময় গুরু নানক বলিলেন, ‘শ্রীচাঁদ, লক্ষ্মীচাঁদ তোমরা ঐ বৃক্ষের নিকট যাইয়া আহাৰ্য্য প্রার্থনা কর, পাইবে ।’ শ্রীচাঁদ, লক্ষ্মীচাঁদ বলিলেন, ‘বাবা এরূপ বাক্য বলিবেন না । বৃক্ষ হইতে কি কখন আহাৰ্য্য পাওয়া যায় ?’ তখন অঙ্গদকে বলিলেন, ‘অঙ্গদ, ঐ বৃক্ষ সমীপে আহার প্রার্থনা করিয়া লইয়া আইস ।’ তখন অঙ্গদ বড় ধামা খুঁজিতে লাগিলেন, আহাৰ্য্য পড়িলে কিসে রাখিবেন । তখন গুরু নানক বলিলেন, ‘অঙ্গবস্ত্র বিছাইয়া দাও । বৃক্ষ ধরিয়া ঝাঁকি দিলেই আহাৰ্য্য পড়িবে ।’ অঙ্গদ বলিলেন, ‘সত্যি মহারাজ,’ এই বলিয়া বৃক্ষের নিকট হইতে প্রচুর আহাৰ্য্য—লুচি, গালপোয়া প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সকলকে ভোজন করাইলেন ।’

“গুরু নানক কিছুদিন পরে শিষ্যদিগকে বলিলেন, ‘আমি আজ দেহত্যাগ করিব । তোমরা শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদকে লইয়া আইস ।’ ‘এই সুস্থ লোকটি কি করিয়া হঠাৎ মরিয়া যাইবে’ ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না । তখন গুরু নানক অঙ্গদকে নিজ গদীতে বসাইয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন, অঙ্গদের অপূৰ্ব্ব শোভা হইল । এই সময় শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ আসিয়া বলিল, ‘বাবা, আপনি অঙ্গদকে গদী দিলেন ; আমাদেরকে কেহ মানিবে না । আমাদের আহাৰ্য্যাদি কিরূপে চলিবে ?’ তখন গুরু

নানক বলিলেন, 'ভগবানের দয়াজার কুকুরটাও অনাহারে মরে না। তোমাদের অভাব হইবে না'।"

"অঙ্গদ একদিন গুরু নানকের নিকট দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন, 'প্রভুজী, আমি আপনার পূর্বে মরিব। দেখুন সরু কাঠগুলি অগ্নিতে পূর্বে পুড়িয়া যায়। মোটা কাঠগুলি অনেকক্ষণ জ্বলে। অতএব আমাকে কৃপা করুন।' নানকজী কৃপা করিলেন।"

জগৎবাবুকে উপদেশ

৫ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ সিংহদ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিলেন। কামাখ্যাবাবু প্রভৃতি আজ পুনরায় 'পুরী' ও 'উড়িয়া' জাহাজে কলিকাতায় গেলেন। ঠাকুর ছুই প্রহরের সময় করগুওয়ালা সাধুকে চাউল চৌদ্ধা ভরিয়া দেওয়াইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "শুন সাধুটি গাইতেছে, 'সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছায়ী তারা তুমি'।"

রাত্রিকালে কিশোরীবাবু, জগৎবাবু * ও আর একটি উকীর আসিলেন। জগৎবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এক বৎসরের ছুটি

* ডিপুটি ব্রীক্স জগৎচন্দ্র রায় ঠাকুরের অন্তর্ধানের কয়েকদিন পূর্বে দীক্ষাপ্রার্থী হন। ঠাকুর বলিলেন, "এখন শরীর অস্থির। কলিকাতা যাইয়া আপনাকে দীক্ষা দিবা" ইতিপূর্বে জগৎবাবুর হাত অবশ হইয়া পড়ে। নানারূপ চিকিৎসাতেও আরোগ্য হয় না। তিনি চিকিৎসার্থ আমাদের সঙ্গে কলিকাতা যাইবেন স্থির করিয়া ছুটি নন। একদিন তিনি ঠাকুরের নিকট বসিয়া আছেন এমন সময় ঠাকুর হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি একদিন নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখেন, হাত অবশ হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপই ঘটনা নয়?" জগৎবাবু বলিলেন "হ্যাঁ।" ঠাকুর বলিলেন, "ভয় নাই, ভয় হইয়া যাইবে।" জগৎবাবু বলিয়াছেন তৎপর দিন হইতে হাতে আর কোন ক্রেশ বো

নইয়াছি, কি ভাবে চলিব ?” ঠাকুর বলিলেন, “সকালে উঠিয়া ব্রাহ্মণের কৃত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া কিছু ‘চরিতামৃত’ পাঠ করিবেন। পরে আহারান্তে মহাভারত কি রামায়ণ পাঠ কিংবা শ্রবণ করিবেন। বৈকালে সমুদ্রের তীরে কিছু বেড়াইবেন। শ্রীমদ্ভাগবত বড়বাজার গরাণহাটা ষ্ট্রীটের এডিসন প্রায় ঠিক অহুবাদ। মহাভারত কালীপ্রসন্ন সিংহের অহুবাদ ও শ্রীশ্রীচরিতামৃত কেদার বাবুর এডিসন্ ভাল।”

অর্থদ্বারা সাধুদের মুক্তি

৬ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। পথে করণ্ডওয়াল সাধুর গল্প হইল। ঠাকুর বলিলেন “ইনি একরূপ নানা রোগে পীড়িত থাকিয়াও সজ্জষ্ট। ভিক্ষা করিয়া মাগের সেবা করেন। লোকনাথের পথে বাসা। অনেকদিন ঢাকায় ছিলেন। ফকিরী ভাব। কাল গাহিয়াছিলেন ‘সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি’।”

সমুদ্র স্নানের সময় বিধুবাবু ও জগবন্ধুবাবুকে অবলম্বন করিয়া স্নান করিলেন। সরলনাথ ও বিশ্বাস মহাশয় মাথায় জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। উপরে উঠিলে অঙ্গ পুঁছিতে ও কাপড়াদি পরিবর্তনে সাহায্য করিলাম।

করেন নাই। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর জগৎবাবু একদিন শ্রীমন্দিরে যান। বাহির হইয়া আসিবার সময় একটি ‘নাম’ ঠাকুর যেন বলিয়া দিলেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। ঠাকুরের দর্শন না পাইয়া মনে মনে সন্দেহ হইল, যথার্থ কি তিনি কৃপা করিয়া এই ‘নাম’ দিলেন? রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখেন, ঠাকুর তাঁহার নিকট প্রকাশ হইয়া বলিতেছেন, “অবিশ্বাস কর কেন? ঐ নাম আমিই তোমাকে দিয়াছি।” ঠাকুর শেষকালে প্রায়ই দীক্ষায় যে ‘নাম’ দিতেন, জগৎবাবু সেই নামই পাইয়াছিলেন।

আজ তিনজন পুলিশ কয়েকজন সাধুকে লইয়া আসিয়া বলিল, “ইহারা টিকিট করিয়া আসে নাই। বারজন লোক, পনের টাকা ভাড়া, ইহা না দিতে পারিলে ইহাদিগকে হাঁজতে দেওয়া হইবে।” ঠাকুর পনের টাকা দিয়া ইহাদিগকে খালাস করাইয়া মহাপ্রসাদ দেওয়াইলেন। সাধুকে কাল হইতে ভোজন হয় নাই। আহা়াস্তে সাধুরা বিদায় হইলেন। একজন বাঙ্গালী কেবল ভস্ম মাখিয়া সাধু হইয়াছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাস করিলেন “কোন সম্প্রদায়ের সাধু?” কিছুই জানেন না। ইহা যথাশাস্ত্র গুরু করিয়া কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইতে বলিলেন। আরও বলিলেন “মনোমুখী হইয়া চলিলে কিছুই লাভ নাই।”

মহাপ্রসাদ বন্ধ

আজ ঠাকুর গুজ্জাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইয়া নিকটস্থ পোলের উপর বসিলেন। আজ আর মহাপ্রসাদ পাওয়া যাইবে না। সোয়ারের একজোঠ হইয়া সংকল্প করিয়াছে, মঠধারী কি অত্র লোকের প্রসাদ পাক করিবে না। ইহা আমাদের সোয়ার বলিয়া পাঠাইয়াছে। সোয়ারের ‘ডাল’ তৈয়ারের উপর টেক্স বসিয়াছে। কুস্তকারেরাও অধিক দর ‘আইট্কা’ বিক্রয় করে। শান্তিদিদি ঠাকুরের জন্ত পাক করিলেন। ঠাকুর জগন্নাথদেবকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইলেন। ঠাকুর বলিলেন, “শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কৃপা করিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছেন।” সন্ধ্যার পর সরলনাথ দশ আইট্কা খিচুরী প্রসাদ আনিলেন। জগন্নাথবল্লভ মঠে দু’জন এখানে প্রসাদ পাইলেন। আর সকলকে ডাল ও চাউল নিয়ে অনুরোধ করা হইল। পণ্ডিতজী ও নরেন্দ্রের গোসাই এক আইট্কা প্রসাদ পাইলেন।

কাশ্মীরের একটি পণ্ডিত আসিয়া ঠাকুরকে অনেক স্তবস্ততি করিলে এবং কুসুম, রিভুতি ও অমরনাথের প্রসাদ প্রভৃতি দিলেন। রাজিকান্ত

ডেপুটীবাবু ও কিশোরীবাবু আসিলেন। কিশোরীবাবুর বিরুদ্ধে একথানা বেনামী দরখাস্ত লেফ্টেন্যান্ট গভর্ণরের নিকট কাহারো পাঠাইয়াছিল। সেখান হইতে উহা হাইকোর্টে পাঠান হয়। হাইকোর্ট হইতে জেলার জজের নিকট আইসে। জজ সাহেব কিশোরীবাবুর কৈফিয়ৎ তলব করেন। ঠাকুর সেই সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন ও বলিলেন, “কোন ভয় নাই। যখন মন নির্মল, তখন সমস্ত জগৎ বিরুদ্ধ হইলেই বা কি?”

কিশোরীবাবুর স্ত্রীর দান

৮ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। পথে কয়েকটি বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীকে অর্দ্ধ পয়সা ও পাই পয়সা ও একটি ছোট ছেলেকে ক্রমাল ও চাদর দান করিলেন। আজও মহাপ্রসাদ আসিল না। জগন্নাথবল্লভ মঠের বৈষ্ণব সকল এখানেই ঘরের প্রসাদ পাইলেন। ছাত্রদিগকে চাউল, ডাল ও তরকারী দেওয়ার কথা হইল। আজ পুনরায় কাশ্মীরি পণ্ডিত আসিয়াছেন। তিনি অতি স্নিগ্ধ স্বরে কয়েকটি ভজন গান করিয়া ঠাকুরকে শুনাইলেন। সন্ধ্যাকালে দাদাগোঁসাই অর্থাৎ অপ্রতুল হেতু দোকানদারের পাওনা দিতে পারিতেছেন না, ইহা ঠাকুরকে জানাইলেন। ঠাকুর বলিলেন, “শাস্তির অলঙ্কার বন্ধক দিয়া আপাততঃ দুই শত টাকা আনিয়া খুচরা দেনা শোধ কর।” আরও বলিলেন, “জগন্নাথদেব বেশ শিক্ষা দিলেন, ‘অর্থ দিব বলিয়া যে পাণ্ডাদিগকে বলিয়াছিলাম তাহারই শিক্ষা।’ যখন হাতে টাকা নাই তখন কিছুই বলা উচিত ছিল না। সকলই ভগবানের হাতে। তিনি যাহা দেন, তাহা হইতেই অন্মকে দিতে হয়।” ইহার পর যোগজীবনদাদা শাস্তির গহনা বন্ধক দিয়া টাকা আনিতে

কিশোরীবাবুর নিকটে গেলেন। তিনি কহিলেন, “জিনিষ বন্ধের প্রয়োজন নাই, আমার জীর পোষ্টাপিসে টাকা আছে, তাহা হইতে ২০০ টাকা তুলিয়া দিব, পরে দিলেই হইবে।” কিছু ঠাকুরের আবশ্যক জানিয়া এবং তাঁহার স্বামীরও ইচ্ছা থাকায় কিশোরীবাবুর জী সমস্ত টাকাই দান করিলেন, এবং পরে বলিয়াছিলেন “এই টাকা ঠাকুর গ্রহণ করায় তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। ইহা তাঁহারই দয়া।”

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও কামিনী-কাঞ্চন

২ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। বিশ্বাসমহাশয় ঠাকুরের স্নানে জন্ম দু'টি হাঁড়ি কিনিয়া লইলেন। পথে অনেক কথাবার্তা হইল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি মুখে যাহা বলিতেন, কাজেও তাহাই করিতেন। ঐ সম্ভ্রদায়ের কেহ কেহ ঐ কামিনী-কাঞ্চন লইয়া খেলা করিতেছেন। হইতে পারে, উহাতে ইহার একেবারে ডুবিয়া যাইতে পারেন। যখন বাবু পরমহংসদেবকে পরীক্ষা করিতে কয়েকটি বেগু পাঠাইয়াছিলেন; বেগুরা তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া নানারূপ ভাবভঙ্গী এবং কেহবা বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পরমহংসদেব ঐরূপ ভাব ভঙ্গী দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ‘মা’, ‘মা’, ‘মা’ বলিয়া তিনবার চীৎকার করিলেন। ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা! তত্ক্ষণে কি ভাবে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন। ঐ সকল বেগু ঐ সকল শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র মূচ্ছিত হইয়া পড়িল। কিছু পরে চেতনা পাইয়া তাহার পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। পরমহংসদেব বলিলেন “মা, তোদের ভয় নাই; আমাকে সখি সাজাইয়া দে, চল মা’র আরতি করি।” উহাদের মধ্যে

প্রধান বেণ্ডাটি পরমহংসদেবকে নিজে ঘাগুরা তৈয়ার করিয়া গোপিনী সাজাইয়া দিয়াছিলেন। একটি বেণ্ডা ঘর-দুয়ার বিক্রয় করিয়া কাশীধামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মথুরাবাবু নিজের পরিবারের ভিতর তাঁহাকে (পরমহংসদেবকে) আনিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামী জী মিলিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেন। মুখে ঘোমটা; দাড়ি গোঁপও রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া মথুরাবাবু কত কৌতুক করিতেন। এ দাড়িওয়াল জীলোক। পরমহংসদেব বলিতেন “তাও আছে; শ্রীমন্দাবনে রাসস্থলীতে মহাদেব সখী সাজিয়াছেন। তাঁহার গোঁপ রহিয়াছে।”

জগন্নাথদেবের ভিক্ষা : হরিবল্লভবাবু

সোয়ারেরা এক জোট হইয়া রান্না না করায় পাঁচ ছয় হাজার লোক কিছুই খাইতে পায় নাই, এই বলিয়া ঠাকুর টেক্স দারোগার কাছে আক্ষেপ করিলেন। পরে হরিবল্লভবাবুর নিকট ক্লেশ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভগবান নিজেই ‘আমাকে খেতে দাও, বলিয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিয়াছেন’ এই বলিয়া তাঁহার নিকট কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরিবল্লভবাবু বলিলেন, “কাল মন্দিরে যাইয়া স্পষ্ট মনে হইল ঠাকুর আর মন্দিরে নাই, সকলেই বিমর্ষ ও মলিন।” ঠাকুর বলিলেন, “এই সকল কথা বলিতে নাই, কিন্তু সত্যের অনুরোধে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; কাল রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময় একটি ভিক্ষুক চীৎকার করিল ‘খেতে দাও’, ‘খেতে দাও’। ডিপুটীবাবু ও মুন্সেফবাবু এবং আমি উহা শুনিলাম। বায়ুনঠাকুর বলিল, ‘কে ডাকিয়া ঐ দিকে চলিয়া গেল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেই সময়ে বাহিরে অনেক দূর অন্বেষণ করিয়াও কাহাকেও পাওয়া গেল না’।”

“হরিবল্লভবাবুকে জগন্নাথদেবই এখানে আনিয়াছিলেন” ঠাকুর এই

কথা বলায়, তিনিও তাহা স্পষ্টই বুঝিতেছেন বলিলেন। ঠাকুরের পক্ষে ধূলা পুনঃপুনঃ লইলেন। এই ধাম তাঁহার প্রাপ্তি হয় এই আকাজ্ঞা জানাইলেন। ঠাকুর বলিলেন, “ভক্তের বাঞ্ছা ভগবান কখনই অপর রাখেন না। আপনার দ্বারা ভগবান বিশেষ কিছু করাইবেন, তাই তিনি এখানে আনিয়াছেন। ভগবানই ভিতরে সম্ভাবের উদ্রেক করাইয়া সদবুদ্ধি দিবেন। হয়ত স্মমহৎ ভার আপনার উপর সমর্পিত হইবে।” পথে আসিতে আসিতে বলিলেন, “জগন্নাথদেব টানিলে ওকালতি ছাড়িতে কতক্ষণ?” পথে এই স্থানের পোষ্টমাষ্টারবাবু বড় রাস্তায় পড়িয়া ঠাকুরকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার পিতার সম্বন্ধে একটি গল্প করিলেন। পিতা সরকারী কার্য্য করিতেন। কার্য্য করিতে করিতে একদিন বলিয়া উঠিলেন, ‘শ্রীবৃন্দাবন হইতে রাধারাণী আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। এই বলিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে ছুটিলেন, তথায় তাঁহার রজঃ প্রাপ্তি হয়।”

নারদের মায়াজয়ের গল্প

ঠাকুর আজ নারদের মায়াজয়ের গল্প করিলেন। অনেকদিন পরে নারদ ভগবান ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “নারদ এতদিন তোমাকে দেখি নাই কেন?” নারদ বলিলেন, “বহু তপস্বী করিয়া মায়া জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং আপনাদের প্রসাদে একপ্রকার কৃতকার্য্যও হইয়াছি।” ব্রহ্মা বলিলেন, “কি, তুমি মায়া জয় করিয়াছ না কি? যাউক, আমার নিকট এই কথা বলিলে কিন্তু বিষ্ণুর নিকট একরূপ বলিও না।” অতঃপর নারদ শিবলোকে গেলেন; মহাদেবে সহিতও একরূপ কথাবার্তা হইল। তিনিও “আমার নিকট বলিলে, কিন্তু বিষ্ণুর নিকট এ কথা বলিও না।” এই বলিয়া নিষেধ করিলেন। পরে নারদ ভগবান বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কি নারদ, এত দিন ত তোমাকে দেখি নাই, কোথায় ছিলে?” নারদ মায়াজয়ের কথাটা যেন না বলিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। বলিলেন, “ঠাকুর এত দিন তপস্শায় ছিলাম, মায়াটা জয় করিতে পারি কি না—তা যাউক, আপনার শ্রীচরণ আশীর্বাদে একরকম.....।” বিষ্ণু বলিলেন, “কি, তুমি মায়া জয় করিয়াছ না কি? ভাল, ভাল, চল একবার বেড়াইয়া আসি।” ইত্যবসরে ভগবান বিষ্ণু মায়াপ্রভাবে এক রাজকন্তার স্বয়ম্বর প্রকটিত করিলেন। তাহাতে নারদ সুন্দর রূপ প্রাপ্তির জন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ভগবান তাঁহার সমস্ত শরীর সুন্দর করিয়া দিলেন। কিন্তু মুখটি বানরের মত করিলেন। রাজকন্তা সভায় আসিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। নারদ ভাবিলেন “আমাকে দেখেন নাই।” এই বলিয়া মুখ উঠাইয়া উঠাইয়া দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু সব বৃথা হইল। নন্দী ভৃঙ্গী ঠাট্টা করিতে লাগিল। তাহাদিগকে নারদ অভিসম্পাত দিলেন। কন্তা বিষ্ণুর গলে মাল্য দিলেন। পরে নিজের আকৃতি জলে দেখিয়া নারদ বিষ্ণুকে অভিসম্পাত ও গালাগালি করিতে লাগিলেন। “এই জীব জন্তু দেশে দেশে কাঁদিয়া বেড়াইতে হইবে। যেমন বানর মুখ দিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ, ইহাদেরই সাহায্যে বহুক্লেশে জীব উদ্ধার হইবে।” ইত্যবসরে ভগবান মায়া অপমৃত করিলেন। নারদ বলিলেন, “ঠাকুর, একি? আমি যে সর্বনাশ করিয়াছি, আপনাকেও অভিসম্পাত করিলাম?” বিষ্ণু বলিলেন, “কিছু ভাবিও না, আমার রামলীলার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমিই তাহার সূচনা করিয়া দিলে।” মায়া জয় কি সহজ?

ভগবতীর তপস্শা

আজ সমুদ্রে যাইয়া একটি কচ্ছপ দর্শন করিয়াছিলাম। জেলে পয়সা চাহিল, পয়সা পাইলেই উহা ছাড়িয়া দিবে। তাহাকে পয়সা দিয়া

কচ্ছপটিকে জলে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আজ বড় বড় ছুই হাড়ি জু দিয়া ঠাকুরকে স্নান করাইলাম। আসিবার সময় হরিবল্লভবাবুর নিন্দা সাক্ষাৎ হইল। তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়াই আন্তে আন্তে লাঠি হু দিয়া আসিলেন। আজ নূতন রাস্তায়, বড় হরিশবাবুর বাসার পার্শ্ব দি বাসায় আসা হইল। রাস্তাটির দুধারে গাছপালা দেখিয়া ঠাকুর আন করিলেন।

পথে আসিতে আসিতে ঠাকুর বলিলেন, “ভগবতী দুর্গা মহাদেব পাঁচবার জন্ম তপস্বী করিতেছিলেন। মহাদেব ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া দিবে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ভগবতী বলিলেন, “কে তুমি? ভগবান কখনো ধ্বজকে নিন্দা করিতেছ? চলিয়া যাও।” ব্রাহ্মণ কহিলেন “তুমি ‘কাল’ মহাদেব কালমেয়ে বিবাহ করিবেন না।” ভগবতী বলিলেন, “তাই কি?” এই বলিয়া এক ডুব দিয়া উঠিলেন। অমনি তিনি গৌরাঙ্গী হইলেন। তাঁহার রূপের কি ছটা! ভগবান আর সামলাইতে পারিলেন না।

বলিলেন, “ছোট বয়সে যে সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, বজ্রের মত মন হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকে। অধিক বয়সে আর সেরূপ হয় না।” সন্ধ্যাকালে কাশ্মীরি বাবাজী আসিয়া অনেক ভজন শুনাইলেন, ঠাকুর বহু স্তবস্ততি করিলেন। “এই ধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও ঠাকুর দর্শনীয়” এরূপ বলিলেন।

রাজা বিষ্ণুর অবতার

১০ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ সকালে ঠাকুর গুজ্জাবাড়ীর দিকে গেলেন। পথে ঘাইতে ঘাইতে রাজভক্তির কথা উল্লেখ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “রাজা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবশক্তি অবস্থিত আছে। বেণ রাজাকে ঋষিরা দি

একাদশ অধ্যায়

২৪১

অবতার বলিয়া স্তুতি করায় তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, “অন্ত কাহাকেও পূজা করিতে পারিবে না ; আমাকেই মাত্র পূজা করিবে।” ঋষিরা কত নিবেদন করিলেও তিনি শুনিলেন না। তখন অথর্কবেদোক্ত ক্রিয়া করিয়া বেণকে মারিয়া ফেলিলেন। কিছুদিন গত হইলে হঠাৎ ঋষিরা দেখিলেন ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, তথাপি মহা ধূলিরাশি চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহার কারণ কি ? ধ্যানে দেখিলেন, রাজ্যে বহু বহু দস্যব উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে ; এই ধূলিরাশি তাহাদেরই উৎপাতের ফল। ঋষিরা বেণকে তৈল হইতে উঠাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ধর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন উহা হইতে এক পাপপুরুষ উদ্ভিত হইল। উহা হইতে নিষাদবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। অতঃপর পুনরায় ঘষিতে ঘষিতে পৃথুরাজ্য জন্ম হইল। ঋষিরা তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি প্রথমতঃ সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইয়া পিতাকে ক্ষমা করিতে এবং তাঁহার সংগতির জন্য প্রার্থনা করিলেন। ঋষিরা “তথাস্তু” বলিলেন। পরে রাজা ও প্রজা ঋষিদের কার্য্যাকার্য্য আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তিনি ধনু ধারণ করিয়া পৃথিবীকে বিদ্ধ করিতে গেলে, অনন্তগতি হইয়া পৃথিবী তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঋষিরা ও কৃষকেরা পৃথিবী দোহন করিলেন। পর্ব্বতশ্রেণী সমভূমি করিলেন। ক্লষিত্ত্ব তিনিই প্রথম শিক্ষা দেন।”

পরে ঠাকুর সাধারণ রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া দরজাপুকুর গগনবাবুর বাসার নিকট দিয়া বরাবর দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিলেন। পথে গাছপালা নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী দর্শন করিয়া বড় আনন্দ পাইলেন। দুইদিকে একরূপ বাঁশগাছের বেড়া, মাঝে মাঝে কৃষকদিগের বাড়ী। একটি ছোট পুকুর দর্শন হইল। বুদ্ধিয়া নামে একটি কাদ্মাল বালক আমাদের পথপ্রদর্শক। গতকল্য কোকিলের ধ্বনি শুনিয়া বলিলেন, “এই স্থানে চিরবসন্ত বিরাজিত বলিয়া খ্যাতি আছে।”

পাগল ব্রাহ্মণের শিবস্তোত্র পাঠ

১১ই মাঘ, ১৩০৫ সাল। আজ পুনরায় সমুদ্র-স্নানে গেলেন। বিধুবাবু ও সরলনাথ ঠাকুরকে ধরিল। আমি ও ললিত জল ঢালিয়া স্নান করাইতে লাগিলাম। শ্রীধর জটা ধরিলেন। বিধুবাবু ও সরলনাথকেও জল ঢালিয়া স্নান করাইলাম। আজ যাওয়ার সময় পথে একটি ব্রাহ্মণ, বিদ্বান্ অথচ পাগল, শিবস্তোত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। ঠাকুর এক আন দিলেন। লোকটি কোন দেবতা-সিদ্ধি করিতে যেয়ে নাকি পাগল হইয়া গিয়াছেন।

১২ই মাঘ। আজ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু ও বরিশালের শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, রাজকুমার সমাদ্দার ও তাঁহার স্ত্রী ক্ষীরোদাসুন্দরী সান্নিধ্য পাইলেন। সাধনে অনেক কথা বলিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপ্তি সাধন হইল। ঠাকুর প্রমথবাবুকে খুব সৎলোক বলিয়া প্রশংসা করিলেন। ইনি এখানকার পোষ্টাপিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পরীক্ষা দিয়া এ ব্যাপ্তি পাইয়াছেন।

কিশোরীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর সাধনা প্রাপ্তি : পঞ্চম

১৩ই মাঘ। আজ মুন্সেফ কিশোরীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, ভাগিনে ও শান্তিদিদির ছেলে জগদানন্দ (পুষ্টি) সাধন পাইলেন। সাধনে জন্ম মুন্সেফবাবুরও বড় একটা ব্যগ্রতা হইয়াছিল। সমুদ্রে স্নান করিতে ভয়, পাছে হাড়ের কাটে, তাহলে আর সাধন পাওয়া হইবে না। ছেলে পিলে মূর্খ হইয়া থাকুক, তথাপি তাহার সাধন পাউক। উহার ধর্মজীবন লাভ হইবে। উহাদিগকে কুসুম ও চন্দন ঘষিয়া দিনারা ছেলেদিগকে সাজাইয়া দেওয়া হইল। সাধন হইলে চা খাইলেন।

একাদশ অধ্যায়

২৪৩

স্ত্রী জগন্নাথ দর্শন না করিয়া চা খাইবেন না। সকল ছেলেপিলেকে প্রসাদী খাজা দেওয়া হইল। এখানে প্রমথবাবু ও মুসেক্‌বাবু এবং কয়েকটি ছেলে প্রসাদ পাইলেন। আজ দশজনের সাধন হইল। সাধনের সময় পঞ্চযজ্ঞের কথা এ দু'দিনই উপদেশ করিলেন। এখন আর কেহ উহা করে না। উহা করিলেই সমস্ত অন্তর্ধান করা হয়। দেবযজ্ঞ—পূজা, অর্চনা, যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি। পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ তর্পণাদি। ঋষিযজ্ঞ—শাস্ত্র-পাঠাদি। নৃযজ্ঞ—অতিথিসংকারাদি। ভূতযজ্ঞ বা প্রাণীযজ্ঞ—কীট, পতঙ্গ ও পশুপক্ষী প্রভৃতিকে আহার ও পানীয় দান। পূর্বে এ সকল, গৃহস্থের প্রতিদিনের করণীয় ছিল। ঠাকুর অস্থিতা সত্ত্বেও সাধন দিলেন। মুসেক্‌বাবুর সাধনের জন্ত আগ্রহ বড়ই চমৎকার দেখিলাম।

ঠাকুরের পুরীধাম আসার পর কিশোরীবাবু প্রত্যহই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ঠাকুরের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন এরূপ সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ইহাতে এক বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল। তাঁহার স্ত্রী কুলগুরু ত্যাগ করিয়া অন্তত্ন দীক্ষা গ্রহণ করিলে বংশলোপ হইবে, এই আশঙ্কায় উহাতে বাধা জন্মাইলেন। তিনি দেশ হইতে কুলগুরুকে আনাইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র নিতে অনুরোধ করিলেন। কিশোরীবাবু এই সঙ্কটে পড়িয়া ঠাকুরকে সমস্ত জানান এবং কহিলেন, “আপনার আশ্রয় লওয়াই আমার সঙ্কল্প। ইহাতে যদি আমার বংশনাশ হয় হউক, আমার সঙ্কল্প আমি ত্যাগ করিব না।” ঠাকুর বলিলেন “যে গুরুর দ্বারা কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়, তিনি কুলগুরু। বাঙ্গালা দেশে ‘কুলগুরু’, ‘কুলগুরু’ বলিয়া কথা। কেহ কৌলিক গুরু ত্যাগ করিতে চাহে না।” পরে তাঁহাকে বলিলেন, “আমি অনুমতি দিতেছি আপনারা কুলগুরুর নিকট দীক্ষা নেন, তারপর ইচ্ছা হয় আমার নিকট নিবেন।” ঠাকুর

নিজেই দীক্ষার দিন, সময়, সমস্ত ঠিক করিয়া দিলেন। কুলগুরুর নিকট তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর দীক্ষা হইল। ইহার কিছুদিন পরে ঠাকুরের নিকট দীক্ষার জন্ত ব্যস্ত হইয়া, তিনি দাদাগোঁসাইকে তাঁহার প্রার্থনা জানাইতে বলিলেন। ঠাকুর মাঘ মাসে সাধন হইবে বলিয়া অনুমতি দিলেন। ইতি মধ্যে তাঁহার জীও একদিন কহিলেন “আগিও তোমার সঙ্গে সাধন লইব।” কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কহিলেন যে মাঝে মাঝে তিনি স্বপ্ন দেখেন যেন ঠাকুরের নিকট বসিয়া আছেন এবং তাঁহার নিকট মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন। ইহার পর কিশোরীবাবু একদিন ঠাকুরের নিকট স্বীর সাধন প্রার্থনা জানাইলেন। ঠাকুর কহিলেন, “আপনি লওয়ান নাই তো?” তদুত্তরে কিশোরীবাবু বলিলেন, “লওয়াই নাই তো নিশ্চয়ই, বরং গুরুত্যাগের বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়াছিলাম।” তখন ঠাকুর সাধনের অনুমতি দিয়া আশীর্বাদ করিলেন, “আপনি যাহাকে আনিবেন, তাহারই সাধন হইবে।”

দ্বাদশ অধ্যায়

সাধন প্রসঙ্গ

দীক্ষার তাৎপর্য : এই সাধনের অধিকারী

আমলাগাছির জমিদারেরা গোস্বামী মহাশয়ের পৈতৃক শিষ্য ছিলেন। এক সময়ে ঐ বাড়ীর একজন কর্তী শ্রীমতী জয়তারা চৌধুরাণী ঠাকুরকে ও মাঠাকুরাণীকে একত্রে বসাইয়া যুগলপূজা করেন। পূজা শেষ হইলে শ্রীমতী জয়তারা করযোড়ে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—
“প্রভো, আমি ভবসাগরে হাবুডুবু খাইতেছি। আমাকে দয়া করিয়া উদ্ধার করুন।” উপরি-উক্ত কথায় ঠাকুরের চিত্ত বিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন ‘আমি কি কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারি?’ আমি নিজেই ভবসন্তাপে জর্জরিত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছি। হায়! আমি আর কপটতা পোষণ করিতে পারিব না। যদি যথার্থ অন্তের ক্লেশ দূর করার ক্ষমতা জন্মে তবে গুরু হইব। গুরুকে দীক্ষাকালে শিষ্যের নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করিতে হয়। কুলগুরু তাঁহারাই, বাহারাই এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করিতে সক্ষম। মূলাধার চক্রে এই শক্তি নিদ্রিতাবতায় বর্ত্তমান আছেন। এই শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যবর্তী সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা, এই ষট্ চক্র ভেদ পূর্ব্বক সহস্রারে পৌছে। দীক্ষাকালে গুরু এই শক্তি জাগ্রত করিয়া দেওয়ার সাধক নানারূপ অবস্থা সম্ভোগ করেন।

ঠাকুরের নিকট সাধন নেওয়া বড় কঠিন ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক

ছেলেদের সাধন লইতে হইলে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের অনুমতি লইতে হইত। বহু বহু বিদ্বান, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকাতরে যাজ্ঞা করিয়াও এই সাধনা পান নাই। বানরীপাড়ার কেহ সাধনপ্রার্থী হইয়া চিঠি লেখায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে “তাহার আমার এখানে আসার কোন দরকার নাই।” ইহাতে কুঞ্জ ঠাকুরের নিকট তাহার সদগুণ বলিতে আরম্ভ করিলে, ঠাকুর হাসিয়া বলিয়াছিলেন “যাহারা সাধন পাইবে তাহাদের নাম নির্দিষ্ট আছে। তার থেকে একটুও বেশী নয়। তাঁহারা যদি না আসেন তবে তাঁহাদের বাড়ী গিয়া সাধনা দিতে হইবে। যদি আমাকে ঠেকা মারিতে থাকে তবুও মার খাইয়াও তাহাদিগকে সাধন দিয়া আসিব।” ঠাকুর এক সময় বলিয়াছিলেন “এই শক্তি সেই, যাহা মহাপ্রভু সাড়ে তিনজনকে দিয়াছিলেন।”

সদগুরুশক্তির মর্যাদা দান

মোহিনীবাবু বলিয়াছিলেন, “আমার জ্বী কলিকাতা হ’তে দীক্ষা নিয়ে বাড়ী যান। ইহার কিছুদিন পরে আমি গেলে তিনি একদিন বলিলেন, “আমি আহারের পর একদিন ঘরের বারান্দায় কাপড় পাতিয়া শুইয়াছিলাম। ভিতরে নাম চলিতেছিল। দেখিতে পাইলাম হাঁসে-চড়া একজন চতুর্ভুজ পুরুষ আমার চতুর্দিকে ঘুরিতেছেন।” এই কথা শুনিয়া আমি কিছু বুঝিলাম না। কলিকাতা গিয়া ঠাকুরের নিকট ইহা বলিলাম। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “ব্রহ্মা আসিয়াছিলেন?” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ব্রহ্মা কেন আসিয়াছিলেন?” তাহাতে তিনি বলিলেন, “এই শক্তির মর্যাদা দিবার জন্য। যিনি যে লোকেই থাকুন না কেন, সকলকেই নিজ নিজ লোক ত্যাগ করিয়া এই জিনিষের (সদগুরুশক্তির) মর্যাদা দিতে আসিতে হয়।”

পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, তিনি সাধন লইলে পর নাম করিতে বসিলেই দেখিতে পাইতেন ‘গণেশ’ সম্মুখে আসিয়া মুখের নিকট গুঁড় নাড়িয়া কৌতুক করিতেছেন। সাধন পাওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি শরীর হইতে বাহির হইয়া পড়েন এবং দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার শরীরটা দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি ও শরীর পৃথক্। তিনি বলিয়াছিলেন, “গুরুজী কৃপা করিয়া শরীর ও আমি যে পৃথক্ তাহা দেখাইলেন।” এইরূপ আরও অসংখ্য ঘটনা আছে।

নামই শক্তি : বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ

ঠাকুর যে ‘নাম’ দিতেন তাহার শক্তি অসীম। ‘নাম’ কতকগুলি শব্দ বা অক্ষর নহে। বিমুগ্ধমোহন্তরে আছে :

“নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য যুক্তোহভিন্নাত্মানামনামিনোঃ।”

নাম ‘চিৎ স্বরূপ’, ‘চৈতন্যরসবিগ্রহ’; ‘নাম’ ‘নামী’ অভেদ। তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর, সদগুরু প্রদত্ত এই শক্তি আপনা আপনি বিকাশ পাইবে ও অনন্তকাল চলিবে।

গুরুদেব ‘আশাবতীর উপাখ্যানে’ লিখিয়াছেন, ঈশ্বরের নাম অক্ষর নহে। স্বরঃ ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি। আমি যে নাম করি তাহাতে যদি শক্তি না থাকে, নাম স্পর্শমাত্র যদি প্রেমভক্তি পবিত্রতা প্রাণে ভোগ না করি, তবে তাহা ঈশ্বরের নাম নহে, কয়েকটি অক্ষর। এ বিষয়ে একটি আখ্যানিকা বলি, শ্রবণ কর :—

এক ব্রাহ্মণ বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক স্তবস্ততি করিলেন। ব্যাস বলিলেন, “হে বিপ্র, তুমি কি জন্ত আমার নিকট দৈন্ত প্রকাশ করিতেছ, আমি তোমার কি উপকার করিব?” ব্রাহ্মণ বলিলেন,

“হে পরাশর-পুত্র, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি তোমার শরণাগত, আমার উপকার কর। আমাকে এমন কিছু শিখাইয়া দাও যে আমি যথেষ্ট গমনাগমন করিতে পারি।” ব্রাহ্মণের এই দৈন্যোক্তি শ্রবণ পূর্বক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিষ্ণপত্রে কিছু লিখিয়া দিয়া বলিলেন “হে দ্বিজ, এ বিষ্ণপত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা দেখিও না। ইহা হস্তে রাখিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিবে। এই পত্র হস্তে থাকিতে তোমার সৌরবিহারে কেহ বাধা দিতে পারিবে না।” ব্রাহ্মণ সেই পত্র লইয়া পরমানন্দে সর্বত্র গমনাগমন করিতে লাগিলেন। কখন ইন্দ্রলোক, কখন চন্দ্রলোক, কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে মনের সাধে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন ‘পত্রটি’ শুকাইয়া গিয়াছে। মনে করিলেন ‘পত্রটি শুষ্ক হইল, কখন চূর্ণ লইয়া যাইবে, অতএব ইহাতে যাহা লেখা আছে তাহা একটা নূতন পত্রে লিখিয়া লই। পত্রটি খুলিয়া দেখেন, তাহাতে লেখা আছে ‘ও রামঃ’। আবার ব্যাসের হস্তাক্ষরও ভাল নয়, হিজিবিজি। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাশ্ব করিয়া বলিলেন “ও হরি! এই সঙ্কেত! ‘ও রামঃ!!!’ লেখারও শ্রী দেখ! দূর হউক শুষ্ক পত্রটা রাখিয়া আর লাভ কি? আমার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর মুক্তার মত।” ইহা বলিয়া একটা বিষ্ণপত্রে দিব্য অক্ষরে ‘ও রামঃ’ লিখিলেন। শুষ্ক পত্র কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ স্বহস্তে লিখিত পত্রটি হস্তে লইয়া মনে করিলেন, ‘মন চল একবার কাশী যাই।’ ওঃ একি! উঠি না কেন? অনেক চেষ্টা করিলেন সমস্ত বিফল হইল। কাশী যাওয়া হইল না। তখন ঘৃণা, লজ্জা ও দুঃখে অবসন্ন হইয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন। আর কোন উপায় না দেখিয়া পুনঃ ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলেন। ব্যাস কহিলেন, “হে বিপ্র! তোমার অবিশ্বাস তোমাকে নষ্ট করিয়াছে। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এই পত্রের মধ্যে কি আছে তাহা দেখিও না। আমি বহুকাল গুরুসেবা পূর্বক

তাঁহার কৃপা লাভ করি। সেই গুরুশক্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে, সেই শক্তি আমার দেবতারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় ও বরে আমি তাহা সঞ্চারিত করিতে পারি। এজন্য আমার লিখিত নামে সে শক্তি বর্তমান ছিল। সেই শক্তি প্রভাবেই তুমি যথেষ্ট ভ্রমণ করিয়াছ। 'ও রামঃ' এই কয়েকটি অক্ষরের কোন মূল্য নাই। এজন্য তোমার হস্তাক্ষর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই।" ব্রাহ্মণ অনেক রোদন করিলেন। কিন্তু ব্যাস অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে, সময় হয় নাই বলিয়া, আর শক্তি সঞ্চার করিলেন না।

এই সাধনের বিশেষত্ব

কানপুরের উকীল গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ঠাকুরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ধামরাইএর খাঁ সাহেবদের ও আমাদের সাধনে পার্থক্য কি?" ঠাকুর বলিলেন, "তাঁহাদের সাধন পুরুষার্থ ও গুরুকৃপা-সাপেক্ষ; আর আমাদের সাধন সম্পূর্ণ গুরুকৃপাসাপেক্ষ।"

ঠাকুর শুধু 'স্বাসে স্বাসে নাম' জপ করিতে বলিতেন। বিশেষ কোনও দেবতার উপাসনা, কি ভগবানের কোনও বিশেষরূপ ধ্যান, কি গুরুকে দেবতা জ্ঞান, কি অল্প কোনরূপ বিশ্বাস কাহাকেও করিতে বলেন না। তিনি বলিতেন, "যাহা সত্য তাহা সময়ে হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে। পূর্বে একটা কল্পনা করা থাকিলে যথার্থ সত্য প্রকাশের ব্যাঘাত হয়।" কোনরূপ কল্পনা করা সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। সাধন সময়ে 'নামের' তাৎপর্য্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেন। এই শক্তি লাভ করিয়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মগণও অন্তপ্রকার হইয়া গেলেন এবং ক্রমে ঋষি প্রণীত শাস্ত্র ও সদাচারের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাসম্পন্ন হইলেন। "যাহা সরলভাবে সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর তাহাই করিয়া যাও" সকলকে এইরূপ উপদেশ দিতেন।

ঠাকুরের অসাম্প্রদায়িক ভাব

ঠাকুর একবার গয়াধামে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে শ্রীযুক্ত শ্রামাবান্ধ পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “দেখুন, আজকাল অসাম্প্রদায়িক ধর্ম-প্রচারের বড় প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি আশাবতী গ্রন্থে লিখিয়াছেন “এক গয়ায় চল্লিশটি বৈষ্ণব আশ্রম। উদাসীন সম্যাসীর প্রায় ছত্রিশটি, কবীরপন্থীর পাঁচটি। এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হইলে কি পবিত্রতা রক্ষা করা যায়।” এই সকল দলের ভিতর কিরূপ হিংসা, বিদ্বেষ, অনেকেই তাহা অবগত আছেন। কালীর মন্দিরে বৈষ্ণবেরা প্রাণান্তেও যাইবেন না। হরিহরমন্ড্রে মহাদেবের পূজা হইলেও তাঁহার প্রসাদ রামাইত বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করিবেন না। শাক্ত ও বৈষ্ণবেরা পরস্পর ঘৃণা করিয়া থাকেন। ঠাকুর কলিকাতায় সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসাতে একখানা কাগজে নিম্নলিখিত অনুশাসন বাক্য লিখাইয়া তাঁহার ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন—

“এখানে বাঁহারা আছেন বা আসিবেন, তাঁহারা কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা করিতে পারিবেন না।”

ঠাকুর সাধন দেওয়ার সময় সকলকে এই উপদেশ দিতেন,—ধর্ম বিষয়ে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি রাখিবে না। তিনি কখনও কাহাকে স্ব স্ব ধর্মপালনে নিষেধ করিতেন না। তবে ঐ সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষাকালীন যাহা বলিয়া দিতেন, তাহার অনুষ্ঠান করিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন “শাস্ত্রে আছে প্রাণী বহুজন্ম ঘুরিয়া পরে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে। মনুষ্যজন্ম পাওয়ার পরেও বহুজন্ম ভূত, প্রেত, পিশাচ ও উপদেবতা সকল পূজা করিয়া তৎপরে গুরুর নিকট দীক্ষার অধিকারী হন। গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রথম তিন জন্ম সূর্যোপাসনা, পর তিন জন্ম

গণেশ, পর শত জন্ম শক্তি, পরে তিন জন্ম শিব, তৎপরে তিন জন্ম বিষ্ণু উপাসনা করিয়া সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলে সৎগুরুর কৃপা লাভ করেন। সৎগুরুর কৃপা লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগ এবং সর্বশেষে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এ সকল বিষয় বিবৃত আছে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন :

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।

গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥

অতএব যাহারা সৎগুরুর কৃপালাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই পঞ্চ উপাসনা করিয়া ইহা লাভ করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের সঙ্গে কোন সম্প্রদায়ের বিরোধ নাই। সকল দেবতাকেই তাঁহারা নমস্কার করেন। সকল দেবতাকেই তাঁহারা উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। এক ভগবানকেই এই পঞ্চ সম্প্রদায় পঞ্চভাবে উপাসনা করিতেছেন।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সন্ন্যাসী ও ফকির প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক ঠাকুরের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। গুরুদেবের কৃপায় তাঁহাদের যে সমস্ত অলৌকিক অবস্থা ও তৎসহ অসাধারণ দিব্যদর্শন শ্রবণাদি শক্তি লাভ হইয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঢাকার আলিজান ফকির ও খৃষ্টান কেঞ্চেল সাহেব তাঁহার শিষ্য ছিলেন। কেঞ্চেল সাহেব 'ঢাকেশ্বরী দেবীর' দর্শনে যাইয়া তাঁহাতে যীশুখৃষ্টের দর্শন পাইয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করেন। এই ঘটনা কেঞ্চেল সাহেব গেণ্ডারিয়া আশ্রমে ঠাকুরকে বলেন।

প্রায় প্রতিদিন হরিসংকীৰ্ত্তনের পর তাঁহার নিকট শ্রামাসঙ্গীতাদি হইত। তিনি তাহা শুনিয়া ভাবে অধীর হইয়া পড়িতেন। তিনি বলিতেন, "যিনি রাধারানী তিনিই আত্মাশক্তি।"

ভোরবেলা গুরুভাতা ও অচিন্ত্য চক্রবর্তী, 'শ্রীশ্রীরামচন্দ্র' সঙ্ক্কে, কখন 'শ্রীকৃষ্ণ' সঙ্ক্কে গান করিতেন। ঠাকুর মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ সকল

খরিদ করিয়া আনা হইয়া উহা পাঠ ও যত্নের সহিত তাঁহার গ্রন্থ সকলের মধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার একখানা বাঙ্গালা ‘কোরাণ’ আমার নিকট অনেক দিন ছিল। এখন উহা তাঁহার গ্রন্থাদির মধ্যে রহিয়াছে। তিনি কলিকাতায় মুসলমানদের পর্কবিশেষ উপলক্ষে, ‘কারবালা’ পুস্তকে বাইয়া পয়সা দিয়া জল দেওয়াইতেন। ঢাকার কুটীরে এবং কলিকাতায় সময়ে সময়ে তিনি ‘বাইবেল’ পাঠ করিতেন। ‘তুলসীদাসের রামায়ণ’, ‘কবীরজীর গ্রন্থ’, ‘সমস্ত পুরাণ’, ‘উপনিষদ’, ‘বৈষ্ণব ও শাক্ত গ্রন্থ সকল’, গুরু নানকের ‘গ্রন্থ সাহেব’ এবং হিন্দুশাস্ত্র সকল তিনি সর্বদা নিকটে রাখিয়া ইচ্ছামত পাঠ করিতেন। তাঁহার নিকট ‘বনুর্বেদ কুটুম্বক’ হইয়াছিল।

ঠাকুরের গলায় সকল ধর্মসম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ চিহ্নস্বরূপ রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ, তুলসী, স্ফটিক, প্রবাল, বিষ্ণুমূল ও চন্দনের মালা ছিল। এক সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার গলায় তুলসীর সহিত রুদ্রাক্ষ ও পদ্মবীজ দেখিয়া বৈষ্ণব বাবাজীরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ—হরিভক্তিবিলাস * হইতে দেখাইয়া দেন যে, বৈষ্ণবের পক্ষে তুলসী, নলিনী ও অক্ষমালা ধারণের ব্যবস্থা আছে।

* শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত নারদীয়ে—

যে কণ্ঠলগ্নতুলসী নলিনাক্ষ মালাঃ ।

যে বাললাটিকলকে লসদূর্ধ্বপুণ্ড্রাঃ ।

যে বাহমুলোপরি চিহ্নিত শঙ্খচক্রা ॥

স্তে বৈষ্ণবাঃ ভুবনমাণ্ড পরিজায়ন্তে ॥

এই স্থানের ব্যাখ্যায় ঠাকুর বলিয়াছেন, ‘নলিনাক্ষ’ অর্থ পদ্মবীজ ও রুদ্রাক্ষ।

ঠাকুর মৌনাবস্থায় স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন, “বৈষ্ণবের রুদ্রাক্ষ মালার মধ্যে স্ত্রেী। কখন অতি বিশুদ্ধ। হরিভক্তিবিলাসে, তুলসী, পদ্ম, রুদ্রাক্ষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এককণ্ঠি মালা পরিতে নাই। দুইকণ্ঠি অথবা তিনকণ্ঠি পরিতে হয়।”

তিনি বলিতেন, “আধুনিক বৈষ্ণবদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলনে মহাপ্রভুর ধর্মবাজন করা যায় না। শাস্ত্রে বাহা আছে তাহার সঙ্গে কোনটার গরমিল নাই।” তিনি প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট চিঠি লিখিতে নিজেকে, “শাস্ত্র ও সদাচার রক্ষাকারী সর্ব সজ্জন-গণের দাসাত্মদাস” লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

ঠাকুর সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের নিকট বাইতেন। সকল সম্প্রদায়ের সাধুরাও তাহার নিকট আসিতেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব উপদেশ সংগ্রহে লিখিয়াছেন “হরি, রাম, দুর্গা, কালী, খোদা, আল্লা, যা বলুক, আমার প্রভুকে যদি কেহ ডাকে অমনি আমার প্রাণ কেড়ে নেয়। তাঁহাকে যা বল, জন বল, সূর্য্য বল, চন্দ্র বল, এই ব্রহ্মাণ্ডকে আমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁকে চাই! প্রাণ কাঁদে তাঁর জন্য।”

‘হরি’ একটি শব্দমাত্র নহে। যে নানে বাহার পাপহরণ হয়, তাহার পক্ষে তাহাই হরিনাম। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী হরিনাম। হরি, দুর্গা, বিষ্ণু, রাম, কালী, শিব, গায়ত্রী সমস্তই হরিনাম।

সাধনের সময় উপদেশ : বিধি ও নিষেধ

হারিসন রোডের বাসায় ঠাকুর সাধন দেওয়ার সময়ে দীক্ষার্থীকে সাধারণতঃ যে যে উপদেশ দিতেন তাহার সংক্ষিপ্তাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। দীক্ষাস্থলের পার্শ্ববর্তী ঘরে থাকিয়া উপদেশ শ্রবণ করিয়া তখনই লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

ঠাকুরের উপদেশ :

“গুরুদেব কৃপা করিয়া তোমাদিগকে এই সাধন দিচ্ছেন। এই সময় যে উপদেশ দেওয়া হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে।

১। সত্য কথা বলিতে হইবে।

উহা বলা সহজ নয়, যাহারা দলাদলির ভিতর থাকে, তাহারা উহা বলিতে পারে না। প্রতিবন্ধক আসে।

২। পরনিন্দা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

মুনি ঋষিদের মতে অন্ন পাপের সহজে মুক্তি কিন্তু পরনিন্দুকের নয়। দোষের কথা বলিলেই নিন্দা হয় না, শিক্ষক ছাত্রকে, পিতা পুত্রকে, দোষের কথা বলেন। অত্রকে ছোট করিতে চেষ্টা, অপমানিত করিতে চেষ্টা—নিন্দা, পরনিন্দা মহাপাপ, নরহত্যা অপেক্ষাও অধিক পাপ। হত্যা করিলে একবারেই মৃত্যু, নিন্দা করিলে অত্নের নিকট লাঞ্চিত ও অপমানিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে উহাদিগকে মৃত্যুব্রণা ভোগ করিতে হয়। যেখানে উহা হয় সেখানে থাকিতে নাই। পরনিন্দুকের মত কুসঙ্গ আর নাই। পরনিন্দুকের হৃদয় এত অন্ধকার যে ভগবান তাহাতে বাস করিতে পারেন না।

৩। সর্বজীবে দয়া করিতে হইবে।

অত্নের স্থখে সুখ, দুঃখে দুঃখ,—দয়া। উহা সকলকে সেবা করিতে করিতে উৎপন্ন হয়।

(i) বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে জল দেওয়া—তাহাদের সেবা। কখনও গা ধোওয়া জল দিতে নাই। যেমন 'তুলসী বৃক্ষে', 'নারায়ণকে', 'শিবকে' পবিত্র জল দিতে হয় তজ্জপ।

(ii) পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গকে কিছু কিছু খাবার দিতে হয়।

(iii) ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা দিবে।

(iv) অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে।

অতিথি তাঁহাকে বলি, যিনি অন্ন কোন তিথিতে আসেন নাই। যাহার জন্ম স্থান নাই, আশ্রয় নাই। তাঁহাকে ভক্তি করিয়া সেবা করা

চাই। এইরূপ করিতে করিতে সৰ্ব্বজীবে দয়া হয়। উহা হইলে প্রাণে অশান্তি থাকে না।

৪। পিতা, মাতা, গুরুজনকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে সেবা করিতে হবে। পিতা মাতা সাক্ষাৎ দেবতা। পিতৃ-মাতৃসেবা দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। মহাভারতে আছে—এক ব্যাধ এইরূপে ধর্মলাভ করিয়াছিলেন। মুনি ঋষিরাও তাঁহার নিকট ধর্মশিক্ষার্থ আসিতেন। তাঁহাদের চরণে ফুল চন্দন দ্বারা পূজা ও চরণামৃত পান করিতে হয়। দেহটি পিতামাতার। ইহা দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে। পিতামাতার যত্ন হইলে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তি করিতে হয়। অন্ত্যাত্ম গুরুজনকে ভক্তি করিতে হইবে।

৫। সাধুদিগকে ভক্তি করিতে হইবে।

বেশ সাধু নয়। সাধুর লক্ষণ যথা—

(ক) সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়।

(খ) কখনও বাচ্ঞা করেন না। যেমন কুকুর দ্বারে পড়িয়া থাকে। গীড়িত হইলেও দ্বার ছাড়ে না। তাঁহারা তদ্রূপ ভগবানের দ্বারে পড়িয়া থাকেন।

(গ) পরনিন্দা করেন না। কোন ব্যক্তির এমন কি কীট পতঙ্গের পর্য্যন্ত নিন্দা করেন না।

(ঘ) আত্মপ্রশংসা করেন না। তিনি আপনাকে দাসাত্মদাস দেখেন, কারণ সকলের মধ্যেই নারায়ণ। সাধুর পক্ষে অত্মের নিন্দা অমৃত, অত্মের প্রশংসা বিষ। নিন্দা দ্বারা উপকার হয়—আত্মদৃষ্টি। প্রশংসা দ্বারা অভিমান হইলে সর্বনাশ। নিন্দকের বাক্য অমৃত।

(ঙ) সাধুরা মনগড়া কথা বলেন না। বাহা শাস্ত্রানুযায়ী—মুনি ঋষিদের বাক্য—কেবল তাহাই বলেন এবং তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ করেন।

(চ) কাহারও বুদ্ধিভেদ জন্মান না।

“তোমার মত ভাল নয়, আমার মত ভাল। একরূপ আচরণ কর
একরূপ বলা বুদ্ধিভেদ।

(ছ) বৃথা সময় নষ্ট করেন না।

ভগবদ্ধ্যানে, শাস্ত্রপাঠে কালহরণ করেন।

৬। যাহারা গৃহী তাঁহারা জীপুরুষের মধ্যে ভগবৎ সম্বন্ধ স্থাপন
করিবেন। জী ভগবৎ শক্তি, স্বামী নারায়ণ ; জী স্বামীকে নারায়ণ জ্ঞানে
ভক্তি করিবেন। স্বামীও জীকে ভগবানের শক্তি মনে করিবেন। ফের
সাবিত্রী, লক্ষ্মী, ভগবতী তদ্রূপ। যে পরিবারে জীপুরুষে এইরূপ সম্বন্ধ
স্থাপিত হয়, সেখানে কোনও অকল্যাণ হয় না। এইরূপ হইলে পরিবারে
ভগবলীলা দর্শন হইবে। এ সকল বিধি।

নিষেধ

৭। (ক) অস্ত্রের উচ্ছিষ্ট খাইবে না।

(খ) নেশা করিবে না।

(গ) মাংস খাবে না।

মাংস খাইলে শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আমোদ করার জন্ত নেশা করা
নিষেধ। ঔষধার্থে চিকিৎসকের ব্যবস্থামত ঐ সকল গ্রহণ করা যাহা-
তাহা ঔষধ। তামাক নেশার মধ্যে নহে। গুরুজনের এঁটো ‘প্রসাদ’।
পঞ্চম বৎসরের নিম্নবয়স্ক ছেলেদের এঁটো উচ্ছিষ্ট নহে।

৮। প্রাণায়াম আর একটা বিধি।

প্রাণায়াম ‘সাধন’ নহে। সাধনের বিশেষ অঙ্গ। উহাতে শরীরে
জড়তা নষ্ট করে। শ্লেষ্মা কমাইয়া দেয়। সাধনের সাহায্য করে, যাহারা
এই সাধন করেন না, তাঁহাদের জ্ঞাতসারে উহা করা হইবে না। পতিগরি

একত্র প্রাণায়াম করা যাইতে পারে। জীলোক অল্প পুরুষের সঙ্গে এক ঘরেও প্রাণায়াম করিবে না। এক আসনে ত নয়ই। জী পুরুষ * বিশেষ সতর্কভাবে চলিবে। জীলোক সর্বদা পবিত্রভাবে থাকিবে। শরীর ও মন পবিত্র রাখিবে।

২। শাস্ত্রে যাহা নাই তাহা যদি কোন মহাপুরুষও বলেন, তাহা অগ্রাহ—তাহা কখনই করা হইবে না। কারণ কখন কখন মহাপুরুষেরাও পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যাহা কিছু লাভ করা যায় তাহা 'নাম' দ্বারা। নামই সাধন। শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা আছে তাহার কোনটার সহিত কোনটার বিরোধ নাই। শ্বাস পড়ছে ও উঠছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সর্বদা মনে মনে নাম জপ করিবে। পরে 'নাম' দান ও নামের ব্যাখ্যা।

দীক্ষার সময়ে নানারূপ অদ্ভুত দর্শন

ঠাকুরের দীক্ষাদান সময়ে কখন কখন মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বুদ্ধদেব, বীণেশ্বর, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, কখনও শিব, শ্যামা, গণেশ, মহাবীর প্রভৃতি দেবদেবগণ প্রকাশিত হইতেন। সাধনকালে কেহ কেহ ইঁহাদের দর্শন পাইতেন। কখন কখন ফকির সাহেবেরা আসিতেন। ঠাকুর 'হজুরং' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতেন।

সাধন সময়ে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিত। ঠাকুর যখন মধুরস্বরে হরিনাম করিতে করিতে শক্তি সঞ্চার করিতেন, তখন প্রায়ই এক অপূর্ব

* ভাগবতে আছে—

“মাতা স্বশ্রী দুহিতা বা ন বিবিক্তাসনে বসেৎ।

বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাসো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

অর্থ—মাতা, ভগিনী কিম্বা দুহিতার সহিতও নির্জনে একাসনে বসিবে না। বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ এমন কি বিদ্বানকেও আকর্ষণ করে।

তড়িৎপ্রবাহ গৃহস্থিত জনমাত্রকে চঞ্চল করিত। কুলবধু স্বামীর নিকট, সর্বসমক্ষে আনন্দবেগ ধারণ করিতে না পারিয়া অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিয়াছেন। কেহ সাধন পাওয়ামাত্র পূর্বপুরুষদিগকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। কাহারও শক্তিসংকারে সংজ্ঞালোপ হইত। কেহবা বায়ুহিল্লোলে বৃক্ষপত্রের শব্দ কাঁপিতে থাকিত। কেহবা প্রাণায়াম ও কুম্ভকের জোরে উপবিষ্ট অবস্থায়ই শূণ্যে উঠিয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ বা দেবদেবীর দর্শন পাইয়া আশ্চর্য্য হইতেন। দীক্ষাকালে এক হলস্থল ব্যাপার হইত।

হুগলী জেলার অন্তর্গত রনবাগপুরের শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় কলিকাতায় হরিনারায়ণ রায় মহাশয়দের মেছোবাজারস্থ ভবনে দীক্ষা পান। তিনি বলিয়াছেন, “আমি রাত্রি ১টার সময় দীক্ষা পাইয়া পরদিন প্রত্যুষে যেমন নীচে নামিয়াছি, অমনি হঠাৎ সমস্ত শরীরে এক অগ্নি তড়িৎপ্রবাহ স্রবস্রু করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমস্ত শরীরে প্রতি পরমাণুতে গুরুদত্ত ‘নাম’ মিষ্ট হইতে মিষ্টতর হইয়া চলিতে লাগিল। আমি এক আনন্দসাগরে ডুবিয়া গেলাম। যেদিকে তাকাই সমস্তই আনন্দক্ষরণ করিতেছে। বৃক্ষ, লতা, পাতা, সমস্ত পৃথিবী স্ববর্ণবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। আমি মধুময় হইয়া গেলাম। শরীরে আর আনন্দবেগ ধারণ করিতে পারি না। পাখীগুলি ডাকিতেছে, যেন মধুবর্ণ হইতেছে। সমস্তই মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং। এই অবস্থা নিরবচ্ছিন্ন প্রায় একমাস ভোগ করিয়াছিলাম। মোহিনীবাবু একজন নির্ধীবান্ ব্রাহ্ম ছিলেন।

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৈজাবাদের ভূতপূর্ব সিভিল সার্জন্ শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রামবাজারের বাসায় দীক্ষা পান। দীক্ষার পর আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, “ঠাকুর যখন স্বপ্নে ‘হরিনাম’ ও

‘জয় গুরু’, ‘জয় মহাদেব’ বলিতেছিলেন, আমার বোধ হইল স্বয়ং মহাদেব আমাকে হাত বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিতেছেন।”

আমাদের মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবী দীক্ষাকালে শ্রীশ্রীঅষ্টত প্রভুর দর্শন পাইয়া অজ্ঞান হইয়া যান। গেণ্ডারিয়ায় ৩মনোহরাদিদি দীক্ষাকালে মৃত পিতা প্রভৃতির দর্শন পাইয়া চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া যান। ঠাকুর তাঁহার কাণে ‘নাম’ দিতে দিতে প্রায় ১৫ মিনিট পরে তাঁহার চৈতন্য হয়। তিনি তখন ঠাকুরকে কাদিয়া বলিলেন, “আমাকে আবার এদেহে আনিলেন কেন? আমি পরম সুখে ছিলাম।” তিনি খুব কাতরভাবে এ আনন্দময় অবস্থার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে পুনরায় প্রাণায়াম করিতে বলিলেন। তিনি প্রাণায়াম করিয়া পুনরায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহার কাণে ‘নাম’ দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল।

আমার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে দীক্ষালাভের সময় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষের ভাগিনেয়ী শ্রীমতী নির্মলা তিব্বতীয় ভাষায় কথা বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। সাধনের শেষে ঠাকুরের মুখে শুনিলাম একজন তিব্বতী-লামা উহার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া ঐ ভাষায় ঠাকুরকে করযোড়ে স্তুতি করেন ও কথাবার্তা বলেন।

শ্রীমতী নির্মলার সম্বন্ধে ঠাকুর বলিলেন যে, তিনি পূর্বজন্মে তিব্বত-দেশবাসিনী সাধিকা ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি ইহার কথা কিরূপে বুঝিলেন?” ঠাকুর বলিলেন, “সে সময় লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইতে যে আমি একটি অঙ্গুলি দ্বারা একটা নাক চাপিয়া ধরিয়াছিলাম। এরূপ করিয়া শক্তি একটা বিশেষ স্থানে স্থাপন করিলে যে-কোনও ভাষা বুঝিতে পারা যায়।”

সাধকের জীবনে সদগুরুশক্তির খেলা

ঠাকুরের নিকট সাধন লাভ করিয়া বহুলোক সদগুরুশক্তিপ্রভাবে যে অলৌকিক দেবদুর্লভ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে সন্নিবেশিত হইল।

(১) মনোরমা ঠাকুরাণী

ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী মনোরমা ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যে সকল অলৌকিক অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। আমি দেখিলাম তিনি এক সময়ে আসনে সমাধিস্থ হইয়া ২৮ ঘণ্টাকাল বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া এক অপূর্ণ নিরাময় অবস্থা ভোগ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী মনোরমাকে আমি এই প্রথম দর্শন করি। দেখিলাম তিনি একখানা ছোট আসনে ঘোড় হস্তে চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। যথার্থই যেন একটি দেবী। তাঁহার মুখশ্রীতে অপূর্ণ লাবণ্য খেলিতেছে। চক্ষু হইতে মাঝে মাঝে টস্‌টস্‌ করিয়া অশ্রুজল পড়িতেছে। চারিদিকে আনন্দপ্রবাহ উছলিয়া উঠিতেছে। কখন আসনে একটু একটু ঘুরিতেছেন। এক তড়িৎপ্রবাহ শরীর হইতে নির্গত হইতেছে। স্বামী ছোট ছেলেটির মতন হইতে দুগ্ধপান করাইয়া লইলেন। জ্ঞান নাই। শ্রীযুক্ত সীতানারায়ণ দত্ত মহাশয় আসিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া নমস্কার করিলেন। খোল বাজাইয়া কীর্তনাদি করিলেন। কিন্তু এ শব্দে ও সঙ্গীতে তাঁহার বাহুক্ষুণ্ণি হইয়া না। একটি মোমাছি যেন মধুপানে বিভোর হইয়া মধুতে ডুবিয়াছে। তিনি সমাধিভঙ্গে উঠিলে সকলের প্ররোচনায় স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই যে খোল বাজাইয়া কীর্তনাদি করিলাম, তুমি কি তাহা জানিতে পারিয়াছিলে?” তিনি বলিলেন, “কাণে একটু একটু শ্রবণ

করিয়াছিল বটে কিন্তু সেই আনন্দের নিকট এ সকল স্থান পায় না।”

মনোরমা ঠাকুরাণীর চেহারা শ্রামবর্ণ ছিল। কখন কখন ভাবে তাঁহার মুখশ্রী পদ্মফুলের মত ফুটিয়া উঠিত। একদিন দেখিলাম প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ত্রায় তাঁহার মুখ আশ্চর্য্যরূপে অরুণবর্ণ হইয়াছে। তিনি ভাবে বিভোর হইয়াও স্থির আছেন। মুখ ভাবে ডগমগু, আয়তনে যেন বড় হইয়াছে। তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসে ‘নাম’ অবিশ্রান্ত চলিত। তিনি স্বামীর নিকট বলিয়াছিলেন, “নাম ভোলে কি করিয়া। নাম চেষ্টা করিয়াও ভোলা যায় না।”

ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে ষেরূপ স্নগন্ধ ছিল, তাঁহার অঙ্গে একবার সেইরূপ স্নগন্ধ পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। এ গন্ধ অনেকটা মৃগনাভির গন্ধের ত্রায়। তাঁহার প্রসাদ একবার যাক্ষা করিয়া খাইতে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। উহা খাওয়ামাত্র ভিতরে এক আশ্চর্য্য শক্তিসঞ্চার হইল। মনোরঞ্জনবাবু বলেন, তিনি এ দ্রব্য নিজ ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়াছেন। নিজের প্রসাদ নহে। তিনি খুব মিতভাষিণী ছিলেন। ধর্ম্মের কথা আদৌ তাঁহার মুখে শুনা যাইত না। এমন সত্যপরায়ণা, পতিব্রতা, দয়াশীলা, মৃদু ও শান্তস্বভাবা স্ত্রীলোক দুর্লভ। যে তাঁহার সংস্রবে একবার আসিয়াছে সে-ই ধন্ত হইয়াছে। তিনি ব্যবহারে সকলকেই আপন করিয়া লইতেন। তিনি স্বামী, পাঁচ ছয়টি ছেলে ও আত্মীয়স্বজন লইয়া একেবারে নিরাশ্রয় অবস্থায় নানা স্থানে কেবলমাত্র ভগবানের দিকে তাকাইয়া শ্রীগুরুর উপদেশে, ‘আকাশবুত্তি’ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। এরূপ ভগবদ্ বিশ্বাসের উজ্জল দৃষ্টান্ত গৃহস্থাশ্রমে অতি বিরল।

শ্রীমতী মনোরমার মুখে প্রায়ই নিম্নলিখিত গান দু’টি শুনা যাইত। তিনি ভক্তিপরিপ্লুতা হইয়া মাঝে মাঝে গাইতেন :

“তব শুভ সন্মিলনে প্রাণ জুড়ায় হৃদয়স্বামী ।
বসিব একান্তে, প্রাণকান্ত, তোমায় নিয়ে আমি ॥
হৃদয় শ্রীবৃন্দাবনে, গোপজনগণ সনে
নিত্যপদসেবি কবে কৃতার্থ হইব আমি ॥”

প্রায়ই ভোরে উঠিয়া সন্তানাদি সহ তাঁহার স্বামীর রচিত নিম্নলিখিত
গানটিও গাইতেন :

“এই কর নাথ, এই কর নাথ ।
প্রভাতে তোমারে করি প্রণিপাত ॥
দিবসের কাজে প্রহরীর সাজে ।
এ হৃদয় মাঝে থেকো সাথ সাথ ॥
সম্মুখে সংসার-ভব-পারাবার ।
কতই তরঙ্গ ছুটে অনিবার ।
পাপ প্রলোভনে তরিব কেমনে ।
তুমি দয়াময় না ধরিলে হাত ॥

যাহারা নিকটে থাকিতেন, তাঁহারা এই প্রেমগাথা গান শুনিয়া কৃতার্থ
হইতেন । তাঁহার ঠাকুরের উপর নির্ভরতার ও স্বাভাবিক দয়ার দুইটি
দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল ।

তিনি যখন ভবানীপুর চাউলপাটী রোডের বাসায় থাকিতেন, তখন
একদিন কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করেন, “ঠাকুর যদি আপনাকে এই সকল সন্তানাদি
লইয়া নিঃসম্বল অবস্থায় সুন্দরবনে বাইতে বলেন, আপনি পারেন কি?”
তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, “ঠাকুর আদেশ করিলে পারি, কোন
চিন্তাই আসে না ।”

ঠাকুর যখন সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় ছিলেন, তখন কুঞ্জের জ্বর
হইয়া শরীর কিছু দুর্বল ছিল । তিনি তাঁহার স্বামী মনোরঞ্জনবাবু দ্বারা

তঁাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পরে কুঞ্জ তঁাহাদের বাসায় গেলে তিনি বলিলেন, “কুঞ্জ, তোমার শরীর দুর্বল। আমার ইচ্ছা তুমি কিছুদিন আমাদের এখানে আসিয়া একটু একটু দুধ খাও।” কুঞ্জ বলিল, “আমি তাহা পারিব না। আপনায় ছেলেদেরই আপনি একটু দুধ দিতে পারেন না, তাতে আবার আমাকে দিতে চান।” তিনি উত্তর করিলেন, “তাতে কি? ছেলেরা অনেক সময় দুধ খায় না।”

(২) শ্রীমতী কুন্সুমকুমারী

আমাদের আর একটি গুরুভগিনী শ্রীমতী কুন্সুমকুমারীর সাধনের অবস্থা দর্শনেও অনেকে আশ্চর্য্য হইতেন। দীক্ষার পর তঁাহার জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে। ঠাকুর যখন কলিকাতায় স্কিয়া স্ট্রীটে রাখালবাবুর বাসায় ছিলেন, তখন দেখিয়াছি, ঐ গুরুভগিনীটি সমাধিস্থ হইয়া ১৮।১৯ ঘণ্টা কাল নিরবচ্ছিন্ন বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিতেন। তখন ইহার শরীর অতরূপ দিব্যশোভা ধারণ করিত। এই অবস্থা দর্শনে অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ব্রহ্মচারীর ডায়েরী পড়িয়া কুন্সুমের জীবনের অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুন্সুমের এ সকল কি সত্য?” ঠাকুর বলিলেন, “হাঁ, ঠিকই।” ইহার বহুপূর্বে এক সময়ে ঠাকুর মহেন্দ্রবাবুকে বলিয়াছিলেন, “মেয়েটি বড় ভাল, এখান হইতে যাইবার সময়, বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার মত কাঁদিয়া গিয়াছে।”

ইনি নামের মধুরতা ব্যক্ত করিতে যাইয়া স্বামীকে একবার পত্রে লিখিয়াছিলেন, “একটি নামে যে আনন্দ, স্বামী-স্ত্রী-সংসর্গ-সুখ তাহার সহস্রাংশের এক অংশও নহে।” তিনি সাধন করিতে করিতে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর প্রদত্ত নাম ও ঠাকুর একই বস্তু।”

এক সময়ে গুরুদেবের অসাধারণ কৃপায় তাঁহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল। তিন বৎসরেরও অধিক কাল তাঁহার ক্ষুধা ছিল না। যাহা আহা করিতেন, আপনা আপনি বমি হইয়া উঠিয়া যাইত—একটি ভাতও পেটে থাকা পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করিতেন। জল খাইয়া তাহাও বমি করিয়া ফেলিতে হইত। এ সময়ে বাহ্যে প্রস্রাব হইত না। এ সম্বন্ধে তাঁহার স্বামীর অনুরোধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে দিলাম। বাদশা ১৩০০ সালে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া নামক স্থান হইতে দুর্ভিক্ষের দরুণ একটি ক্ষুৎপিড়িত জীলোক কয়েকটি শিশুসন্তান সহ তাঁহাদের গ্রামে ভিক্ষা করিতে আসে। তাহার অবস্থা দর্শনে কুম্বের প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ হইত এবং তিনি বাড়ীর সকলকে লুকাইয়া তাঁহার নিজের মধ্যাহ্ন ভোজনের আহাৰ্য্য অন্ন প্রভৃতি ঐ জীলোকটিকে দিতেন। নিজে দিনে মুড়ি প্রভৃতি এবং রাত্রিতে ভাত খাইয়া কাটাইতেন। এইভাবে ছয় সাত দিন গত হইলে আহাৰের অন্নতায় তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। ওরা কান্তুন দুগ্রহরে পুষ্করিণীতে গা ধুইতে গেলেন। তখন জলের উপর গুরুদেবের প্রকাশ দেখিতে পাইলেন এবং দুই হাতে শরীর হইতে ক্ষুধা আকর্ষণ পূর্ব্বক ঠাকুরের চরণে ক্ষুধাপুষ্পে অঞ্জলি দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর অন্তর্দ্বান করিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার ক্ষুধা একেবারে চলিয়া যায়। যাহা কিছু খাইতেন সমস্ত বমি হইয়া উঠিয়া যাইত। মুখে অরুচি ছিল না। ইহার পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি তাঁহার পিতার নিকটে যান। সেখানে ক্ষুধাবোধ না থাকিলেও ঠাকুরের আদেশে সন্ধ্যার সময় কিছু ফলমূল খাইতেন। নিরবচ্ছিন্ন অনাহারে থাকিলে লোকে অলৌকিক বোধে ইহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া বর্ষপথে বিঘ্ন জন্মাইবে, তাই ঠাকুর ইহাকে সাত দিন অন্তর স্বহস্তে পাক করিয়া ভোগ দিয়া আহাৰ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি ও সঙ্গীক

দ্বাদশ অধ্যায়

২৬৫

দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত একবার এই ভোগের সময় উপস্থিত ছিলাম। তিনি স্বামীর সহিত ঐ প্রসাদ আহার করিয়া তখনই বসি করিয়া ফেলিলেন। জনটুকু পর্য্যন্ত বসি হইয়া গেল। আমি এই সময় কিছুদিন রাখালবাবুর বাড়ীতে থাকিয়া এ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। দুই তিন মাস অন্তর সামান্ত মলত্যাগ হইত। ১৩০৩ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল। ১৩০৩ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩০৪ সালে বৈশাখ পর্য্যন্ত কিছুই আহার করেন নাই। ১৩০৪ জ্যৈষ্ঠ মাসে গর্ভসঞ্চার হইল। তখন হইতেই তাঁহার ক্ষুধাবোধ হইতে থাকে এবং সাধারণের মত আহারাদি করিতে থাকেন।

অন্নপূর্ণার পাক

১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে একদিন একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। শ্রীমতী কুসুম সন্ধ্যার সময় রান্না করিতে রান্নাঘরে গিয়াছেন। চুলায় আগুন ছিল না। হাঁড়িতে চাউল ও জল দিয়া সরা দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছেন। উনান ধরাইবার জন্ত এক মুঠা খড় লইয়াছেন। 'লেম্পে' খড় ধরাইয়া উনানে দিলেন। কিন্তু কাঠ দিয়া আর উনান ধরাইতে ইচ্ছা হইল না। আগুন তখনই নিবিয়া গেল। চাউল, জল উনানের উপর তেমনি রহিল। ঐ অবস্থায় তিনি নামানন্দে সমাধিস্থ হইলেন। একটু পরে ঠাকুর প্রকাশিত হইয়া কুসুমকে বলিলেন, "আজ তোমার ভাত অন্নপূর্ণা রাখিলেন। তোমাকে আর আজ রান্না করিতে হইবে না।" দেড় ঘণ্টা পরে সমাধিভঙ্গে উঠিয়া ভাতের হাঁড়ির ঢাকনি তুলিয়া দেখিলেন, ফেন-শূণ্য বরুবারা গরম ভাত হইয়া রহিয়াছে।

১৩০০ সালের মাঘ মাসে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় সময়ে বরিশালের উকীল গোরাচাঁদ দাস মহাশয়, ইহার সত্যতা নিরূপণের জন্ত, প্রাতের পাঠের সময়, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কুম্ভদের দেশে নাকি বিনা অগ্নিতে

রান্না হইয়াছে ?” ইহাতে ঠাকুর বলিলেন, “ইহা আর আশ্চর্য্য কি? পঞ্চভূত পড়িয়াই রহিয়াছে, যখন যাহা দ্বারা কাজ হয়।” পুনরায় পাঠের পর গেণ্ডারিয়ায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সামনে ছাদের উপর দাঁড়াইয়া, ঠাকুর কুঞ্জকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের ওখানে যে দিন অগ্নিতে রান্না হইয়াছে, সেই ঘটনাটি কি, বল ত।” তাহাতে দ্বন্দ্ব ঐ বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, “ইহা অতি সত্য কথা। ইহাকে সত্য বলে। এইরূপ ঘটনা অতি বিরল। এই একটি ঘটনা দ্বারা পরবর্তী কত লোক উদ্ধার হইয়া যাইবে। যুগযুগান্ত চলিয়া যাইবে কিন্তু এই ঘটনা পাহাড়ে অঙ্কিত রেখার ন্যায় চিরদিন থাকিবে। বর্তমান সময়ে এ সকল ঘটনার কেহ আদর করিতে পারিবে না। হয়ত বলিবে ইহা মিথ্যা, কেহ প্রশংসার জন্ত চাতুরী করিয়া এরূপ প্রকাশ করিয়াছে। যদি তোমরা ভক্তি করিতে পায় এবং মর্যাদা দাও তবে আরও অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতে পাইবে। ভগবানের অসংখ্য শক্তিই রান্না করিয়াছেন।” শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় বলিলেন, “লোকে কি আর মর্যাদা দিতে পারে?” ঠাকুর বলিলেন, “ই, তা পারে না।”

(৩) শ্রীমতী সত্যদাসী

শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের ভাগিনেয়ী গুরুভগিনী শ্রীমতী সত্যদাসীর সাধন অবস্থাও অতি সুন্দর। তিনি ভাবাবেশে বিভোর হইয়া কখন কখন ফুল তুলিয়া চন্দন ঘষিয়া ইষ্টদেবের অর্চনা করিতেন। ষষ্ঠ ও ভাস্কর সম্মুখে থাকিলেও জ্ঞান নাই। তিনি অতি স্বামীপরায়ণ। ইহার সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন আমাকে বলিলেন, “সত্যদাসী নয়, কৃষ্ণদাসী” অর্থাৎ ইহার প্রকৃত নাম “কৃষ্ণদাসী”।

সত্যদাসী সাধন পাইবার ৪৫ দিন পূর্বে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার গুরু আসিতেছেন। স্বপ্ন সত্য হইল। ৪৫ দিন পরে ঠাকুর ঢাকা হইতে কলিকাতা যাইয়া অভয়বাবুদের বাসায় উঠেন ও তথায় তাঁহাকে দীক্ষা দেন। দীক্ষাকালে সত্যদাসী প্রাণায়াম ও কুস্তকের তেজে শূণ্ডে উঠিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন।

(৪) শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্সী

আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয় ঠাকুরের একজন নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বিনয় দেখিয়া আমরা অবাক হইতাম। তিনি যেন মাটির উপর পা ফেলিতেও শঙ্কিত হইতেন। নিজে কে ধূলিকণা হইতেও লঘু মনে করিতেন। তিনি যখন পথ দিয়া যাইতেন, করযোড়ে বালক, বৃদ্ধ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জীব সমূহকে প্রণাম করিয়া চলিতেন। কখনও তাঁহাকে কটুবাক্য প্রয়োগ, গ্রাম্য কথা আলাপ ও লোকের সহিত অপ্রিয় বাবহার করিতে দেখি নাই। তিনি যে সর্বভূতে কি দর্শন করিয়া এরূপ নিষ্কিঞ্চন বিনয়ী হইয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন। ঠাকুরের সাধনের কি অপার মহিমা, ধূলি হইতেও লঘু করিয়া দেয়। বক্সী মহাশয় ২৫ বেতনে ঢাকা 'ইডেন' বালিকা বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। শত অভাব সত্ত্বেও ঐ টাকার ১ টাকা প্রতি মাসে ঠাকুর-সেবায় দিতেন। ঠাকুর আনন্দ করিয়া বলিতেন বক্সী মহাশয়ের টাকাতেই আমি ভোজন করি। শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বটব্যাল গুরুভ্রাতার সহিত তাঁহার সময়ে সময়ে গোপনীয় আলাপাদি হইত। অবনীবাবু অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া সময় সময় বক্সী মহাশয়ের জীবনের দুই চারিটি কথা বাহির করিতে পারিতেন। ঠাকুরের রূপায় অলৌকিক ভাবে তিনি যে কুস্তমেলায় উপস্থিত হইয়া সাধুদর্শন ও

ত্রিবেণীতে স্নান করিয়াছিলেন এবং জনৈক মহাপুরুষ তাঁহার বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জন্মান্তরের নাম ‘দুর্বাসা ঋষি’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবনীবাবুর নিকট প্রকাশ করেন। এবার তাঁহার দেহধারণের উদ্দেশ্য পঞ্চমপুরুষার্থ—প্রেম-ভক্তি লাভ।

গৌরীদাস ঠাকুর ও ‘নিতাই-গৌর’ বিগ্রহ

১৪ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ সমুদ্র-স্নানে গেলেন। পথে অম্বিকা-কালনার গঙ্গা হইল। মহাপ্রভুর মাতুল গৌরীদাস ঠাকুর, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে এতই ভালবাসিতেন যে, তাঁহাদের বিরহে কি করিবেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু, ‘নিতাই গৌরের’ দুইটি দারুণ বিগ্রহ তৈয়ারী করাইয়া আনাইলেন। উহা তাঁহাদের এতই অমূল্য হইয়াছিল যে, গৌরীদাস ঠাকুরকে তাঁহাদের চারিটির মধ্যে দুইটি পছন্দ করিয়া লইতে বলাতে, তিনি দারুণ বিগ্রহ দুইটিকেই লইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, এই দুই বিগ্রহ হইতেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কথিত আছে যে বিগ্রহ দুইটিকে যখন আনান হইল তখন মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু ও বিগ্রহ দুইটি জীবন্তভাবে খেলা করিয়াছিলেন। তাহা গৌরীদাস ঠাকুর ভ্রমে পতিত হন। এই বিগ্রহ দুইটি বড়ই জাগ্রত। অধুনা অম্বিকা-কালনার ঠাকুরবাড়ীতে একটি ঘটনা হইয়াছিল। একদিন রাত্রিকালে ঠাকুরবাড়ীতে কয়েকটি যাত্রী আসিল। তাহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধাতুর ছিল। সেখানে তাহাদের তত্বাবধান করিবার কেহ ছিল না। এমন সময় একটি ছেলে আসিয়া বলিল, “আপনারা কি চান?” তাহারা বলিল, “আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, খাবার কোথায় পাইব?”

সে বলিল, “আমি দিচ্ছি।” এই বলিয়া চাউল ও ডাল ভাণ্ডার হইতে খুলিয়া দিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, “আপনাদের আর কি কিছুর প্রয়োজন আছে?” তাহারা বলিল, “আমাদের মাছ খাইতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে।” বালকটি বলিল, “এখন রাত্রিকাল, মাছেরা চোখে দেখে না; গঙ্গায় হাত দিয়া একটি ধরিয়া আনুন। গঙ্গার ঘাটে এখন মাছ আছে।” তাহারা গঙ্গার ঘাটে যাইয়া একটা প্রকাণ্ড মৎস্য পাইয়া ধরিয়া আনিল এবং উহা রান্না করিয়া আহাৰ করিল। পরদিন সকালে গৌসাইরা আসিয়া যাত্রীদিগকে দর্শন করিলেন এবং ভাণ্ডারঘর খোলা কেন, ইহারা কি আহাৰ করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, “কেন, আপনাদের একটি গৌসাইয়ের ছেলে আমাদের ভাণ্ডার হইতে চাউল প্রভৃতি রাত্রে দিয়াছে।” এই সকল শুনিয়া গৌসাইরা ‘ধরণা’ দিলেন। তাহাতে আদেশ হইল “হাঁ, আমিই একাজ করিয়াছি; এখন আর এখানে অতিথি-সেবা হয় না। তোরা কি জানিস্ না, পূজারী বেষ্ঠাবাড়ী পড়িয়া থাকে? উহাকে ছাড়াইয়া দে।” পূজারী ইহাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া, ‘ধরণা’ দিলেন। তাহাতে আদেশ হইল, “পুনরায় একরূপ করিস্ না। গৌসাইদের নিকট দীক্ষা লইয়া বৈষ্ণব হও।” পূজারী তাহাই করিলেন। তিনি এখন অতি যত্নসহকারে বৈষ্ণব-সেবা করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে স্তব

১৫ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর মন্দিরে গেলেন। পতিতপাবনের নিকট কে মলত্যাগ করিয়া রাখিয়াছে এবং উহা ছাই দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। নমস্কার করিতে যাইয়া উহা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর শিবলিঙ্গ নমস্কার করিয়া একটি বোবা যুবকের নিকট হইতে শিবের

চরণোদক গ্রহণ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন। আমি মহাদেবের নিকটে এক পয়সা ও ঐ যুবককে দুই পয়সা দিয়া ঠাকুরের সঙ্গ নইলাম। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া অনেক স্তবস্ততি করিতে লাগিলেন; “তুমি দামোদর, তুমি কেশব, তুমি নৃসিংহ, বামন, তুমি কৃষ্ণ, বাসুদেব। তুমি এক বিগ্রহ চতুর্দ্বা বিভক্ত—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।” পুনঃপুনঃ এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। “হরিবোল”, “হরিবোল” বলিতে বলিতে কিছু অধৈর্য্য হইলেন। ঠাকুর বলিলেন, “জগন্নাথদেবের কি অপূর্ব শোভা, নিজের ছটায় নিজের আলোকিত। তোমরা দোপ দাও কি নাই দাও, তাঁহার আলোতে তিনি উজ্জ্বল।” এই সময় দোপ নির্বাণপ্রায় হইয়াছিল, পাণ্ডারা ইহা শুনিয়া দোপ উদ্ধাইয়া দিল।

আজ কোরঙওয়াল সাধুটি আসিলেন। ঠাকুর তাঁহার শব্দ শুনিয়াই এক চৌদ্দা চাউল ও কিছু পয়সা দিতে বলিলেন। ভাণ্ডারে পয়সা নাই, চাউল দেওয়া হইল। তিনি একটা ঘটি চান। ঠাকুর বলিলেন, “আমার ছোট ঘটিটা দিলে হয় না? আমার একটাতেই চলিবে।” আমি বলিলাম “বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া দেওয়া ভাল। আর তিনি নৃত্য ঘটিই চান। সরলনাথ বাকী আনিতে পারিবে।” ঠাকুর বলিলেন, “যোগজীবনকে বলিয়া সরলনাথ দ্বারা একটা ঘটি আনা হইয়া দেওয়াইতে পারিলে ভাল হয়।” আমি বলিলাম, “এখন যেক্রপ অর্থাভাব, তাহাতে দাদাগোঁসাইকে বলিতে ইচ্ছা হয় না।” ঠাকুর উত্তর করিলেন, “এত ভাবনার দরকার কি? সুসময় ছাড়িয়া দিলে, আর মিলে না। হৃষ্যোদন, শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবে সন্ধি করিলে আর বৃদ্ধ পিতামাতাকে দাবান্নিতে মরিতে হইত না।”

রাত্রিকালে অচিন্ত্যবাবুর ভ্রাতা ও কান্দীরি পণ্ডিত আসিলেন।
 গুনিলাম অচিন্ত্যবাবুর ভ্রাতা মন্দিরের কর্তারূপে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুর
 ও ডেপুটী জগৎবাবু তাঁহাকে সুপরামর্শ দিলেন—রত্নদেবীর পেছনে
 একটি দীপ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ ঐ স্থানে মাঝে মাঝে জ্বীলোকের
 প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে। মন্দিরে কেহ মলমূত্রাদি ত্যাগ না করে
 তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। যথাসময়ে পূজা ও অর্চনা ও যাত্রীদের প্রতি
 বাহাতে সদ্যবহার করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

পাণ্ডাদের দুর্গতি

১৬ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ নিয়মিত শৌচাদি, পূজা, পাঠ ও চা সেবা অস্ত্রে ঠাকুর সমুদ্রে
 চলিলেন। পথে জগবন্ধুবাবু ঠাকুরকে বলিলেন, “মন্দিরের ভিতর চন্দন
 কাঠের নিকট কে মলত্যাগ করিয়া উহার নিকট একটি ঘুতের প্রদীপ
 জালিয়া রাখিয়াছে। দিদিমা যজ্ঞস্থান ভ্রমে উহা নমস্কার করিয়া আসিয়া-
 হেন। রাস্তায় একটি ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঠাকুর এদেশের
 ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডাদের দুর্গতির কথা বলিলেন। জগন্নাথদেব ইন্দ্রহাস্য রাজার
 নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ পঞ্চাশ বৎসর এখানে থাকিবেন।
 তাই এখনও এ স্থান ছাড়িয়া যান নাই। ঠাকুর যখন ইহাদের অত্যাচারে
 উগ্রমূর্তি ধরিবেন, তখন সব ছারখার করিয়া দিবেন। পাণ্ডাদের অত্যাচারে
 উহারা নির্বংশ হইত, কিন্তু ঠাকুর “অহিংসা পরমোধর্ম” অবলম্বন করিয়া
 জীবের মুক্তির জগ্নু বসিয়া আছেন। পথে একজন ব্রাহ্মণ (কেহ বলিল
 জাতিতে সোয়ার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সুপকার) পিঁয়াজ শাক বাজার
 হইতে কিনিয়া আমাদের নিকট দিয়া লইয়া গেল। ঠাকুর বলিলেন, “দেখ,
 দেখ কিরূপ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পিঁয়াজ গোমাংস তুল্য।” সমুদ্রের পথে

পোষ্টাফিসের নিকট প্রমথবাবু ও মুসেফবাবু সজ্জ লইলেন। তাঁহার হাঁড়ি ভরিয়া জল দিতে লাগিলেন। আমি ও সরলনাথ ঐ জল ঠাকুরের মাথায় ঢালিতে লাগিলাম। তাঁহারাও দুই এক হাঁড়ি জল ঠাকুরের মাথায় ও পিঠে দিলেন।

স্নানান্তে বাসার দিকে ফিরিলাম। একটি লোক মন্দিরের চূড়ায় দ্বন্দ্ব বাঁধিতেছিল। তাহাকে ৬৭ বৎসরের বালকের মত দেখাইল। চক্রে অর্ধ পর্য্যন্তও তাহার মস্তক স্পর্শ করিল না। চক্রটির বেড় অস্থান ২২ হাত হইবে। ঠাকুর বাসায় অত্যন্ত পিপাসার্ত হইয়া জবজ্ব খাইলেন। পরে চন্দন দ্বারা তিলক করিয়া কিঞ্চিৎ ‘পাকাল’ ও মুড়ি প্রসাদ পাইলেন। আজ প্রমথবাবু মহাপ্রসাদ আনাইয়া সকলকে খাওয়াইলেন। কিশোরীবাবুও সপরিবারে এখানেই প্রসাদ পাইলেন।

মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যা : অক্ষয়বট

সায়ংকালে ডেপুটী শশীবাবু আসিলেন। তাঁহার সহিত অনেক লোক হইল। ঠাকুর মার্কণ্ডেয় ঋষির তপোবৃত্তান্ত বলিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি এক বৎসর মাত্র আয়ু আছে জানিয়া, গুরুর আদেশে যোগে মগ্ন হইলেন। ভগবানের নামপ্রভাবে বহির্জগতের সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হইল। কত যুগান্তর এইভাবে কাটিয়া গেল। অনন্তর ভগবান দর্শন দিলেন এবং “অমর হইবে” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন। ভগবান তাঁহাকে সৃষ্টি স্থিতি দর্শন করাইয়া প্রলয় উপস্থিত করিলে, তিনি দেখিলেন সমস্ত জগৎ জলময় ও অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইল। তিনি সমুদ্র-হিল্লোলে ভাসিতে লাগিলেন। কত জনজন্ত তাঁহাকে আঘাত করিতে আসিল কিন্তু তিনি অমর বলিয়া রক্ষা পাইলেন। কতকাল এই ভাবে ভাসিলেন। অতঃপর একটি বটগাছ

সমুদ্রে ভাসিতেছে দর্শন হইল। সেই সময়, মার্কণ্ডেয়, “এই দিকে এস,” এই আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, একটি বালক ঐ বটবৃক্ষের একটি পত্রের উপর শায়িত আছেন। মার্কণ্ডেয় অজ্ঞাত-শক্তিপ্রভাবে সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি শ্বাসের সহিত ঐ বালকের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেখানে কত বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড, জল, স্থল, শূন্য বর্তমান রহিয়াছে। কত যুগ-যুগান্তর উহাতে ঘুরিতে-ফিরিতে লাগিলেন। পরে একদিন পুনরায় শ্বাসের সহিত বাহির হইয়া এই সমস্ত জগৎ দর্শন করিলেন। তৎপরে তিনি সেই বটবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া মন্দিরের ঐ স্থানে নামিলেন। এখন যে কল্প বৃক্ষটি দর্শন হইতেছে উহা সেই বৃক্ষ নাও হইতে পারে কিন্তু উহা তাহার একটি ‘বয়্যা’ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রসঙ্গক্রমে গয়ায় বুদ্ধ মন্দিরের কথা উল্লেখ করিলেন। সেখানেও অক্ষয়বট আছে।

আহার্য্য বস্তু নিবেদন :

মদ্য, মাংস ও বিষয়-স্পর্শে মলিনতা

১৭ই হইতে ২০শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় উঠিয়া শৌচাদি সমাপন করিলেন। পরে ভোর-কীর্তন আরম্ভ করিলেন। প্রায় সাড়ে চারিটার সময় শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ কন্দের সহিত গরম ঘৃত পান করিলেন এবং ধ্যানস্থ হইলেন। আজ ঠাকুর মন্দির পরিক্রমণ করিতে বাহির হইলেন। দক্ষিণ দরজায় প্রকাণ্ড মহাবীর দর্শন করিলেন। হরচণ্ডিসাইর একটি বালকের সহিত আমাদের অনেক কথাবার্তা হইল। বালকটির ব্যবহার বড়ই মিষ্ট। এই বালকটিতে লোকনাথ কি বলরাম অবিষ্ট হইয়াছিলেন শুনিলাম। পথে দুইটি পূজারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

ঠাকুর উহাদিগকে প্রশংসা করিলেন। ইহারা বড় নির্ভাবান্। উহাদের মধ্যে একজন কিছুদিন পূর্বে ঠাকুরকে যন্ত্রে কৃষ্ণমূর্ত্তি দিয়াছিলেন। ঠাকুর প্রতিদিন উহা পূজা করেন। অতঃপর মন্দিরের পশ্চিম-উত্তর কোণে কোরঙওয়াল সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মা মরিয়াছে। তিনি একখানা কঞ্চল ও একটা টাকা চাহেন। চুখের কথা বলিতে বলিতে টস্টস্ করিয়া চোখের জল পড়িতে লাগিল। ঠাকুরের আদেশে টাকাটি তখনই ধার করিয়া দিলাম। জগদ্বন্ধুবাবু কঞ্চল বাগা দিয়া দিলেন।

রাত্রিকালে মুসেফ্ কিশোরীবাবু আসিলেন। কিশোরীবাবু মাছ খান। মাছ কি করিয়া নিবেদন করিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, 'বাহা খাইবেন, সমস্তই ভগবানের নিকট ধরিবেন। যখন প্রহ্লাদ দি ডক্ষণ করেন, তাহাও ভগবানকে নিবেদন করিয়াছিলেন। কিংবা মৎস্য ছাড়া অগ্নি জিনিষ নিবেদন করিয়া মৎস্য নিবেদিত জিনিষের সঙ্গে মিশাইয়া আহার করিতে পারেন। জলটুকু খাইতে হইলেও ভগবানের নিকট ধরিয়া মনে মনে গ্রহণ করিবেন। শ্রীবৃন্দাবনে গৌর শিরোমণি মহাশয়ের পোস্ত্রটির বড় সুন্দর ভাব দেখিয়াছি। সে প্রসাদী বস ভিন্ন আহার করিবে না। এমন কি জল পর্যন্ত প্রসাদী না হইলে পান করিত না। বৃন্দাবনে এ বিষয়ে বড়ই সুন্দর নিয়ম।

প্রহ্লাদের দৈত্যভাব জাগ্রত করিবার জন্ত দৈত্যেরা তাঁহার খন্ডের সহিত মত্ত-মাংস মিশ্রিত করিয়া দিল। মত্ত ও মাংস স্পর্শে তাঁহার তমোভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। যে রাজ্যে যান, সকলেই তত্ত প্রহ্লাদকে উপঢৌকন দিয়া বশতা স্বীকার করেন। ক্রমে বৈকুণ্ঠে যাইয়া ভগবানের আসনে উপবেশন করিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন, "ঠাকুর, প্রহ্লাদ এ কি করিল? ইহাতে যে উহার অমঙ্গল হইবে।"

ভগবান বলিলেন, “দেখ, দেখ, প্রহ্লাদকে তো আমি অগ্নিতে, জলে, পর্ত্তশৃঙ্গ হইতে পতনে ক্রোড়ে করিয়া রক্ষা করিয়াছি, আমার আসনে বসি আর এমন বেশী কি অপরাধ?” নারায়ণ আসিলেন। তাঁহার দৃষ্টিমাত্রে প্রহ্লাদের তমোভাব বিনষ্ট হইয়া সত্ত্বগুণ প্রকাশ হইল। তখন প্রহ্লাদ, “এ কি করিলাম?” বলিয়া কাদিতে লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন, “বৎস! ভয় নাই, দৈত্যেরা তোমাকে কোশলে মত্ত-মাংস আহার করাইয়া তমোগুণাধিত করিয়াছিল। তুমি সে সকল জিনিষ নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিলে এরূপ হইত না।” প্রহ্লাদ বলিলেন, “ঠাকুর, আমার নিবেদন করিতে কেন ইচ্ছা হয় নাই বলিতে পারি না।”

ঋবও ভ্রাতৃহত্যাকারীদের ধ্বংসের নিমিত্ত মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কত লোক বিনষ্ট হইল। পিতৃপুরুষেরা আসিয়া বলিলেন, “এ কি করিতেছ? একের দোষে অন্তকে কেন হত্যা করিতেছ?” ঋবের তখন তব্জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি বলিলেন, “এরূপ কেন হইল?” পিতৃগণ বলিলেন, “বিষয়ের স্পর্শে মলিনতা আসে। তুমি পুনরায় তপস্তা কর।”

নরেন্দ্রের গোস্বামী

আজ ঠাকুর নরেন্দ্রের পারে অঐত পরিবারের গোস্বামীর নিকট গেলেন। মন্দিরে যে সকল অত্যাচার হইতেছে, তাহা বলিলেন। এখানকার লোক শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করে না। শাস্ত্র বলিবার লোকও নাই। জানিয়া-শুনিয়া অগ্নায় দেখিয়া শাস্ত্র না বলিলে পাপ হয়। নরেন্দ্রের গোস্বামী বলিলেন, “মন্দিরে প্রায়ই মাহুষ মরিয়া থাকে। সিদ্ধগণেশের নিকট অল্পদিন হইল এক দড়িতে তিন জন ঝুলিতেছিল। দেবতার দিকে মাথা রাখিয়া মৃত পড়িয়াছিল।” ঐ গোস্বামীর বাড়ী হইতে একটি তুলসী গাছ আনা হইল। নরেন্দ্র দেখিয়া চন্দনযাত্রার উৎসবের কথা মনে

করিয়া ঠাকুর আনন্দ করিলেন। সম্মুখে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রণাম ও চরণামৃত লইয়া বাসায় অগ্রসর হইলেন। পূজারী একখানা কাপড় প্রার্থনা করিল। একটি বাদ্যলীও একখানা কাপড় চাহিয়াছিল। তাহার জুত কাপড় আনা হইল। রাত্রিতে জগৎবাবু, মুন্সেফ্‌বাবু আসিলেন। নরেন্দ্রের গৌসাইর কুটীরে বিগ্রহ আছেন। তিনি কোঠাবাড়ী করিতে চান। ঠাকুর বলিলেন, “পাকাবাড়ী কি করিতে আছে? ইহসংসারে কিছুই পাকা বন্দোবস্ত করিতে নাই।”

সমুদ্রের শোভা

ঠাকুর আজ সমুদ্রে গেলেন। সমুদ্রের শোভা বড়ই মনোরম হইয়াছিল। ঠাকুর উহার নানারূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন লক্ষীদেবীর বস্ত্রে যেন অসংখ্য মণিমাণিক্য জলিতেছে। শ্রীরামচন্দ্রের তনুতে যেন রাশি রাশি মাণিক্যহার বলমূল করিতেছে। পূর্বাকাশে নববর্ণা উদ্ভিত হইয়াছে। তাঁহার মনোহর রশ্মি সাগরজলে পড়ায় আমাদের বামপার্শ্ব হইতে সমুদ্রের মধ্যদেশ দিয়া প্রায় দুইশত হস্ত প্রশস্ত একটি পথ যেন আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। ঐ পথে অসংখ্য হীরকখণ্ড যেন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। নীল সমুদ্রে এইরূপ কোটি কোটি হীরকের ছড়াছড়ি দেখিয়া চক্ষু যেন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না।

আসিবার সময় পথে মুন্সেফ্‌বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আফিসে যাইতেছিলেন। ঠাকুরের নিকট আসিয়া, জুতা ছাড়িয়া, মাটিতে পড়িয়া নমস্কার করিলেন। পথে কত রাজকর্মচারী যাইতেছে, সেদিকে লক্ষ্যপও নাই। রাস্তায় একটি দুঃখী স্ত্রীলোক কাপড় চাহিল। তাহাকে একখানা কাপড় খরিদ করিয়া দেওয়া হইল। আর একটি শ্রীহট্টবাসিনীকে একখানা কাটিয়া কাপড় খরিদ করিয়া দেওয়াইলেন। ঐ স্ত্রীলোকটি

রোজ ভোরে ফুল তুলিতে, “রাঙ্গা পায়ে সোণার নুপুর, কল্লুরূহ বাজে” এই গানটি করেন। ফুল তুলিয়া জগন্নাথদেবকে দেওয়াই তাঁহার নিত্যব্রত। আজ খড়দহের গোস্বামী পরিবারের তিনটি জীলোককে বাড়ীওয়ালা এ বাড়ীতে থাকিতে পাঠাইয়াছেন।

লিঙ্গপূজা

অন্য মাদ্রাজ কংগ্রেস হইতে নানাস্থান দর্শন করিয়া বরিশালের গুরু-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি লিঙ্গপূজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ঐ সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত শুনাইবার জন্ত তিনি আল্মারি হইতে একখানা গ্রন্থ চাহিলেন। আল্মারিতে গ্রন্থ পাওয়া গেল না। তিনি নিজেই বলিতে লাগিলেন “যখন নিগুণ ব্রহ্ম সগুণ হন, তখন প্রথম এই ‘লিঙ্গরূপ’ ধারণ করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ একাধারে বিরাজিত থাকেন। পরে সমস্ত সৃষ্টি আদি সম্পন্ন হয়। যোগী, ঋষি, মুনি সকলেই এই ব্রহ্মরূপ লিঙ্গের উপাসনা করেন। উহাই ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। উহা পরব্রহ্মেরই (নিগুণের) সগুণ রূপমাত্র। যেমন সমুদ্রের ঢেউ হয় হঠাৎ ফেণও হয়। কেন হয় কে জানে? কোন কারণ নাই, অথচ হঠাৎ তরঙ্গ হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের যখন ইচ্ছা হইল (কেন ইচ্ছা হইল কে জানে?) তখন তিনি ঐ ‘লিঙ্গমূর্তি’ রূপে সগুণ হইলেন। পরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই ভাগ হইয়া পঞ্চদেবতা ও তিনগুণ হইতে তিন দেবতা জন্মিল। এই তিনগুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।” তিনি বিদায় হইবার সময় ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর সম্মেহে তাঁহার পিঠে তিনটি চাপড় মারিয়া বলিলেন, “খুব কাজ করিতেছেন, বেশ করুন।” তখন অশ্বিনীবাবু ঠাকুরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

গুরুতর অপরাধের শাস্তি : জগন্নাথদেবের দর্শন না পাওয়া : রামচন্দ্রের শূদ্র তপস্বীর মস্তক ছেদন

আজ সকালে বাহির হইয়া ঠাকুর গুজাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে চাকার শ্রীযুক্ত বন্ধুবিহারী চলিল। একটি দুঃখিনী জীলোক গতকল্য একখানা কাপড় চাহিয়াছিল। আজ একখানা নূতন কাপড় তাহার জন্ত লওয়া হইল। বন্ধু গল্প করিল, “সেদিন একটি বাঙ্গালীর ছেনে গৈরিক পরিয়া আমাদের বাসায় আসিয়াছিল। সে বহু চেষ্টা করিয়াও জগন্নাথদেবের দর্শন পায় নাই। সে এখন জগন্নাথবল্লভ মঠে আছে।” পাণ্ডুরা বলিল, “তাহার বিশেষ কোন অপরাধ আছে।” আশ্চর্য্য এই, মণিকোঠার ভিতর যাইয়াও দর্শন পায় নাই। ঠাকুর বলিলেন, “বাহার গো-হত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ করে, তাহাদের জগন্নাথদেব দর্শন হয় না।” বিধুবাবু বলিলেন, “ঐ লোকাট বোধ হয় আমাদের প্রজা ছিল, জাতিতে চণ্ডাল।” ঠাকুর বলিলেন, “তবে ত তাহার মন্দিরে প্রবেশের অধিকারই নাই। অথচ গৈরিক পরিয়াছে। আজকাল ফেরিওয়ালারা গৈরিক পরে। দেশীয় রাজা থাকিলে ইহার মৃগপাত করিয়া দিত।” রাত্রিকালে কিশোরীবাবু বলিলেন, তাহার ‘মাসশাওড়ি’ আজ মন্দিরে গিয়াছিলেন। একজনকে চীৎকার করিয়া বলিতে শুনিলেন, “ওগো আমি গো-হত্যা করিয়াছি, আমার জগন্নাথদেব দর্শন হইল না। সমস্তই অমাবস্তার অন্ধকার।” এই বলিয়া লোকাট ছটফট করিতেছে।

ঠাকুর আবার বলিলেন, “দ্বৈতা যুগে রামরাজ্যে একটি ব্রাহ্মণকুমার মরিল। ঋষিরা বলিলেন শূদ্র জাতি তপস্তা করিতেছে। শ্রীরামচন্দ্র ধর্মবিপ্লবকারী তপস্বীর মস্তক ছেদন করিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠে পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণকুমার জীবিত হইল। ঋষিরা ইহা জানিয়াই বহুপূর্ব হইতে

“হরেনা মৈব কেবলম্” এই মহামন্ত্র কলিতে জীবের পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। নিজে ঠাকুরও চূপ করিয়া মণিকোঠায় আসিয়া পলাইয়া আছেন।

গোপিনীদের কাত্যায়নী পূজা

আজ জেল ঘুরিয়া আঠারনালার নিকট হইয়া নরেন্দ্রের পার দিয়া ঠাকুর বাসার দিকে ফিরিলেন। পথে একটি মঠ দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানে কি আছে।” আমরা বাইয়া দেখিলাম শিবলিঙ্গ ও মহাবীর রহিয়াছেন। আঠারনালার পাড়ে বাহারা তালপাতার ছাতা তৈয়ারী করে তাহাদের ছেলেরা আসিয়া ঠাকুরকে নমস্কার করিল। পথে বাইতে বাইতে প্রায়ই উড়িয়া ছেলেরা ও পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকেরা ঠাকুরকে নমস্কার করে। ছাতিওয়ালারা হিন্দু অথচ মুগী খায়। পথে চলিতে চলিতে ঠাকুর বলিলেন, “যিনি আত্মশক্তি কাত্যায়নী—তিনিই রাধারানী। গোপকন্ডারা ভোরে উঠিয়া অতি সরলভাবে কাত্যায়নী পূজা করিতেন। তাঁহারা শ্রীনন্দনন্দন, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের স্বামী হউন” এই প্রার্থনা করিতেন। ভগবান তাঁহাদের সরল প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

আজকাল ঠাকুর রাস্তায় চলিতে চলিতে এই গানটি গাহিয়া থাকেন :

জান না রে মন, পরম কারণ শ্রামা কখন মেয়ে নয়।

মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ॥

হ'য়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি দলুজতনয়ে করে সভয়।

(কভু) ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥

ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন লয়।

(কভু) আপন মায়ায়, আপনি বাঁধা যতনে এ ভব-যাতনা সয় ॥

যে রূপে যে জনা, করয়ে ভাবনা, সেরূপে তার মানসে রয়।

কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে কমলমাঝারে করে উদয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের মুক্তাফলের বাগান

ঠাকুর গল্প করিলেন, “শ্রীকৃষ্ণ মুক্তাফলের বাগান করিবেন। সখীদের দ্বারা শ্রীমতীর নিকট একটি মুক্তা চাহিয়া পাঠাইলেন। সখীরা ও শ্রীমতী গালাগালি দিলেন, মুক্তা দিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ মা’র নিকট চাহিয়া একটি উৎকৃষ্ট মুক্তা পাইলেন। কতটুকু স্থান চিহ্নিত করিয়া ভাল করিয়া খুঁড়িয়া পরিষ্কার করিয়া মুক্তাটি পুঁতিলেন। উহার গোড়ায় দুখ ঢালিলেন। পরদিন মা’কে ডাকিয়া দেখাইলেন, অন্ধুর হইয়াছে, পরে দেখিতে দেখিতে গাছ হইল, রাশি রাশি উৎকৃষ্ট মুক্তা গাছটিকে আলো করিয়া রহিয়াছে। ধামায় ধামায় মুক্তা তুলিয়া আনিলেন কিন্তু শ্রীমতীর সখীরা নিতে আসিলে, আচ্ছা করিয়া বেত মারিতে সখাদিগকে আদেশ করিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীমতীও গাছ করিবেন মনে করিলেন। চাষ করিলেন, কত কি করিলেন, কিন্তু কোথায় বা বৃক্ষ, কোথায় বা মুক্তা, কিছুই হইল না। তখন ফাঁফরে পড়িয়া সকলে কৌশল আটিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়া কৌশলে মুক্তা বাগান করাইয়া লইবেন। সখীরা বলিল, ‘তোমার ঐ যে মুক্তাবাগান উহা যথার্থ মুক্তাবাগান নহে। আচ্ছা, যদি তাই হয়, তবে আমাদের এই বাগানে মুক্তা পুঁতিয়া মুক্তা ফলাও দেখি?’ শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রি করিয়া সখীদিগকে ব্যঙ্গ আরম্ভ করিলেন, ‘এই তো কেরামত!’ শ্রীমতী বলিলেন, ‘আর আশ্ফালনের প্রয়োজন নাই, যত করিতে পার সব জানি, আমি একটু আড়াল হইলেই সব টের পাওয়া যায়।’ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্তুতি আরম্ভ করিলেন ‘তুমি আত্মশক্তি ভগবতী।’ তখন শ্রীকৃষ্ণ মুক্তা পুঁতিয়া গাছ করিলেন, রাশি রাশি মুক্তা ফলিল। সখীরা সময় বুঝিয়া বলিলেন, ‘কেমন কৌশল করিয়া তোমা দ্বারা মুক্তাবাগান করাইয়া লইলাম, দেখলে তো?’

শ্রামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের সৃষ্টি

এইস্থানেই রাধাকুণ্ড হইল, রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে পাপ বিনষ্ট হইয়া ভক্তিলাভ হয়। একদিন সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, “তুমি বৎসাসুর বধ করিয়া গো-হত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছ, আমাদিগকে আর স্পর্শ করিও না।” তখন ভগবান বংশী দ্বারা শ্রামকুণ্ড খনন করিয়া সমস্ত তীর্থ আহ্বান করিলেন। সমস্ত তীর্থ তাহাতে আগমন করিল। তিনি তাহাতে স্নান করিলেন। সখীরা তাহা দেখিয়া নিজেরা এক কুণ্ড তৈয়ারী করিলেন, কিন্তু জল নাই, সকলে ফাঁপরে পড়িলেন এবং যুক্তি করিলেন ‘শ্রামসুন্দর দ্বারাই এই কুণ্ডে জল আনাইবেন।’ সখীরা বলিলেন “উহাতে হইবে না। যদি এই কুণ্ডে সমস্ত তীর্থ আনিয়া স্নান করিতে পার তবে হইবে।” শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিলেন, ইহাই রাধাকুণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণের সেতুবন্ধনলীলা

ঠাকুর পরে সেতুবন্ধের গল্প করিলেন। “শ্রীকৃষ্ণ একদিন সখীদের সঙ্গে ঐস্থানে (সেতুবন্ধে) ক্রীড়া করিতেছিলেন, কতকগুলি বানর রহিয়াছে দর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন, ‘আমি শ্রীরামচন্দ্র হইয়া সমুদ্র বন্ধন করিয়াছিলাম, এই আমার বানর সকল।’ সখীরা বলিল, ‘তাই তো। আচ্ছা যদি তাই হয়, এই জলাশয়ে সেতুবন্ধন কর দেখি?’ তখন তিনি হনুমানকে স্বরণ করিলেন। নল, নীল গুপ্তভাবে ঐ বানরগণুলীর ভিতরে ছিল। তাহারা আসিয়া জলে নামিল। হনুমান নিকটস্থ পাহাড় হইতে পাথর আনিয়া দিল। সেতুবন্ধ শেষ হইল কিন্তু সখীরা বলেন, ‘ইহা স্মৃঢ় নয়, ইহা অধিক ভার বহন করিতে পারিবে না।’

তখন ভগবানের স্মরণমাত্র রুদ্রদেব পাহাড় হইয়া ঐ সেতুতে চাপিলেন।
নীচে ভগবান মাথা পাতিয়া সেই ভার বহন করিলেন।”

বাসায় আসিতে আসিতে জগদানন্দ (শান্তিদিদির দ্বিতীয় পুত্র) অতি
ভক্তিভরে জগন্নাথদেবকে যে সাষ্টাঙ্গ দিয়াছে, তাহা বলিলেন।

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমায় কোন্ কোন্ বন, কুণ্ড, পাহাড়, গ্রাম
প্রভৃতি পথে পড়ে বলিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন “শ্রীবৃন্দাবন সহ
হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ‘বন’ বড়ই মনোরম।”

সমুদ্রে যাইতে যাইতে ‘জয় মহাপ্রভু’, ‘শ্রীগৌরানন্দ’ বলিয়া একটি
মেথরের ছেলে ভক্তিভাবে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।
ঠাকুর উহাতে বড় ব্যাকুল হইলেন এবং বলিলেন “শ্রীগৌরস্বয়ং
হরিনাম দ্বারা এদেশ উন্নত করিয়া গিয়াছেন, আজও সেই ধ্বনি, সেই
গৌরস্বন্দরের নাম দেশে দেশে হইতেছে। কিই তিনি করিয়া গিয়াছেন।
২২শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ প্রচণ্ড রৌদ্রে বাসায় আসিতে ঠাকুরের বড়ই ক্লেশ হইল।
শরীর দুর্বল হইয়া পড়িল। আর পা চলে না। আজ ঠাকুরের
জ্বর হইয়াছে, বাহির হইলেন না, চুপ করিয়া একমনে রহিলেন।
সকালে অল্প মুড়কি প্রসাদ পাইলেন। স্বাত্রে প্রায় কিছুই খাইলেন
না। ঠাকুরের অস্থখ হইলে নিঝুম মারিয়া একমনে যেমন ধ্যানে থাকেন
আজ তদ্রূপ হন নাই, মাঝে মাঝে বানরগুলিকে খাবার দেওয়াইলেন।

ব্রহ্মচারীর শান্তি

২৩শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ সকালে উঠিলে ব্রহ্মচারী বলিলেন, “ঠাকুর জ্বরের দ্বারা
আর মুড়কি খাইতে পারেন না। আপনারা অত্র জিনিস কে

আনান না? অস্ত্রের হইলে ত কত আসিত।” সকালে ঠাকুরও বলিলেন, “এখানে পুনঃপুনঃ আর মুড়কি ভাল লাগে না। ফলমূলদি ভাল কিছু কি মিলে না?” দাদাগৌসাই বলিলেন, “কেবল ঠাকুরের সুবিধার জন্তই এত ধার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এমন কি শাস্তিদের জন্তও দরদ নাই। কেবল এই পৃথিবীতে ঠাকুরের জন্ত প্রাণের একটা টান আছে।” এইরূপ ঠাকুরের সেবা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

ঠাকুর আসিলে পর শাস্তিদিদি বলিলেন, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে অপমান-স্বচক কথা বলিয়াছে, চলিয়া যাইতে বলিয়াছে। আরও কি কি বলিলেন স্মরণ নাই। ঠাকুর বলিলেন, “যে জীলোকের মর্যাদা করিতে পারে না সে ত মানুষই নহে, তাহার আবার ব্রহ্মচর্য্য কি? আজ অবধি ব্রহ্মচারী না বলিয়া উহাকে ‘কুলদা’ বলিয়া ডাকিব। সে যেন আমার ঘরে আসে না। বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে কি হইল? সবই ত মিছে দেখছি।” অতঃপর ব্রহ্মচারী নিজ হইতে ঠাকুরের গৃহে গিয়া সেবকার্য্য করিতে লাগিলেন, তখন তিনি পায়খানায় গিয়াছেন। পায়খানা হইতে আসিবার সময়ে “আমি নিজেই ঔষধ তৈয়ার করিব, তোমরা কিরূপ ব্যতিক্রম করিয়া ফেলিবে।” এইরূপ বলিলে ব্রহ্মচারী সম্মুখে আসিল। তখন ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, “কে? ব্রহ্মচারী, তুমি? আচ্ছা, ঔষধ তৈয়ার কর।” ব্রহ্মচারী বলিল, “আর ব্রহ্মচারী নহে, ‘কুলদা’ বলিবেন।” ঠাকুর এই সময় হাঁকি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। “আমার বুক দধ্ব হ’য়ে যাচ্ছিল। তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি। তুমি আসিয়াছ দেখিয়া আনন্দ হইল।” ব্রহ্মচারী পায়ে পড়িয়া পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, “আমার কোন ক্লেশ নাই। আশীর্বাদ করিবেন আপনি যখন যেরূপ অবস্থায় ফেলেন, তাহা আপনার আশীর্বাদ

বলিয়াই যেন গ্রহণ করিতে পারি। আমার ছুই একটি কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, দয়া ক'রে যদি শুনেন।" ঠাকুর বলিলেন, "কিছুই বলতে হবে না, আমি সব জানি, ও কিছুই নয়, আমার সঙ্গে কি যে দল পরে টের পাবে।" অতঃপর বলিলেন, "দিন বার তের 'কুলদা' বলিয়া ডাকিব।" ব্রহ্মচারী বলিল, "ইহাতে আমার কিছুই ক্লেশ হইবে না।" অতঃপর ঠাকুর আহ্বার করিলেন।

দ্রৌপদীর স্থালী

আজ কথায় কথায় গল্পচ্ছলে দিদিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "আমাদের যে প্রসাদ আসে ইহাতেই হয়। তবে আমাদের বিশ্বাস নাই বলিয়া গোলমাল হয়। দ্রৌপদীর স্থালীর কথা মনে করুন।" তখন অশ্বিনী ও দিদিমা বলিলেন, "কেন অল্প এক ঘট দধি দিয়া পঞ্চাশ বায়র জন লোককে যোগজীবনের বিবাহের সময় তোমাদের ঠাকুর খাওয়াইয়া ছিলেন। ছ'মুষ্টি পরিমাণ অন্ন দ্বারা প্রয়োগে কুস্তমেনায় অশ্বিনী, ভগবৎ বাবু, মহাবিশ্ববাবুকে ও ব্রহ্মচারীকে পরিপূর্ণরূপে আহ্বার করা ইয়াছিল এবং এক বৌকনা অন্নদ্বারাও তোমাদের মাতা ঠাকুরানী শ্রীবন্দাবনে লোককে খাওয়াইতেন।

'সকলকে দিলেই ভগবান পান'

২৪শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

কাল ফরমাইস দিয়া ভাল প্রসাদী লাড্ডু আনা হইয়াছিল। সকলকে তাহা দেওয়া হইয়াছে কি না আজ প্রাতে ঠাকুর তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "অনেককেই দেওয়া হইয়াছে, উপরে পাণ্ডা দিগকে কি দেওয়া হইবে?" তিনি বলিলেন, "সকলকেই দিতে হইবে।"

চাকর, বানর, গরু, মেথর এবং যাহারা যাহারা এখানে আছে, সকলকেই দিবে। সকলকে দিলেই ভগবান পান।”

ঠাকুর আজ বাহির হইয়া জগন্নাথদাস বাবাজীর নিকট গেলেন। টাকাদার আসিয়া শান্তিদিদির মেয়ে নারায়ণীর জামা খুলিয়া উহাকে টাকা দিবে কি না অনুসন্ধান লইতেছিল। জগদ্বন্ধুবাবু উপর হইতে আসিয়া বড় গালাগালি করেন। ঠাকুর যাইতে যাইতে বলিলেন, “একটু হইলেই যদি উত্তেজিত হইতে হয় তবে আর কি হইল? রাগের অবস্থায় স্থিরভাবে কার্য্য করাই মহত্ব। স্বাভাবিক অবস্থায় ত লোকে স্থিরভাবে সর্ব্বদাই কাজ করে।” ঠাকুর বড়ছাতার মহন্তের নিকট গেলেন। তিনি দাদা-গোসাঁইকে বলিলেন, “সমস্তই অসার, কেবল ভগবানের নামই সার। ঠাকুর, ‘আমি ত আপনাদের দাসানুদাস,’ এইরূপভাবে বিনয় করিয়া বাসার দিকে চলিলেন। পথে একটি দরিদ্র সাধুকে একখানা কাপড় খরিদ করিয়া দিতে আগে পাঠাইলেন। আমি মন্দির হইয়া বাসায় ফিরিলাম। সায়ংকালে বড়ছাতার মহন্ত ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং বানর-দিগকে খাওয়াইতেছি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “রাজকর্নচারীরা (মিউনিসিপ্যালিটির) বানর মারা বন্ধ করিবে বলিয়া ফাঁকি দিয়া ছ’বার টাক্স নিয়াছে কিন্তু একাজ কে করে? আপনি আসাতে এটি হইল।”

সন্ধ্যাকীর্তনে ভাবাবেশ

ঐ সময় নূতন পোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টবাবু আসিলেন, ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি বাসায় না যাইয়াই এখানে আসিয়াছেন। কীর্তন শুনিয়া বাসায় যাইবেন। ঠাকুরকে দেখিতে লোকটি যেন চাতক পক্ষীর গায় হইয়াছিল। ঠেলিয়া বাসায় পাঠান যায় না। ঠাকুরকে লইয়া তিনি জগন্নাথ দর্শন করিবেন, তবেই তাঁহার দর্শন হইবে, এই

বিশ্বাস। রাত্রিতে কীর্ত্তন হইল। যদিও গানের লোক ছিল না, তথাপি আশ্চর্য্য কীর্ত্তন জমিয়া গেল। সরলনাথ ও অমৃত পাগলের মত বেসামান্য হইল। পুনঃপুনঃ সরলনাথ অজ্ঞান হইতে লাগিল, অমৃত কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া নাম করিতে লাগিল। ঠাকুর মাঝে মাঝে ‘হরিবোল’, ‘হরিবোল’ বলিতে লাগিলেন। জগৎবাবু, কিশোরীবাবু ছিলেন।

২৫শে মাঘ, ১৩০৪ সাল।

আজ সকালে শ্রীধরবাবু ঠাকুরের নিকট গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার জীবন কথা বলিলেন, তিনি ঠিক যেন সতীসাক্ষী লক্ষ্মীদেবী, অতি মিষ্টভাবিণী ছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “যদি শাহি পাইতে চাও, সকলকে মিষ্টবাক্য বলিবে। কাহাকেও নিন্দা করিবে না।” শ্রীধরবাবু বলিলেন, “ঠাকুরমা আমাকে বলিয়াছেন, “যেখানে ঘরি এমন বাক্য বলিবি যেন প্রাণ শীতল হইয়া যায়।”

আজ ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ডাকের নূতন সুপারিন্টেন্ডেন্টবাবু সহিত আলাপ হইল। তাঁহার পরিবার প্রভৃতির সাধন পাইবে। ভিঁরি বড় সজ্জন লোক।

একাদশীতত্ত্ব : অন্বরীষ উপাখ্যান

২৬শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ছড়ি দারেরা যাইতেছিল, ঠাকুরকে নমস্কার করিল। অনন্তরাম ছড়িয়ার আসিয়া ঠাকুরকে ঘোড়হাতে বলিলেন, “অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।” ঠাকুর বলিলেন, “তোমার কি অপরাধ আছে?” তিনি বলিলেন, “এমন অপরাধ নাই বাহা না করিয়াছি।” তাঁহার বিনীতভাব

বড়ই মিষ্ট লাগিল। অমৃত যাইয়া জানিয়া আসিল, এখানে ‘গদ্যামাতার মঠ’, ‘রাধাকান্ত মঠ’ প্রভৃতি মঠে একটা নূতন মত ঘটাইয়া একাদশী স্বেচ্ছামতে প্রচার করিতে চায়। এবারে সোমবার স্মার্ত মতে একাদশী, হরিভক্তিবিলাস মতে ঐ দিনই একাদশী। সোমবার ছয়চল্লিশ দণ্ড একাদশী আছে। ইহারা কিন্তু এখানে মঙ্গলবার দিন একাদশী করিবে।” শ্রীধর-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “একাদশী ব্রতটা কি?” ঠাকুর বলিলেন, “পূর্বে-কালে এক সময়ে ঋষিরা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। ইহার কারণ কি, ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন ‘তোমরা একাদশী ব্রত অহুষ্ঠান না করাতে ঐরূপ ঘটিয়াছে। উক্ত তিথিতে আহারের বস্তুতে কীট কন্মে, ঐ কীট শরীরে যাইয়া বহুতর কীট জন্মায়। ইহাদের প্রভাবে কালে মানুষ কুষ্ঠরোগগ্রস্তও হইতে পারে। এই তিথিতে উপবাসই বিধি। কিন্তু যাহারা অক্ষম তাহারা কেবল কোন জিনিষ বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া আহার করিতে পারেন। এই তিথিতে সারাদিন ভজন-সাধন করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিতে হয়। একাদশী ব্রত যাহারা অহুষ্ঠান করিবেন তাঁহারা ঐ দিন কদাচ আত্মপ্রশংসা বা পরনিন্দা করিবেন না।”

একাদশী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি আসনস্থ ঈশাদি দশ উপনিষদ গ্রন্থের শেষ অংশে, ২৬৬ পৃষ্ঠায়, স্বহস্তে বাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এই :

“একাদশী—হরিভক্তিবিলাস (১২শ ও ১৩শ বিলাস)।

বিষ্ণুরহস্তে—“সমাদায় বিধানেন দ্বাদশী ব্রত যুক্তমম্।

তস্ম ভঙ্গং নরঃ কৃত্বা রৌরবং নরকম্ ব্রজেৎ॥”

অন্তার্থ :—বিধি পূর্বক উক্তম দ্বাদশী ব্রত গ্রহণ করিয়া নর তাহা ভঙ্গ করিলে রৌরব নরকে যাইয়া থাকে।

পরে হরিভক্তিবিলাসধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটিও তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন :

“উপাবৃত্তস্ত পাপেভ্যো বস্ত বাসো গুণৈঃ সহ ।

উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বভোগ বিবর্জিতঃ ॥

(কাভ্যায়ন স্মৃতিষু)”

অন্ত্যর্থঃ—পাপ কর্ম সমূহ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া গুণসমূহের সহিতসকল প্রকার ভোগবর্জিত হইয়া বাস করাকে উপবাস বলিয়া জানিতে হইবে।

হরিভক্তিবিলাসে গুণ শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ—

গুণাশ্চাক্তাঃ ভবিষ্যে :

ক্ষমা সত্যং দয়া মোদনং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।

দেবপূজাগ্নিহবনং সন্তোষস্তাপ বর্জনং ।

সর্ব ব্রতেহয়ং ধর্মঃ সামান্তো দশধা স্মৃতঃ ॥

ক্ষমা, সত্য, দয়া, মোদন, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম, দেবপূজা, হোম, সন্তোষ এবং মানসিক সন্তাপ পরিহার—সাধারণভাবে এই দশ প্রকার ধর্ম উক্ত আছে, ইহা সর্ব ব্রতেই বিহিত ।

পাদে চ, শ্রীষমধুত্রকেতু সংবাদে—

দশম্যাং সংযমং কৃৎস্না ব্রতাহে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।

ক্রোধ হিংসা বিহীনশ্চ কৃষ্ণ কীর্ত্ত্যা দিনং নরেণ ॥

দশমীতে সংযম অবলম্বনপূর্বক, ব্রতের দিনে সংযতেন্দ্রিয় হইবে এবং ক্রোধ হিংসা পরিত্যাগপূর্বক, কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন দ্বারা দিবা যাপন করিবে বিমুখশ্রোতরে—

তদ্ব্যানং তজ্জপঃ শ্রানং তৎকথা শ্রবণাদিকং ।

তদর্চনঞ্চ তন্মায় কীর্ত্তন শ্রবণাদয়ঃ ।

উপবাস কৃতোহেতে গুণাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ ॥

তাহার ধ্যান (বিষ্ণুর) রূপ, জ্ঞান এবং তাহার কথাদি শ্রবণ, পূজন এবং তাহার নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ—পণ্ডিতগণ উপবাসী ব্যক্তির এই গুণ-গুলি নির্দেশ করিয়াছেন।

একাদশীতত্ত্বে গুণ শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ আছে :

“গুণানাহ গোতমঃ—

দয়াসর্বভূতেষু ক্ষান্তিরনন্তয়া শৌচমনাস্যসো

মঙ্গলমকার্পণ্যম স্পৃহা চেতি ।”

সর্বভূতে দয়া, ক্ষমা, পরনিন্দাবর্জন, পরিত্রতা, চেষ্টাশূন্যতা, মানসিক কার্যের অন্তর্ধান, দীনতা বর্জন, নিস্পৃহতা—এইগুলিই গুণ।

শ্লোকার্থ ‘ভোগ’ শব্দের ব্যাখ্যা হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ আছে :

ভোগাশ্চোক্তাঃ শীতাতপেন—

গন্ধালঙ্কার বাসাংসি পুষ্পমালাহুলেপনম্।

উপবাসেন দ্ব্যস্তি দন্তধাবন মঞ্জনম্ ॥ ইত্যাদি

গন্ধদ্রব্য, অলঙ্কার, বস্ত্র, পুষ্পমালা ও অঙ্গরাগ দ্রব্যের ব্যবহার, দন্তধাবন উপবাস দিনে দূষণীয়।

রাত্রিকালে জগৎবাবু ডাকের স্থপারিটেণ্টেণ্টবাবু, কিশোরীবাবু প্রভৃতি আসিলেন। ঠাকুর তাহাদের নিকট একাদশী সংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনা সকল উল্লেখ করিলেন। বলিলেন, “জগন্নাথ দাস বাবাজী বলিয়াছেন তিনি দলের খাতিরে মঙ্গলবার একাদশী করিবেন। গদ্যমাতা মঠ, রাধাকান্ত মঠ প্রভৃতি একমতে চলে। তাহারা মনোমুখী, শাস্ত্র গ্রাহ্য করেন না। এ সকল কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু কার নিকট বলা যায়, কেই বা কথা গ্রাহ্য করে ?”

দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে উপবাস, দ্বাদশীতে পারণ—এই বিধি। কথায় কথায় অম্বরীষের গল্প করিলেন। অম্বরীষ রাজার নিকট দুর্কীসা ঋষি

অতিথি। তিনি সশিষ্য স্নান আত্মিক করিতে গিয়াছেন। এদিকে দ্বাদশী অতীত হইতে চলিল। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি রাজা অশ্বরীষকে উপদেশ দিলেন, “কুশাগ্রে করিয়া গজাজল গ্রহণ করুন।” যেই এইরূপ করা, অমনি দুর্কীসা উপস্থিত। “অতিথির অভুক্ত অবস্থায় আহার করিলে? দেখ, আমি কি করিতে পারি। ইহার ফল পাও।” এই বলিয়া ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া একটি জটা ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। অমনি একটা বিকটাকার রাক্ষস আবির্ভূত হইল। রাক্ষস অশ্বরীষকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে অমনি ভক্তগণের রক্ষক সুদর্শনচক্র আবির্ভূত হইল। উহার তেজে রাক্ষস অমনি বিনষ্ট হইল। চক্র রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া দুর্কীসার পেছনে পেছনে ছুটিল। দুর্কীসা ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের নিকট গেলেন। আশ্রয় পাইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, “বিষ্ণুর নিকট যাও। আমরা কি করিব?” অতঃপর তিনি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন বিষ্ণু বলিলেন, “আমি ভক্তের অধীন, আমি অস্বতন্ত্র, অতএব তুমি অশ্বরীষের নিকট যাও।” দুর্কীসা বলিলেন, “আমি ভক্তের মহিমা জানিতাম না। আজ বিষ্ণু-ভক্তের মহাত্ম্য বুঝিলাম।” ভক্ত অশ্বরীষ দুর্কীসার এক বৎসরকাল এইরূপ নানাস্থানে ভ্রমণকালীন ঘোড়হস্তে যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন তথায়ই রহিলেন। অতঃপর দুর্কীসার আহারান্তে নিজে ভোজন করিলেন।

‘সন্ন্যাসী’ অর্থ সম্যকরূপে ভগবানে যিনি আপনাকে লুপ্ত করিয়াছেন। ‘বৈষ্ণব’ অর্থও তাই।

মহাবীরের পূজাদান

২৭শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ জগন্নাথবল্লভ মঠে গেলেন। যাওয়ার সময় পদ্ম করবী ও ভাণ্ডির ফুলের প্রশংসা করিলেন। বাগানের শোভা দেখিয়া

দ্বাদশ অধ্যায়

২৯১

আনন্দ করিলেন, তৎপরে মহাবীরের নিকট বাইয়া বসিলেন। বানরবধ বন্ধ হওয়ার জন্ত ১০ টাকা মানস করিয়াছিলেন। এই মহাবীরের নিকট ৫ টাকা এবং অত্যাগত মহাবীরের নিকট ৫ টাকা ভোগ দেওয়া হইবে। বানরবধের সময় একদিন ঠাকুরের নিকট মহাবীর প্রকাশ হন। ঠাকুর প্রার্থনা করিলেন, “ইহাদের প্রতি কৃপা করুন।” তৎপর দিনই বানরমারা বন্ধের হুকুম হয়।

মহাবীরের প্রসাদী সিন্দূর নিজে গ্রহণ করিয়া বিধুবাবু, পান্না, জগদানন্দ প্রভৃতির কপালে দিয়া দিলেন। সিন্দূর, কর্পূর, চুয়া, ফুল, মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে ৫ টাকা ও কলা, ছোলা প্রভৃতিতে ২ টাকা ব্যয় হইবে। পূজারী একখানা রেশমী বস্ত্র চাহিল, তাহা কিনিয়া দিবার নিমিত্ত সরলনাথকে বলিলেন। আরও কহিলেন, “আমরা কেবল পূজারীকেই জানি, পূজারীই—মহাবীরের স্বরূপ।” ঠাকুর আসিবার সময় মহাবীরের সামনে সাষ্টাঙ্গ হইয়া ‘কৃত্ত’, ‘কৃত্ত’, ‘মহাবীর’ প্রভৃতি অশ্লুট শব্দ করিলেন।

সকালে উপনিষদ সম্বন্ধে কথা হইলে ঠাকুর বলিলেন, “ইহাতে বাজে কথা নাই, সব সিদ্ধান্ত বাক্য।” শ্রীধরবাবু বলিলেন, “এই জন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও ইহার এত আদর করেন। আমি ত কিছু বুঝি না, যাহা পাঠ করেন মনে হয় যেন ‘মন্ত্র’।”

সত্যকাম ও ব্রহ্মজ্ঞান

ঠাকুর বলিলেন, “ঋষিকুমার ‘সত্যকাম’ গুরুর নিকট শিক্ষা করিতেন। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন ‘তুমি কার সন্তান জানিয়া আইস।’ গুরুস্থানে কিরিয়া আসিয়া সত্যকাম বলিলেন, ‘মা বলিয়াছেন তিনি যৌবনকালে বহুচারিণী ছিলেন; অতএব ব্রাহ্মণ কি অগ্ন জাতির গুরুসে জন্মিয়াছি, তিনি

বলিতে পারেন না।' ঋষি বলিলেন, 'তুমি ব্রাহ্মণকুমার, কারণ এইরূপ সত্য বাক্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ বলিতে পারে না।' তিনি উহাকে উপবীত দিয়া পাঁচ শত গোচারণ করিতে দিলেন। মাঠে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি ডাকিয়া ডাকিয়া উঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। গোচারণ করিয়া সত্যকাম আশ্রমে ফিরিলে গুরু বলিলেন, 'তোমার মুখে ব্রহ্মভেদ দেখিতেছি, অতএব তুমি ব্রহ্মজ্ঞান কোথা হইতে লাভ করিলে?' সত্যকাম বলিলেন, 'বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন।'।

গুরু যাহা বলেন শিষ্যের তাহাই অবিচারে করা প্রয়োজন। গুরুনির্দেশে গোচারণ করিতে গিয়া 'সত্যকামের' ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল।

ব্রজনাথের অনিচ্ছায় বাবাজীর মন্ত্রদান

রাত্রিকালে কিরণদের দেশের একটি গুরুভাই, ব্রজনাথ অধিকাংশ কুলীনগ্রাম প্রভৃতি স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় এক বাবারী জোর করিয়া তাঁহাকে মন্ত্র দেন। শুনিলাম কুলীনগ্রামের ২৩টি গুরুভাই ঐ বাবাজীর নিকট মন্ত্র লইয়াছেন। এখানে যে মন্ত্র ও যে পদ্ধতিতে ঐ প্রদান করা হয়, তাহা বাবাজী মহাশয় উহাদের নিকট হইতে শুনিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, এবং, প্রহ্লাদ প্রভৃতির আরাধিত নারায়ণাঙ্কুরতত্ত্ব লাভ হয় না।

গোস্বামী মহাশয় কি মন্ত্র দেন, ইহাতে ত নারায়ণতত্ত্ব লাভ হইবে না। ব্রজনাথকে না কি জোর করিয়া পাতের প্রসাদও দিয়াছে। ব্রজনাথ ঠাকুরের নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করে। ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, "বেশ ত এরূপ সাধনে যদি তোমার প্রবৃত্তি জন্মে তাহাই করিয়া ভগবানকে লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। উহার বহু পথ আছে। আমাদের ত কোন দল নাই।"

ছেলেটি পুনঃপুনঃ কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, “আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করুন, উঁহার নিকট হইতে আমার মন্ত্র লইতে কদাচ ইচ্ছা ছিল না।”

কিশোরীবাবু ঐ সময় আইসেন। তখন ঠাকুর এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, “‘কৃষ্ণ’, ‘কৃষ্ণ’ বলিলেই কি কৃষ্ণদর্শন হয়? ‘নাম’ অক্ষর নয়, রেখা নয়, পূর্ণ শক্তি।” এই বলিয়া আজ আবার ‘বেদব্যাস ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের’ গল্পটি বলিলেন।

জগন্নাথদেবের ঐশ্বর্য্য

২৮শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর মন্দিরে গেলেন। পূর্বেই দোড়াইয়া গিয়া দেখিয়া আসিলাম দরজা খোলা আছে কি না। ভিতরে যাইয়া ঠাকুরের বিশেষ ভাব লক্ষিত হইল। ঠাকুর বলিলেন যে, কৃপা করিয়া জগন্নাথদেব তাঁহাকে তাঁহার অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। কোটি কোটি শালগ্রাম তাঁহা হইতে নির্গত হইতেছে ও তাঁহাতে প্রবেশ করিতেছে। কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, কত ব্রহ্মাও এক-একবার বহির্গত হইতেছে। দেখিলেন সমস্ত সেবকমণ্ডলীই চতুর্ভুজবিশিষ্ট।

ঠাকুরের সম্মুখে কোটি কোটি দীপ জলিতেছে। আমি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, “এরূপ সৌন্দর্য্য যেন না ভুলি।” ঠাকুর চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে অনেক স্তুতি করিতে লাগিলেন। উহা দেখিয়া সেবক দলের বাক্যরোধ হইল। এত যে টাকা পয়সার জন্ত খিচাখিচি, তাহাও আর দৃষ্ট হইল না। আসিবার সময় দুইজন পাণ্ডাকে দুই টাকা ও একটি সাধুকে কব্বলের জন্ত পাঁচ সিকা দেওয়া হইল। বলিলেন, “আমি দেই, ইহা কে বলে? জগন্নাথদেবই দেন। তিনি ভিতরে ইচ্ছা না দিলে কেই বা দিতে পারে?”

মানুষ ইহা বুঝিলেই গোল মিটিয়া যায়।” শান্তিদিদির গহনা বন্ধক রাখিয়া ইমার মঠ হইতে আড়াই শত টাকা আনিয়া কাপড়ওয়ালার দেনা শোধ করিতে বলিলেন। আমাদের সাড়ে তিন শত টাকার প্রয়োজন, জগৎবাবু অল্প সূদে ঐ গহনা বন্ধক রাখিয়াই টাকা যোগাড় করিলেন। রাত্রিকালে শুনিলাম, গত দিন যে কিশোরীবাবুর মাসশাশুড়ী মন্দিরে চীৎকার শুনিয়াছিলেন, উহা সেই বাদ্দালী গৈরিকধারী যুবকটিরই। ইনি জাতিতে চণ্ডাল, মন্দির-প্রবেশে অনধিকারী।

২২শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাসায় ফিরিলেন। পথে একটি শিশুকে টুকুরীতে করিয়া মাথায় বহিয়া একটি স্ত্রীলোক দর্শনে বাইতেছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, “বসুদেবও শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে বহন করিয়া পদব্রজে গিয়াছিলেন।”

আজ রাধাকুণ্ডবাসী ‘বেণী’ ব্রজবাসী আমাদের সঙ্গে চলিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে কলিকাতা হইয়া এখানে আসিয়াছেন। আজ দক্ষিণ দরজার পশ্চিম কোণে একজন লোককে মই বাহিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া দুর্গামাধবের মন্দির হইতে নাগিতে দেখিলাম। ঐ স্থান দিয়াই না বিদ্যুৎসংস্কারের সময় বিমলামায়েয় জন্ম বাহির হইতে মৎস্তভোগ যায়। বড়ছাতার মহন্ত আসিলেন। যোগজীবনদাদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি দুধ ও শর্করা দিয়া গিয়াছে?” তিনি বলিলেন, “হাঁ, কাল জগন্নাথদেবের পদ্মবেশ হইবে।” ৮টা ৮।০টার সময় মহন্তরা ঠাকুরকে দর্শনে বাইতে বলিলেন। মহাবীরের পূজার জন্ম পূজারীকে জিনিষ-পত্র খরিদ করিতে পাঁচ টাকা দিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রজদান মহোৎসব

পদ্মবেশ দর্শনে ভাবাবেশ : জগন্নাথদেবের আদেশে দান

১লা ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ জগন্নাথদেবের 'পদ্মবেশ'। গত রাত্রি ১টা হইতে আজ ১০টা পর্যন্ত শ্রীঅঙ্গে এ বেশ থাকিবে। ত্রস্ত করিয়া ঠাকুর চা খাইয়া চাণ্টার ভিতরই দর্শনে বাহির হইলেন। ঠাকুরের সহিত জগন্নাথদেব দর্শন করিবেন, তাই জগৎবাবু, কিশোরীবাবু, হীরালালবাবু আসিয়া জুটিলেন। আমাদের বাসার সকলে শান্তিদিদি, দিদিমা প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরাও চলিলেন। মন্দিরে মুন্সেফবাবুর স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি বসিয়া আছেন। ঠাকুর গেলে তাঁহার সহিত জগন্নাথদেব দর্শন করিবেন। ধাওয়ার পূর্বে পথে গরু প্রভৃতি ও কাঙ্গালীদিগকে দিতে কিছু পয়সা লইতে বলিলেন। সকলেই আজ আনন্দে উৎসাহের সহিত চলিয়াছে। আমাদের সঙ্গে রাধাকুণ্ডবাসী 'বেণী' ব্রজবাসী আছেন। যাইতে যাইতে বড়ছাতার মোহন্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি ঠাকুরকে লইতে অতি ত্রস্ত আসিতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া বড় আনন্দ পাইলেন। লোকটি বড়ই নির্ভাবান্। তিনবার দিনে জগন্নাথদেবকে দর্শন করেন ও একান্ত-মনে অল্প সময়ে ভজন-সাধন করেন। ঠাকুর তাঁহাকে দর্শন করিয়াই নেশাখোরের মত ভাবে মত্ত হইলেন। তাঁহার রূপ ঠিক মহাবীরের মত হইয়াছে। লেজটি গোল হইয়া চক্রে মত হইয়াছে। ঠাকুর দর্শন পাইলেন। একথা পরে আমাদের কাছে বলিয়াছিলেন।

মোহন্তজী ঠাকুরকে ধরিয়া মন্দিরে লইয়া চলিলেন। আমাকে গুরু ঘাস দিতে বলিলেন। আমি উহা দিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া অগ্রসর হইলাম। মোহন্তজী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রথম চন্দনকাঠের নিকট ঠাকুরকে লইয়া উপনীত করিলেন। আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মেয়েরা চলিল। রক্ষক হইয়া পাণ্ডা, ছড়িদার, বেণী প্রভৃতি বহুলোক চলিলেন। আজ মন্দিরে লোকে লোকারণ্য। ঠেলিয়া যাইতে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। ঠাকুরকে বিধুবাবু, সরলনাথ ও বেণী পাণ্ডা চতুর্দিকে ঘেরিয়া লইয়া চলিলেন। ঠাকুর 'মণিকোঠায়' যাইবেন না। কিন্তু পাণ্ডারা টানিয়া লইয়া গেলেন। যাইতে যাইতে ঠাকুর যেন ক্ষেপিয়া গেলেন, হরিশ্বনির উপর হরিশ্বনি, বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। কোন প্রকারে একটু বাহিরে আসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আবার হরিশ্বনি, জয় জয় ধ্বনি, জয় জগবন্ধু, জয় সঙ্কর্ষণ, জয় সুভদ্রামায়ী, জয় চক্রসুদর্শন, সমস্ত পাণ্ডা সেবক প্রভৃতির চরণে কোটি কোটি প্রণাম, একটি ছড়িদারকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমি সুবর্ণছড়ি হস্তে তোমাকে এ স্থানে পাহারা দিতে দেখিয়াছি।"

এইরূপ মহা আবেশে ঠাকুর মন্দির হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ির নীচে মুক্তিমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। পাণ্ডা, পরিহারি, ছড়িদার, ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণে স্থান জনাকীর্ণ হইল। সকলেই ঠাকুরের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল। পাণ্ডারা ৫০০ টাকা চাহিল। ঠাকুর দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কপর্দকও ছিল না। সরলনাথ মন্দিরের বাহির হইতে নিজ পরিধান বস্ত্রের এক কোণে সিকি দোয়ানী আনিয়াছিল, তাহা দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল। আবার তিনি বাহির হইতে ঐরূপ সিকি দুয়ানী আনিলেন। তাহা দিতে দিতে মন্দির হইতে ঠাকুর বাহির হইতে লাগিলেন। বহু জনতার ভিতরে গুরুভ্রাতারা

তাহাকে ঘেরিয়া লইয়া চলিলেন। আজ যে বাহা প্রার্থনা করিল, তাহাই পাইল এবং বাহাকে দিতে পারিলেন না ভবিষ্যতে দিতে স্বীকৃত হইলেন

ত্রিশ টাকার সিকি দোয়ানী মুক্তিযুগের সম্মুখে নীচে বসিয়া দিলেন, পরে কাহাকে পাঁচ টাকা দশ টাকা, কাহাকেও ৭৫ টাকা দিলেন। অনেকক্ষণ পরে উঠিলেন। বেণী ব্রজবাসী বলিল ৭৫ টাকার কম লইবে না। ঠাকুর ৫০ টাকার কথা বলিয়া দাদাগোঁসাইকে বলিলেন, “কেমন যোগজীবন, ইহাকে ৭৫ টাকা দিতে পারিবে?” যোগজীবনদাদা বলিলেন, “তুমি ইচ্ছা করিলে সবই হয়।” তখন ঠাকুর বলিলেন, “তুই কিছু ভাবিস্ না। মনে সম্ভাব রাখিলে, যা ইচ্ছা করিবি তাই হবে।” দাদাগোঁসাই ভাবে গদগদ হইয়া ঠাকুরের চরণধূলি লইলেন। কিছু অগ্রসর হইলে একজন বস্ত্র চাহিল; সরলনাথ নিজের গাত্র হইতে শীতবস্ত্র-খানা দিলেন। ঐ সময় নানা জনে নানা প্রার্থনা করিতে লাগিল; কেহই বঞ্চিত হইল না। আমাদের পাণ্ডা ঠাকুরকে ৬০ টাকা দিয়া একখানা গাত্রবস্ত্র দিতে আদেশ হইল। মন্দির হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া ‘বড়ছাতার’ সীতারাম দর্শন করিয়া তথায় ৫ টাকা ভোট দিলেন। পরে বাসায় আগমন করিলেন। আজ অনেকে পট্টবস্ত্র, সাধারণ বস্ত্র প্রভৃতি পাইলেন। দু’টাকার পয়সা ভাঙাইয়া হাতে হাতে দিতে না পারিয়া লুট দিলাম। আজ নগদ ও বাকীতে ৪০ টাকার কম ব্যয় হয় নাই।

বাসায় আসিয়া একরূপ ব্যাপারের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, “শ্রীশ্রীগঙ্গাথদেব আজ গোবিন্দজী হইয়া রাখাল-বালকদের সহিত গোচারণ করিতেছেন, আবার কিছু পরে তিনি রাজরাজেশ্বর হইয়া যে বাহা চাহিতেছে তাহাই দু’হাতে বিলাইতেছেন দেখিলাম। জগন্নাথদেব হাসিয়া হাসিয়া স্পষ্টভাবে বলিলেন, “আজ যে বাহা চাহিবে যত পারিস্ দে।”

আমি তাঁহার আদেশ প্রতিগালন করিয়াছি মাত্র ।” ঠাকুরও দিকবিদিক না চাহিয়া যে বাহা চাহিল, তাহাই দিতে লাগিলেন ।

সারাদিনই অপূর্বভাবে বিভোর ছিলেন, রাত্রিকালে ঐ কথাই বলিলেন । আজ একজন পাণ্ডা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পদ্মবেশের দুইখানি কর্ণভূষণ আনিয়া দিলেন । ঠাকুর উহা তাঁহার জগন্নাথদেবের বিগ্রহের উপরে টাঙ্গাইয়া রাখিতে আদেশ করিলেন । রাত্রে ডাকের সুপারি-টেণ্ডেণ্টবাবু আসিলেন, কীর্তন খুব জমিল । সরলনাথ ও অমৃতের দুই ভাব হইল । সরলনাথ নাচিয়া নাচিয়া করতাল বাজাইয়া অগ্রপশ্চাৎ হইয়া নৃত্য করিলেন । আজ পরলোকগত সতীশ ও স্বামিজী সন্দেহই ছিলেন, ঠাকুরের মুখে শুনিলাম ।

২রা ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল ।

আজ জগন্নাথবল্লভ মঠে মহাবীর দর্শন করিয়া কোণে যে অস্ত্র এক মহাবীর আছেন তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন । আজ আমার মুকুল দর্শন করিবেন বলিয়া বাহির হইয়াছিলেন । একটি ছেলের পৈতা দেওয়ায় জন্ম ৫ টাকা দিলেন । অস্ত্র এক ব্যক্তিকে পাঁচ টাকা দেওয়া হইল এবং এক পাণ্ডা জগন্নাথদেবের ‘দস্তকাঠ’ দিয়া আট আনা পাইলেন । মহাবীরের নিকট যে ‘পা-কাটা বাবাজী’ আছেন তাঁহাকে একখানা রেশমী বস্ত্র ও চাদর দেওয়াইলেন । মহাবীরের পূজারীকে ঐরূপ একখানা চাদর দেওয়া হইল । পূর্বের দিন পূজারী ঠাকুর কেবল রেশমী বস্ত্র পান । উহার খুব খুসী হইয়াছেন । মালীকে ১ টাকা দিতে বলিলেন । একটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষকে একখানা গামছা কিনাইয়া দেওয়াইলেন । ‘হরেকৃষ্ণ’ ‘রাধাকৃষ্ণ’ বাবাজী লাল বিলাতী কঞ্চল ও মহাবীরের পূজারী ও অস্ত্র একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক একটি টাকা পাইলেন । আগামী কল্য সরস্বতী পূজা, আবীর, আমার মুকুল, যবের কি ধানের শীষ সংগ্রহ করিয়া

রাখিতে বলিলেন। রাত্রিকালে বাগানের গালী একটা উৎকৃষ্ট কেতকী ফুল আনিয়া দিল, ঠাকুর উহার প্রশংসা করিলেন এবং উহাকে যে এক টাকা দেওয়ার কথা ছিল তাহা দেওয়া হইল।

বসন্তপঞ্চমী

৩রা ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ বসন্তপঞ্চমী। ঠাকুর ৬।০টায় উঠিয়া পায়খানায় গেলেন। মন্দিরে বাইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া পূজায় বসিলেন। আজ নানা ফুলে জগন্নাথদেব, বলদেব, স্তম্ভদ্রামায়ী প্রভৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের যন্ত্রমূর্তি সাজাইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে আবীর দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রায়নার মূর্তিতেও আমের মুকুল, কেওয়া ফুল ও তুলসী চন্দন দেওয়াইলেন। এইরূপে তুলসীকে ও গ্রন্থসাহেবকে সাজাইলেন; নিজের আসনে ও বক্ষে, মাখার জটাতে আবীর দিলেন। আমার সাহস হইল না যে চরণে আবীর দেই, কিন্তু উনি জটাতে আবীর দিতেছেন দেখিয়া উভয় চরণে ও জটাতে আবীর দিয়া সাত্ত্বিক প্রণাম করিলাম।

অতঃপর চা পান করিয়া বাহির হইলেন। মন্দিরে বাইতে দুইটি ছেলে পৈতার জন্ত ভিক্ষা চাহিলে ২ টাকা দিলেন এবং অল্প এক ব্যক্তিও দুই টাকা পাইল। চারিজন ধুতি চাদর পাইলেন। কেহ কেহ শুধু কাপড় পাইল। বেণীকে তসরের জোড় দেওয়া হইবে। হরেকৃষ্ণের খুড়া ২৫ মূল্যের বস্ত্র ও একজন ছড়িদার উর্ণা বস্ত্র ও চাদর পাইলেন। মন্দির ঘুরিয়া আসিতে আসিতে আবার চারিটি বালক ধুতি ও চাদর ও পাঁচটি শুবক বোয়াই চাদর ও অল্প একজন ধুতি চাদর পাইলেন, আর কাহাকে রেশমী বস্ত্র দিলেন।

জগন্নাথবল্লভ মঠের মহাবীরকে ঠাকুরের মানসিক পূজা দান

ঠাকুর বাসায় ফিরিয়া জগন্নাথবল্লভ মঠে মহাবীরের নিকট বানরবধ নিবারণের জন্য মানসিক পূজা দর্শনে আসিলেন। স্থানটি অতিশয় মনোহর। স্থানীতল বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া শরীরে ও মনে আনন্দ দিতে লাগিল। মহাবীরের ভোগের জন্য, একটি ব্রাহ্মণ পূজারী কলা ছাড়াইতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মহাবীরের পূজারীর ত্রায় রেশমী বস্ত্র দিতে বলিলেন। এক ব্যক্তি মহাবীরের নিকট পাঠ করিতেছিলেন, ‘পা-কাটা’ বাবাজীর পরামর্শে ঠাকুর তাঁহাকেও রেশমী বস্ত্র দিতে বলিলেন। উদ্ভানের মালী কয়েক ছড়া বক ফুলের ও কয়েক ছড়া গাঁদা ফুলের মালা আনিয়া দিল। উহা লইয়া মহাবীরকে সাজান হইল। মালীকে এক জোড়া দেশী ধুতি চাদর ও আট আনা পয়সা দিতে বলিলেন। আরও ৪।৫ জনকে ধুতি চাদর দিতে আদেশ হইল। উহাদের মধ্যে একজনকে রেশমী বস্ত্র ও চাদর দিতে হইবে। দুই টাকার পয়সা একজন ছড়িদারের হস্তে দিয়া জগন্নাথ-বল্লভ মঠের বাহিরে বড় রাস্তায় কান্ধালীদিগকে দান করা হইল। পূজা দেখিতে আশ্রমস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই গিয়াছিলেন। পূজার পর সকলে ‘পেড়া’ প্রসাদ পাইলেন। অস্থিনী আশ্রমের পাহারায় ছিল।

ঠাকুর আজও বলিলেন, “এই পূজা মহাবীরের নিকট যে দিন মানদ করিলাম, তার পর দিনই ‘বানরবধ’ বন্ধের অনুমতি হইল। মহাবীর প্রকাশ হইলে বলিলাম, “ঠাকুর, প্রায় সবই ত মারিয়া ফেলিয়াছে, এখন ইহাদিগকে রক্ষা করুন।” ঠাকুর বাসায় আসিয়া মহাবীরের প্রসাদী কলা হইতে একটি চাহিয়া খাইলেন। ‘ফতে মহাবীর’ হইতেও প্রসাদ আসিল।

বেণী ব্রজবাসী তাঁহার বাবার জন্ত রেশমী বস্ত্র ও চাদর লইলেন, উহার মূল্য ১৮ টাকা। দীনবন্ধু ও হরেকৃষ্ণের ছড়িদারকে ঐরূপ বস্ত্র দেওয়া হইল। পরণ দিবস হইতে যেন একটি শ্রোতের মত উৎসব চলিতেছে। দানে প্রত্যেকেরই আনন্দ; কোনরূপ সঙ্কোচ নাই। দাদাগৌসাইও বলিলেন, “এ যেন একটা উৎসব চলিতেছে। দানে বড়ই আনন্দ হইতেছে। ঋণ পরিশোধের কোন চিন্তাই আসিতেছে না।” ঠাকুরও বলিলেন, “তাহাই।” হরেকৃষ্ণের মাতা ও পরিবারস্থ কাহাকে কাহাকে বস্ত্র দিতে দাদাগৌসাই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর বলিলেন, “আমিও তিন চার বার এরূপ ভাবিয়াছি। কিন্তু ভিতরে চাহিয়া দেখি সব অন্ধকার। বরং যাওয়ার সময় চেষ্টা করিও। বাহাকে বাহাকে দিতে বলেন তাহাকেই দেওয়া হয়। আমি কিছুই করি না। স্পষ্ট ভিতর হইতে হুকুম আসে। আমার কি সাধ্য কাহাকে কিছু দিতে পারি।”

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রার্থনা

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ মন্দিরে সিংহদরজা পর্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পথে একটি কাণা জ্বীলোককে একখানা এদেশী বস্ত্র ও ‘টিনদাস’ বাবাজীকে একখানা কঞ্চল দেওয়াইলেন। পথে তিনটি সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা গত কল্য কঞ্চল লইয়াছিল। অল্প পুনরায় অল্পবেশে ভিক্ষার্থী হইল। ঠাকুর তাহাদের কণ্ঠস্থেরে চিনিতে পারিয়া ভৎসনা করিলেন। ব্রজবাসী বেণীর সঙ্গে আজ শ্রীবৃন্দাবনের অনেক কথাবার্তা হইল। আজ একটি ব্রাহ্মণ বলিলেন, “ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মিকট প্রার্থনা করেন, তাঁহার যেন বংশ সোপ হয়। বংশ থাকিলে বংশধরেরা এই জগন্নাথদেব আমাদের পিতৃগুরুষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গৌরব করিবে।”

সন্ধ্যাকালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তিনি সত্য-সাক্ষী, পতিব্রতা কামিনী।

অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব তিথি

ভুবনেশ্বর মহাদেবের আগমন

৫ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ মাঘী শুক্লা সপ্তমী। এই তিথিতে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভোর চারটার সময় শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া আসিয়াই ঠাকুর ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, “দেখ দেখি পদকল্পতরুতে অদ্বৈত প্রভু আবির্ভাব সম্বন্ধে কোথায় কোন্ পদ আছে?” ব্রহ্মচারী বাহির করিয়া রাখিল। ভোরে প্রাতঃকালীন ভজ্ঞন শেষ করিয়া বিধুবাবু নলিত প্রভৃতিকে ঐ গানটি গাহিতে বলিলেন। এই সময় মঠের বাবাজীরা আসিয়া যোগ দিলেন। একজন গৈরিকধারী বাবাজী খোল বাজাইতে লাগিলেন। পদকল্পতরু হইতে দুই একটি গান করিয়া বিধুবাবু অল্প গান আরম্ভ করিলেন। গান বেশ জমিয়া উঠিল। ঠাকুর নৃত্য করিলেন। একটা প্রবল ভাবের শ্রোত বহিতে লাগিল। অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর বসিলেন। ঐ সময় ডমরুধারী রুদ্রাক্ষ বিভূষিত একজন ব্রহ্মচারী হঠাৎ আসিয়া ডমরু বাজাইতে বাজাইতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কতক্ষণ পরে পুনঃপুনঃ ঠাকুরের চরণে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। কখন বা ঠাকুরের পা টিপিয়া দিতে লাগিলেন, কখন কোমর জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন আবার কখনও বাম চক্ষুতে ঠাকুরের পদাঙ্গুলি স্পর্শ করাইয়া ভাবের সহিত নমস্কার করিতে লাগিলেন। উহার ভাব দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল, যেন ঠাকুরের কত কালের পরিচিত বন্ধু। সকলেই ইহার বিশেষ দেখিয়া “ইনি কে?” জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি যাইতেছেন

দেখিয়া দরজার নিকট বাইয়া পদধূলি লইলাম। কি জানি কোন মহাপুরুষই বা ঐ বেশে আসিয়া থাকিবেন। ইহাকে পুরীতে কদাচ দেখি নাই। আশ্চর্য্য, বাহির হইলেন, আর নাই। পরে ঠাকুর বলিলেন, “ইনি ভুবনেশ্বরের মহাদেব। ঐ বেশে আসিয়াছিলেন।”

মঙ্গুমঠে বস্ত্রদান : লোকনাথ মহাদেবের আগমন

অতঃপর প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর চা খাইয়া বাহির হইলেন। পূর্বেই বহু লোক দরজায় জড় হইয়াছিল। এখন ঠাকুর বাহির হওয়ামাত্র বহু লোক পিছনে পিছনে ছুটিল। পূর্বেই বৃহস্পতিবার কাপড় দেওয়া হইবে রাষ্ট্র হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে মঙ্গুমঠের ভিতর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, দীন দুঃখীদিগকে বন্ধ করা হইল। বহু লোক হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও অপর জাতির ছেনেপিলেই ষাট জন। ঐ মঠের পার্শ্বে ঠাকুর, পান্না, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিধুবাবু প্রভৃতি একটা কাপড়ের দোকানের বারান্দায় বসিলেন। সরলনাথ উহার ভিতর বসিয়া সকল যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন। আমি দুই-একজন লোকের সাহায্যে কাপড় পৌছাইতে লাগিলাম। ঐ স্থানে অশ্বিনী ও জগদ্বন্ধুবাবু কাপড় বিলি করিতেছিলেন। বিশ্বাস মহাশয়, দাদাগাঁসাই, অমৃত ও ব্রহ্মচারী পাহারা দিতেছিলেন। কখন কখন বেতহাতে করিয়া, দাদাগাঁসাইকেও লোক তাড়াইতে হইয়াছে। লোকের এমনি সংঘট্ট হইল যে বারজন ছড়িদার, সাতজন পুলিশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই সাতজন পুলিশ না থাকিলে কখনও কাপড় বিলি করা বাইত না। সমস্ত লুট হইত। তাহাদের কেহ আহ্বান করিয়া আনে নাই। ভগবৎ রূপায়ই তাহাদের আগমন হইয়াছিল। প্রায় ৬০০ টাকার কাপড় দান করা হইল। উপস্থিত ব্রাহ্মণ, ছড়িদার ও পুলিশদিগকেও ধুতি দেওয়া হইল। অশ্বিনীবাবু ও জগদ্বন্ধুবাবু লোকের সংঘটে কিছু আঘাত

পাইলেন। দোকানও নুটের উপক্রম হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য, এক ব্যক্তি একখানা বস্ত্রের জন্ত খুন করিয়া জেলে বাইতেও স্বীকার। পরে ঠাকুর বাসায় আসিলেন।

হরিদাস ঠাকুরের মঠে অষ্টমত প্রভুর বিগ্রহের জন্ত 'রায় মহাশয়' খুঁচি চাদর পাইলেন। বহু লোক দরজায় আসিয়া জড় হইল। আজ 'জগৎনাথ বল্লভের' বাবাজীদের এখানে নিমন্ত্রণ। তাহাদিগকে এক আইটুক প্রদান ডাল তরকারী পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

সন্ধ্যার পর পুনরায় কীৰ্ত্তনে ভাবের স্রোত বহিল। ঠাকুর, সরলনাথ, বিধুবাবু প্রভৃতি নৃত্য করিলেন। মঠের বাবাজীরা আসিলেন। একজন খোল বাজাইলেন। "ভালী গোরাচাঁদের আরতি বলি" এই গান হইতে লাগিল। এই সময়ে একটি সন্ন্যাসী কীৰ্ত্তনে যোগ দিলেন। তিনি ঠাকুর ও শ্রীধরের হাত ধরিয়া খুব নৃত্য করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি লোকনাথে থাকি। সেখানে গেলে আমাকে দেখিতে পাইবে। আমার কি সেখানে দেখ নাই? আমি কেবল দুধ খাই।" ঠাকুর পরে বলিলেন, "ইনি স্বয়ং লোকনাথ। ঐ বেশে আসিয়াছিলেন।"

৬ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুরের জ্বর হইয়াছে। বাহির হইলেন না। লোকের ভিড় বাসার সম্মুখে খুব গোলমাল হইতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর একজন তাড়ান হইতে তখনই আর একদল আসিয়া উপস্থিত। সারাদিন লোকের জালায় অস্থির। মন্দিরে কোন প্রয়োজনে গেলাম। যেই দেখে, লোকের বলে, "এত বস্ত্র দিলা, আমি পাইলাম না।" কেহ নিজে পাইয়া থাকিলে বিগ্রহের জন্ত চায়। রাত্রিকালে জগৎবাবু, কিশোরীবাবু ও পুলি ইন্সপেক্টর নারায়ণবাবু আসিলেন। নারায়ণবাবু ঠাকুরের বহুদিনের বন্ধু দীনবন্ধুবাবুর পুত্র। অনেক কথাবার্তা হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

৩০৫

জগন্নাথদেব স্বয়ং ব্রহ্ম

৭ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের অর। বাহির হইলেন না। কাণা, আতুর, খোড়া প্রভৃতিকে দেওয়ার জন্ত ছাব্বিশখানা কাপড় গোপনে বন্ধু ও কিরণদের দেশীয় একটি গুরুভাইকে দিয়া বিতরণ করা হইল। আজও লোকের সংঘট্ট কম নয়। রাত্রিকালে বড়পাণ্ডা ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “মনে করিও না, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ঐ কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত মূর্তি। ভগবান স্বয়ংই এরূপ ধারণ করিয়াছেন। যেমন বাষ্প জমাট হইয়া বরফ হয়, তজ্জপ ব্রহ্ম ঘনীভূত হইয়া ঐরূপ হইয়াছেন।”

দানযজ্ঞ : মহাবীরের কৃপা

৮ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর মন্দিরে গেলেন। বাসার দরজায় লোকে লোকারণ্য। কেহ বলে “কাপড় দাও,” কেহ বলে “ছেলেকে পৈতা দিয়া দাও।” কেহ বলে “ঠাকুর, সেবার জন্ত রেশমী বস্ত্র দাও।” লোকের ভিড় ঠেলিয়া যাইতে বড়ই ক্লেশ হইল। মন্দিরে ঢুকিলেন, সেখানেও লোকের ভিড়। আজ দর্শনের সময় নীরবে, একদৃষ্টে দর্শন করিয়া ঠাকুর অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বাহির হইয়া একটি পূজারীকে রেশমী কাপড় ও চাদর দিতে বলিলেন। একটি অন্ধ ও অপর দুইটি লোককে ধুতি চাদর দিলেন।

আজ বড়ছাতার মোহন্তকে, জগন্নাথদাস বাবাজীকে ও মন্দিরের

কাশী-বিশ্বেশ্বরের পূজারীকে রেশমী বস্ত্র দিতে আদেশ করিলেন। মোহন্তজীদের ২০ টাকা করিয়া ছুইখানা ও পূজারী ঠাকুরকে ১১ টাকার একখানা কাপড় দেওয়া হইল। গত কল্যের বড়পাণ্ডাকেও ১৫।১৬ টাকার একজোড়া ধুতি চাদর দিতে আদেশ হইল। আজ মন্দিরের পুলিশ প্রভৃতি কর্মচারী সকল মহাপ্রসাদ আনিয়া ঠাকুরকে ভেট দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধানকে ১৩।০ টাকার ও তাঁহার সহকারীকে ৯ টাকা মূল্যের এক একখানা গরদের ধুতি আনাইয়া দিলেন। অবশিষ্ট ২৫ জনকে ২৫ জোড়া ধুতি চাদর দেওয়াইলেন। ধুতি ও চাদর খুব ভাল ছিল। তাহারা পাইয়া বড়ই সম্বষ্ট হইল। খুসী হইয়া বলিতে লাগিল “ইনি স্বার্থহীন দাতা। কর্ণ, পরশুরাম দান করিয়াছিলেন, আর ইনি করিলেন। কত রাজা মহারাজা আসে, এরূপ কেহ করিবে না।” হরেকৃষ্ণের দুই ভগিনীকে ও গন্ধাধর খুটীয়ার স্ত্রীকে ৩৪ টাকা করিয়া এক-একখানা গরদের শাড়ী, হরেকৃষ্ণের ছোট ভ্রাতাকে ৩৬ টাকার ও অত্যাগত ভ্রাতা ও গন্ধাধরের ছেলেকে ১৬।১৭ টাকার গরদের ধুতি দেওয়া হইল। আর প্রায় ৫৫০ টাকার কাপড় বিতরণ হইল।

রাত্রিতে স্বপ্ন দেখি, খুব কীৰ্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে ভাবের উচ্ছ্বাসে বিধুবাবু একটি ছোট মর্কট হইলেন। আমি উহার দৈর্ঘ্য মাপিলাম। প্রায় সওয়া হাত হইল। বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইল। মাথায় আবার মর্কট হয়! আমি পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। নিকটে একটি প্রদীপ ছিল, তাহাতে যেন গায়ের রোম না পোড়ে একটু সতর্ক হইলাম। অত্য়দিকে মুখ ফিরাইতেই, অমনি মর্কটটি বিধুবাবু হইলেন। আমিও জাগিলাম। ঠাকুরকে এ সম্বন্ধে তখনই জানাইলে, তিনি বলিলেন, “মহাবীর কৃপা করিয়া তোমাকে ঐরূপ দেখাইয়াছেন। বিধুতে মহাবীরের অংশ আছে।”

ত্রয়োদশ অধ্যায়

৩০৭

৩সতীশের মহাপ্রসাদী খাজা গ্রহণ

৯ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

রাত্রি সাড়ে বারটার সময় ঠাকুরের ঔষধ সেবনান্তে একটু মিষ্ট মুখে দিবার জন্ত একখানা রেকাবে করিয়া মহাপ্রসাদী লাড্ডু ও খাজা ব্রহ্মচারী লইয়া গেল। উহা ঠাকুরের সম্মুখে রাখিবার সময় হঠাৎ শুধু খাজাখানা দুই তিন হাত তফাতে বাইয়া ছুটিয়া পড়িল। ব্রহ্মচারী অপ্রস্তুত হইয়া দাড়াইয়া রহিল। ঠাকুর ঈষৎ হাসিমুখে একটু উর্দ্ধদিকে তাকাইয়া ব্রহ্মচারীকে কহিলেন, “আর একখানা খাজা আনিয়া দাও।” ব্রহ্মচারী খাজা দিয়া ভাবিতে লাগিল, ‘গোল লাড্ডু রেকাবে যেমন তেমনই রহিল—একটুও নড়িল না—অথচ খাজাখানা কি প্রকারে অত দূরে পড়িল।’ ব্রহ্মচারীর ভাব বুঝিয়া ঠাকুর বলিলেন, “তোমার কোন অসাবধানতায় ওরূপ ঘটে নাই। সতীশ আসিয়া খাজাখানা খাবা মারিয়া লইয়াছেন। কল্য সমুদ্রে বাইয়া ঐ খাজাখানা উহাকে স্মরণ করিয়া নাম গোত্র বলিয়া দিয়া দিও। স্বামিজীকেও (দেবেন্দ্রপ্রসাদকে) একখানা দিও। এই মহাপ্রসাদের জন্ত কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব লালায়িত!”

রাখালবাবুর মহাপ্রয়াণ

১০ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অস্থস্থ। বিশেষতঃ দারুণ রোজে বাহির হওয়া বড়ই ক্লেশকর। আজ পাঁচজন জগন্নাথদেবের পূজারীকে ১৮ টাকা দামের এক-একখানা গরদের ধুতি দিয়া মর্যাদা করিলেন। চারি সম্প্রদায়ের ছয়জন মোহন্তকেও ঐরূপ ধুতি ও তাহাদের অধীনস্থ আটজন ছড়িদারকে ধুতি চাদর দিলেন। অত্যাশ্র পূজারীদের মর্যাদার জন্ত পূর্বে ১০ টাকা

দিয়াছিলেন। আজও ২৫ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। স্বর্গদ্বারী ঘাটের প্রাঙ্গণে কার্যের পুরোহিত গরদের ধূতি চাদর পাইলেন।

আজ রাখালবাবুর মৃত্যুসংবাদ আসিল। ঠাকুর বলিলেন, “বধূ বৃহস্পতিবার কাপড় বিলি হয়, তখন বটগাছটির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, একটি জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এ কি! শ্রীমদ্রাবনের লীলা হইতেছে? এদিকে রাখালবাবু দাঁড়াইয়া ষোড়হস্তে কি প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথমতঃ উহা অন্তরূপ মনে করিলাম। পরে দেখিলাম যথার্থই ‘রাখাল’ চলিয়া গেল।” কিশোরীবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মৃত পিতার পাপের জন্য পুত্র কি করিতে পারে?” ঠাকুর বলিলেন, “কুচ্ছু চান্দ্রায়ন কিংবা তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট—গয়ায় পিণ্ডদান।”

গৌরান্ধদেব সম্বন্ধে কথা

১১ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অস্থস্থ। নিয়মিত কার্য যথামত চলিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এদেশী দুইটি লোক দর্শনে আসিলেন। একটি পণ্ডিত আজ দুই তিন দিন যাবৎ ঠাকুরকে বেদান্ত শুনাইতেছেন—“আপা নিত্য পদার্থ, কেহ কেহ বলেন সৃষ্ট।” সেদিন তাঁহাকে একটা টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন, “আপনার যৎকিঞ্চিৎ মর্যাদা একখানা রেশমের ধূতি ও চাদর কিছুদিন পরে দিব।” আজও পণ্ডিতটি অভাব জানাইলেন। দাদাগোঁসাই ১ টাকা দিলেন। এই পণ্ডিতটি মহাপ্রভু সম্বন্ধে সুন্দর গল্প করিলেন। “চৈতন্যঠাকুর ষড়ভুজ দর্শন করাইয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথদেবের অবতার। রাজা এ কথা বিশ্বাস করে না। রথের নদ্য রথ দর্শন করিয়া চৈতন্যঠাকুর সমুদ্রের পারে যাইয়া বালির রথ তৈয়ারী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজার রথ অচল হইল। কত

হাতী পালোয়ান দিয়া চালাইতে চেষ্টা হইল কিন্তু রথ চলিল না। তখন রাজা 'ধনুগা' দিল। দু'দিন পরে আদেশ হইল "আমি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। তুই তাঁহার মর্যাদা করিস্ নাই। তাই রথ অচল হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে বাইয়া রাজা ভূমে পড়িয়া কত অহুনয় করিয়া চৈতন্যঠাকুরকে রথের নিকট আনিল।

যেই তিনি আসিলেন অমনি রথ আপনা আপনি ছুটিতে লাগিল। রাখাকান্ত মঠ প্রসিদ্ধ মঠ। এই স্থানে চৈতন্যদেব অনেক লীলা করিয়াছেন।

ভক্তি গোপনীয়

১২ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ 'মাঠাকুরাণীর' তিরোভাব তিথি। নিত্যানন্দ প্রভু এই দিনে আবিভূত হন। দাদাগৌসাইর ইচ্ছা ছিল, আজ দরিদ্রদিগকে অকাতরে উৎকৃষ্টরূপে ভোজন করান। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা হইল না। সামান্য দুই আইটুকা মহাপ্রসাদ ও ডাল তরকারী বিতরণ হইল। ঠাকুর আজ অনেক কথা বলিলেন। "ভক্তিকে রূপণের ধনের ন্যায় গোপনে রাখিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা যুবতীর স্তনের সহিত উহার উদাহরণ দিয়াছেন। কণ্ঠা অবস্থায় মেয়েটি নেংটা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যুবতী হ'লে স্তন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে। পিতামাতা গুরুজন কেহ তাহা দেখিতে পায় না। যুবতী কেবল স্বামীর নিকটই উহা প্রকাশ করে। তদ্রূপ ভগবান ব্যতীত সকলেরই নিকট ভক্তি অতি সন্তুর্পণে গোপনে রাখিবে। প্রথম প্রথম যখন ভাবের উচ্ছ্বাস হইল, একটু চোখ দিয়া জন পড়িল, অমনি ভাবিতাম, লোকে দেখুক। পরে দেখি, কি করিয়া ইহা গোপন করিব। স্বপ্নের অতি নিভৃত স্থানে ইহা গোপন করিতে ইচ্ছা হইত।"

ঠাকুরের দেশীয় ভাবে শিক্ষার প্রশংসা

১৩ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর তত সুস্থ নহে, তবে অপেক্ষাকৃত ভাল। আজ বানরের কলা আসে নাই। বানরদের ক্রেশে ঠাকুর বড় অস্থির হইলেন। দু'বার লোক পাঠাইয়া কলা আনা হইল। বন্ধুর মাথা খারাপ হইয়াছে। সে বানরদের জন্ত চারি আনার পচা কলা আনিল। আর বানরদের নিকট টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'যা কলা খাগে যা।' ঠাকুরের নিকটও এক টাকা বানরের কলার জন্ত ছিল। ঠাকুর উহা একটি ব্রাহ্মণকে দিতে বলিলেন।

বৈকালবেলা ছয়টি ছোট ছোট এদেশী বালক গুরুমহাশয়ের সহিত পাণ্ডার গোমস্তা দীনবন্ধুকে লইয়া আসিল। ইহারা উড়িয়া ভাষায় জগন্নাথদেব, মহাদেব ও গণেশ প্রভৃতির বন্দনা গান করিল। বালকদের গলায় তিন চারি লহর হার, কর্ণে কুণ্ডল, মাথায় বুঁটি বাঁধা। ইহাদের মধ্যে একটি হরেকৃষ্ণের ভাই। অল্প কয়জনও তাহাদের নিকটস্থ আত্মীয়। ঠাকুর দেখিয়া বড় আনন্দ করিয়া বলিলেন, "এরূপভাবে ত্রীপঞ্চমীর গান আগাদের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। শান্তিপুরে ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, কিছু ছিল, তবে অগুরুপ। ইহাদিগকে ইংরাজী পড়াইলে অর্থ আনিতে পারিবে বটে, কিন্তু দেশীয় ভাবে এরূপ শিক্ষায় সুখী হইতে পারিবে। শিশুকালে যে সকল ছাপ হৃদয়ে পড়ে, তাহা প্রায় উঠে না। এই সকল শিক্ষায় বিশেষ উপকার হইবে। সারাজীবন কার্য্য করিবে।" ঠাকুর ইহাদিগকে ৫ টাকা দেওয়াইলেন।

১৪ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আগামী কল্য পর্য্যন্ত ঠাকুর বাহির হইবেন না বলিলেন। আজ

বাসায় মুন্সেফবাবু, স্বরেনবাবু প্রভৃতির সপরিবারে নিমন্ত্রণ। কানিকা পিঠা ও অন্নাগ্নরূপ মহাপ্রসাদ সোয়ারের দ্বারা আনাইলেন। বড়ছাতার মোহন্তের গুরুভাই অনেক ধর্মকথা বলিলেন। সোয়ার তাহার ছেলেটিকে লইয়া আসিয়াছিল। খুব উৎকৃষ্ট গরদের ধুতি চাদর ছেলেটিকে খরিদ করিয়া দিতে বলিলেন। ছেলেটি বড়ই স্নানক্ষম। ঠাকুর উহার প্রশংসা করিলেন। সন্ধ্যার সময় যে পণ্ডিতটি এখানে পাঠ করেন, তাঁহাকে গরদের ধুতি চাদর দেওয়াইলেন।

জগন্নাথদেবের সৌন্দর্য্য দর্শন : দীনতা

১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর সুস্থ নহে। বৈকালে পণ্ডিতজী ও পশ্চিমা সাধুটি অনেক ধর্মকথা বলিলেন। পণ্ডিতজী বেদান্ত পাঠ করিলেন। রাত্রিকালে মন্দিরে গেলাম। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অপার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। বস্তুতঃ তাঁহার মুখমণ্ডলের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের সহিত পৃথিবীর কোন বস্তুই তুলনা হয় না। একবার সুন্দরী জীলোকের মুখ কল্পনা করিলাম; কিন্তু উহা প্রাণে স্থান পাইল না। কত শত উজ্জল শ্বেতবর্ণ হীরকখণ্ড যেন তাঁহার শিরে, কপালে ও অন্নাগ্ন স্থানে জলিতেছে। এই রূপ পরে চেষ্টা করিয়াও মনে আনা যায় না। গুরুদেবের নিকট গত দুই দিন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, 'এ রূপ যেন মনে থাকে।' অতঃপর যে রূপ দর্শন করিলাম, তাহা মনে হইলেও প্রাণ শীতল হইয়া যায়।

মুন্সেফবাবুর সঙ্গে দীনতা সম্বন্ধে কথা হইল। ঠাকুর বলিলেন, "উহা ভিতরের বস্তু। উহা হৃদয়ে আসিলে মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।" একবার ঠাকুর একটি মুসলমান মুটিয়ার পা ধরিয়া সাষ্টাঙ্গ দিয়াছিলেন।

ঐ লোকটি “বাপ”, “বাপ” বলিয়া ঠাকুরকে চক্ষের জলে ভাসাইলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন, যেন কত দিনের পরিচিত বন্ধু। ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে বাঁকাধারী মুটিয়া, তৎপরে দেবমূর্তিতে দর্শন করিয়াছিলেন। বার বার ঠাকুর এইরূপ দেখেন। মুটেটি বলিল, “যিনি রাম, তিনিই রহিম, তিনিই কৃষ্ণ। ভগবান সকলেরই এক।” ঠাকুর বলিলেন, “বস্তুতঃ দীনভা আসিলে সমস্ত জীব হইতে নিজেকে হীন বলিয়া বোধ হয়।”

শান্তিদিদির পূজা

১৬ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর বাহির হইবেন। তাই সকালে উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোথায় যাইবেন?” তিনি বলিলেন, “কি করিয়া বলিব? যে দিকে লইবেন, সেই দিকেই যাইব।” পূর্বে একদিন শান্তিদিদি ঠাকুরকে পূজা করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। ঠাকুর এড়াইতে চেষ্টা করিলে ঠিক একটি খুকীর মত অতি মিষ্টভাবে বলিয়াছিলেন, “আমাকে ফাঁকি দিও না কিম্বা।” আজ অনেক করবী ও অগ্ন্যাগ্ন ফুল থালা ভরিয়া আনিলেন। সেখানে অগ্ন কেহ উপস্থিত ছিলেন না। ঠাকুর আমাকেও অগ্ন ঘরে যাইতে বলিলেন। আমি বারান্দা পরিষ্কার করিতে গেলাম। শান্তিদিদি ঐ সকল পুষ্প-চন্দন দ্বারা মনের সাধে ঠাকুরকে পূজা করিলেন। পরে ঠাকুর ‘চা’ খাইয়া বাহির হইলেন।

দুইজন পাণ্ডাকে ১৩।০ ও ৯ টাকার গরদের ধুতি চাদর দেওয়া হইল। একটি ব্রাহ্মণের ছেলে বলিল, “আমার বাপ নাই, মা নাই, কেহ নাই। এত লোক ধুতি চাদর পাইলেন, আমি পাইলাম না।” ঠাকুর তাহাকে সন্ধ্যামন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কিছু বলিয়া আর জানে না বলিল। উহাকে ধুতি চাদর দেওয়া হইল। তৎপরে দক্ষিণ দ্বারের প্রকাণ্ড

মহাবীরের সেবক সাধুটিকে ধুতি চাদর ও উত্তর দ্বারের কোমরে ডুরি-বাঁধা সাধুটিকে এবং একটি পূজারীকে ঐরূপ বস্ত্র দিবেন বলিয়া চলিতে লাগিলেন। ডুরিওয়ালা সাধুটি কিছুই চাহেন নাই। ঠাকুরের মুখের দিকে তাকাইয়া “গুরু মহারাজ” বলিয়া পদধূলি লইলেন ও “ভজনই সার” বলিয়া ষোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে সঙ্গীয় অনেককে ২২ চৈত্র ধুতি চাদর দিবেন বলিয়া বাসায় ফিরিলেন। ছড়িদারদিগকে ২ ও অন্য ব্যক্তিকে কিছু দিবেন বলিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। মন্দির প্রদক্ষিণ কালে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, “জম্মুর রাজা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিল, কিন্তু এমনটি আর কেহ করিবে না।”

ভগবান সহস্রশীর্ষ পুরুষ

১৭ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ আর বাহির হইবেন না। বড়ই দুঃস্থ রোদ্ভ। সকালে শান্তিদিদি আসিয়া কি বলিলেন। ঠাকুর উপদেশচ্ছলে কহিলেন, “ভগবান সহস্রশীর্ষ পুরুষ—এ তো ঠিকই। আবার বিধে কত প্রাণী রহিয়াছে। প্রত্যেকের মস্তকই তাঁহার মস্তক। প্রতি প্রাণীতেই তিনি বর্তমান। এজন্যও তিনি ‘সহস্রশীর্ষ’।”

‘চা’ লওয়ার সময়ে দু’টি কবরী ফুল শান্তিদিদির চরণে দিলাম। তিনি আমার মস্তকে উঠাইয়া দিলেন। উহা বড়ই ভাল লাগিল। পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তেও একটি সচন্দন পদ্ম করবী দিলাম। সায়াংকালে হিন্দুস্থানী সাধুটি আসিলেন। আজ চিঠি আসিয়াছে, প্লেগের নূতন নিয়মাহুযায়ী কার্য কলিকাতাতে আরম্ভ হইল। ঠাকুর বলিলেন, “আমাদের ত আর ঘরবাড়ী নাই। ভগবানের চরণতলে কোন একটা তীর্থস্থানে পড়িয়া থাকিতে পারিলেই হয়।”

ঠাকুর কিশোরীবাবু ও জগৎবাবুর সহিত, রাম ও কৃষ্ণগীতা সম্বন্ধে অনেক আলাপ করিলেন। “শ্রীকৃষ্ণ জননীকে বিশ্বরূপ দর্শন করান, গর্গমুনি নন্দরাজকে, ‘কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান’ বলিয়া উপদেশ দেন, বাল্যকালে বশিষ্ঠ ঋষির নিকট শ্রীরামচন্দ্র, ‘আমার হনুমান কৈ?’ বলিয়া আশি করিয়াছিলেন।”

১৮ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাসায় ফিরিলেন। পক্ষি দরজায় মেখলাধারী সাধুটিকে গরদের চাদর ও চারি দরজার ছড়িয়ার ১৬ জনকে ধুতি চাদর, প্রতিহারী ২৫ জনের ১৮ জনকে ধুতি চাদর ও ৭ জনকে গরদের ধুতি চাদর দিলেন। আরও ৪।৫ জন ধুতি চাদর ও ৫।৬ জন গরদের ধুতি চাদর পাইলেন। আজ প্রায় ৩০০ টাকার কাপড় বিতরণ করিলেন।

ঠাকুরের দানের তাৎপর্য : আচারী সাধু ও মহাপ্রসাদ :
জন্মগাথদেবকে কর্পূর দানের প্রতিশ্রুতি

১২শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ভোরে শান্তিদিদি আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, “তিনি কাল রাতে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, ‘এখানে যত অর্থ এভাবে ব্যয় হবে, ততই আসিবে।’” রঘুরাজার দানশীলতার কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করিলেন। ঠাকুর পুনঃপুনঃ বলিতেছেন, “এ দান আমার স্বকৃত দান নহে। অল্প একজন ভিতর হইতে উহা করিতেছেন। ইহাতে আমার একেবারেই স্বাধীনতা নাই। আমার কি ক্ষমতা আছে। একটি পয়সাও কাহাকে দিতে শক্তি নাই।” দাদাগৌসাই বলিলেন, “এ দানে কাহারও মনে গ্লানি নাই।

কণ শোধের জন্ত কোন চিন্তা পর্য্যন্ত নাই। ইহা যেন ভগবানের একটি বিশেষ বিধান বলিয়া সকলেই ভাবিতেছেন। আশ্চর্য্য বটে।”

কাল শ্রীবৃন্দাবনবাসী একজন ‘আচারী’ সাধু তথায় ঠাকুরের বিস্তর প্রশংসা শুনিয়া দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ‘আচারী’দের মধ্যে আহালাদি লইয়া বড়ই হাদ্যমা; পর্দার পর পর্দা খাটাইতে হয়। তিনি বলিলেন, “মহাপ্রসাদের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, একত্র দশজনে বসিয়া একপাতে আহালা করিলেও মনে কোন গ্লানি আসে না।” ঐ লোকটি একখানা গরদের বস্ত্র চাহিয়াছে। একটি পূজারী প্রতি বৃহস্পতিবারে জগন্নাথদেবকে কর্পূর আরতি করেন। চন্দনঘাতা, বুলন, রথঘাতা, কুলদোল প্রভৃতিতেও জগন্নাথদেবকে কর্পূর দেন ও আরতি করেন। তিনি আসিলে, ঠাকুর কর্পূর সেবার জন্ত প্রতি বৎসর ১০ টাকা দিবে বলিলেন। লোকটি বড়ই আনন্দ করিল। স্তুতি-নতি করিতে লাগিল। ঠাকুর ইহার ঠিকানা লিখিয়া লইলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ‘হাড়মাস’ প্রাপ্তি

কিশোরীবাবুকে সান্ত্বনা—“সকলের পক্ষে সমান নয়”

২০শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। বাহির হইলেন না। যথানিয়মে কার্য্য চলিল। আজ ‘সরলচিত্ত’ রাগ করিয়া কাপড় ধরিয়া টানিয়াছে। অপরায়, উহার নিকটে বাচ্ছাদিগকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে। ‘দাদামহাশয়’ গত পরশ্ব কলা কম দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, হু’হাতে এক থাকা। কিন্তু ইহারা কোনরূপ ক্লেশ বা আঁচড়-কামড় দেয় না।

আজ গঙ্গাতে দেওয়ার জন্ত একটি উড়িয়া ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের

‘হাড়মাস’ ঠাকুরকে দিলেন। নববোবনকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূর্ণ বৎসরের পরিত্যক্ত বস্ত্রাদিকে ‘হাড়মাস’ বলে। উহা রাজা ভিন্ন কেহ পায় না। ঠাকুর উহা রোজ পূজা করিবেন ও পরে গঙ্গায় দিবেন বলিলেন। বামুনঠাকুর জ্বর হওয়ায় বাড়ী চলিল। তাহাকে ৮১০ টাকা দিয়া ধুতি চাদর দিতে আদেশ করিলেন।

আজ কিশোরীবাবু কাতরভাবে ঠাকুরকে কহিলেন, “গুরুভ্রাতাদের কেহ কেহ বলিতেছেন, ‘এ সাধন পাওয়া নয়, পিশিয়া যাবে, সব টের পাবে’। উহা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে।” ঠাকুর বলিলেন “ভয় কি! সকলের পথ সমান নয়। আপনি দেবনাগর অক্ষর পড়িতে পারেন।” অল্প অল্প পারেন বলায় ঠাকুর ভক্ত সুরদাসকৃত একখানা ‘সুখনাগর’ গ্রন্থ কাপড়ে জড়াইয়া তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, “প্রত্যহ একটু একটু পা করিবেন।”

শান্তিদিদির গোপালের ভোগ

২১শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ভোরে শান্তিদিদি আসিয়া বলিলেন, “ছেলেরা যে গোপাল পূজা করিত, তাহা দুই চারিদিন হইল আমি ফুল দিয়া সাজাই, পূজা অর্চনা করি। কাল আমি অসুস্থ ছিলাম বলিয়া সেবা করিতে পারি নাই। চক্ষু মুদিলে, উহাদের তিনটিকেই দেখিলাম। তাহারা খাইতে চাহিল। পরে রাত্রে উঠিয়া উহাদিগকে ভোগ দিই, তবে শুই।” ঠাকুর বলিলেন, “সকালে আরতি, মধ্যাহ্নে ভোগ ও সন্ধ্যাহ্নে আরতি প্রভৃতি করিবে। ঠিক ছেলেপিলের মত আদর করিয়া সেবা করিবে।” ঠাকুরের শরীর আজও অসুস্থ। আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ‘হাড়মাস’ একটি কোঁটা পুরিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন।

মুন্সেফ্‌বাবুর দীক্ষাপ্রাপ্তি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ

২২শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ মুন্সেফ্‌বাবু তাঁহার দীক্ষাপ্রাপ্তি উপলক্ষে খাওয়াইলেন। সপরিবার জগৎবাবু, শশীবাবু ও দুই সুরেনবাবু নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ইহা আজ অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়াছেন, ইহার ভিতর একগাছি চুল নাই, কচুর খোলা নাই! যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি হইয়াছে।” পরে জানিলাম কিশোরী-বাবুর বাড়ীর মেয়েরা কুটুনা কুটিয়া দিয়াছেন। সমস্ত জিনিষই অতি বহু সহকারে বাড়ীতে বাছিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঠাকুর আদেশ করিলেন, “ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব কেহ যেন না ফিরিয়া যায়।” এই আদেশে কৃতার্থজ্ঞান করিয়া কিশোরীবাবু ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বাহিরে গেলেন। শতাধিক বাহিরের লোক আহার করিল।

শশীবাবুর ছেলেটি বড়ই সুন্দর। ঠাকুরের নিকট আসিয়া সাষ্টাঙ্গ দিয়া ঠাকুরের পদ সমীপে বসিল। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের বাড়ী বাঁদর যায়?” উত্তর—“হাঁ।” প্রঃ—“তাহারা কেমন?” উঃ—“তোমারই মতন অর্থাৎ ঠাকুরের নিকট যে সকল বানর আসে তজ্জপ।” বানদের কলা খাইতে শশীবাবু ১০ দিলেন। ‘ষণ্ড’ মহারাজ সর্ক্সাগ্রেই প্রসাদ পাইয়া গেলেন। আজ হেড্‌মাষ্টার, নূতন ডেপুটীবাবু ও অন্য একটি ভদ্রলোক সন্ধ্যাকীর্তনের সময় সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

সমুদ্রে সূর্য্যাস্তদর্শন : দেবদাসীদের ‘গীতগোবিন্দ’ বস্ত্রদান

২৩শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ কলিকাতা হইতে পুরী আসিবার রেল খুলিল। নিয়মিত কার্য শেষ হইল। আজ সোমবার বলিয়া অল্প কয়েকটি বানর আসিয়াছিল।

সোমবার বানরগণ লোকনাথ যাইয়া থাকে। আহারাশ্বে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর বাহির হইলেন। আজ মহোদধিতে সূর্য্যাস্ত দর্শন করিবেন। আলো সঙ্গে নিতে বলিলেন, যাইবার সময় দয়ানিধি পাণ্ডা বাড়ী দেখিলেন। ছেলেটির উপনয়ন হইয়াছে। পূজারী ছেলেটিকে নিকটে আনিয়া ঠাকুরকে নমস্কার করাইলেন ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। লোকটি বড়ই সজ্জন। ঠাকুর বলিলেন, “ইনিও আপনার মতন, জগন্নাথদেবের পূজা করিবেন। দয়ানিধি শুনিয়া খুব খুসী হইলেন। ভদ্রঘরের ছোট ছোট মেয়েরা ও অগ্ন্যাত্ত স্ত্রী পুরুষ বাহির হইয়া কেহ বা আড়ালে থাকিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে লাগিল। সমুদ্রে যাওয়ার সদর কাছারির ছুটি হইল। অনেকে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। আমিও অনেককে নমস্কার করিলাম।

পরে সমুদ্রের তীরে যাইয়া বসিলেন ও অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সূর্য্যদেব কখনও ঘোর রক্তবর্ণ, কখনও অরুণ বর্ণ, কখনও গ্রহণ কালে গ্নায় তাম্রবর্ণ দৃষ্ট হইতেছিলেন। সূর্য্যদেব সমুদ্রগর্ভে অস্ত গেলেন। সূর্য্য অস্ত দর্শন করিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। মন্দিরের সম্মুখে দেবদাসীরা আসিয়া ষোড়হাতে দাঁড়াইল। কেহ কেহ পদধূলি লইল। তাহারা প্রার্থনা করিল, “এত লোককে প্রভু দিলেন, আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া হয়।” ঠাকুর তাহাদের দুই দলকে দুইখানা রেশমী, ‘গীত-গোবিন্দ’ বস্ত্র মর্য্যাদা স্বরূপ দিবেন বলিলেন। ঠাকুর কহিলেন, “আমি তোমাদিগকে কি দিব? আমি ভিখারী ফকির মানুষ, আমি সকলেরই দাসাত্মদাস। তোমরা ত ঠাকুরের দাসী, তোমাদের অভাব কি?” অনেকে বস্ত্রাদি চাহিলে, “অন্ত নয়, সময় হইলে মিলিবে” বলিয়া আশ্বাস দিলেন। একটি ব্রাহ্মণ কল্য ছেলের উপনয়নের জন্ত ভিক্ষা চাহিলেন। তাহাকে পাঁচ টাকা দিতে আদেশ করিলেন।

একটি কাল বালকে জগন্নাথদেবের প্রকাশ ও মর্যাদা দান

২৪শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ সকালে কল্যাকার ব্রাহ্মণ কণ্ঠাটি আসিলেন। তাঁহার ছেলের পৈতার জন্ম ৫ টাকা দেওয়া হইল। আজকাল বানরগুলি বড়ই ক্ষেপিয়াছে। ঘর হইতে তাড়াইয়া দিতে হইতেছে। প্রায় ৬টার সময় ঠাকুর বাহির হইলেন। অনেকে ঘটী, বস্ত্র ও টাকা চাহিতে লাগিল। তিনজনকে ঘটী, ১৫।১৬ জনকে ধুতি চাদর ও দু'টি 'বামন' ভাগিনীকে ৫ টাকা দিয়া চলিতে লাগিলেন। আজ লোকের বড় ভিড়। ছড়িদারেরা নাই। অনেক ঠেলিয়া পথ করিতে হইল। পশ্চিম দরজায় সাধুটি গাত্ৰের লুগা (বস্ত্র) পাতিয়া দিলেন এবং ঠাকুরকে বসিবার জন্ম অন্ননয় করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ক্লেশ হইবে শুনিয়া ক্ষান্ত হইলেন। দেবদাসীদের দুই দলের প্রধান দুইজনকে বস্ত্র দিবার জন্ম ডাকিতে বলিলেন। তাহারা বাসায় ছিল না।

এই সময় একটি কাল ১৩।১৪ বৎসরের বালক ধুতি চাদর বাজ্রা করিল। ঠাকুর তাঁহার ভিতর শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলেন ও বাসায় বাইয়া উহার মর্যাদা করিবেন স্থির করিয়া দাদাগোঁসাই, জগবন্ধু বাবু, সরলনাথ প্রভৃতির হস্তে তাহাকে গ্রস্ত করিয়া হাত ধরিয়া বাসায় লইয়া আসিতে বলিলেন। হঠাৎ ছেলেটি সঙ্গছাড়া হইয়া পড়িল। বাসায় আসিয়া যেই সিঁড়িতে পা দিবেন, অমনি দেখেন, জগন্নাথদেব মণিকোঠায় বিরাট মূর্তি ধারণ করিয়া ঠাকুরের প্রতি কিল, ঘুসি দেখাইতেছেন। ঠাকুর তখনই ছেলেটির অন্নসন্ধান করিয়া দেখেন, ছেলেটি সঙ্গ নাই। অমনি উহাকে খুঁজিতে ব্রস্ত হইয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন, বলিলেন,

‘যে পর্য্যন্ত ছেলেটিকে না পাওয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত বাসায় ফিরিব না। শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে পড়িয়া থাকিব।’ ইহাতে সকলেই ভীত হইল। সরলনাথ দৌড়িয়া বালকের অনুসন্ধানে গেলেন। মুন্সেফ বাবুও ফিরিয়া চলিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন একটি চালার মধ্যে, বেড়ার আড়ানে কেবল মাথাটি উঁচু করিয়া বালকটি লুকাইয়া আছে। তৎক্ষণাৎ তাহারে চিনিলেন এবং তাহার হস্তধারণ করিয়া দৌড়িয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং বড় দাস্তের উপর ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তখন ঠাকুর বাসা হইতে মাত্র ৪০।৫০ হাত মন্দিরের দিকে গিয়াছিলেন। সকলে আনন্দ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। ছেলেটিকে অতি যত্ন করিয়া বাসায় আনা হইল। ঠাকুর উহার পা টিপিয়া দিতে লাগিলেন। ছেলেটি অপূর্বভাবে ষোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। ধূতি ও চাদর মেজা হইলে বালকটি অত্যন্ত তেজের সহিত বলিল, “তোমার খুব পুণ্য হইল। এই ছেলেটিকেই গতকল্য সমুদ্রে যাওয়ার সময় কিছু না দিয়া ফিরাই দেওয়া হইয়াছিল।

রায়বিরেলীর অন্ধ বাবাজী

ঠাকুর আজ একটি অন্ধ বাবাজীকে দর্শন করিয়া পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। লোকটি বড়ই মিষ্ট। সদাই হাস্তবদন। বায় রায়বিরেলী। বাড়ী হইতে হাঁটিয়া দ্বারকা ও রামেশ্বর গিয়াছিলেন। পরে তিন বৎসরে এখানে আসিয়াছেন। শুনিলাম তাঁহার ভিতর শঙ্কর চক্রধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিয়াই ঠাকুর ঐরূপ আলিঙ্গন করেন। লোকটি যেন একটি দেবমন্দির। উহাকে ধূতি, চাদর ও একটি ঘটি দেওয়া হইল। ঠাকুর বলিলেন, “এ স্থানের রজঃ এক-একটি মহাবিষ্ণু। জগন্নাথকে মহাপ্রসাদ ও রজঃ এ তিনই এক।”

কাক্সালীদের বস্ত্রদান : বিমলামায়ীর বস্ত্র প্রার্থনা

২৫-২৬শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ভোরে উঠিয়া দেখি, গুরুভ্রাতা কিরণ ও বাইসারির প্রিয়নাথ প্রভৃতি আসিয়াছেন। ঠাকুর ভোরে উঠিয়া পাখানায় গেলেন। পাখানায় যেই হাতে জল ঢালিব, অমনি নীচের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর চমকিয়া বলিলেন, “এই!” জল ঢালিতে যেন নিষেধ করিলেন। বলিলেন, “নন্দীশ্বর।” পরে আসনে আসিয়া পূজা করিতে করিতে গাইতে লাগিলেন, “শ্রামাপদ আকাশেতে, মন ঘুড়ি মোর উড়তে ছিল” ইত্যাদি।

আজ সকালে বাহির হইলেন। ‘রীমা’ মঠে কাক্সালীরা ভোজন করিতে বসিয়াছিল, ঠাকুরকে দেখিয়াই বলিতে লাগিল, “কাপড় দেও, ঘটা দাও, লুগা দাও।” প্রতিজনকে একখানা ধুতি দিতে ঠাকুর আদেশ করিলেন। এক দল লোক পেছনে পেছনে দোকানে চলিল। অল্প লোক সকলও ঐ সঙ্গে একত্রিত হইয়া বস্ত্র প্রদানের বিষয় করিতে লাগিল। ইহাদিগকে বস্ত্র দিতে লাগিলাম। পান্না, মহেন্দ্র ঘোষ, জগবন্ধুবাবু ও কিরণ প্রত্যেকে এক এক দল লোক লইয়া আসিল। একজন পুলিশ সাহায্যার্থে আনা হইল। অনেককে ধুতি দেওয়া হইল কিন্তু দলে দলে লোক আসিয়া উহাদের সঙ্গে মিশিয়া গেল। বাছিয়া যতদূর সাধ্য দেওয়া হইল। চিনিতে না পারায় কাপড় দেওয়া বন্ধ করিতে হইল। পান্নার ও আমার পেছনে এক এক দল লোক চলিল। পান্না টেক্স দারোগার বাড়ীতে আশ্রয় লইল। আমি মুন্সেফবাবুর বাড়ীর নিকট দিয়া ঘুরিয়া তাঁহার সহিত সমুদ্রপারে ঠাকুরের দর্শন পাইলাম। ঠাকুরের নিকট আমরা ও ৩০।৪০ জন কাক্সালী, ছড়িদার পাণ্ডা ও সন্ন্যাসী ছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “শ্রীরামচন্দ্র এই সমুদ্রেই সেতু-বন্ধন করিয়াছিলেন।

আমরা সব বানর, শ্রীজগন্নাথদেব রামচন্দ্র।” পথে আসিতে আসিতে ডেপুটী শশীবাবু অতি বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া একপাশ ধরিয়া চলিলেন। সঙ্গে রাশি রাশি লোক! কেহ বলিতেছে, “দেও, এত লোক পাইল, আমি পাইলাম না।” ঠাকুর বলিলেন, “ব্রাহ্মণদিগকে রবিবার ৪টার পর দেওয়া হইবে ও কান্ধালীদিগকে বুধবার।” মুন্সেবাবু ও দাদাগোঁসাই টিকিট করিবেন। শনিবার হইতে রবিবার ৩টা পর্যন্ত টিকিট বিলি হইবে। পান্না জিজ্ঞাসা করিলেন, “টিকিটে কি লেখা হইবে?” তিনি কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া বলিলেন “হুঁ।”

বাসায় ফিরিয়া আসিলে, “বিমলামায়ী” প্রকাশিত হইয়া অত্যন্ত আবদারের সহিত ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, “এত লোককে বস্ত্র দিছ; আমি আর কেউ নই।” ঠাকুর বলিলেন, “বিমলাদেবী যেন কুলীন কুমারীদের জায়।” এই উপলক্ষে ঠাকুর কুলীন কুমারীদের গল্প করিলেন। “ঢাকা হইতে নৌকায় গোয়ালন্দ আসিবার সময় একদিন পদ্মার পায়ে দেখিলাম, একটি কুলীন কুমারী মলিনমুখে আমগাছতলায় দাঁড়াইয়া আছে। পদ্মায় বাড়ীখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অতি অল্পই বাকী, তাহাও ২১ দিনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া যাইবে।” এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল।

ঠাকুর বিমলামায়ীকে ৩০।৪০ টাকা দিয়া একখানা ভাল সাড়ী ও পূজাদির জন্ত ১০ টাকা দিতে দাদাগোঁসাইকে বলিলেন। পান্না শ্রীমলাদেবী সম্বন্ধে কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, এই সঙ্গে তাঁহারও পূজা হইবে। ১০ টাকা দিয়া একখানা সাড়ী ও ৫ টাকা দিয়া পূজা দিতে বলিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, “আজ ঘরে প্রবেশকালে যেমন বিমলামায়ীর দর্শন পাইলাম, লোকনাথও তখন কৃপা করিয়াছিলেন। লোকনাথের মূর্তি হাসিখুসি দেখিলাম।”

শিবচতুর্দশীতে লোকনাথ দর্শন : ঠাকুরের নৃত্য : ভাবে উদ্ভি

২৭শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ শিবচতুর্দশী। ঠাকুর লোকনাথ দর্শনে যাইবেন। সরলনাথ বিমলামায়ীর জন্ত একখানা 'দাক্ষিণ্য সাড়ী' ৪৫ টাকা মূল্যে ও শীতলাদেবীর জন্ত ১২ টাকা মূল্যে আর একখানা সাড়ী আনিলেন। পূজার জন্ত শাঁখা, সিন্দূর, চুয়া, কর্পূর, চিনি প্রভৃতি খরিদ করিয়া আনা হইল। সকালে চারিজন অন্ধ লোককে ধুতি চাদর ও তিনজনকে ঘটা দেওয়াইলেন। স্নানের সময় শীতলাদাস বাবাজী বলিলেন, "এ দেশের বৈষ্ণবেরা বিমলামায়ীর ও মহাদেবের প্রসাদ পান না। লোকনাথ দর্শন করিতে যান, কিন্তু কেহ বিমলামায়ী দর্শন করেন না।"

বৈকালে আমরা সকলে লোকনাথ যাত্রা করিলাম। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। শ্রোতের গ্রায় লোক, লোকনাথ দর্শনে যাইতেছে। মন্দির হইতে 'লোকনাথ' বিগ্রহ দোলায় চড়িয়া লোকনাথ শিবের নিকট চলিলেন। পথে হাঁড়িতে হাঁড়িতে খাজা, মালপুয়া প্রভৃতি ভোগ লইয়া যাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের সহিত স্ত্রী পুরুষ ৫০ জনের কম হইবে না। সকলেই উত্তমের সহিত চলিতেছেন। পথে কেহ কেহ প্রার্থনা করিল। তাহাদিগকে আগামী কল্য সিংহদরজায় যাইতে বলিলেন। পথপার্শ্বে পুরী গোসাইয়ের কূপ দর্শন করিলাম। তথায় হাঁড়িতে করিয়া পাকাল প্রসাদের জল দান করিতেছে দেখিলাম। রাজা হাতীতে চড়িয়া লোকনাথ হইতে বাড়ী চলিয়াছেন। আমাদিগকে লোক ঠেলিয়া যাইতে হইল। মন্দিরের সমীপে যাইয়া ঠাকুর অতিকষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। পুরুষের জল সরলনাথ হাতে করিয়া আনিয়া

ঠাকুরকে দিল। ভিতরে যাইবার সময় সরলনাথকে দক্ষিণপাশে ও বিধুবাবুকে বামপাশে ধরিয়া চলিলেন। পাণ্ডা, ছড়িদার, স্বরেনবাবু, মুন্সেফবাবু আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। অর্দ্ধ-পরিক্রমার পরে ভগবতী দুর্গাদেবী দর্শন করিয়া পুনরায় মন্দিরের দ্বারে আসিলেন। মন্দিরের দ্বারে আসিয়াই অদ্ভুতভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে বাহুজ্ঞান লোপ হইল। বহুকষ্টে আমরা কয়েকজনে চারিধারে দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে লোকের সংঘট্ট হইতে রক্ষা করিতে লাগিলাম। পাণ্ডারা সম্মুখে আসিলে দুইজনকে ক্রমে ছড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন “তুই নন্দী, তুই ভৃঙ্গী, দে শিঙের গুঁতো।” এই বনিয়া মাথায় মাথায় ঢুসাইতে (গুঁতো দিতে) লাগিলেন। পুনরায় ভাবে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “হরি হর’, ‘হরি হর’, ‘জয় লোকনাথ’, ‘জয় লোকনাথ’, ‘ওঁ নমঃ শিবায়ে নমঃ’, ‘ওঁ নমঃ শিবায়ে নমঃ’ এই নাম জপ কর। যে এই নাম করিবে সেই সিদ্ধ হইবে। এ সমগ্র নাম নয়; ইহা জপ করিয়া দ্বারকানাথ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।” বোধ হইতে লাগিল, ঠাকুর নামের সহিত শক্তি ছড়াইয়া দিতেছেন। প্রবল ‘শক্তি’ শ্রোতের শ্রায় বহিয়া যাইতেছে। ‘নন্দী’ এই নাম পুনঃপুনঃ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আরও বলিলেন, “যিনি কৃষ্ণ পূজা করেন, অথচ শিব পূজা করেন না, তিনি নরকে যান। আর যিনি শিব পূজা করেন অথচ কৃষ্ণ পূজা করেন না, তিনিও নরকে যান।” অতঃপর ধীরে ধীরে অতিক্রমে বাহির হইয়া আসিলেন। কিছু দূর আসিয়া আফিসের কর্মচারীদের তাস্তুর সামনে বসিলেন। পাণ্ডারা আসিল। তাহাদিগকে এই রাত্রে ভোজন ও পূজা প্রভৃতির জন্য ২১ টাকা এবং ত্রিশজন পাণ্ডার প্রত্যেককে এক জোড়া দেশী ধুতি চাদর দিতে আদেশ করিলেন। তিনজন টহলদারকে তিন জোড়া কাপড় দিতে

বলিলেন। সরলনাথের নিকট মাত্র ৫৮ টাকা ছিল, বাকী ১৬৮ টাকা দৌড়িয়া আসিয়া বাসা হইতে লইয়া গেলেন। তিনি প্রায় অর্ধ ঘণ্টায় এই ২১০ ক্রোশ রাস্তা যাতায়াত করিয়াছিলেন। ঠাকুর বাসায় আসিয়া সরলনাথের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। বস্তুতঃই সরলনাথ ধন্য। ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র।

আজ দেখিলাম, লোকনাথে প্রায় লক্ষ লোক জড় হইয়াছে। যে দিকে চাই কেবল ছোট ছোট ঘৃত-দীপ জলিতেছে। আমাদের নিকটস্থ তাম্বুর চতুর্দিক দীপমালায় সুশোভিত হইয়াছিল। তাম্বুও চার পাঁচটা দেখিলাম। বড়ই সুন্দর দৃশ্য। বালুকাময় স্থান। চারিদিকে উঁচু-নীচু বালির স্তূপ রহিয়াছে। ঠাকুর বাসায় আসিয়া বলিলেন, “তিনি লোকনাথের দরজায় উপস্থিত হইলেই দর্শন করিলেন, ‘আকাশ পাতাল জ্যোতির্ময়! সমস্ত পুরী ব্যাপিয়া লোকনাথ বিরাজ করিতেছেন। অদ্বৈত প্রভুর জন্মদিনে রাত্রিকালে যে সন্ন্যাসীটি বলিয়াছিলেন, ‘লোকনাথ গেলেই আমার দর্শন পাইবে’, উহা যথার্থ।”

আজ সন্ধ্যার সময় মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়, অভয়বাবু ও বেণী আসিয়াছেন। খুড়দায় টিকিট দেখিবার সময় প্লেগ ক্যাম্পে উহাদিগকে আটক করিয়াছিল। বেণী দাদাগোঁসাইকে পত্র দিয়াছেন, “আমার ইচ্ছা ছিল, আপনার সঙ্গে লোকনাথ দর্শন করি, তাহা হইল না।” পরে অকস্মাৎ প্লেগ ডাক্তারের মতি পরিবর্তিত হইল, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। ঠাকুর বাসায় আসিলে তাঁহারা প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আলিঙ্গন করিতে হাত বাড়াইয়া দিলেন। মিত্র মহাশয় গোঁসাইর কোলে গিয়া পড়িলেন। ঠাকুর কহিলেন, “আহা! বেণী, তোমার চিঠি পেয়েই লোকনাথকে বলিলাম, ‘উহাদিগকে এনে দাও।’ যাও এখন মহাপ্রসাদ পেয়ে লোকনাথ দর্শন করে এস।” বিধুবাবু তাঁহাদের লইয়া গেলেন। বিধুবাবু লোকনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, “দেখিলাম, ঐ স্থানটি যেন ঠিক কৈলাসপুরী।”

লোকনাথ ও জগন্নাথ এক

২৮শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ব্রাহ্মণদের ধুতি চাদর বিতরণের জন্ত ২০০০ ছই হাজার টিকিট বিলি হইল। উহা তিনবারে দেওয়া হইল। একবার ১০০০ ১১টায়, পরে ৩টায় ও পুনরায় ৬টার সময়। ইমার মঠে এই ধুতি চাদর দেওয়া হইবে। নিম্নজাতিও গলায় পৈতা দিয়া টিকিট নিতে চেষ্টা করিয়াছে। টিকিট দিতে বড়ই ক্লেশ হইল।

রাত্রিকালে মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে শুভবর্ণ দর্শন করিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি?” ঠাকুর বলিলেন, “লোকনাথ ও জগন্নাথ যে এক, তাহাই কৃপা করিয়া দেখাইলেন। সত্যকে অবিশ্বাস করিলে অনেক অনর্থ ঘটে, অনেক ঘূর্ণার তলে পড়িতে হয়।”

বস্ত্রদান মহোৎসব

২৯শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

জগন্নাথবল্লভ মঠের ছেলেদের (ছাত্র) আহার ও প্রদীপের তৈরির অনুবিধার কথা জ্ঞাত হইয়া ঠাকুর পান্নাকে ছোট হরিশবাবুর নিকট পাঠাইলেন। “এ বিষয়ে যেন তিনি একটু কৃপার চক্ষে দেখেন” এই অনুরোধ জানাইলেন। আজ সকালে কে আসিয়া বলিল, পান্না বাল ছোট হরিশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে। হরিশবাবু পান্নার কথায় দুঃখের সহিত বলিলেন, “আমার হাতে সম্পূর্ণ ভার থাকিলে স্ববন্দোবস্ত হইতে পারিত। অত্যাশ্র মেঘরেরা এখানেও থাকেন না, আমার হাতে সম্পূর্ণ ভারও দেন না। অধিকন্তু অর্থ সংগ্রহ মোহন্তর্জীর নামে হইয়া থাকে।” শুনিলাম, হরিশবাবু ছেলেদিগকে ভালরূপ মালপুত্র

প্রভৃতি খাবার দিতে, প্রদীপ জালিবার পলাং তৈল ও অন্য একটি ঘর থাকার জন্ত দিতে আদেশ করিয়াছেন। ঠাকুর শুনিয়া কহিলেন, “পান্না ও হরিশবাবু উভয়েই ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করিবেন।”

আজ ১২টার সময় দাদাগোঁসাই, বিশ্বাস মহাশয়, মুন্সেফবাবু, সরলনাথ প্রভৃতি ‘ইমার’ মঠে গেলেন। তথায় লোক জড় হইয়াছে। বস্তায় বস্তায় সাজান রহিয়াছে। ইমার মঠ খুব বিস্তৃত স্থান। ‘আটকের’ পর ‘আটক’ থাকায় বস্ত্র বিতরণের সুবিধা হইল। একেবারে দুই স্থানে বহুলোক পুরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া টিকিট দেখিয়া একদিকে পান্না ও উকীল সুরেন্দ্রবাবু লোক ছাড়িতে লাগিলেন। ডেপুটী জগৎবাবু, জগবন্ধুবাবু, বর্দ্ধমান মঠের কামদাবাবু, ইনস্পেক্টর নারায়ণবাবু প্রভৃতি প্রত্যেককে ধুতি চাদর দিতে লাগিলেন। এদিকে মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় ও সরলনাথ বস্ত্র গণিতে ও ঠিক করিতে লাগিলেন। বেণী, কিরণ, রমেশবাবু, বিধুবাবু প্রভৃতি একখানা ধুতি ও চাদর একত্রে বাঁধিয়া রাখিতেছেন। অনেক টিকিট জাল হইয়াছিল। ৪।৫ শত লোক বাকী থাকিতে সাধারণ চাদর ফুরাইল। ঠাকুরকে বেণী কাপড়ওয়াল বলিল, “উড়ুনি ফুরাইয়াছে, আর নাই, উৎকৃষ্ট চাদর আছে, দাম বেশী।”

ঠাকুর হুকুম দিলেন, “তাহাই দাও।” অতি উৎকৃষ্ট চাদর সকল আসিতে লাগিল। মুন্সেফবাবু, জগৎবাবু ও আমাদের সকলেরই ঐ চাদর দেখিয়া লোভ হইতে লাগিল। মুন্সেফবাবু বলিলেন, “এইরূপ চাদর এখানে পাওয়া যায়, জানিতাম না।” এইবার ধুতি চাদরে ৪০০০ টাকা ব্যয় হইল। ইহার মধ্যে এক পয়সাও কাপড়ওয়ালকে দেওয়া হয় নাই। পূর্বেও প্রায় ১০০০, ১২০০ টাকা বাকী রহিয়াছে। অথচ কি সাহসে যে কাপড়ওয়াল এসব দিচ্ছেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। জগন্নাথদেবের কি অপূর্ণ মহিমা। ঐ টাকা কি ভাবে শোধ

হইবে একদিনের জন্তও আমাদের চিন্তা আসে না। সকলেরই মনে একটা নিশ্চিত ভাব। কাপড়ওয়াল ধন্য। সেদিন দুপ্রহর রাজে সরলনাথকে আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল “আমরা কটক হইতে আসিয়াছি। আপনাদের বস্ত্র প্রস্তুত।”

এ জগন্নাথদেবের দান

৩০শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

অন্য লোকনাথের পাণ্ডারা আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ৩০ জনকে দেশী ৩০ জোড়া ধুতি চাদর ও তিনজন টহলদারকে তিন জোড়া বিলাতী ধুতি চাদর দেওয়া হইল। আরও ২১ জন মাধু ধুতি চাদর পাইলেন। নরেন্দ্রের পারের গোপীনাথ ও গণেশের মন্দিরের পূজারী দুইজনকে, বাসায় ডাকিয়া আনিয়া রেশমী ধুতি চাদর দেওয়া হইল। তাঁহারা এখানেই বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

যখন ব্রাহ্মণদের বস্ত্র বিতরণের কথা হইতেছিল, সেই সময় মুন্সেফ-বাবুর একটি ছেলে তার মাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ওখানে কি হবে?” মা বলিলেন, “ভিক্ষুক ব্রাহ্মণদের কাপড় দেওয়া হইবে।” শুনিয়া ছেলেটি বলিল, “আমরা ভিক্ষা করিব, আমাদের নিয়ে চল।” মা বলিলেন, “আমি কেমন করিয়া নিয়ে যাব?” ছেলেটি বলিল, “কেন, পাকী ক’রে।” এই কথা মুন্সেফবাবু আনন্দ করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সরলনাথকে আদেশ করিলেন, “উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র ও সাড়ী মুন্সেফবাবুর চার পুত্র, এক কন্যা, ভাগিনেয়, সুরেনবাবুর কন্যা, জগৎবাবুর ভাগিনেয়ী কন্যাকে খরিদ করিয়া দিও।”

ঠাকুর বলিলেন, “যিনি প্রার্থনা করিবেন, তাঁহাকে তাঁহার উপযোগী বস্ত্র দিতে হইবে।” মুন্সেফবাবুর ৫টি পুত্র কন্যা ও ভাগিনেয়কে ও

ত্রয়োদশ অধ্যায়

৩২৯

স্বরেনবাবুর কত্তা ও জগৎবাবুর ভাগিনেয়ী কত্তাকে 'পীতাম্বরী' রেশমী বস্ত্র দেওয়াইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "এ জগন্নাথদেবের দান।" আমাদের ফুটুকুও (শান্তিদিদির তৃতীয় পুত্র) ঐরূপ কাপড় চাওয়ায়, উহাদের সকলকেই ঐ প্রকার বস্ত্র দেওয়াইলেন। বলিলেন, "প্রার্থনা একজনের ভিতর দিয়াই আসে।"

হরেন্দ্রবাবু খুড়দা প্লেগ ক্যাম্পে আটক রহিয়াছেন। তাঁহার জন্ম ঠাকুর ক্লেশ প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর আজ বলিলেন, "লোকনাথের দুধ ও ফুল চন্দনের জন্ত এক ব্যক্তিকে ৪০ টাকা দেওয়া হইয়াছিল, উহা সে লোকনাথকে দেয় নাই। চুরি করিয়াছে।" যে দরজী ঠাকুরের কোপিন ও আলখিল্লা তৈয়ার করে, সে আসিয়া কাপড় চাহিল। ঠাকুর বেণীকে আদেশ করিলেন, "তোমার পছন্দ মত ভাল ধুতি উড়ুনি ইহাকে এনে দাও।" বেণী তাহাই করিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

চারি সম্প্রদায়ের পঙ্গত : সাধুসেবায় ভিক্ষা :

সময়ই শোকের দাগ উঠাইয়া থাকে

১লা-২রা চৈত্র, ১৩০৫ সাল ।

আজ হরেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতির আসিয়া পৌঁছিলেন। ঠাকুর সমুদ্রতীরে বাহির হইলেন। সমুদ্রের শোভা অতি চমৎকার। মুন্সেফ-বাবু ছেলেপিলে লইয়া সিংহদরজা হইতে পিছনের লোক তাড়াইয়া চলিলেন। লোকের সংঘট বড়ই অধিক। পূজার জন্ত ঠাকুর 'কেতুকা ফুল' অনুসন্ধান করিতে বলিলেন।

গত কল্যা দুটি লোককে মটকা দিবেন বলিয়াছিলেন। আজ তাহাদের ১১।১২- দরের দুইখানা মটকা দেওয়া হইল। ঘরে একটা ঘটা খরিদ করিয়া রাখা হইয়াছে। কাহাকে দেওয়া হইবে। আজকাল দারুণ উত্তাপ। ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিলে ভাল হয় বলিলেন।

আজ জেলা স্কুলের হেড্‌ পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। তাঁহার ছেলেমেয়ে মরিয়া গিয়াছে। ভাতাও মৃতপ্রায়। ঠাকুর ইহা শুনিয়া দুঃখ করিলেন। ঠাকুর তাঁহার পঞ্চম বৎসর বয়স্কা কন্যার মৃত্যুতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন, সে কথা বলিলেন। মেয়েটির শ্রাদ্ধদিনে যথাবিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া দীন-দুঃখীদিগকে ঠাকুর কিছু দিতে চাহিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার শ্রাদ্ধ?" ঠাকুর ঐ মেয়েটির শ্রাদ্ধের কথা বলিলে, তাহারা কোনক্রমেই কিছু লইতে স্বীকার করিল না। তাহারা বলিল, "আহ,

ঐ মেয়েটি গোপনে আমাদেরকে কত চাউল, কলা, পয়সা দিত। আমরা ইহার প্রেতকার্যে পয়সা নিব না।” ঠাকুর বলিলেন, “শ্রাদ্ধের পর চিন্তা আসিল—এই ছোট মেয়েটিকে এ সব দান করিতে কে শিখাইল? এরূপ মেয়েদের জ্ঞাত এদেশ নহে। ক্রমে সময়ে শান্তি আসিল। ‘সময়ই’ ভগবানের স্বরূপ। ‘সময়ই’ মাত্র ক্রমে ক্রমে শোকের দাগ উঠাইতে থাকে। নচেৎ কাহার সাধ্য, উপদেশ দিয়া কিছু করে। যখন মেয়েটিকে ক্ষমাশানে লইয়া যায়, ভাবিয়াছিলাম, সেখানে যাইয়া বুঝি বাঁচিয়া উঠিবে। তাই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলাম। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন, ‘শত পুত্রশোকে হৃদয়ে শতটি ছিদ্র হইয়াছে’।”

আজ কীর্ত্তন বড় জমিল। ঠাকুর উঠিয়া নৃত্য করিলেন। সরলনাথ অনেকক্ষণ অজ্ঞান হইয়া অস্ত্র গৃহে পড়িয়াছিলেন।

সুরদাসের পদ

৩রা চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ সুরদাস পাঠ করিতে করিতে অশ্রুজলে বারবার ঠাকুরের কণ্ঠ-রোধ হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিলেন, “এ বড় অপূর্ব গ্রন্থ।” সুরদাস অন্ধ সাধক। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার লীলাগান করিবার বর পাইলেন। এক শত পদ রচনা করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঐ এক শত পদ সম্পূর্ণ না হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ভগবান স্বয়ং সে সকল পদ সম্পূর্ণ করিলেন। ভগবান যাহা রচনা করিয়াছেন তাহার নীচে ‘সুরশ্রাম’ পদ আছে। এ সকল যাহারা পাঠ করিবেন, তাঁহাদেরই ভক্তি লাভ হইবে।”

সায়ংকালে ঠাকুর সমুদ্র দর্শনে গেলেন। পিছনে লোকের হট্টগোল। আমাদের বাসার স্ত্রীলোকেরা মন্দিরে গিয়াছিলেন। শীতলার পূজারী

গল্প করিল, “এই শীতলাদেবী মাটি ভেদ করিয়া উঠিয়াছেন। এখন কেবলমাত্র ‘মুখপদ্ম’ দৃষ্ট হইতেছে। যখন ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীর দৃষ্ট হইবে, প্রলয় হইবে।” এইরূপ বাহার বাহা খুসী সে তাহাই বলে।

হরেন্দ্রবাবুর সতরঞ্চীর মত গাত্রবস্ত্র দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, “এই গাত্রবস্ত্র দেখিয়াই, ইহাদিগকে এত সময় খুড়দায় আটক রাখিয়াছিল। ভক্তলোকের মত বেশ না হইলে উহারা এইরূপই করে। ছালা গায়ে দিলে বুদ্ধি মোটা হয়। ইহাতেও তজ্রপ।” আজ পান্না যাইয়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিল, তাহাদের নিযুক্ত কর্মচারী ছয়জনকে ধুতি চাদর দেওয়া যায় কি না? উহারা মন্দিরের সেবক বলিয়া যাক্কা করে।

জগন্নাথদেবের আদেশ : আজ সেবকদিগকে দাও

৪ঠা-৫ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ উহাদিগকে ধুতি দেওয়া হইল। আজ দাদাগোঁসাই এক ছড়া প্রকাণ্ড পদ্মফুলের মালা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দিলেন। পরদিন আবার দাদাগোঁসাই প্রকাণ্ড এক ছড়া পদ্মফুলের মালা বলদেব স্বামীকে দিলেন। অনেক দিন যাবৎ দর্শনে যাই নাই। কাল রাত্রিকালে প্রায় দশটার সময় দর্শনে গেলাম। অনেক দিন পরে দর্শনে বড় আনন্দ পাইলাম। আজ সুরেনবাবু, তাঁর মা প্রভৃতি এখানে আসিয়াছেন। পথে খুড়দা কাপ্পে ১৫ টাকা ঘুস দিতে হইয়াছে।

৬ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর সাতটার সময় দর্শনে বাহির হইলেন। মন্দিরের পথে গরুকে ঘাস দিলেন। পথে শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহ দর্শন হইল। তিনি দোলায়

চতুর্দশ অধ্যায়

৩৩৩

চড়িয়া জগন্নাথবল্লভ উত্থানে শিকারে চলিয়াছেন। সেবকগণ কিছু চাহিলে, 'পরে দেওয়া যাইবে' বলিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথদেব দর্শন করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "হৃদয়ে যে যে মূর্ত্তি ধ্যান করিলাম, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাহাই দেখাইলেন। এমন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা, এমন দয়াল ঠাকুর আর নাই।" ঠাকুর রামগোপালবাবুকে বলিলেন, "এ ত কেহ বিশ্বাস করিবে না, মন্দিরে প্রবেশ করিতেই সিঁড়ির নিকট শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রকাশ হইয়া বলিলেন, 'আজ সেবকদিগকে দাও'। আমার এক কপর্দকও দেওয়ার স্বাধীনতা নাই। ইহা বলিলেও কেহ বুঝিবে না।" রামগোপালবাবু আজ নির্জনে ৫টার সময় ঠাকুরের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে একখানা রেশমী বস্ত্র দিয়া বলিলেন, "ইহাও জগন্নাথদেবেরই দান; জানিবেন।"

যখন পুনরায় বস্ত্র দেওয়ার প্রস্তাব হইতে লাগিল, আমার মনে অত্যন্ত বিরক্তি আসিল। যাহারা পাইয়াছে তাহারাও চাহিতেছে। রাজবাড়ীর ছড়িদারের মধ্যে একজন বলিল, সকলের নিমিত্ত যে কাপড় দেওয়া হইয়াছে, তাহা উহাদের মধ্যে কয়েকজন পায় নাই। বিরক্তি বোধ হওয়ায় এদিকে ওদিকে ঘুরিতে লাগিলাম। সকল কার্যে যোগ দিলাম না।

ঠাকুর আজ সমস্ত সেবকদের নাম চাহিয়াছেন। মুক্তিমণ্ডপের বান্ধণেরাও তাঁহাদের নামের তালিকা দিবে না। পথে আসিতে আসিতে তিনজনকে ধুতি চাদর ও আর একজনকে ১২ টাকা দিয়া একখানি রেশমী বস্ত্র দেওয়া হইল। রাত্রিকালে জগৎবাবু প্রভৃতি আসিলেন। রথের সম্বন্ধে কথোপকথন হইল।

“গৌসাই আপনি ইহা কোথায় পাইলেন”

৭ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ প্রাতঃকালে আসিয়া মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়, আমাদের সাধন ও অত্যাগত সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “এই সাধনে বিশেষ অধিকার চাই। নারায়ণ ব্রহ্মাকে দেন, ব্রহ্মা নারদকে, এই প্রকারে গুরু-প্রণালীক্রমে ইহা চলিয়া আসিয়াছে। মাধবেন্দ্র পুরী মহাশয়ের এই শক্তি। মহাপ্রভু কেবল সাড়ে তিনজনকে এই শক্তি দান করিয়াছিলেন। স্বরূপ—দামোদর, রামানন্দ ও শিখি মাহিতী ও তাহার ভগ্নি মাধবী।”

ঠাকুর আবার বলিলেন, “এক সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে এই শক্তির ক্রিয়া হঠাৎ আমার মধ্যে প্রকাশ দেখিয়া গৌর শিরোমণি মহাশয় বলিয়াছিলেন, ‘গৌসাই, আপনি ইহা কোথায় পাইলেন? এ শক্তি আর দেখা যায় না। হু’একজনের নিকট গচ্ছিত আছে বলিয়া মাত্র শুনিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া ইহা আমাকে দিন।’ এ শক্তি বাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদেরই মহাপ্রভুর সহিত জ্ঞানান্তরীণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। মহাপ্রভুর ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ রামোপাসক, কেহ নৃসিংহোপাসক, কেহ বা নারায়ণোপাসক ছিলেন। এই শক্তি দেওয়া না দেওয়া তাঁহারই ইচ্ছা। এই শক্তির ক্রিয়া হইতে থাকিলে সংসারে লোক প্রায় অকর্ষণ্য হইয়া পড়ে। সেইজন্যই বোধ হয় মহাপ্রভু তখন এই শক্তি সকলকে দেন নাই। এই শক্তি বাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে অন্তের বিরোধ নাই। কারণ তাঁহাদের সমস্ত দেবদেবীর উপাসনা শেষ করিয়া এই শক্তি লাভ করিতে হইয়াছে।”

ঠাকুর আরও বলিলেন, “মহাপ্রসাদ ও জগন্নাথদেব এক। মহাপ্রসাদ আহাৰ করিলে পুনর্জন্ম হয় না। উহার দ্বারা শ্রদ্ধা করিলে পিতৃগুরুবদেরও

আর জন্ম হয় না। আত্মের পূর্বে জন্ম হইয়া থাকিলে, উহা পিতৃলোকে জন্ম থাকে, পরে পায়।”

ঠাকুর অন্য সময়ে বলিলেন, “শাস্ত্র ও সদাচার সর্বদাই পালনীয়। আমি ত ব্রাহ্ম ছিলাম। কিছুই মানিতাম না। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে চলিয়া শারীরিক ও মানসিক উপকার উপলব্ধি করিয়াছি।”

ঠাকুরের সমুদ্র-স্নানে আরাম

৮ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ভোরে ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। প্রায় ৪০।৫০ হাঁড়ি জল তাঁহার গায়ে ঢালা হইল। উহাতে খুব আরাম পাইলেন। বলিলেন, “আমার পেটে যেন কেহ হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। সমুদ্র মহাতীর্থ। এ ত সামান্য নহে। ভিতর হইতে শক্তি সরসরু করিয়া একবার উঠিতে আবার নামিতে লাগিল।” আজ ঠাকুরের জরও তত হয় নাই। আমরাও সমুদ্রপারে যাইয়া, উহার স্নমধুর হাওয়াতে যেন পুনর্জীবিত হইয়াছি মনে হইল। সরলনাথের শরীর খুব দুর্বল। সমুদ্রের হাওয়াতে অনেকটা বল পাইল। আসিবার সময় দু’টি সাধুকে কখন, ঘটা ও বস্ত্র দেওয়া হইল। চন্দনঘাতার ‘সুন্দর পাণ্ডার’ (মাধব শিদ্দারী) জন্য একখানা ভাল ‘মটকা’ সরলনাথ কিনিয়া দিয়া আসিল। ‘দয়ানিধি পাণ্ডা ও অন্য একটি পাণ্ডা সকালে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পূজারীদের এবং আমাদের ‘সোয়ার’ মাধো মহাপাত্র, সোয়ারদের তালিকা দিবেন। এইরূপ দলে দলে তালিকা দিবেন, তাহা হইলেই সমস্ত সেবকগণের তালিকা সহজে পাওয়া যাইবে।

সায়ংকালে গঙ্গাধর খুটিয়া আসিলেন। তিনি দানের সমস্ত কাপড় অন্যত্র হইতে দিতে চাহেন। ঠাকুর উহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন।

তাঁহাকে বলিলেন, “ভগবান আমার চক্ষের পরদা নষ্ট করিয়াছেন। তোমাকে দেখিলেই আমার আত্মা শুকাইয়া যায়। সমস্তই বেন অন্ধকার দেখি। কালপুরুষের মত তোমাকে দেখাইতেছে।” পরে অল্পসম্মানে জানা গেল, তালিকা সম্বন্ধে উনিই সমস্ত গোল বাধাইয়াছেন। ইনিই হরেকৃষ্ণের সর্বনাশের মূল। ইনিই আমাদের পাণ্ডা সাজিয়া পুরী আসিবার দিন টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দানের কাপড়ের কমিশনের লোভে কাপড় দিতে চান।

কাপড়ওয়ালা ভাই দু’টি আশ্চর্য্য লোক

এ সময়ে দয়ানিধি ও অন্য একটি পাণ্ডা আসিয়াছেন। আজ তাঁহারা তালিকা দিবেন। সরলনাথ বলিলেন, “প্রায় সাড়ে চার হাজার সেবকের নাম লিখিত হইয়াছে। আমাদের কাপড়ওয়ালা ধারে কাপড় দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কাপড়ওয়ালা ভাই দু’টি আশ্চর্য্য লোক। প্রায় ৬০০০ হাজার টাকা বাকী পড়িয়াছে, তথাপি কাপড় দিতে চায়। এই কাপড় দিলে প্রায় ২০ হাজার টাকা বাকী পড়িবে। উহারা আমাদের সমস্ত অবস্থাই জানেন। আমাদের আকাশবৃষ্টি তাহাও জানেন। কিরা বলিল, সে দিন নাকি বলিয়াছে “আমাদের টাকা দু’দিন পরে দিউন কতি নাই কিন্তু বাবা কৃপা করিয়া আমাদের দোকানে কি একবার পদধূনি দিবেন?” শ্রীধরবাবু বলিলেন, দোকানদারের বিশ্বাস, টাকা বাকী থাকিবে না। তাহাদের মধ্যে একজন গল্প করিলেন, “দেখুন, একজন সম্ভ্রম লোক সাধুসেবায় নিজের সর্বস্ব ব্যয় করিল ও পরে ঋণ করিতে লাগিল। ক্রমে ঋণ অত্যন্ত অধিক হইল। মহাজনেরা নালিশ করিল। কাল তাঁহাকে আটক করিবে। রাত্রিকালে একটি লোক আসিয়া বাড়ী বাড়ী বাইরা ঋণ পরিশোধ করিল। পরদিন মহাজনেরা তাঁহাদের টাকা পাইয়াছে, বলিয়া

বিজ্ঞাপন দিল। তখন ঐ সজ্জন লোকটি কাঁদিয়া আকুল হইয়া মহাজন-দের বলিলেন, “আহা! তোমাদেরই ভাগ্য। তোমরা ভগবানের দর্শন পাইয়াছ।” আমাদের দোকানদারদেরও ঐরূপ বিশ্বাস। আশ্চর্য্য লোক বটে। সেদিন তাহাদের একজনকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আরতির সময় দেখিলাম। একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হইল।”

আজ ঠাকুর বলিলেন, “‘কালী’ (বানর) ভয় পাইয়াছে দেখিয়া ‘সরলচিত্ত’ আমার হাত ধরিল। হাতখানা ঠিক যেন মখমলের স্তায় কোমল। একটা আনন্দ উপলব্ধি হইল। ‘কালী’র দিকে পুনঃপুনঃ তাকাইয়া যেন বলিল, ‘কোন ভয় নাই।’”

৯ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর বাহির হইলেন। শ্রীমন্দিরের সেবকদের তালিকা অনেকে দিয়াছেন; এখনও বাকী আছে। কিরূপ বস্ত্র দেওয়া হইবে তদ্বিষয়ে পাণ্ডাদের মত চাহিলেন। পাণ্ডারা সকলেই মুকুটা (এক প্রকার রেশমী বস্ত্র) পাইলে খুব খুসী হয় বলিল। কিন্তু এখানে চার কি সাড়ে চার হাজার ‘মুকুটা’ পাওয়া যাইবে না। পরন্তু উহাতে ৩০।৫০ হাজার টাকার কম খরচ পড়িবে না। সেজন্য ‘মুকুটার’ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

সমুদ্রের জলে মিষ্টতা

১০ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ ভোরে সমুদ্র-স্নানে গেলেন। শাস্তিদিদি জগদ্বন্ধুবাবুর সহিত পূর্বেই গিয়াছিলেন। আমি মুন্সেফবাবুর বাসা হইয়া গেলাম। ঠাকুর আজ উপবীতের জগ্গ তিনটি ছেলেকে ৩ টাকা দিলেন। একটি সাধুকে ধুতি ও ঘটা, ৫ জনকে ধুতি চাদর ও অন্ত একজনকে কমণ্ডলু ও কঞ্চল দিলেন। বাসার নিকটস্থ একটি সাধু ও তাহার সঙ্গী ভগ্নীকে

একখানি চাদর ও পাঁচ টাকা দিলেন। প্রতিদিন ইহাদিগকে কাঠ এবং যখন যাহা প্রয়োজন দেওয়া হয়। পূর্বের কিরণ ইহাদিগকে একটা ভাল ঘটা কিনিয়া দিয়াছে।

সমুদ্রের জল অতিশয় লবণাক্ত। একটু পেটে গেলেই অসুখ করে। আজ ঠাকুর সমুদ্রের জল মিষ্ট আশ্বাদন করিলেন। বেণীও বলিল, সেও সুস্বাদু জল আশ্বাদন করিয়াছে। আমি এখনও উহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

গুপ্তাবাড়ীর দিকে যে সব সাধুরা থাকেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে ঠাকুর আজ সায়ংকালে পুনরায় বাহির হইলেন। যাইবার সময় আগামী কল্য অনেককে কাপড় দিবেন বলিলেন।

সাধুদের পঙ্গত

১১ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। দুইটি হাঁড়ি খরিদ করিয়া লইল। অশ্বিনী, বিশ্বাস দাদা, মিত্র মহাশয় প্রভৃতি ঠাকুরের মাথায় জল দিলেন। আসিবার সময়ে সিংহদরজায় পাঁচটি জ্বলোককে সাড়ী ও দুইটি পুরুষকে ধুতি চাদর দিলেন। বাসায় আসিয়া একটি সাধুকে ঘটা, কমণ্ডলু, ধুতি ও চাদর দেওয়া হইল। কয়েকজন মথুরাবাসী দরিদ্র লোক কাপড়ের ছাউনীর নীচে রাস্তার অপর পার্শ্বে নিঃস্ব অবস্থায় আছেন। শ্রীধরবাবু তাহাদের কথা বলিলেন। ঠাকুর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক একটি টাকা দিতে আদেশ করিলেন।

জগন্নাথদাস বাবাজীর আশ্রমে ২১৩ হাজার সাধু আসিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা—ঠাকুর উহাদের সেবার জন্য ৫৭ হাজার টাকা দেন। উনি সাধুসেবা করিবেন। আমাদের যে আকাশবৃষ্টি—ভাণ্ডার শূন্য—ইহা

কে বোঝে ? দাদাগোঁসাই রাত্রিতে সাক্ষাৎ করিয়া এ সম্বন্ধে বলিতে যাইবেন। ডেপুটী শশীবাবু একটি ব্রাহ্মণকে চিঠি দিয়া পাঠাইয়াছেন, এত লোককে কাপড় দেওয়া হয়, অভিপ্রায় হইলে ইহাকে দিতে পারেন। ঠাকুর বলিলেন, “এ অল্পরোধ-উপরোধের দান নহে। এ জগন্নাথদেবের দান। আমার এক কানা কড়িরও ক্ষমতা নাই।” ইহা অশ্বিনীকে বলিতে বলিলেন।

যাত্রীদিগকে ঘটা, বস্ত্র দান ও তাহাদের আনন্দ

১২ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর শ্রীমন্দিরে গেলেন। বহুদিন ভোরের বেলা আরতির বাগ্ম শুনিবার কামনা ছিল। আজ তাহা পূর্ণ হইল। ‘বড়ছাতার’ মোহন্তজীকে নমস্কার করিলাম। তাঁহারা আরতির বাগ্ম করিতেছিলেন। ঠাকুর গুরুভৃত্তের নিকট হইতে কতক্ষণ বিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রথম চন্দন-কাষ্ঠের নিকটস্থ উঁচু সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। অতি সুন্দর দর্শন, অপূর্ব মূর্তি।

বাসায় আসিয়া দরিদ্র জ্বালোক, সাধু, কান্দাল প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-বাসী যাত্রীদিগকে আগ্নিনায় ও ছাদে বসান হইল। প্রত্যেককে এক একটি ঘটা, ধুতি, চাদর ও হুপয়সা দেওয়া হইল। ইহারা প্রায় ২ ঘণ্টা পর্যন্ত নানারূপ আমোদ-প্রমোদ ও নৃত্যগীত করিয়া বাসাটি অমৃতময় করিয়া তুলিলেন। সকলে আবার ছড়াইয়া খেলিতে লাগিলেন। কেহ বাঁশী বাজাইলেন, কেহ তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। আনন্দের শ্রোত বহিতে লাগিল। ঠাকুর বারান্দায় বসিয়া এ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। সকলকে তামাক, গাঁজা, দোস্তা প্রভৃতি দেওয়াইলেন। সকলেই খুশী হইয়া ‘জয়’, ‘জয়’ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কোন দল ‘জয়

জগন্নাথ স্বামী' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। চারিজন ছড়িদারকে জল থাইতে ২৭ টাকা দিলেন।

বৈকাল বেলা সরলনাথ হরিদাস ঠাকুরের সমাধিতে মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে ৬ খানা কাপড় দোকান হইতে দিয়া আসিলেন। বদরিকাশ্রমে যাইবার জন্ত একটি সাধু পাথের বাবদ ৫৭ ও ধুতি চান্দর পাইলেন। রাত্রিকালে পাণ্ডারা তালিকা লইয়া আসিলেন। দেবদাসীরা তালিকা দিয়া গেল।

মণিকোঠায় দর্শন : 'মেড়া পোড়া' উৎসব

১৩ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ সকালে মন্দিরে গেলেন। অনেকক্ষণ প্রথম চন্দনকাষ্ঠের নিকট বসিয়া থাকিতে হইল। দরজা খুলিতে অনেক দেৱী ছিল। বড় ছাতার সাধুরা অতি স্নমধুর তালে ঢোল করতাল বাজাইতেছিলেন। প্রত্যহ তাঁহারা ঠাকুরের উত্থানের পূর্বক্ষেণে এইরূপ মনোহর বাজ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে জাগ্রত করেন। সাধুদের এই ভক্তি-সহকৃত করতাল-যুক্ত বাজ শুনিতে বড়ই স্নমধুর। আজ পাণ্ডারা ঠাকুরকে দর্শন করাইতে মণিকোঠার ভিতর লইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীবলভদেবকে বড়ই স্নমদ দেখিলাম। দিদিমার ভাব হইল। পূজারীরা ঠাকুরের গলায় ও মাথায় রাশি রাশি মালা দিতে লাগিলেন। পাণ্ডা, পরিহারি, পূজারী প্রভৃতি সকলেই ঠাকুরকে জগন্নাথ দর্শন করাইতে ব্যস্ত। নিজেরা বিশেষ সতর্ক হইয়া ঠাকুরের চারিপার্শ্বে হাতে হাতে বেড় দিয়া ছড়ি দ্বারা লোক সরাইতে লাগিল। অনন্তরাম ছড়িদার ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। আজকাল লোকের বড় ভীড় কিন্তু পাণ্ডাদের অনুগ্রহে আমাদের কোন ক্লেশ নাই। ঠাকুর পাণ্ডাদের বলিয়া আসিলেন, নামের তালিকা সম্বন্ধে দয়ানিধি পূজারী প্রভৃতি যাহা করিবেন, সেইরূপই হইবে।

বাহিরের সমস্ত বিগ্রহের পূজারীদেরও তালিকা চাহিয়াছেন। বাসার দরজায় লোকের হাট বসিয়া গিয়াছে। লোকের ভীড় কিছুতেই কমিতেছে না। কেহ কেহ একখানা ছোট পাত্রে নারিকেল রাখিয়া উপবীতের জন্ত ভিক্ষা চাহিতেছে।

আজ রাত্রিকালে ‘মেড়া পোড়া’ উৎসব। দোলমঞ্চের নিকট ভূমিতে একখানা ৪।৫ হাত উঁচু কুটীর নির্মিত হইয়াছে। এই কুটীরে অনেকগুলি পুরাতন টুকরি ভাঙ্গা রাখা হইয়াছে। সন্ধ্যার একটু পূর্বে ঠাকুর এখানে গেলেন। পরে আবার রাত্রি ১১।১২টার সময় আমরা সকলে তথায় উপস্থিত হইলাম। লোকে লোকারণ্য। পুলিশ আসিয়া অনেক লোক চক্রাকারে বসাইয়া দিয়াছে। কেহই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। মাঝে মাঝে দুই চারিজন মার খাইয়া এদিক-ওদিক্ যাইতেছে। ছোটছাতার বাহিরে পায়খানার কিছু দূরে আমরা অন্ত্রান্ত লোকের সম্মুখে বসিয়া গেলাম। অনেকক্ষণ পরে ঐ কুটীরে অগ্নি দেওয়া হইল। একটা ‘ভেড়া’ ঐ গৃহে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। অগ্নি দেওয়ার অব্যবহিত পূর্বেই উহাকে খুলিয়া লওয়া হইল। অগ্নি ‘হু হু’ করিয়া নানাবর্ণে দশবার হাত উঁচু হইয়া জলিয়া উঠিল। কাহার সাধ্য নিকটে থাকে। যখন অগ্নি অনেকটা নির্কারণপ্রায় হইয়া আসিল, তখন ‘দোলগোবিন্দ’, লক্ষ্মী, সরস্বতী, পঞ্চমহাদেব সেই অগ্নিকুণ্ডকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অগ্নির বর্ণ কখন আবিরের ত্রায়, কখনও রক্ত, কখনও নীল প্রভৃতি নানাবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক মার খাইয়াও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া বিগ্রহ সকল শ্রীমন্দিরে যথাস্থানে গেলেন। আজ এই সময়ে বামাপুকুরের চাক্ৰ-বাবু তাঁহার মাতা প্রভৃতির সহিত আসিয়া আমাদের সঙ্গে দোলমঞ্চে মিশিলেন।

দোল পূর্ণিমা : একটি স্ত্রীলোকে বিমলাদেবীর আবেশ

১৪ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল ।

আজ দোল পূর্ণিমা। খুব সকাল সকাল ‘চা’ খাইয়া ঠাকুর বাহির হইলেন। যাইবার সময় ৪টি টাকা লইলেন এবং পথে দুইটি লোককে দুই টাকা করিয়া দিলেন। পথে একটি হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঠাকুরকে হাত দিয়া আরতি ও ভাবের সহিত নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন, “মেরা রাম, সবহি মেরি শূত্র রাম বিনা।” ঠাকুর নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন এবং কাঁদিয়া ফেলিলেন। সরলনাথকে বলিলেন, “একখানা রেশমী কাপড় ইহাকে আনিয়া দাও। একটি ভাল ঘটিও দাও।” সরলনাথ তখনই উহা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন, “ঐ স্ত্রীলোকটিতে বিমলামায়ী আবিষ্ট হইয়াছিলেন।” দোলগোবিন্দেব দোলমঞ্চে উঠিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া ঠাকুর দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিয়া বাসায় ফিরিলেন। আমাকে ‘বড়ছাতার,’ ‘ছোটছাতার’ ও অন্যান্য স্থানে আবীর দিতে বলিলেন। আমি বড়ছাতায় ১/৫, ছোটছাতায় ১/৫ এবং অন্ত এক স্থানে ১/১ সের আবীর দিয়া বাসায় ফিরিলাম। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, কীর্তনে সকলেই মাতিয়াছে। মহা ছলস্থল পড়িয়া গিয়াছে। ঘরের মেঝে আবীরে ভরিয়া গিয়াছে। ছাদের কড়িকাঠে পর্যন্ত আবীর লাগিয়াছে। ঠাকুর উর্দ্ধদিকে ঐ আবীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ কীর্তন হইল। বাইসারীর প্রিয়নাথ গাহিতেছিল—

নবদ্বীপে গৌর হয়ে ভুলেছ কানাই।

তোর মা যশোদা পিতা নন্দ তাও কি মনে নাই।

দেখ্লেম কালিন্দীর তীরে রাখাল ধেহু চরায় নারে।

মাঠ শূন্য পড়ে আছে দেখে এলেম তাই ॥

দাঁড়ারে ত্রিভঙ্গ হয়ে অধরে মুরলী নিয়ে ।

গোর বাঁকা লাগে কেমন দেখাও দেখি ভাই ॥

এই গানটি গাহিতে গাহিতে ১১।১২টার সময় আমরা ঠাকুরের সহিত দোলমঞ্চে চলিলাম। প্রচণ্ড রোদ্দ। জ্বলন্তপত্রও নাই। ঐ স্থানে পৌছিয়া দেখিলাম, দোলগোবিন্দ, লক্ষ্মী ও সত্যভামার সহিত চৌকিতে আরোহণ করিয়া দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতেছেন। আমরা কখন অগ্রে, কখন পশ্চাতে কীর্তন করিতে করিতে চলিলাম। ঠাকুর এই সময়ে চৌকি-বাহকদের ১০ টাকা দিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ কীর্তনের পর গোবিন্দজী মঞ্চে আরোহণ করিলেন। আমরা ঐ সময়ে ছোটছাতায় বাইয়া বসিলাম। আমাকে ২ টাকা প্রণামী দিয়া ওখানকার জগন্নাথদেবের বিগ্রহকে নমস্কার করাইলেন। কতক্ষণ পরে গোবিন্দজী, সত্যভামা ও লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর সহিত দোলায় আরোহণ করিলেন। আমরাও কিছু পরে দর্শনে চলিলাম। ঠাকুর দর্শন করিলে পাণ্ডারা প্রণামী চাহিল। তিনি প্রণামী ৫১ টাকা দিয়া ওখানে বত ফুল ছিল প্রায় সকলগুলি দিয়াই ঠাকুর সাজাইতে বলিলেন। এদিকে বানরীপাড়ার ডাক্তার শ্রীনাথ দাস প্রণামীর টাকা বাসা হইতে আনিয়া তাহাদিগকে দিলেন। অতঃপর কীর্তন করিতে করিতে বাসায় আসিলেন। বাসায় অনেকক্ষণ কীর্তন হইল। ঠাকুর যখন দোলবেদিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন একটি হিন্দুস্থানী বালক, দোলগোবিন্দের পদপ্রাপ্ত হইতে আবির সহ ৪।৫টি আম আনিয়া ঠাকুরকে উপহার দিলেন। ঠাকুর উহা অশ্বিনীকে রাখিতে দিলেন। কীর্তনান্তে ঠাকুর বলিলেন, “গোবিন্দজী স্বয়ং এই আম দিয়াছেন। এই আম কাটিয়া সকলকে প্রসাদ দাও।” কীর্তনের পর সকলেই পিপাসার্ত। দাদাগৌসাই ডাব আনাইয়া দিলেন। সকলেই প্রসাদ পাইল।

সাধুসেবার উদ্যোগ

১৫ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর অল্প সমুদ্র-স্নানে গেলেন। আসিবার সময় একটি বাবাজীকে ৫ টাকা দেওয়াইলেন। ব্রজবাসীরা আজ আসিরা দশটি ঘটা ও ধুতি চাদর লইয়া গেলেন। 'নাভার' নিকটবর্তী স্থানের একজন সন্ন্যাসীকে একজোড়া মটকা দিলেন। ঠাকুর সমস্ত জম্মায়েতের সাধুগণকে মহাপ্রসাদ ভোজন করাইতে ইচ্ছুক হইলেন। ঐ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায়ে ঠাকুর জগন্নাথদাস বাবাজীর নিকট গেলেন। পাঁচ সিকা প্রণামী দিয়া দাদাগৌসাই পঞ্চায়েত ডাকিবার প্রার্থনা করিলেন। মাধব মহাপাত্র সোয়ারের বাড়ী ললিত ও আমি যাইয়াও দেখা পাইলাম না। রাত্রিকালে সোয়ার আসিলেন। ঠাকুর হাতঘোড় করিয়া বলিলেন, "৪৫ হাজার সাধু ভোজন করাইতে হইবে। ইহার জন্য মহাপ্রসাদ, মালপুয়া, ডাল, তরকারী, কাণিকা প্রভৃতি দিতে হইবে। সমস্তই বাকী থাকিবে। এবার তোমাকে আমার লজ্জারক্ষা করিতেই হইবে। প্রায় ৩০০০ টাকা খরচ পড়িবে।" কথা বলিবার সময় 'জয় জগন্নাথ', 'জয় জগন্নাথ' বলিতে লাগিলেন। জগন্নাথদেবও প্রকাশ হইয়া এ বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন, বলিলেন। সোয়ার স্বীকৃত হইলেন। এ পর্যন্ত সোয়ার আমাদের নিকট প্রায় ১৫০০ টাকা পাইবে।

প্রেতের চীৎকার

১৬ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ সমুদ্রে যাইতে পারিলেন না। আজ বাসার নিকট সমস্ত পুলিশ, মিলিটারী পুলিশ, কাছারির সমস্ত পেয়াদা, দপ্তরীদিগকে কাপড়

চতুর্দশ অধ্যায়

৩৪৫

দিতে ইচ্ছুক হইয়া ১০৭ জোড়া ধুতি আনাইলেন। বাসার নিকটস্থ ২৫ জনকে ও মিলিটারী পুলিশ ২৫ জনকে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাহত ৩ জন ও উহাদের চাকর ৩ জনকে ভাল ধুতি চাদর দেওয়াইলেন। আর আর সকলে এখনও আসিয়া লয় নাই। একজনকে এক জোড়া মটকা, টিনওয়ালা বাবাজীকে একটি ঘটা এবং হরিদাস ঠাকুর সমাধি মন্দিরের জন্তও আর একটি ঘটা দিতে বলিলেন। গত কল্যা মুন্সেফবাবু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের জরের কথা বলায়, ঠাকুর ছেলেটিকে দেখিবার জন্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তারবাবু মুন্সেফবাবুর বাসায় গিয়া ছেলেটিকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেন।

আজ রাত্রিকালে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। প্রায় ১১টার সময় হঠাৎ বিকৃত চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলাম। ঐ চীৎকারে আমি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলাম। ঠাকুরের বামপার্শ্বে ব্রহ্মচারী নিদ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া বাতাস করিতেছিল। সে 'হরেনা'ম', 'হরেনা'ম' বলিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঐ চীৎকার খামিয়া গেল। ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন। চীৎকার শুনিয়া উঠিলেন। শুনিলাম, উহা প্রেতের চীৎকার। অসহ যন্ত্রণায় প্রেত হাহাকার করিতেছে। ঠাকুরের নিকট উহার প্রতিকার প্রার্থনা জানাইতেছে। প্রেত নিজের শরীর ঠাকুরকে দেখাইল, শরীর যেন আগুনে পুড়িয়া কাল হইয়া গিয়াছে। ঠিক দক্ষ কাঠের গায়।

রবিবার পঙ্গত বসিবে

১৭ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ সমুদ্র-স্নানে গেলেন। সমুদ্রের জল ঈষৎ রক্তবর্ণ। যেন গৈরিক রং জলে মিশিয়াছে। বাসায় ফিরিবার সময় দাদাগৌসাই জগন্নাথদাস বাবাজীর নিকট পতঙ্গ (সাধুসেবা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে

গেলেন। ঠাকুর হলো আতুরটিকে দু'আনা পয়সা দিতে বলিলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু আজ বাড়ী চলিলেন। তাঁহাকে একটা বড় নূতন ঘটা দেওয়া হইল। তাঁহার ঘটা ছিল না। আজ ৪১ জন বেঙ্গল রিজার্ভ পুলিশের তালিকা পাওয়া গেল। তাহাদিগকে ধুতি দেওয়া হইবে।

আজ ৮৭ জোড়া ভাল ধুতি চাদর আসিয়াছে। আরও ৬০ জোড়া আসিল। আপাততঃ যাহারা নাম দিয়া গিয়াছে, তাহারা পাইবে। ঠাকুর আহা়াস্তে জগন্নাথদাস বাবাজীর নিকট সাধুসেবার সংবাদ লইতে গেলেন। সম্ভবতঃ আগামী রবিবার 'পদ্মত' হইবে। প্রায় ৪০০০ চারি হাজার সাধু আসিবেন। কাপড়ওয়ালার দোকানে সাত হাজারেরও অধিক ধার হইয়াছে। সে কিছু টাকা চায়, নচেৎ দোকান ফেল পড়িবে। তথাপি আগামী কল্য ৪০ জোড়া দক্ষিণা ধুতি ও রবিবার ৪৫ শত জোড়া ধুতি চাদর দিতে স্বীকার হইয়াছে। ঘটাওয়ালারও ৪৫ শত ঘটা ঐ তারিখে বাকী যোগাইতে পারিবে বলিয়াছে।

জগন্নাথদেবের আদেশে সাধুসেবার ভিক্ষা

১৮ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ সকালে উঠিয়া সমুদ্রে গেলেন। ফিরিবার সময় আমিও সরলনাথ কিছু পিছনে পড়িলাম। ঠাকুর হরিবল্লভবাবুর সহিত একাঙ্গে কি কথাবার্তা বলিলেন। ঠাকুর পরে বলিলেন, "হরিবল্লভবাবুর ওখানে যাইবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু কি করি, জগন্নাথদেবের আদেশে যাইতে হইল।" আজ সরলনাথ দোকান হইতে ১১৩ জোড়া ধুতি চাদর আনিলেন। উহা বিভিন্ন আফিসের পিয়ন, দপ্তরী, পুলিশ প্রভৃতিকে দেওয়া হইল। এখানকার আফিসগুলির কয়েকজন পিয়ন, দপ্তরী ভিন্ন আর সকলেই ধুতি চাদর পাইয়াছে। আগামী রবিবারের জন্ম ৫০০

জোড়া ধুতি চাদর ও ৫০০ বটা আনিতে আদেশ করিলেন। কাপড়ের দোকানদারেরা দুই ভাই—হরি সাহ বড় ও দীনবন্ধু ছোট। বড় ভাইয়ের এত টাকার কাপড় বাকীতে দিবার ইচ্ছা ছিল না। তাই ছোট ভাইয়ের সহিত ঝগড়া করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ছোট ভাইটি বড় সং লোক। সাত আট হাজার টাকার জিনিষ বাকী দিয়াছে। লোক কত বলিতেছে, “ইহাদের কিছুই নাই। কোথা হইতে টাকা দিবে? ইহাদিগকে এত বাকী দেও কেন?” ছোট ভাই দীনবন্ধু তত্বত্বের বলে, “গৌসাইকে দেখিয়া আমার মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। কদাচ ইহাঁর ধার থাকিবে না।” দীনবন্ধু সরলনাথকে বলিয়াছে, “আমার এখন দুই এক হাজার পাইলেই চলিত। তাহা হইলেই মহাজনদিগকে কিছু কিছু দিয়া পুনরায় বজ্রাদি আনিয়া কারবার চালাইতে পারি, নচেৎ কারবার প্রায় বন্ধ হইতে চলিল।” ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “এ সব কথা খুবই ঠিক। দেখ, জগন্নাথদেব কি করেন।”

সায়ংকালে ঠাকুর পায়খানায় গেলেন। পায়খানা হইতে আসিয়াই বলিলেন, “যোগজীবন কোথায়?” দাদাগৌসাই আসিলে বলিলেন, “রূপবাবু ও উমাচরণবাবুর নিকট টেলিগ্রাম করিয়া দাও। জগন্নাথদেবের আদেশক্রমে সাধুসেবার নিমিত্ত রূপবাবুর নিকট ২০০০ ও উমাচরণবাবুর নিকট ৩০০০ টাকা ভিক্ষা চাহিতেছি। ইহা শুদান করিলে উভয়েরই কল্যাণ হইবে।” শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার বসু নিজে যাইয়া টেলিগ্রাম করিয়া আসিলেন। আজ সোয়ার আসিয়া বলিল, “ঘি, আটা, চাউল ইত্যাদির দোকানদার ‘শতপতি’ আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া জিনিষ দেয় না। যদি মুন্সেফবাবু বলিয়া দেন তবেই হইতে পারে।” আমাদের মাধো সোয়ার আশ্চর্য্য মানুষ। গত কল্যা ঠাকুরের নিকট বলিয়া গিয়াছেন, “আমার কোঠাবাড়ী বিক্রয় করিতেও যদি হয় তথাপি এই সাধুসেবার

নিমিত্ত প্রসাদ দিব।” ইনি ঠিক যেন আমাদের ঘরের লোক। আমাদের মানে ইহার মান ও অপমানে অপমান। মুন্সেফবাবুর বাসায় শতপত্তির গোমস্তা বিশ্বনাথ গিয়াছিল। মুন্সেফবাবু বলিয়াছেন, “ইহাদের টাকা কদাচ পড়িবে না। ইহাদিগকে নিঃশঙ্কভাবে জিনিষ দিতে পারেন।” রবিবারেই সাধুসেবার দিন নির্দিষ্ট হইল। চল্লিশ মণ দধি ও দশ মণ কন্দ করমাইস দেওয়া হইয়াছে। মাধো সোয়ারও প্রসাদ দিতে প্রস্তুত আছেন।

জগন্নাথদাস বাবাজীর অসঙ্গত দাবী

দাদাগৌসাই, ঠাকুরের অভিপ্রায় মত জগন্নাথদাস বাবাজীর নিকট রাত্রে গিয়াছিলেন। জগন্নাথদাস বাবাজী বলিলেন, “রবিবার ‘পন্থত’ হইবে স্থির হইয়াছে। ঐহার! বাহিরের লোক, তাঁহাদিগকে ঘোড়হাতে বলিয়াছি, এ দু’টি দিন অপেক্ষা করিয়া যান। তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। সাধু প্রায় তিন হাজার হইবে। উট, ঘোড়া প্রায় চারি শত আছে। উহাদের খোরাকের জন্ত নগদ এক শত টাকা, গাঁজা, আফিং এও দুই তিন শত টাকা পড়িবে। এখানে চারি সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ শত মঠ আছে। মঠের মোহন্তদের ও সাধুদের মর্যাদা করিতে হইবে। নিশানের ভেট দিতে হইবে। এই সমস্ত ও নানারূপ আবশ্যকীয় ব্যয় নগদ ২০০০ দুই হাজার টাকার কমে হইবে না।” সোয়ারেরও নগদ ৭৮ শত টাকা প্রয়োজন। সোয়ার অতিকষ্টে তিন শত টাকা যোগাড় করিয়াছে। আরও চেষ্টা করিতেছে। আজকাল ২৫৩০ জন সাধু বৈষ্ণব, কাদাল প্রভৃতি নিয়ত বাসার নীচে রাস্তায় আসন করিয়া রহিয়াছে। ঠাকুর প্রতিদিন ইহাদিগকে ১০ কি ৮০ আনা করিয়া দিয়া থাকেন।

পঙ্কতে বুঝি বাধা পড়ে

১৯শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ভোর ৪টার সময় দাদাগোঁসাইকে ঠাকুর বলিলেন, “নেড়া (শ্রীমতী চন্দ্রমণি দাসী) ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে টেলিগ্রাম করিয়া দাও। জগন্নাথদেবের আদেশক্রমে সাধুসেবার জন্ত নেড়ার নিকট ১০০০্ ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের নিকট ৫০০০্ টাকা ভিক্ষা চাই। রূপবাবু ও উমাচরণবাবুকেও তারে জানাইবে যে, সাধুসেবা আগামী কল্য রবিবার হইবে।” দাদাগোঁসাই বলিলেন, “কালীকৃষ্ণ ঠাকুর কিছা তাঁহার কর্মচারীরা এ কথাও বিশ্বাস করিবে না, বরং এ ঘটনা লইয়া নানারূপ কটাক্ষ করিবে।” ঠাকুর তাহাতে উত্তর করিলেন, “তাতে আমার মান অপমান কি? জগন্নাথদেবের আদেশমত কার্য্য করিতেছি। তাঁহার বিশ্বাস নাই করিলেন। এ পৃথিবীতে এমন একজনও ত থাকিতে পারেন, যিনি ইহা বিশ্বাস করিবেন।” হরেন্দ্রবাবু টেলিগ্রাম করিয়া আমাদের সহিত সমুদ্রপারে মিশিলেন। ঠাকুর স্নান করিয়া বাসায় আসিলেন। কাল ৪ সম্প্রদায়ের সাধুদের ‘পঙ্কত’। জগন্নাথদাস বাবাজীর উপর ভার। বাবাজী বহু টাকা চাহিয়া বসিলেন। নগদ অন্ততঃ এক হাজার টাকা এখনই দিতে হইবে বলিলেন। আমাদের হাতে এক পয়সাও নাই। বৈকালে বিশ্বাস মহাশয় হরিবল্লভবাবুর নিকট গেলেন। তিনি সাধুসেবায় ১০০্ টাকা দিলেন। এখন আমাদের কেবলমাত্র এই একশত টাকাই সম্বল। সায়ংকালে দাদাগোঁসাইকে ঐ ১০০্ টাকা সহ জগন্নাথদাস বাবাজীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া ঠাকুর বলিলেন, “তিনি যেন আপাততঃ ইহা দ্বারাই কোন প্রকারে কাজটি চালাইয়া দেন। আমাদের এই একশত টাকাই সম্বল।” দাদাগোঁসাই

ভগ্ননাথদাস বাবাজীর নিকট যাইয়া ঠাকুরের কথা জানাইলেন এবং ঐ ১০০ টাকা বাবাজীর সম্মুখে রাখিলেন। বাবাজী বলিলেন, “তব ক্যায়েসা হোগা, আব্ তো নিমন্ত্রণ হো চুকা, ক্যা কিয়া যায়।” যে কোন প্রকারে অন্ততঃ হাজার টাকা যোগাড় করিতে বলিলেন। ঠাকুরকে ইহা জ্ঞাত করায় তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি এক হাজার টাকাও দিতে পারিব না, সাধুসেবাও করিতে পারিব না।” দাদাগৌসাই ও কিশোরী-বাবু ঐ কথা বাবাজীকে বলায়, তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, “আচ্ছা, দেখা যাউক। সাধুদের হাতে-পায়ে পড়িয়া যদি রাজী করা যায়।” পরে আমরা জানিলাম, এখন পর্য্যন্ত সাধুদের নিমন্ত্রণও হয় নাই। এই সাধুসেবার প্রায় ১০,০০০ টাকার প্রয়োজন। অতঃপর ইহাই ঠিক হইল যে সোয়ারকে যে ভোগের কথা বলা হইয়াছে, সে তাহাই দিবে। সাধুরা পক্ষতে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ না পাইলে, দীনদুঃখী এবং অন্য় ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকেও ত উহার দ্বারা খাওয়ান যাইবে। বৈকালে মন্দিরের পূজারীরা আসিয়া ঠাকুরকে ধরিলেন। তাঁহাদিগকে ভোগের দক্ষিণ স্বরূপ ৫০০ টাকা দিবেন স্বীকার করিলেন। রাত্রে রূপবাবু ২০০ টাকা পাঠাইলেন। ঠাকুর ঐ ২০০ টাকা কি ভাবে ব্যয় করিতে হইবে, দাদাগৌসাইকে তাহা বলিলেন।

সাধুদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ

২০শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ খুব ভোরে যখন ঠাকুর আরতির গান করিতেছিলেন, তখন ভগ্ননাথদাস বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “টাকার কি হইল?” ঠাকুর বলিলেন, “দেখুন, এই একশত বই আর এ পর্য্যন্ত কিছু নাই। ভগবান না দিলে আমরা কোথায় পাইব? না

জানি হামারা ক্যা কহুর হয়। ম্যাসা তো কভি নেহি হয়।' বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, আমাদের ভগবান কৃপা করিয়া বাহা উপস্থিত করিবেন তাহা দ্বারা কাজ হইবে। এখন পত্র পুষ্প গ্রহণ করিয়া আপনারা কৃপা করুন।" জগন্নাথদাস বাবাজী বলিলেন, "কি প্রকারে হইবে? সাধুদের নিমন্ত্রণ করিলেই মর্যাদা করিতে হয়। উট, ঘোড়া প্রভৃতিকে খাইতে দিতে হয়। গাঁজা, চরস, অথবা ঠাকুরের ভোগ কোন্ বিষয়ে কমাইব?" ঠাকুর বলিলেন, "এই একশত টাকা বই আর নাই, ইহাতে একরূপ চালাইয়া নিন্।" জগন্নাথদাস বাবাজী বলিলেন, "তবে পদ্মত বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।" ঠাকুর বলিলেন, "আপনারা কৃপা করুন; বদি টাকা আসে তাহা হইলে আমি ইহাদের দস্তরমত মর্যাদা করিব।" ইহা শুনিয়া বাবাজী চলিয়া গেলেন।

অতঃপর মুসেফ্ বাবু, বিশ্বাস মহাশয় ও জগন্নাথদাস বাবাজী প্রতি আখড়ায় বাইয়া মোহন্তদিগকে, কৃপা করিয়া সেবা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এখন এই অর্থ দ্বারাই সমস্ত হইবে বুঝা গেল। মুসেফ্ বাবু আসিয়া বলিলেন, "জগন্নাথদাস বাবাজীর সঙ্গে প্রতি ছাউনিতে বাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলাম। তাঁহারা সহজেই রাজী হইলেন। সকলে অতি আদরের সহিত আমাদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।" আমাদের বাসায় যে গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় সাধুটি প্রায়ই আসিয়া থাকেন, তিনি বলিলেন, "এত টাকা কি জন্ত লাগিবে? ৩০।৪০ টাকায় উট ঘোড়াদের আহার চলিতে পারে। ৩৪ শত টাকার গাঁজা। এক অসম্ভব ব্যাপার।" অভয়বাবু বলিলেন, "সাধুরা বলিয়াছেন, 'গোসাইয়ের নিমন্ত্রণে আমরা অমনি যাব। জগন্নাথদাস বাবাজী এত টাকা লইয়া কিছুই আমাদের দিবে না; কোঠা করিবে'।"

চারি সম্প্রদায়ের 'পদ্ধত'

সাধুদিগকে দিবার জন্ত ৫০০ লোটা ও ধুতি সংগ্রহ হইয়াছিল। তাহা বিতরণের জন্ত আমরা বাসার ভিতরে সাধুদের প্রবেশ করাইতে লাগিলাম। বাসার আঙ্গিনায় ও ছাদে স্ত্রীলোক ও পুরুষ সাধুদের প্রত্যেককে একটি লোটা ও একখানা ধুতি দেওয়া হইল। বিধুবাবু প্রথমে দরজায় ছিলেন; পরে লোটা দিতে বাস্তব রহিলেন।

এই সময়ে পুনরায় জগন্নাথদাস বাবাজী আসিলেন। তিনি পদ্ধতের প্রত্যেক সাধুকে একটি লোটা ও চহাতী খান দিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। দোকানদার উহা দিতে স্বীকার করিল। পাঁচ হাজার ধুতি ঠিক হইল, কিন্তু লোটা ধারে পাওয়া যাইবে না। তখন জগৎবাবু নিজে দায়ী হইয়া ঐ লোটা বাকীতে ঠিক করিলেন। তিনি নিজে 'ভমশুক' লিখিয়া দিয়াও লোটা সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জগন্নাথদাস বাবাজী ১৩ জোড়া 'মুকুটা' ও ভবিষ্যতে মোহন্তদিগের মর্যাদার জন্ত ৭৮ শত টাকা চাহিলেন। "ভবিষ্যতে টাকা হইলে মিলিবে" বলিয়া ঠাকুর স্বীকার করিলেন। জগন্নাথদাস বাবাজী ক্রমে ক্রমে ষোল টাকা আদায় করিলেন।

মাধো মহাপাত্র একজন সাধারণ সোয়ার। এত বড় কাজ সে করিতে ইহাতে রাজার বড় সোয়ারের খুব ঈর্ষা হইল। বড় সোয়ার তাহাকে পিঠা রান্না করিতে চুল্লি দিবে না। জগৎবাবু তাহাকে অনুরোধ করিয়া চুল্লি দেওয়াইলেন। পুনরায় শুনিলাম, মাধো সোয়ারকে পাক করিতে দিবে না, পাক করিলে তাহাকে মারিবে। এইজন্ত দাদাগোঁসাই ও সরলনাথ মন্দিরে গেলেন। জগৎবাবু উহাও বিচক্ষণতার সহিত মিটাইয়া দিলেন। আগাদের সোয়ার বলিল, "সে জন্মাবধি এরূপ বিরাট জেত

চতুর্দশ অধ্যায়

৩৫৩

দেখে নাই। ২০০ কনিকা (মিঠা পোলাও), ২০০ বাইহাণ্ডি (মহা-
 প্রসাদ) ১০,০০০ দশ হাজার মালপুয়া, ৪০/০ চল্লিশ মণ দধি, ১০/০ মণ
 কন্দ (মিষ্ট), উক্ত প্রসাদ অনুযায়ী ডাল, বেসর (স্নজ্জো), মোহর
 (বালের ডালনা) ইত্যাদি।” আমরা বাসা হইতে প্রায় ৫টার সময় বড়
 আখড়ার দিকে রওনা হইলাম। পূর্বেই বহু সাধু সেখানে উপস্থিত
 ছিলেন। ২৫০০।৩০০০ সাধু ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবদি
 ওখানে উপস্থিত হইলেন। বড় আখড়ায় অনেক স্থান, প্রকাণ্ড আগুনি।
 ছোট দরজা দ্বারা অল্প একটা প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা যায়। উহা একটা
 আখড়ার স্থায়। ‘আচারী’ সাধুরা দালানের ছাদে বসিয়াছেন। তাঁহারা
 প্রায় ৩০০ হইবেন। ‘নির্ঝাণী’দল উক্ত প্রকোষ্ঠের নীচে ও ছাদে
 বসিলেন। মঠের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের একখানা ঘরে আমাদের ভাণ্ডার
 রহিল। রাশি রাশি ঘটা ও কাপড়ের বস্তা তথায় জমা রহিয়াছে।
 নিকটেই ছাদে উঠিবার সিঁড়ি। সেখানে দাঁড়িপাল্লা খাটাইয়া ডেপুটী
 শশীবাবু ঘটা ওজন করাইতেছেন। ডেপুটী জগৎবাবু দোকানে ও বাহিরে
 নানাস্থানে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। দিদিমা ও শান্তিদিদি প্রভৃতির
 কিছু সময় ভাণ্ডারঘরের, নিকট ও ছাদে উঠিয়া দর্শন করিয়া বাড়ী গেলেন।
 মুসেফবাবুর জীও কস্তার সহিত দর্শন করিয়া গেলেন। শ্রামাকান্ত পণ্ডিত
 মহাশয় মালপুয়ার গৃহ ও কলার পাতা পাহারা দিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র
 মিত্র মহাশয় প্রসাদগৃহের কর্তা রহিলেন। জগন্নাথদাস বাবাজী ও অল্প
 কোন কোন মোহন্ত বহুক্লেণ করিয়া সমস্ত দিক তত্ত্বাবধান করিতে
 লাগিলেন। প্রদীপ জ্বলাইবার জন্ত ১/০মণ পলাং তৈল আসিল। ১৬ জন
 মশালধারী নানাস্থানে থাকিয়া মশাল ধরিল। মাটির খোরাতে করিয়া
 তৈল ও মোটা ‘সলতের’ প্রদীপ নানাস্থানে অনেক জ্বালান হইল। স্থানটি
 দীপমালায় সুন্দররূপে আলোকিত ও সাধুদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া কুস্ত-

মেলার একটি পল্লীর মত বোধ হইতে লাগিল। শশীবাবুর খুব আনন্দ। কেবল ‘হরিবোল’, ‘হরিবোল’ বলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, “আর কি ? হরিবোল।” কতক্ষণ পরে পাতা পড়িল। প্রথমতঃ মহাপ্রসাদ, ডাল, তরকারী, মোহর, বেনর, টক, মালপুয়া, কানিকা, দধি প্রভৃতি দেওয়া হইলে সাধুরা জয়ধ্বনি পূর্বক আহারে বসিলেন। আহারে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে জগন্নাথ, শশীবাবু, মুন্সেফবাবু, শশীবাবুর ছেলে, অশ্বিনী ও অন্যান্য অনেকে ঘটা ও কাপড় দিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ দুই তিনবার ঘটা কাপড় লইল। সে যাহা হউক, এইরূপ নির্বিরোধে এত বড় কর্ম সম্পন্ন হইতে বড় দেখা যায় না। রাধাকান্ত মঠের পূজারীর সহিত জগন্নাথদাস বাবাজীর মুখোমুখি হয়। জগন্নাথদাস বাবাজী রাগিয়া মারিতে চকু দেন। ঠাকুর তাঁহার পা ধরিয়া অনুন্নয় করিয়া থামাইয়া দিলেন।

পঙ্গত বসিবার পূর্বেই দাদাগোঁসাই সাধুদের নিশান পূজা করিয়া আসিলেন। আমি ১৫টি নিশান গণিলাম। পঙ্গত শেষ হইতে অনেক সময় লাগিল। পঙ্গত শেষ হইলে সাধুরা, “এই দাও, ও দাও” বলিয়া ঠাকুরকে ঘেরিল। ঠাকুর “ভবিষ্যতে যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিবার ইচ্ছা রহিল” বলিলেন। প্রায় ২০০০ কাপড়, ১০০ ঘটা ও প্রায় চারি হাজার লোকের মহাপ্রসাদ যাহা যাহা অবশিষ্ট ছিল, বড় আখড়ার মোহরের নিকট সমর্পণ করিতে ঠাকুর মহেন্দ্রবাবুকে আদেশ করিলেন। মোহর বাবাজী বড়ই সংলোক। তিনি ঐ সকল বস্ত্র, লোটা, প্রসাদ প্রভৃতি ইচ্ছামত দান করিবেন। এই বলিয়া ঠাকুর বাসায় ফিরিলেন। শুনিলাম উহা দ্বারা তিনি মুক্তিমণ্ডপের ব্রাহ্মণ, মন্দিরের দ্বাররক্ষক ও অন্যান্য সেবক ও দীনদুঃখীদিগকে আহার করাইয়াছেন। বাসায় আসিতে রাত্রি ২০টা হইল। আহার করিতে শুইতে ৩টা বাজিল। ইতিমধ্যে দিদিমা ও

চতুর্দশ অধ্যায়

৩৫৫

সোয়ার বহু কান্দালী ও জগন্নাথবল্লব নঠের বৈষ্ণবদিগকে বাসায় আনিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। মুন্সেফবাবু, জগৎবাবু, হরেকৃষ্ণ পাণ্ডা ও সুরেনবাবুর বাসায়ও মহাপ্রসাদ পাঠান হইয়াছিল। তথাপি বড় বড় পাঁচ হাঁড়ি মহাপ্রসাদ ও ৪০।৫০টি তরকারির হাঁড়ি অবশিষ্ট ছিল। সরলনাথ অনাহারে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিল।

ছোটছাতার মোহন্ত ও সাধুদের সহিত অস্ত্রাস্ত্র সাধুরের দলাদলি; তাহাদিগকে ১২৫ খণ্ড বস্ত্র ও ঐ পরিমাণ লোটা ও মহাপ্রসাদ পাঠান হইল। বড়ছাতায় এবং অস্ত্রাস্ত্র কোন কোন আখড়ায়ও প্রসাদ পাঠান হইয়াছিল। পঙ্গভের সময় কতকগুলি বদমায়েস লোক ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিলে, ডেপুটী শশীবাবু প্রভৃতি থানা হইতে কনেষ্টবল আনিয়া মোতায়েন করাতে তাহারা নিবৃত্ত হয়।

ঠাকুর অনুস্থ

২১শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুরের শরীর বড় খারাপ হইয়াছে। সাতটার সময় যখন পায়খানা যান তখন দিবা কি রাত্রি জ্ঞান ছিল না। দুই প্রহরের সময় বাসার সমীপস্থ ১২ জন ও অন্ত তিনজন সাধুকে ধুতি ও লোটা দেওয়া হইল। ইংহারা কয়েক দিন যাবৎ দরজায় আসন করিয়া রহিয়াছেন। বান্দালী নানকপন্থী বাবাজী আজ আসিয়া বলিলেন, “অনেক মোহন্তকে জগন্নাথদাস বাবাজী নিয়ন্ত্রণ করেন নাই। তিনি জগন্নাথদাস বাবাজীর অনেক কুৎসা করিলেন।” মুন্সেফবাবু আসিয়া পুলিশের সাহায্যে বাসার নিকটস্থ রাস্তা হইতে সাধুদিগকে উঠাইয়া দিলেন। শ্রীধর গল্প করিলেন, “কাপড়ওয়ালা দীনবন্ধু বলিয়াছে, ‘আমার ত কিছু ছিল না, জগন্নাথদেবই

৩৫৬

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

দিয়াছেন। আবার তিনি যদি সাধুসেবায় আমার সমস্ত গ্রহণ করেন, তবে তাহাই হউক।”

সাধুসেবায় মহাপ্রসাদ পাকের প্রশংসা

২২শে চৈত্র, ১৯০৫ সাল।

আজ অপর একটি নানকপন্থী বাবাজী আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই বলিলেন। ইনি বাউলীমঠের মোহন্ত। গত কল্যা ঠাকুর বাহাকে সরবত দিয়াছিলেন, সেই পাগলা মোহন্ত ১৫।১৬ জন সাধু লইয়া ঠাকুরের নিকট কাপড় ও লোটা লইতে উপস্থিত হইলেন। আর এক দল সাধুও উপস্থিত হইলেন। আমরা দরজা হইতে তাঁহাদিগকে বড় আখড়ায় পাঠাইয়া দিলাম। ঠাকুর ‘নির্কলী’ মোহন্তজীকে বলিলেন, “প্রায় ২০০০ কাপড় এবং কতকগুলি লোটা বড় আখড়ার মোহন্তের নিকট রাখা হইয়াছে। তিনি বাহাকে যাহা দিবেন তাহাই হইবে।” সরলনাথের নিকট কাপড়ওয়াল বলিয়াছে, হাজার পাঁচেক টাকা ৫৬ দিনের মধ্যে না পাইলে তাহার বড় ক্লেশ হইবে। টাকার অভাবে চালান আসিতেছে না। সোয়ার বৈকালে আসিয়াছিল। সকলেই মহাপ্রসাদের পাক অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া প্রশংসা করিলেন। জগন্নাথদাস বাবাজী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই বলিলেন “ঘি খারাপ”। কিন্তু কেহই তাঁহার কথা সমর্থন করেন নাই। আমরাও রাত্রি ৩টার সময় প্রসাদ পাইয়া দেখিয়াছি, ঘি ভাল ছিল, পাকও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। মালপুয়া আজও ভাল আছে, কোন গন্ধ হয় নাই।

সন্ধ্যাকালে কয়েকটি পণ্ডিত ও সাধু আসিলেন। উহার মধ্যে একজন কাশীবাসী ভাগবতের পণ্ডিত। ঠাকুর তাঁহাকে একটি বড় ঘি

দিলেন। ঐ ঘটতে সাধুসেবাব জল পরিবেশন হইয়াছিল। বড়দাদা (ডাক্তার হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) প্লেগ ডিউটিতে বেরিলৌ চলিলেন গুনিয়া বড়ই উদ্ভিগ্ন হইলাম।

বাজার ধার সম্বন্ধে নানা সমালোচনা

২৩শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অস্থস্থ। দিদিমা মন্দিরে গিয়াছিলেন। তথায় একটি পাণ্ডা বলিল, “গৌসাই ত ভারী দান করিল! কুড়ি হাজার টাকা বাজার ধার। শোধের ত কোন উপায় নাই। কি করিয়া আদায় করিবে। একদিন রাত্রিকালে পলাইয়া যাইবে।” একটি স্ত্রীলোক নিকটে ছিলেন, তিনি এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। দিদিমাও বলিলেন, “কিছু ভাবিও না, গৌসাইর দুইখানি বাড়ী আছে। কিছু জমি আছে। তাহা বিক্রয় করিয়াও ত ধার শোধ হইতে পারিবে? গৌসাইয়ের একজন শিষ্য, এমন কি, আমি থাকিলেও উহা পরিশোধ হইবে।” পাণ্ডা বলিল, “আমি বলি না, দোকানদারেরা বলে।” দীনবন্ধু কাপড়ওয়ালার বড় দুরবস্থা। দোকান একরূপ বন্ধ। সে বলিয়াছে, “আর কাপড় চাহিলে আমি দিতে পারি, কিন্তু যে সকল কাপড় দোকানে নাই, তাহা আনাইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। পুরাতন পাইকার সকল বস্ত্র না পাইয়া অন্য দোকান ঠিক করিলে স্থায়ীরূপে ক্ষতি হইবে। অতএব আজকালের মধ্যে কিছু অর্থ অতি প্রয়োজন।” দীনবন্ধু ইতিপূর্বে একবার পাগল হইয়াছিল। তাহার দোকানের কর্মচারীরা ভয় করে পাছে সে পুনরায় ক্ষেপে।

আজ ঢাকা হইতে রাখাবল্লভবাবু লিখিয়াছেন, ২০০ টাকার জ্ঞপ্তি তারে খবর দিয়াছিলেন তাহা পাঠাইয়াছি। পুরীর ঘটনা সকল বিস্তারিত

লিখিবেন। দাদাগোঁসাই পত্র পাইয়া আশ্চর্য। সকলেই আশ্চর্য হইলেন। জগন্নাথদেবের আদেশক্রমে ২০০০, দুই হাজার টাকার জন্ম তার করা হইয়াছিল। তারের লোকদের ভুলক্রমেই এরূপ ঘটিয়াছে। আজ পুনরায় রাজবল্লভের নামে তারে খবর গেল, “২০০ শতের নহে ২০০০ হাজারের জন্ম। উহা ডাক বিভাগের কর্মচারীদের ভুলে ঘটিয়াছে।” উমাচরণবাবুর নিকট হইতেও খবর আসিল, “আমি কলিকাতা ভোরে পৌঁছিয়াছি। অর্থের কি এখনও প্রয়োজন আছে?” তারে উত্তর গেল, “অর্থের বিশেষ প্রয়োজন, তারে পাঠাইবে।” বৈকালে কয়েকটি সাধু আসিলেন। একজন বৈষ্ণব পাগলের দ্বায় গান ও নৃত্য করিলেন।

মাধোদাস বাবাজীর শিষ্য নারায়ণদাস বাবাজীর আগমন

২৪শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। শ্রীধরজী আজ স্নান করিয়া বাসার ফিরিবার পথে জগন্নাথদাস বাবাজী তাহাকে ডাকিলেন। শ্রীধর, বাবাজীর নিকট যাইয়া বলিল, “আপনি গোঁসাইর নিকট হইতে মর্যাদা প্রভৃতির জন্ম অনেক অর্থ লইয়া দালান, কোঠা করিবেন, লোকে বলে।” সাধুদের ব্যবহারে মন বড় উত্যক্ত হইয়াছে। সাধুদের অর্থের জন্ম এত লিপ্সা কেন? শাস্ত্রে সাধুদের লক্ষণ শুনিয়াছি, “তঁাহারা যাজ্ঞা করিবেন না।” বৈকালে জগন্নাথদাস বাবাজী ও অগ্রান্ত কয়েকজন সাধু আসিলেন। বাবাজী বলিলেন, “প্রশংসা ত শূকরের বিষ্ঠা। নিন্দাই সাধুদের গুহ্মির কারণ।” ঠাকুর এ কথা সমর্থন করিলেন এবং অর্থ আসিলে সাধুদের মর্যাদা করিবেন বলিলেন।

আজ অষোধ্যার নারায়ণদাস বাবাজী আসিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কেহ তঁাহাকে চিনিতে পারে নাই। তিনি ঠাকুরের হাতে কিছু ভিক্ষা চাহেন।

ঠাকুর অত্যন্ত অহুন্নয় বিনয় করিলেন এবং ভাণ্ডার শূন্য জানাইয়া সরলনাথ দ্বারা ১০৮ টাকা ধার করাইয়া তাঁহাকে দিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ মাধোদাস বাবাজীর শিষ্য। ইনি ইচ্ছা করিলে অবোধ্যার ব্যাধি কি অগ্রত্ব হইতে এখনই দশ লক্ষ টাকা আনাহিতে পারেন। মাধোদাস বাবাজীর প্রভাব, অবোধ্যায় বড়দাদার নিকট গুনিয়াছি। কাল নারায়ণদাস ও ঠাকুরের নিকটও অনেক গুনিলাম। একদিন দশ বার হাজার সাধু আসিয়াছেন। রাত্রি তখন ছ' প্রহর। ঘি নাই, কি করিয়া ভাল রুটি প্রস্তুত হইবে? মাধোদাস নিকটস্থ ২৩টি শিষ্যকে বলিলেন, “সরযুতে বাইয়া কলসী ভরিয়া লইয়া আইস।” শিষ্যেরা তাহাই করিল। কড়াতে ঢালিয়া দেখা গেল উহা জল নহে, উৎকৃষ্ট স্নাত। নারায়ণদাসকে দাদাগোঁসাই টাকা দিয়া নমস্কার করিলে তিনি স্তম্ভিতদৃষ্টিতে তাঁহার পানে তাকাইলেন। ঠাকুরের গায়ের বেনিয়নটি (গেঞ্জি) নিকটে রহিয়াছে দেখিয়া একবার উহা লইলেন, আবার ফিরাইয়া দিয়া পুনরায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “আমাদের চিহ্নস্বরূপ উহা গ্রহণ করিয়াছেন।”

রাত্রি ৯টার সময় উমাচরণবাবুর প্রেরিত ৩০০০ টাকা তাহা আসিল। ১২০০ টাকা নগদ পাওয়া গেল। বাকী আগামী কল্যাণ পাওয়া যাইবে। এই ১২০০ টাকা দীনবন্ধুকে দেওয়া হইল। বড় দাণ্ডের রাস্তা দিয়া মাঝে মাঝে নিশাকালে যে সাধুটি বংশীধ্বনি করিয়া যান, তিনি এ সময় আসিয়া ৩৪ বার বংশী বাজাইলেন। বড় স্তম্ভিত স্বর। অবোধ্যাবাসী দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ বাবাজীকে একজোড়া ‘মুকুটা’ ৪০ টাকা দিয়া আনাইয়া দিলেন। এই বাবাজী সাধুদের পদ্মতের সময় বহু সংপরামর্শ দিয়াছিলেন।

২৫শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ভোরে বংশীবাদক সাধুটিকে ঘণ্টা ও মটকা দেওয়া হইল। দীনবন্ধু

কাপড়ওয়ালা ৯১০ টার সময় আসিয়াছিল। উহার সহিত ঠাকুরের কি কথাবার্তা হইল। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিল, “এ ত গোঁসাইএর দোকান।” আজ উমাচরণবাবুর বাকী ১৮০০ টাকা পাওয়া গেল। উহা হইতে দীনবন্ধু ৬০০ ছয় শত, হরি সাউ ৩০০ টাকা, সোয়ার ৬০০ টাকা, দুধওয়ালা প্রভৃতি ১০০ ও নগদ ধার শোধ ২০০ টাকা দেওয়া হইল। বৈকালে নারায়ণদাস বাবাজী আসিলেন। তিনি বলিলেন, “পঞ্চতত্ত্ব—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার যাঁহারা জয় করিয়াছেন, তাঁহারাই সাধু।” তিনি আফিং খাওয়ার জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ১০ আনা চাহিলেন। ১ টাকা দেওয়া হইল। ইনি ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিলেন, “উনি ভগবানের স্বরূপ। তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।”

সরলনাথ দীনবন্ধুর নিকট হইতে আরও ১০০ জোড়া ধুতি আনিয়া রাখিলেন। পুলিশ, ডাক্তারখানার চাপরাসী প্রভৃতিকে দেওয়া হইবে। বৈকালে অনেক সাধুসজ্জন ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

হুগলী স্কেলার একজন রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ গৈরিক লইয়াছে। গুরু-করণ হয় নাই। ঠাকুর তাহাকে শাস্ত্রানুসারে চলিতে বলিলেন। বলিলেন, “শাস্ত্র সদাচার অবলম্বন না করিলে কিছুই হবার যো নাই।”

২৬শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ আমাদের বাসার চাকর, মেথর প্রভৃতিকে কাপড় দেওয়া হইল। হাঁসপাতালের চাপরাসী ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারী প্রভৃতিকে বস্ত্র দিলেন। বুড়ার (চাকরের) স্ত্রীও অন্য তিনটি ছেলে, অনন্ত দেব (চাকরের) সমস্ত পরিবার, পান্নাদের চাকর মুকুন্দ সপরিবারে বস্ত্র পাইল। সায়ংকালে অনেক সাধু ও অন্যান্য লোক দর্শনে আসিলেন।

নানকজীর কথা

২৭শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। একটি অন্ধ দু'প্রহরের সময় একটি ষটী ও খাবার পাইলেন। সন্ধ্যাকালে ডেপুটীবাবু ও বালেশ্বরের একটি ভদ্রলোক আসিলেন। ঠাকুরকে একটি উৎকৃষ্ট পেয়ারা দিলেন। শশীবাবু, জগৎবাবু, মুন্সেফবাবুও আসিলেন। ঠাকুরের নিকট একটি পাঞ্জাবী সাধু কয়েকদিন যাবৎ আসিতেছেন। তাঁহার সহিত ধর্মচর্চা হইল। গুরু নানক সম্বন্ধে দুই মত। কেহ বলেন ইনি ভগবান বিষ্ণুর অবতার; কেহ বলেন ইনি জনক ঋষি ছিলেন।

জনক ঋষির মৃত্যু হইলে তিনি বিষ্ণুলোক যাইতেছেন—পথে যমলোকের সম্মুখবর্তী হইলে এক ভীষণ কলরব তাঁহার প্রতিগোচর হইল। তিনি সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি?” তাঁহারা বলিলেন, “এ শব্দ যমপুরী হইতে আসিতেছে।” তখন জনক ঋষি যমপুরী দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। বিষ্ণুদূত সকলে বিষ্ণুর অমুজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে যমপুরী লইয়া চলিলেন। যমের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ কলরবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যম বলিলেন, “এ পাপীদের আর্তনাদের শব্দ।” তখন তিনি উহা দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলে, স্বর্ঘ্যরাজ জনক ঋষিকে নরক দর্শন করাইলেন। নরকে পাপী তাপীর যন্ত্রণা দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল এবং কি করিলে ইহাদের পরিত্রাণ হয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন স্বর্ঘ্যরাজ বলিলেন, “যদি কেহ স্বাসে প্রস্থাসে নাম করিতে পারেন এবং সেই নামের পুণ্যফল ইহাদিগকে অর্পণ করেন, তাহা হইলে ইহাদিগের মুক্তি হয়।” জনক ঋষি বলিলেন, “আমার সমস্ত জীবনের নামের ফল ইহাদিগকে অর্পণ করিলাম। স্বর্ঘ্যরাজ বলিলেন, “সমস্ত জীবনের ফলদান করিতে হইবে না, একদিনের ফল অর্পণ করুন।” উহা করিবামাত্র সমস্ত

পাপী উদ্ধার হইয়া স্বর্গে গেল। কিন্তু তথায় যাইয়া ও এত আনন্দ-
 প্রমোদের মধ্যেও আহাৰ্য্য কিছু না পাইয়া ঐ সকল পাপী পুনরায় চাঁৎকার
 আরম্ভ করিল। তখন পুনরায় উহার কারণ অনুসন্ধান করায়, ইন্দ্র
 তাঁহাকে বলিলেন, “ইহারা ত কিছু দান করে নাই, কি খাইবে? বাহা
 পৃথিবীতে দান করা যায় তাহাই এখানে উপভোগ হয়। যদি ইহারা
 পুনরায় জন্মগ্রহণের পর আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া, ভগবানে ভক্তি ও
 দান করে তবে ইহাদের কল্যাণ হইবে।” এইজন্ত জনক ঋষি নানকজী
 রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, “কোন সময়ে
 নানকজী জলে ডুবিয়া যান। তখন বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে বিষ্ণুর সমীপে
 লইয়া যান। ভগবান জনার্দন বলিলেন, “তুমি আমার অবতার। নাম দান
 ও সংস্দের মহিমা প্রচার কর।”

নামেই সব হয়

২৮শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অস্থস্থ। বড়দাদার নিকট ৬০০০ টাকা
 ধারের জন্ত তাকে খবর দিলেন। বৈকালে ১০।১২ জন সাধু আসিলেন।
 তাঁহারা প্রত্যেকে একটি লোটা ও কাপড় পাইলেন। বাউলা মঠের
 মোহন্ত ও ঐ মঠের একটি পাঞ্জাবী গুরুগোবিন্দ সিংহের গ্রন্থসাহেব পাঠ
 ও ব্যাখ্যা করিলেন। একজন বৈষ্ণব ঠাকুরের গলার তুলসীর মালা
 চাহিলেন। ঠাকুর উহা ভজনের বস্তু বলিয়া দিলেন না। একজন
 জিজ্ঞাসা করিলেন, “নামেই সব হয়?” ঠাকুর বলিলেন, “হঁ।” প্রশ্ন:-
 “কাম যায়?” “উ:-“নিশ্চয় যায়”। আজ প্রায় ২০।০টার পর শান্তিপুরের
 নিকটস্থ গ্রামবাসী একটি ভদ্রলোক ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
 আসিলেন। ইনি এক জমিদারের ম্যানেজার। ইনি বড়ই সম্মান
 লোক। ঠাকুরকে কাকিনিয়ায় ২১।২২ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছিলেন।

বলিলেন, “গোস্বামী বংশের অনুরূপ কার্যই করিয়াছেন। বানরবধ বন্ধ করা বড়ই ভাল কার্য হইয়াছে। পুলিশ সাহেব, কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন, ‘একজন বাঙ্গালী (learned) শিক্ষিত সাধু ইহা বন্ধ করিয়াছেন’।”

২৯শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। সায়ংকালে ১০।১২ জন সাধু আসিলেন। দুই একটি এদেশী পণ্ডিত বানরবধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তাঁহাদিগকে আমাদের গল্পের ছাপান বই দেখান হইল। সাধুদের মর্যাদা দেওয়া সম্বন্ধে বড়ছাতার একটি সাধু আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন। ঠাকুর উত্তর করিলেন, “দোকানদারদের স্বস্থ না করিয়া সাধুদের মর্যাদা করা অসম্ভব।”

৩০শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ বৎসর শেষ হইল। ঢাকা হইতে তারে খবর আসিয়াছে। “রাধাবল্লভবাবুর জীবন গর্ভে সম্ভান মারা গিয়াছে, ডাক্তারেরা বলিতেছে। এখন কি কর্তব্য।” ঠাকুর বলিলেন, “ডাক্তারেরা যাহা বলেন তাহাই করিবে। ২০০০ টাকা সাধুসেবার জন্ত জগন্নাথদেবের আদেশে প্রার্থনা করা হইয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র ২০০ টাকা পাঠাইয়াছে এবং ঢাকার চিঠিতে জানা গেল যে, ইহা লইয়া নানাপ্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপও হইয়াছিল।”

শান্তিদিদির শরীর বড় অসুস্থ। আমার মনেও অশান্তি। কোনও বিগ্রহেই বিশ্বাস নাই। সকলই কাষ্ঠ কি প্রস্তরের বিগ্রহ মাত্র বোধ হইতেছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবেও বিশ্বাস নাই। আজ মন্দিরে যাইয়া তথায় শুইয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম। সেজন্য বোধ হয় এইরূপ বিকৃত ভাব হইয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিষ প্রয়োগ

১লা বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

সাধুদের পঞ্চতের দিন গাঁজায় ধোঁয়ায়, লোকের সংঘটে, গরমে ও অনিয়মে ঠাকুরের শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়াছে। কিন্তু নিয়ম মত পাঠ প্রভৃতি সমস্তই চলিল। একটি সাধু সায়ংকালে একখানা লুই ও ধুতি পাইলেন। অল্প একজন সাধু, 'সখী' সাজিয়া আসিয়াছিলেন, তিনিও ধুতি ও চাদর পাইলেন। বড়ছাতার বাবাজী ও বাউলী মঠের মোহন আসিলেন। মোহনজীকে রোজ না আসিয়া মাঝে মাঝে আসিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রের গৌসাইর নিকটস্থ বাবাজীর জন্য ধুতি চাদর ও অল্প ২৪ জনকেও ধুতি চাদর দেওয়া হইল। গোবিন্দ গুড়িয়া (চিনিওয়াল) টাকা চায়। তাহার প্রায় ৭৮ শত টাকা বাকী। এই মাসের মধ্যে মিলিবে বলিয়া দাদাগৌসাই তাহাকে আশ্বাস দিলেন। সন্ধ্যাকালে ষ্টেশন মাষ্টার প্রভৃতি ২৪ জন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

রাধাবল্লভবাবুর স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা

জগন্নাথদেবের আদেশ

২রা বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। বড়দাদা বেরিলি হইতে চিঠি লিখিয়াছেন। "টাকা ধার পাওয়া যাইবে কি না বলিতে পারি না। সম্ভব কম।" ভগবানের লীলা অনন্ত ও অগম্য। এই চিঠি পাঠ করিয়া ঠাকুর পুনরায় গোরাচাঁদবাবু, কুঞ্জলাল নাগ, বাঁকীপুরের উকিল ব্রজেন্দ্রবাবু ও

শরৎবাবুকে প্রত্যেকের নিকট তিন হাজার এবং সতীশবাবুর নিকট এক হাজার টাকার জ্ঞান নিজের নামে তারে খবর দেওয়াইলেন। ঐ সময় বিধুবাবুর কথায় দাদাগৌসাই রাধাবল্লভের স্ত্রী কেমন আছেন জানিবার জ্ঞান তার করিলেন।

সকালবেলা মন বড় অস্থির ছিল। মন্দিরে দর্শনে গেলাম। কল্যাণ বিগ্রহ দর্শনকালে, “উহা কাঠময়, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কেমন করিয়া হইবে?” এইরূপ ভাব মনে আসিয়াছিল। আজ মন বড় খারাপ। মনে করিলাম, “বিশ্বাস করি কি নাই করি, দ্রব্যগুণ ত আছেই?” বস্তুতঃ বিগ্রহ দর্শন করিয়া মন অনেকটা হাল্কা হইল। অনেক দিনই দেখি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিলে বুকের ভিতর হইতে কে যেন একটা বোঝা নামাইয়া লয়। ‘নাম’ আপনা আপনি চলিতে থাকে।

রাধাবল্লভবাবুর নিকট হইতে প্রায় ৪টায় তারে খবর আসিল “এখনও গর্ভস্থ সন্তান সম্বন্ধে কি করা হইবে স্থির হয় নাই। আগামী কল্যাণ সন্তান কাটিয়া বাহির করা হইবে। ডাক্তারদের বিভিন্ন মত, কি করিব?” আবার কিছুক্ষণ পরে টেলিগ্রাম আসিল, “স্ত্রীর ভয়ানক জ্বর ও যন্ত্রণা। অপরাধ মার্জনা করুন।” ইতিপূর্বেই তারে জানান হইয়াছিল “ভগবানে নির্ভর কর। তিনি বাহা করিবেন তাহাই হইবে।” পুনরায় রাত্রি সাড়ে দশটার সময় তার আসিল, “প্রসূতির সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতেছে না।” উত্তরে ঠাকুর জানাইলেন, “যদি এক হাজার ব্রাহ্মণের পাদোদক সূর্য্যোদয়ের পূর্বে খাওয়াইতে পার তবে জীবিতাবস্থায় ছেলে ভূমিষ্ঠ হইবে এবং প্রসূতিও সুস্থ হইবে।” আমাদিগকে বলিলেন, “শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই আদেশ। কিন্তু ইহারা বিশ্বাস করিবে, মনে হয় না।”

রাত্রিতে ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে বলিলেন, “হাজার ব্রাহ্মণের পাদোদক

এক রাত্রির ভিতর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে কি প্রকারে যোগাড় হইবে?" ঠাকুর বলিলেন, "কেন? তাহারা বড়লোক—অনেক কর্মচারী আছে। ছেলেদের মেসে মেসে (mess) লোক পাঠাইয়া তো অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারে।" তাহাতে ব্রহ্মচারী বলিল, "তারা কি আর ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যাপূজা কোন কালেও করে না। অনাচারের একশেষ।" ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, তোমার মত বুদ্ধি হইলেই হয়েছে—তা হ'লেই ওতে গোল বাধিবে। যার গলায় পৈতা দেখিবে তারেই ব্রাহ্মণ জ্ঞানে পাদোদক আনিবে।"

বিধুবাবুর ধার শোধের চেষ্টা

আজ বিধুবাবু আহাৱাস্তে ৪টার সময় ঠাকুরকে নির্জনে বলিলেন, "আমি কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাই। টেলিগ্রামে অনেকে বিশ্বাস করে না।" ঠাকুর বলিলেন, "জগন্নাথদেবের আদেশক্রমেই আমি কাৰ্য্য করিয়াছি। এ বিষয় আমার আজ্ঞা অনাজ্ঞা নাই। ইচ্ছা হয়, যাও।" কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ বিষয়ে জগন্নাথদেবের অনুমতি হইয়াছে।" বিধুবাবু আজই কলিকাতা হইয়া ঢাকা, নোয়াখালি, ইদিলপুর প্রভৃতি স্থানে চলিলেন। ঠাকুর এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া দিলেন :—

শ্রীশ্রীহরি শরণং

আমি ৬জগন্নাথদেবের আদেশ মত সাধুসেবা করিয়াছি। এখানে কিছু দেনা হওয়াতে অর্থের প্রয়োজন। যিনি যাহা দিবেন ৬জগন্নাথদেবের আদেশ মত ৬ মাসের মধ্যে তাহা পরিশোধ হইবে। অন্ততঃ ১০,০০০ দশ হাজার টাকার প্রয়োজন। যিনি যাহা দিবেন, আমি তাহা পরিশোধ করিব।

জগন্নাথ স্বামীর আজ্ঞাকারী দাসানুদাস

শ্রী রিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

দোকানদারের ধার শোধের অভিপ্রায়ে কিছু টাকা ধার করিয়া আনিবার জন্ত ঠাকুর পান্নাকে কলিকাতা পাঠাইলেন। বিধুবাবুও পান্নাকে বলিয়া দিলেন, “আসিবার সময় দেবেন্দ্র সানন্তের নিকট হইতে আমার জন্ত একখানা বৃন্দাবনী কাপড় ও চম্‌মা চাহিয়া আনিও।”
৩রা বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর সুস্থ হয় নাই, তবে অপেক্ষাকৃত ভাল। রাধাবল্লভবাবু তারে খবর দিলেন, “One thousand Brahmins' পাদোদক, i. e. hot water—ইহার তাৎপর্য কি?” ঠাকুর উত্তর পাঠাইলেন, “Signallerদের ভুলক্রমে এরূপ ঘটয়াছে। Hot water নহে, foot water। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।” রাত্রি ১০টার সময় খবর আসিল, “স্ত্রীর প্রসব হইয়াছে। পাদোদক সংগ্রহ হইতেছে।” ঠাকুর বলিলেন, “যদি আদেশানুসারে হাজার ব্রাহ্মণের পাদোদক সূর্য্যোদয়ের পূর্বে খাওয়াইতে পারিত, তবে সন্তান জীবিতাবস্থাতেই প্রসূত হইত এবং ভাগ্যবান হইত।”

কুঞ্জলাল নাগ তারে খবর দিলেন, “আমার বহু কৰ্জ্জ রহিয়াছে। চেষ্টা করিতেছি।” উত্তর গেল, “যদি ভগবানের আদেশ মত কার্য্য কর, ভগবৎ আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে।” বাকীপুরের ব্রজেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন “ক্ষমা করিবেন, পারিব না।” উমাচরণবাবু চিঠি লিখিলেন, “আমি যেমন হীন, ঠাকুর যে আমার অর্থ দ্বারা সাধুসেবা করাইয়াছেন, ইহা আমার পরম মৌভাগ্য।”

বাক্যরক্ষা হওয়াতে সোয়ারের আনন্দ

৪ঠা বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর সুস্থ হয় নাই। ১০টার সময় কুঞ্জলাল নাগের নিকট হইতে তারে ৬০০ টাকা আসিল। পিয়ন বলিল, আরও ৬০০

টাকা আসিয়াছে। আফিসে টাকা না থাকাতে এখন দেওয়া হইল না। এই ৬০০ টাকা সোয়ারকে ডাকাইয়া দেওয়া হইল। সোয়ারের আনন্দ ধরে না। আমরা পুনঃপুনঃ এমন কি ঠাকুর বলিলেও সে টাকা গণিল না। সোয়ারের বাক্য রক্ষা হইয়াছে, তাতেই তাহার এত আনন্দ। তাহার দোকানদারদের ১৫ দিনের মধ্যে হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল। ইতিপূর্বে ৬০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। আজ ১৫ দিন পূর্ণ হইবে। আজ বাকি টাকা দিতে পারিয়া সে বড়ই আনন্দিত হইল। শতপতি দোকানদার, “কেমন, গৌসাই টাকা দিল না?” বলিয়া ঠাট্টা করাতে সোয়ার অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিল। সোয়ার বলিল, “আর আপনার আমাকে ছয় মাসের ভিতর, কিছু না দিতে পারিলেও ক্ষতি নাই।” সোয়ারের মহত্ব ও বিশ্বাস দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছি। সে জগন্নাথদেবের নিকট বলিয়াছে, “সকলে কাপড় না পাইলে আমি কদাচ গৌসাইয়ের নিকট হইতে কাপড় লইব না।” ঠাকুর সোয়ারের বিশ্বাস প্রশংসা করিলেন। কুঞ্জলাল নাগ ৩০০ টাকা পাঠাইলে কি ভাবে ব্যয় করিতে হইবে, বলিলেন। “এই টাকার একটিও অন্য প্রকারে ব্যয় না হয়। কোন ঘরে কত দিতে হইবে ঠিক অঙ্কটি হৃদয়ে পড়িতেছে” বলিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, “রাধাবল্লভ যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা ভিক্ষা না করিল, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের দয়া হয় নাই। ঠাকুর পরম দয়ালু। যে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল, ঠাকুরও দয়া করিয়া আদেশ করিলেন, ‘স্বর্ঘ্যোদয়ে পূর্বে হাজার ব্রাহ্মণের পাদোদক খাওয়াও।’ যদি উহারা ইহা করিতে পারিত, চারিদিকে জয় জয়কার হইত। ভগবানের বিশেষ কৃপা দর্শন করিতে পাইত। সম্ভান অপূর্ব প্রতিভাসম্পন্ন, ভক্তিমান ও সংলোভ হইতেন। ইহা দ্বারা উহাদের সমস্ত পরিবার, এমন কি ভারতবর্ষের পরম কল্যাণ হইত। ইনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ হইতেন।”

সন্ধ্যা আরতি শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগের নিকট হইতে তারে খবর আসিল। নানারূপ ক্লেণ ও পরিশ্রমের ভিতরেও আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিয়া এক অপূর্ণ আনন্দে বিভোর ছিলাম।*

ডেপুটী জগৎবাবু সন্ধ্যার পূর্বে আসিলেন। শশীবাবুও কীর্তনের সময় ছিলেন। কীর্তনের পর তাঁহাকে তারের খবর শুনান হইল। শশীবাবু কাপড়ওয়ালার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “কাপড়ওয়ালার একদিন আমার নিকট আসিয়া বলিল, ‘দেখুন, নানা জনে নানা কথা বলে; আমি তাহা-দিগকে বলিয়াছি, মরিবার সময় কাপড় তো সঙ্গে লইয়া যাইব না? জগন্নাথদেবের আদেশক্রমেই এই বস্ত্রাদি গৌসাই মহাপ্রভুকে দিতেছি, এই আমার ধারণা। যদি এইরূপেও ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারি।’”

২০০ টাকা মোহন্তদের মর্যাদার জন্ত কিশোরীবাবুর নিকট দেওয়া হইবে, ঠাকুর বলিলেন। “ইহা অতি অল্প, কৃপা করিয়া তাঁহারা যেন গ্রহণ করেন।”

ডাক্তার সতীশবাবু নৈহাটির নিকটস্থ একটি রোগীকে বাড়ী পাঠাইবার সাহায্যার্থে এখানে পাঠাইলেন। ঠাকুর উঁহাকে ধুতির চাদর ও রেলভাড়া দিলেন। এই রোগীটি (Pilgrim's Hospital) যাত্রী হাসপাতালে ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের একটি ব্রহ্মবাসী এখানে দোকান করিয়া ফেল হইয়াছে। দোকান ফেল হওয়াতে তিনি পাগল হইয়াছেন। ঠাকুর

* পরে কুঞ্জবাবুর মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার কোন নিকট আসিয়া স্ত্রীলোক এ কার্যে বিশেষ বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, “গৌসাই আমাদের ককির করিবে। এ বিপুল কাজ। তুই লিখিয়া দে, টাকা দেওয়া যাইবে না।” গুরুভাইদের মধ্যেও কেহ কেহ বাধা দিয়া-ছিলেন। কুঞ্জবাবু এ সকল বাধা-বিলম্ব অগ্রাহ করিয়া ধার করিয়া টাকা পাঠান। টাকা ধার পাইতে খুব কষ্ট হইয়াছিল।

তাহাকে ধুতি চাদর ও ঘটি এবং তাহার সম্বন্ধে লোকটিকে ধুতি চাদর দিলেন। ইহারা প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিল।

আজ অভয়বাবু ঠাকুরকে বলিলেন, “আপনাকে সমস্ত পরিবারের ভায় দিয়া নিশ্চিত হই। এই কামনা।” ঠাকুর চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “দেওয়ামাত্র ভগবান গ্রহণ করেন।”

শিব ও বিষ্ণু এক— বিভিন্ন ভাবিলে অপরাধ হয় :

কুঞ্জবাবুর দান

৫ই বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজও ঠাকুর স্বস্থ নহেন। অস্থস্থ হইলেও স্নান করিলেন। বৈকালে অভয়বাবু জগন্নাথদাস বাবাজীর সম্বন্ধে গল্প করিলেন। আজ ভোর-বেলা যখন অভয়বাবু স্নান করিয়া আসেন, তখন জগন্নাথদাস বাবাজী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমি ৪০ জন মোহন্তকে ১৫ টাকা দামের এক একখানা মটকা কিনিয়া মর্যাদা করিয়াছি।” ইতিপূর্বেও তিনি দাদাগোঁসাইর নিকট ঐরূপ বলিয়াছিলেন। কিন্তু যে দোকানদারের নিকট হইতে ধারে কাপড় আনিয়াছেন জানাইলেন, তাহাকে সরলনাথ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, “আমাদের নিকট হইতে আপনাদের নাম করিয়া কিম্বা নিজের নামে ৪০ জোড়া মটকা কি ঐরূপ কোন কাপড় বাবাজী লন নাই।” ঠাকুর এই কথা শুনিয়া বিশেষ অস্থসন্ধানের জন্য ঐ দোকানদারের নিকট সরলনাথকে পাঠাইলেন। দোকানদার বাসায় টাকা নিতে আসিয়াছিল, সে বলিল, “আমার নিকট মটকা আদৌ নাই, কি করিয়া লইবে?”

জগন্নাথদাস বাবাজী অভয়বাবুকে বলিয়াছেন, “আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায় কদাচ ভুবনেশ্বর মহাদেবের প্রসাদ খাইবে না। মহাদেবের

প্রসাদ কদাচ আমরা খাই না। ভগবান বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ দেবতা। আমরা সতী স্ত্রীর জায় তাঁহার উপাসনা করি। অশ্রু দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করা ব্যভিচার।” অভয়বাবু বলিলেন, “শাস্ত্রে আছে, হরি-হর এক, বিভিন্ন ভাবিলে অপরাধ হয়।” জগন্নাথদাস বাবাজী শাস্ত্র আওড়াইয়া তাহার নিজ মত সমর্থনের চেষ্টা পাইলেন।

ঠাকুর এ সকল শুনিয়া খুব হুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “ইহাদের নিয়ম মত শাস্ত্রপাঠ নাই। সাধন পাইয়া কিছুকাল গুরুর নিকট টেহলদারী করিতে হয়। ইনি তাহা করিয়া গুরুর নিকট নিয়মিত উপবিষ্ট হন নাই।

“শিব ও বিষ্ণু অভেদ। পঞ্চ উপাসনার মধ্যে শিবোপাসনা একটি। বেদবাস, ‘বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ দেবতা, শিব তদ্রূপ নহেন,’ মনে ইহা স্থির করিয়া কাশীধামে গেলেন। কিন্তু তিন রোজেও ভিক্ষা মিলিল না। তখন কাশীবাসীদিগকে অভিসম্পাত দিতে উত্তত হইলেন। হরগৌরী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বেশে নিকটে আসিয়া কিছু আহার দিয়া বেদব্যাসকে সুস্থির করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি কি দোষে কাশীবাসীদিগকে অভিসম্পাত করিবেন? নিজের স্বার্থে ব্যাঘাত হইলে তাহার জন্ত অভিসম্পাত করিলে কি কিছু হয়?’ বেদব্যাস বলিলেন, ‘না’। এই সময় ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন, ‘এই মহাদেবই একমাত্র উপাস্ত, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।

“তখন মহাদেব কালভৈরবকে আদেশ করিলেন, ‘এই ব্রাহ্মণকে কাশী হইতে দূর করিয়া দাও। ইনি এত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও যদি এরূপ করেন তবে প্রাকৃত জ্ঞানে কি করিবে?’ তখন বেদব্যাস অনেক স্তুতি-নতি করিলে, কোন কোন পরে কাশীধামে তিনি যাইতে পারিবেন এই বলিয়া হরগৌরী অন্তর্ধান করিলেন।”

ঠাকুর বলিলেন, “শিবলিঙ্গের উপর যে চাউল প্রভৃতি দেওয়া হয়, উহা গ্রহণ করিতে নাই। কিন্তু হরিহরমূর্তি ও শিবমূর্তির নিকট ভোগ প্রভৃতি দিলে, তাহা গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য।”

ঠাকুর রাখালবাবু ও তাঁহার কন্যা স্নানার্থে বিস্তর প্রশংসা করিলেন। স্নানার্থে গোপনে গোপনে ঠাকুরের বাসা ভাড়ার টাকা দিয়া বাইতেন। চরিত্র অতি সুন্দর ছিল। যথার্থই যেন দেবীমূর্তি। মৃত্যুর পূর্বে প্রথমতঃ পদধূলি, তৎপরেচ রণামৃত, তৎপরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। ইচ্ছা ছিল সন্তানদের ভার ঠাকুরের উপর দিয়া যান। রাখালবাবুর জন্ত ঠাকুরের নিকট প্রার্থনার ভাবে বলিলেন, ভগবান উহাকে শাস্তি দিউন।

কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় গত কল্য ৩০০০ টাকা পাঠাইয়াছেন, আর রাতি ৮টার মধ্যেও টাকা পাওয়া যায় নাই। জগৎবাবু, মুন্সেফবাবু প্রভৃতির ইচ্ছায় Post Master General-এর নিকট টেলিগ্রাম করা হইল। টেলিগ্রাম গেলে কিছুক্ষণ পরেই টাকা আসিল। উহা হইতে ঘটাওয়ালার ১১০০ টাকা, সোয়ার ৮০০ টাকা, গোবিন্দ ৩০০ টাকা, দীনবন্ধু ৩০০ টাকা ও অন্যান্য কাপড়ওয়ালাকে ১০০ টাকা দেওয়া হইল। আজ টোটা গোপীনাথের শীতলা প্রসাদ আসিল। বাহককে ১০ আনা দিলেন।

সতীশবাবুর দান

৬ই হইতে ৯ই বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ ভোরে উঠিয়াই কুঞ্জলাল নাগকে মনি অর্ডার-এর প্রাপ্তি সংবাদ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আশীর্বাদ জানাইতে দাদাগোঁসাইকে বলিলেন। ভবানীপুরের ‘ডন’ কাগজের সম্পাদক গুরুভাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় হাজার টাকা তারে পাঠাইলেন। উহা হইতে মুন্সেফবাবু, দিদিমাতা, হীরালালবাবুর টাকা দিতে চাহিলে, অল্প দেনা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না, বলিলেন। সুতরাং গোবিন্দ ২০০ টাকা, মুকুটগুপ্তা ১০০ টাকা, পান্নার মাতা ১০০ টাকা, দীনবন্ধু ২০০, ডেপুটীবাবু ৩০০ টাকা পাইলেন। সতীশ মুখোপাধ্যায়কে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আশীর্বাদ জানাইতে বলিলেন।

সতীশবাবু তাঁহার টাকা সংগ্রহের ব্যাপার নিম্নলিখিত মত জানাইয়াছিলেন : “শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু আমাকে একখানা টেলিগ্রাম করেন। তারের মর্ম্ম এই—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আদেশ করিতেছেন যে, চারি দিনের মধ্যে ৬পুৰীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দানে এক হাজার টাকা পাঠাও। ঐ তার পাইয়াই আমি হেমেন্দ্রবাবুর (মিত্র) কাছে যাই। তাঁহার নিকট ধার চাহিলে, তাঁহার হাতে টাকা না থাকায় দিতে পারিলেন না। আমি বলিলাম, আমি ত pauper, আমাকে ত কেহ ধার দিবে না। আপনি জামিন হইয়া আপনার বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে ধার করিয়া দিলে ভাল হয়। আমি অবশ্য উহা শোধ করিব। দুই দিন তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া বন্ধুবান্ধবদের নিকট ঘুরিলেন কিন্তু কেহই দিতে স্বীকৃত হইল না। দ্বিতীয় দিন রাত্রি দশটায় বিফল-মনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তখন আমি ভাবিলাম, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না কিন্তু টেলিগ্রাম যখন শ্রীশ্রীগুরুদেবই করিয়াছেন, তখন ইহা কখনই ব্যর্থ হইবে না। তিনি যখন আমার একটি কর্তব্য স্থির করিয়াছেন তখন তিনিই নিশ্চয় কোন-না-কোন উপায়ে আমার এই কর্তব্য পালন করাইয়া লইবেন। এই সুবিশ্বাসে আমি নিশ্চিন্তমনে ঐ রাত্রি ঘুমাইলাম। আমার আর কোন কর্তব্য নাই; চুপ করিয়া ঐ অর্থপ্রাপ্তির জন্য মাত্র অপেক্ষা করিতে হইবে। তৃতীয় দিন চুপ করিয়া

ঘরে বসিয়া রহিলাম। চতুর্থ দিন বেলা ১০টার সময় নীচের তলায় বসিয়া আছি, এমন সময় ‘অমি’ আসিয়া বলিল যে, দিদিমণি দুঃখিত যে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু তাঁহাদের কাছে কিছুই চাহিলেন না। আপনি নিধন, আপনার কাছে অর্থ চাহিলেন। তিনি তাঁহার নিজের এই গহনা পাঠাইয়াছেন, তাহা বাজারে বন্ধক দিয়া আপনাকে হাজার টাকা দিতে বলিয়াছেন। ঐ টাকা ধার নয়, উহা দান। তৎক্ষণাৎ গহনা বন্ধক রাখিয়া ‘অমি’ টাকা আনাইয়া দিল এবং তখনই (৪র্থ দিন বেলা ১১:১১টা) টেলিগ্রাফিক মনি অর্ডারে ঐ টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেই রাতেই আমি হেমেন্দ্রবাবুকে যাইয়া হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলাম। তিনি কিছুতেই হ্যাণ্ডনোট নিতে চাহেন না। বলেন, তুমি কোথায় টাকা পাইবে। আমি বলিলাম, শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুই আমাকে হ্যাণ্ডনোট দিতে ছোঁয় দিতেছেন। তখন তিনি আর আপত্তি করিলেন না। হ্যাণ্ডনোটে তিন মাসের কড়ার দেওয়া হইয়াছিল। আঠার দিন পরে রাত্রি ১০টায় হেমেন্দ্রবাবুর ঐ টাকা আমি পরিশোধ করি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমার একখানি ইংরাজী Grammar আছে এবং উহা হইতে আমি মাসে ৩০ টাকা পাই। একথা আমি সম্পূর্ণ বিন্মত হইয়াছিলাম। ঐ পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ শেষ হইয়াছে। পঞ্চম সংস্করণ হইবে। আমার ৪র্থ সংস্করণের publisher কেদারবাবু। তিনি ৫ম সংস্করণ করিবেন, একথা আমি মুখে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। দুই সপ্তাহ পরে যখন কেদারবাবু ৫ম সংস্করণের জন্য আমার সহিত agreement করিতে আসিলেন তখন তাঁহাকে এক হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়ার কথা বলিলাম। তিনি এখন ‘দাঁও’ বুঝিয়া বলিলেন যে, পুস্তকের সমস্ত copy right লেখাপড়া করিয়া বিক্রয় করিলে এখনই এক হাজার টাকা দিতে পারেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব তখন আমার ভিতর প্রেরণা দিলেন যে, তাহাই কর্তব্য। কারণ

ঐ পুস্তক বাবদ ৪ সংস্করণে আমি ৬০০০ হাজার টাকা লাভ করিয়াছি। ঐ পুস্তকের প্রতি আর লোভ রাখা উচিত নয়। আমি তৎক্ষণাৎ কেদারবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কেদারবাবু একটা লেখাপড়া করিয়া রাখিবেন (sale of copy right)। আমি তাহাতে দস্তখত করিয়া টাকা লইব। 18th dayতে তিনি টাকা দিলেন। ঐ রাত্রেই আমি যাইয়া হেমেন্দ্রবাবুর টাকা দিয়া হ্যাণ্ডনোট ফিরাইয়া লইলাম।

ঠাকুরের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। বাসায় তৈয়ারী জলখাবার জিনিষই খাইবেন, বলিলেন। মহাপ্রসাদের ঘি ভাল নহে। টাটকা জিনিষও বড় মিলে না। মণিবাবু আরো ২৩০ টাকা উমাচরণবাবুর নিকট হইতে পাঠাইলেন। আমার বড়দাদা লিখিয়াছেন, “টাকা ধার পাওয়ার আশা খুব কম।” শাস্তিদিদির গহনা বন্ধক দিয়া জগৎবাবু তাঁহার একজন কর্মচারী দ্বারা তিন শত টাকা আনিয়া দিলেন। বড়দাদা অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে না পারায় মনে বড়ই অশান্তি আসিয়াছে। দাদাগোঁসাই বলেন, “তিনি যাহা করিয়াছেন, খুব কম লোকে তাহা করিতে পারে। তবে ভগবানের এই আদেশটি রক্ষা করিতে পারিলে, তাঁহার বিশেষ উপকার হইত।” সেদিন ঠাকুরও বলিয়াছিলেন, “হরকান্তবাবু কোথা হইতে টাকা দিবেন। তাঁহার হাতে কিছুই নাই। তাঁহার নিকট টাকা থাকিলে কি আমার আর কোথাও ধার চাহিতে হয়?”

সাধুর গাঁজার ব্যবস্থা

১১ই হইতে ১৪ই বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

এতদিন ভয়ানক গরম পড়িয়াছিল, আজ বৃষ্টি হওয়াতে ঠাকুর অনেকটা সুস্থ হইলেন। নরেন্দ্রের পাড়ের গোঁসাইয়ের নিকট একটি সাধু আসিয়াছেন। তিনি এখানে আসিলেন। ঠাকুর তাঁহার সেবার

জন্ম ১ টাকা দিলেন। তিনি রামেশ্বর যাওয়ার ভাড়া চাহেন। এখন হাতে কিছুই নাই, অর্থ আসিলে মিলিবে, বলিলেন। ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন, “আজকাল সাধুদের মধ্যে প্রকৃত ‘সাচ্চা’ লোক অতি বিরল। এখন কেবল ‘দাও’, ‘দাও’ বলিয়া অস্থির করে। ভগবানের দিকে তাকাইয়া তাঁর দরজায় পড়িয়া থাকিতে বড় দেখা যায় না।” ঠাকুর আবার বলিলেন, “তাঁহার কোন পরিচিত ব্যক্তি একদিন দেখিলেন, একটি সাধু পথের ধারে Telegraph Post (তারের থামে) সপাসপ্ চিমটার ঘা মারিতেছেন। ‘বেটী সংসার হইতে বাহির হইয়া, আফিং গাঁজা ধরালি, এখন ছ’দিন পর্য্যন্ত না পাইয়া কত ক্লেশ পাচ্ছি, দে বেটা দে, গাঁজা আন।’ ঐ সময় চৌকীদার এক ব্যক্তির মাথায় গাঁজা ও আফিং চাপাইয়া ঐ স্থান দিয়া যাইতেছে। ঐ স্থানে তাহার মলভ্যাগের চেষ্টা হইল। সামলাইতে না পারিয়া, সন্দের লোকটিকে বলিল, ‘ভূঁই এখানে দাঁড়া। আমি পায়খানা সারিয়া আসি।’ যেই চৌকীদার পায়খানায় গেল, অমনি ঐ লোকটি গাঁজা আফিং লইয়া সাধুটিকে বলিল, ‘আপনি ইহা লইবেন?’ সাধু বলিলেন, ‘হাঁ, মার খাইয়া তবে ঠিক। দে বেটা দে।’ সাধু উহা আচ্ছা করিয়া পুটুলি বাঁধিয়া চলিলেন। এদিকে চৌকীদার ফিরিয়া আসিয়া দেখিল গাঁজা আফিং নাই। ‘কৈ বেটা কৈ? গাঁজা আফিং কোথায়?’ লোকটি বলিল, ‘কোথায় রে বেটা গাঁজা, আফিং, তুই বুট বলছিস্।’ চৌকীদার পুরস্কারের প্রত্যাশায় লোকটির নিকট অন্তায়রূপে রক্ষিত গাঁজা আফিং পাইয়া ধরিয়াছিল, অগত্যা প্রমাণের অভাবে লোকটিকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

আজকাল প্রতিদিনই বৈকালে সাধু সঙ্জন আসিতেছেন। ইতিমধ্যে মেজদাদা বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সাধুসেবার জন্ম ৩০০ টাকা পাঠাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু ১২৫ টাকা পাঠাইলেন। উহা

সোয়ার ও চিনিওয়াল। পাইল। যুসেফবাবু ভুবনেশ্বর গিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকট মন্দিরের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। এইরূপ প্রবাদ, জগন্নাথদেব ঐ স্থানে থাকিবেন বলিয়া বিশ্বকর্মা এক লক্ষ দেবমন্দির তৈয়ার করিতে আদেশ করেন। কিন্তু একটি কম হওয়াতে এখানে চলিয়া আসেন।

আজ রাউলপিণ্ডির বাঙ্গালী সাধুটিকে আট দিনের আহারের জন্য ১২ দিনের এবং এক পোয়া দুধ প্রতিদিন এখান হইতে পাইবেন বলিলেন। তিনি গত কল্য কলা, দুধ, লাডু খাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। লোকটি খুব সাদাসিধে, আফিং খায়। আজ আফিং-এর জন্ত পুনরায় ১২ টাকা পাইলেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাওয়ার ভাড়া চায়। ঠাকুর বলিলেন, “টাকা আসিলে, মিলিবে।”

পান্নার দিদিমার প্রশংসা

রূপচাঁদ পত্নীর সগোত্র একটি সাধু অত্যন্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে ধূতি চাদর দিলেন এবং কাপড় ধোয়াইলে এখান হইতে পরস্রা মিলিবে বলিলেন। পান্না তাহার দিদিমার (ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধাত্রী) দ্বারা হাজার পাঁচেক টাকা ধারের জন্য কলিকাতা গিয়াছেন। এখনও কোন খবর নাই। দাদাগোঁসাই বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, “ভাবনার কোন প্রয়োজন নাই। ভগবানের বাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।” পান্নার দিদিমার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। “তিনি যথায় যান সমস্ত হাওয়া যেন অন্যরূপ হইয়া যায়। ইহার এই শেষ জন্ম। আর জন্মাইতে হইবে না। প্রস্থতিদের অঙ্গে হাত দেওয়ামাত্র তাহারা আরাম বোধ করে। ইহার এই আশ্চর্য্য শক্তি, ভগবৎপ্রদত্ত।” অভয়বাবু বলিলেন,

“তাহাকে কখনও নিন্দা করিতে শুনি নাই, উহার মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট।”

ভূতনাথ গোয়ালার কাল রাত্রে ৫০ টাকা পাঠাইয়াছে। ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির জমাদার ও ১৫ জন পুলিশকে ধুতি চাদর দেওয়া হইয়াছে। কাল রাত্রে ৮জগন্নাথদেবের মুখশ্রী দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য হইয়াছি। সুন্দরী স্ত্রীলোকের মুখশ্রীতে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু এই মুখশ্রী তাহা হইতেও সুন্দর। সাধ্য কি কোন স্ত্রীলোক, ইহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার দিকে লইয়া যাইতে পারে। আজও রাত্রে দর্শনে গিয়াছিলাম। বড়ই সুন্দর দর্শন। কল্পিত ভগবানকে, ‘ভুবন-সুন্দর’ বলিয়াছিলেন, সেই কথা মনে হইল।

দান ব্যাপারে কলিকাতায় আলোচনা ও

ঠাকুরের উক্তি

১৫-১৬ই বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ ঠাকুরের শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ। বৈকালে নেপালী ঋতু সাধু ও একজন ‘মায়ী’ দর্শনে আসিলেন। তাঁহারা সেতুবন্ধ যাইবেন, কিছু প্রত্যাশা করেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় পান্না আসিলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম তাঁহার দিদিমা ঋণজালে জড়িত। তিনি ধর্ম করিয়া দিতেও অসমর্থ হইলেন। কলিকাতায় এখানকার ঘটনা লইয়া আলোচনা হইতেছিল। তারে কি চিঠি দ্বারা প্রকৃত ঘটনা সকলে বুঝিতে পারে না। পান্নাদের যাওয়াতে সকলে আমূল ঘটনা জানিয়া আনন্দ করিয়াছেন। গোষ্ঠীবাবু ২০ টাকা বেতনের কেরানী। স্ত্রী পাগল, অন্যান্য পরিবারও আছে। অতিকষ্টে তিনি তাহাদের ভরণ-পোষণ করেন। তিনি ৫ টাকা পান্নাদের নিকট ধরিয়া বলিলেন,

এই আমার আছে, ইহা এই সংকার্য্য গ্রহণ করুন।” ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “এ পাঁচ টাকা নহে, এ পাঁচ লক্ষ, ইহার মূল্য নাই।”

উমাচরণবাবু ইতিপূর্বে ৩০০০ টাকা দিয়াছিলেন। তাঁহার আরো ২০০০ টাকা আছে। তাহাও দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকের কথায় তাঁহার মতের পরিবর্তন হওয়ায় তিনি আর এক হাজার মাত্র পাঠাইলেন। উমাচরণবাবুর ইচ্ছা যে, তিনি যে অর্থ সাহায্য করেন তাহা অগ্রে না জানে। তিনি বলিয়াছেন “ঈশ্বর জগন্নাথদেবের সেবায় ৩০০০ পাঠাইয়া যেক্রপ আনন্দ পাইয়াছি, জীবনে কদাপি ঐরূপ পাই নাই।” ঠাকুর সকল শুনিয়া বলিলেন, “ভগবান যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। ভগবৎ প্রেমলাভের পূর্বেই বৈরাগ্য আসে। লোকে কে কি বলিল, তাহার দিকে দৃকপাত থাকে না। যথার্থই যদি উমাচরণবাবু ২০০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা হইলে লোকের কথায় কি আসে যায়? ভগবান দেখেন, তাঁহাকে কে কতদূর চায়। সে জিনিষ (পরাভক্তি) কি ঐশ্বর্য্য থাকিতে মিলে? একেবারে দীনহুঃখী হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয় না করিলে, তাহা মিলে না। একজন বলিলেন, “তাঁহার পুত্রকন্ঠা নাই, চের সম্পত্তি আছে। সমস্ত বিক্রয় করিয়া সাধু-সেবায় সমর্পণ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করিলে পরম কল্যাণ হইত। তাহা করিলে একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে থাকিত। তাঁহার পেন্সন আছে, অর্থের অভাব তো আর হইবে না।” ঠাকুর এই কথায় সায় দিলেন এবং বলিলেন, “ভগবান যে খেলা খেলিতেছেন, বসিয়া বসিয়া দর্শন কর।”

পান্না ও মণিবাবু বোলপুর গিয়াছিলেন। হরিদাসবাবুর চের কর্ত্ত্ব ; সম্প্রতি কন্ঠার বিবাহে অন্ততঃ ২০০০ টাকা লাগিবে। তিনিও ধার করিয়া অন্ততঃ ১০০০ টাকা দিবেন, বলিলেন।

পান্না কহিল, “এই দান ব্যাপার লইয়া কলিকাতা অঞ্চলে সকলেরই যেন সম্ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। উহা সকলেই সম্ভাবে গ্রহণ করিতেছেন। বড়দাদা লিখিয়াছেন, “সমস্ত জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর বিক্রয় করিয়া ঠাকুরের চরণে সমর্পণ কর। তোমরা কেহ বাড়ী বাইয়া ইহা কর। ইহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। অন্ত্র কোথাও ধার পাইনাম না।” ঠাকুর বলিলেন, “তাহা নহে, তাহাকে এ বিষয়ে নিবেদন লিখিয়া দাও।”

দাদাগোঁসাই মাঝে মাঝে টাকার জন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন, “ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। এজন্ত ব্যস্ততা কেন?” ঠাকুরের এরূপ নিশ্চিন্ত ভাব দেখিলেই প্রাণ শীতল হয়। সেই সময়ের জন্তও অন্ততঃ সমস্ত অবিদ্য, অশান্তি দূর হইয়া যায়।

মণিবাবু ও পান্না বর্দ্ধমানে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট জ্ঞানেন্দ্র হাজরা এই সংকার্য্যে কিছু না পাঠাইতে পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি পিতামাতার অধীন, কি করিয়া অর্থ দিবেন? তথাপি অনেক ক্রোশে ৩৫ টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন।

বড়দাদার পুনরায় চিঠি আসিল। ঠাকুরের নিকট তাহা পাঠ করা হইল। মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় তখন সেখানে ছিলেন। দাদা লিখিয়াছেন “* * * গুরুদেব দয়া ক’রে হুকুম ক’রেছিলেন কিন্তু পালন করাইয়া নিলেন না। বাঁহাকে দিয়া পালন করাইবেন তিনি যন্ত * * *...।” মহেন্দ্রবাবু বড়দাদার কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, “তিনি বাড়ীঘর বিক্রয় করিয়া টাকা দিতে চাহিলেন।” ঠাকুর বলিলেন, “তাঁহার ভিতর বাহির ত দুইরূপ নয়। তাঁহার ভিতরে যা হচ্ছে, ভগবান দেখছেন, অন্ত কে বুঝবে?”

আমি বলিলাম, “আমার মনে হয়, ইহাতে বাঁহারা অর্থ দিতেছেন ও বাঁহারা দিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সকলেরই মঙ্গল হইবে।” ঠাকুর বলিলেন, “তাই, জগন্নাথদেবের কাজ কল্যাণের নিমিত্তই হইয়া থাকে। সকলের মন খুলিয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা কল্যাণই হইবে কিন্তু সকলে ইহা বোঝে না।”

আজ ষ্টোর সময় টাকা হইতে ১২০০ টাকা আসিল। শশীমোহন দাস ২০০ টাকা আর নবদ্বীপদাস ১০০০ টাকা পাঠাইলেন। মনে হয় এই সকল বিধুবাবুর কার্য্য। দারুণ জর লইয়াও কলিকাতা হইতে অর্থ সংগ্রহে টাকা গিয়াছেন। ঠাকুর বলিলেন, “এরূপ বার আবেগ তার কিছুতেই ঠেকায় না। ভগবান তাঁর আশা পূর্ণ করেন। বিধু এখন অনেকটা শান্তি পাইবে।” শান্তিদিদি বলিলেন, “এরূপ প্রাণের দরদ আর একটি লোকেরও দেখা যায় না।”

রাউলপিণ্ডির সাধু

রাউলপিণ্ডির বাঙ্গালী সাধুটিকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ যাওয়ার রেল-ভাড়া বাবদ ১০ টাকা দিলেন। সাধুটি ঠাকুরের বিস্তর প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “আমি বহুদেশ ঘুরিয়াছি, কিন্তু এরূপ লোক আমার দৃষ্টিতে আসে নাই। সমস্ত দেশে এরূপ আর একটি সাধু আছে কিনা সন্দেহ। টাকা ত দিলেন কিন্তু চরণে কি স্থান পাইব? সমস্ত জীবকে যিনি সন্তুষ্ট করিতে পারেন, এরূপ লোক আপনি বই দেখি নাই।” যোধপুর হইতে কয়েকটি জীলোক ও পুরুষ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইহারা বলিলেন, “আমাদের দেশের একটি দুঃখী লোকের সহিত ভুবনেধ্বরে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, ত্রীক্ষেত্রে যাও ত জটীয়া বাঙ্গালী বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিও।” ইহারা কেহ ১০,

কেহ ১০ দিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর ঐ প্রণামী 'শিব-শিব' সাধুকে দিয়া দিলেন।

সাধু নরসিংদাস

১৭-১৮ই বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ সকালে প্রায় ১০টার সময় স্বর্গদ্বারী ঘাটের সমুদ্রবাবা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। ঠাকুরকে একখানা 'নামাবলী', একখান চাদর ও গ্রন্থসাহেব ঢাকিবার জন্য একখণ্ড ছিটের কাপড় দিয়া গেলেন। লোকটি বড়ই মিষ্ট। মন্দিরে যখন দেখি, বড়ই আরাম লাগে।

আলিপুরের উকীল শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ১০০ টাকা পাঠাইলেন। উহা হইতে বাড়ীভাড়া ৫০ টাকা ও হরি বেয়ায় কাপড়ওয়ালাকে ৫০ টাকা দেওয়া হইল।

আজ সায়ংকালে একটি পাঞ্জাবী যুবক এতাজ লইয়া গান করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে ধুতি চাদর দিলেন। ইনি 'শিব-শিব' সাধুর সহিত আসিয়াছিলেন।

ঠাকুর আজ গল্প করিলেন, "নরসিংদাস নামে গুজরাট অঞ্চলে একটি সাধু ছিলেন। তাঁহাকে সকলে পরীক্ষার ভিতর ফেলিতে চেষ্টা করে। একটি যাত্রী 'দ্বারকা' দর্শনে যাইবেন। সাত শত টাকার হাতি করিতে হইবে। সকলে শিখাইয়া দিল, নরসিংদাসের নিকট যাও। ইনি একজন বড় পোদ্ধার। সে আসিয়া ৭০০ টাকা নরসিংদাসের নিকট গণিয়া দিয়া বলিল, 'হুণ্ডি চাই'। শত নিবেধেও যখন প্রত্যাখ্য করিল না, তখন নরসিংদাস হুণ্ডি লিখিয়া দিল। 'শ্রামল সা ৭০০ টাকা দিবা ইতি নরসিংদাস।' দ্বারকায় যাইয়া দিন রাত ঘুরিল কি শ্রামল সা পোদ্ধার কেহ নাই। একদিন পরিশ্রান্ত হইয়া নির্জন বৃন্দ

ছায়ায় বসিয়া আছেন, টাকার খলি কাঁধে করিয়া ‘শ্রামল সা’ উপস্থিত। ‘কে হে তুমি? ৭ দিন বাবৎ টাকার খলি কাঁধে করিয়া ঘুরিতেছি। তুমি কি নরসিংদাসের নিকট হইতে হুঁপু আনিয়াছ?’ তিনি বলিলেন, ‘হাঁ।’ অমনি টাকা গণিয়া দিল। যাত্রীটি মাঝে মাঝে পোদ্দারের রূপের ঝলক দেখিয়া আশ্চর্য হইতে লাগিলেন। দেশে গিয়া নরসিংদাসের নিকট গল্প করিলেন। নরসিংদাস বলিলেন, ‘তুমি ধন্ত, ভগবানকে দর্শন করিয়াছ।’

শ্রীলোকের মনোপান : ঠাকুরের চেষ্টায় উহা নিবারণ

২০শে হইতে ২২শে বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজকাল বড়ই গরম। গরমে ঠাকুরের শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়াছে। পুরাতন তেঁতুল এ সময় বড় উপকারী। কাঁচা আম পোড়াইয়া, ভাজা জিরার চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সরবত খাইয়া থাকেন। ইহাও বড় উপকারী। শাস্তিদিদি রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, জগন্নাথদেবের দেহে কোটি কোটি নক্ষত্র বিরাজ করিতেছে। ঠাকুর বলিলেন, “এইরূপ বিশ্বরূপ দর্শন লোকের ভাগ্যে বড় ঘটে না।”

আজ একটি গায়ক বৈকালে আসিয়া গান করিল। দাদাগোঁসাই তাহাকে ২৮ দিলেন। রাত্রিকালে নোয়াখালী হইতে ১৮০ টাকা আসিল। উহা দীনবন্ধু কাপড়ওয়ালাকে দেওয়া হইল। হরেন্দ্রবাবু ঐ টাকা পাঠাইয়াছেন। দেউলকরণ (শ্রীমন্দিরের একজন কর্মচারী) দুই দিন বাবৎ সন্ধ্যায় আসিতেছেন। লোকটি বড় ভাল। কি বিপদে পড়িয়াছেন। ঠাকুর ষোড়হাতে জগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সন্ধ্যাবেলা রাজার বাড়ীর কবিরাজও আসিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ হইয়া কবিরাজী করিতে হইতেছে বলিয়া

দুঃখ করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, “আমার কি ভাগ্য, মহাপুরুষ দর্শন করিলাম।”

বরিশালের গোরাচাঁদবাবুর অর্থের অভাব নাই। ঠাকুরের টেলিগ্রাম পাইয়া, দাদাগোঁসাইর নিকট লিখিয়াছেন, “কি করিব, মনের অবস্থা এরূপ নহে যে আপনাদিগকে ধারস্বরূপ প্রার্থিত অর্থ দিই।” ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “চিরদিন ত আর অর্থ থাকে না, পরে এজ্ঞ ক্লেশ হয়।”

আজ টাকা গেণ্ডারিয়ার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষের নিকট হইতে ভোরে ১০০ ও দুই প্রহরে হাজার টাকা আসিল। উহা সমস্তই দীনবন্ধু কাপড়ওয়ালাকে দিলেন। এখন অবধি যাহা আসিবে, দীনবন্ধুকেই দেওয়া হইবে ঠাকুর এইরূপ বলিলেন। শুনিলাম এই হাজার টাকা শ্রীনগরের কালীনাথ বসু মহাশয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু নোয়াখালী হইতে ৩০০ টাকা পাঠাইলেন। উহা দীনবন্ধু পাইল।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখে মদের দোকান বসিয়াছে, শুনিয়া ঠাকুর ক্লেশ করিলেন। শান্তিপুরে পূর্বে বহুদূরে মদের দোকান ছিল। হাড়ী, জেব প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উহা পান করিত। ক্রমে ক্রমে ভদ্রবর্গেও এ বিষ ঢুকিল। কিছুদিন পরে দোকান শান্তিপুরের মধ্যেই প্রকাশ্য স্থানে বসিল। রাত্রিকালে লুকাইয়া ভদ্রসন্তানেরা এমন কি জীলোকেরাও বি দ্বারা মদ আনাইয়া খাইত। ঠাকুর, জীলোকেরা মদ খায় শুনিয়া বড়ই ক্লেশ পাইলেন এবং উহা যথার্থ কি না জানিবার জ্ঞান কোন এক সম্ভ্রান্ত বাড়ীর ঝির নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, “আপনি গুরুগোঁসাই, আপনার নিকটে মিথ্যা বলিতে নাই। যথার্থই বাড়ীর গিন্নি স্বামী বিদেশে থাকিলে সতর্কতার সহিত মদ থান।” ঝির মদের বোতল হস্তে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। ঠাকুর চান্দ্র এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জ্ঞান বাড়ীর পার্শ্বস্থ জানালার নিকট একটি

বৃক্ষে উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন,—গিন্নি দুই চারিটি স্ত্রীলোক লইয়া, টেবিল টানিয়া মদ খাইতে বসিলেন। মদ খাইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, “পুরুষেরা আমাদেরকে অত্যাচার করিয়া ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে ইত্যাদি।” ঠাকুর এ সকল শুনিয়া অবাক! কিছুদিন পরে ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামী বাড়ী আসিল। ঠাকুর উহার নিকট যাইয়া বলিলেন, “একটি গোপনীয় কথা, বড়ই গুরুতর। যদি ধৈর্য্যের সহিত শোনে, তবে বলিতে পারি।” তিনি আগ্রহের সহিত শুনিতে চাহিলে বলিলেন, “দেখুন, পাঁচজনের নিকট আপনার স্ত্রী মদ খায় শুনিয়া, অনুসন্ধান প্রত্যক্ষ করিলাম, যথার্থই তাই। আপনি ইচ্ছা করিলে আপনাকেও দেখাইতে পারি। কিন্তু অল্পরূপ চরিত্র দূষিত হয় নাই।” “আমার বাড়ীতে আসিতে গৌণ হইবে” এই ভান করিয়া ভদ্রলোকটি ঠাকুরের সহিত সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া বলিলেন, “কোনরূপ অস্থিরতা প্রকাশ করিবেন না, স্থির হউন। কি প্রকারে ইহাকে নেশা হইতে রক্ষা করা যায়, তাহার উপায়, আমি বাহা বুঝিয়াছি, তাহা শুনুন।” এই বলিয়া ঠাকুর তাহার সঙ্গে মদের দোকানে গেলেন। মদওয়ালা স্বীকার করিল, এই ভদ্রলোকটির বাড়ীর ও অন্তঃস্থ বাড়ীর ২০।২৫ জন স্ত্রীলোক মদ খান। ঠাকুর অনুরোধ করিলেন, “দেখ, তুমি একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। স্ত্রীলোকের জন্ত আর মদ বিক্রয় করিও না। দেশ উচ্ছন্ন যাইবে। তোমাকে কৃপা করিয়া এই অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।” মদওয়ালা স্বীকার করিল এবং বলিল যে, জানিতে পারিলে সে আর স্ত্রীলোকের জন্ত মদ বিক্রয় করিবে না। অতঃপর ভদ্রলোকটিকে বলিয়া দিলেন, “অতি ধীরভাবে বাড়ী যেয়ে স্ত্রীর নিকট, তিনি মদ খান, এই জনশ্রুতির সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি অস্বীকার করিলে ঝিকে নিকটে ডাকিয়া ধমক দিয়া, আর একরূপ

না করে সাবধান করিয়া দিবেন।” তিনি বাড়ী যাইয়া তাহাই করিলেন।
 স্ত্রী কতক্ষণ মায়াকান্না কাঁদিয়া বলিল, “পোড়া লোকেরা একরূপ মিছাই
 বলে, তোমাদের দেশই এইরূপ।” অতঃপর ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও
 অস্বীকার করিল। যখন ধমক দিয়া বলিলেন, “দেখ, আমার প্রমাণ
 আছে।” ঝি বলিল, “গুরুগোঁসাই বলিয়াছেন কি?” ভদ্রলোকটি
 বলিলেন, “আর মদ আনিতে গেলে পাইবে না।” স্ত্রী সমস্ত গুনিয়া সব
 অপরাধ স্বীকার করিল এবং স্বামীর পায়ে ধরিয়া তাহাকে আর
 যেন একাকী না রাখেন, এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।
 ঠাকুর আরও বলিলেন, “কোন এক বৃদ্ধ গোস্বামীকে স্ত্রীর দ্বারা কোশলে
 মদ ছাড়াইয়াছিলাম। ঐ বৃদ্ধ গোস্বামী মদ খাওয়ার সমর্থনপূর্বক
 বলিতেন, “ঔষধার্থং সুরাং পিবেৎ।”

আজ বাজারে নূতন আম উঠিয়াছে। ঠাকুর ৪০০ শত আম
 আনাইলেন। পাণ্ডাদিগকে, জগন্নাথবল্লভের বাবাজী ও ছাত্রদিগকে,
 শাস্তিদিদি ও বাসার সকলকে দেওয়াইলেন।

‘প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ : “দৈবী হেমা গুণময়ী”

২৩শে বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ নরেন্দ্রের গোঁসাই বৈকালে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ঘর দিয়া
 জল পড়ে। ঠাকুর ধার করিয়া মেরামত খরচ বাবদ ২০ টাকা
 পাঠাইয়া দিলেন। আজ রাত্রি ১২টা সময় পায়খানা হইতে আসিয়া
 ৩টা পর্যন্ত ঠাকুর ব্রহ্মচারীকে ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’ শুনাইলেন। ৩টার
 সময় পায়খানা যাইবেন বলিয়া ব্রহ্মচারী ডাকিলে বলিলেন, “আরও কিছু
 শোন। প্রহ্লাদের বিষ প্রয়োগ ঘটনাটি বাকী রহিল। তাহাও গুনিয়া
 রাখ।” ব্রহ্মচারী গুনিয়া বলিল, “এ সকল কথা বলছেন কেন?” তিনি

বলিলেন, “এইজন্ত বলিলাম, তোমরা স্বরণ রেখ—ভগবান যাহাকে নিবেন তাহাকে কেহ রাখিতে পারে না ; আর ভগবান যাহাকে রক্ষা করিবেন তাহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। এই ভাব তোমাদের অন্তরে থাকিলে, কখনও কিছুতে উদ্বেগগ্রস্ত হইবে না।”

ইতিমধ্যে আমি একদিন ডাঙারগৃহ হইতে ঠাকুরের আসনগৃহে আসিতেছিলাম ; দেখি, শূণ্ণে একটি স্ত্রী-মূর্তি প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল অতি স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল দেখিলাম। তিনি বলিলেন, “সব ছাড়িয়া উহার সেবা কর।” তখনই আমি ঠাকুরকে বলিলাম, “দেখুন, একটি স্ত্রীলোক সব ছাড়িয়া আপনার সেবা করিতে বলিলেন।” ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “বেশ ত বলিয়াছে।” আমার মনে হইল মাতাঠাকুরাণীই এইরূপ বলিয়া গেলেন। ঠাকুরকে বলিলাম, “ভাগলপুরে গঙ্গাতীরে একদিন স্বপ্নে দেখিলাম—আপনি প্রকাশিত হইয়া স্মৃষ্টিস্থরে গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিতেছেন :—

‘দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥’

এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া আপনি অন্তর্ধান করিলেন।” ঠাকুর শুনিয়া পুনরায় সেই শ্লোকটি স্মৃষ্টিস্থরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বিষম জ্বরে অজ্ঞান

২৪শে হইতে ২৭শে বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ ১২টা হইতে ঠাকুরের বিষম জ্বর। এমন জ্বর আর আমি কখন দেখি নাই। জ্বরে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। ডাকিলেও কথাটি নাই। কোন প্রকারেও চেতন করাইয়া আঁটার সময় ঔষধ খাওয়ান গেল না।

অবশেষে উচ্চ সংকীৰ্ত্তন করিলে কথঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া অর্দ্ধ পরিমাণ ঔষধ গ্রহণ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে অনেকটা সংজ্ঞালাভ করিলে অপরাধ ঔষধ সেবন করান হইল। সেই সময় তেঁতুলের সরবত, কিছু আম, ভিজা চিড়া প্রভৃতি আহার করিলেন। আজ বড়ই দুর্দিন গেল। টাকা হইতে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস ভারে ১৫০/- টাকা, পান্নার দিদিয়া ১০০/- টাকা ও বড়দাদা ১০০/- টাকা পাঠাইলেন। উহা হইতে সোয়ার ২৫০/- টাকা পাইল।

ইতিমধ্যে রেবতীবাবু চিঠিতে জানিতে চাহিয়াছেন, তিনি পুরী কি টাকা যাইবেন? বিধুবাবু তাঁহাকে টাকা যাইতে লিখিয়াছেন। রেবতীবাবুকে লইয়া ঠাহার নোয়াখালী যাইবার ইচ্ছা। ঠাকুর রেবতীবাবুকে এখানে আসিতে বলিলেন। “ভগবান অর্থ দিবেন কি না তিনিই জানেন। আমাদের অত ভাব্‌বার দরকার কি? এ ঠাহারই ধার। তিনি তজ্জ্ঞা যাহা হয় করিবেন। সকলকে জানাইবার হুকুম দিয়াছেন। জানাইয়া খালাস হইয়াছি।” ঠাকুর দাদাগোসাইকে এইরূপ বলিলেন। কলিকাতা হইতে ১১টি আম আসিয়াছে। তাহা সকলকে দিতে বলিলেন, “সকলকে দিও, না হইলে বড় ক্লেশ হয়।”

আজ ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। টাকা গেণ্ডারিয়া হইতে শ্রীযুক্ত শশি-ভূষণবাবু ৫০০/- টাকা ও গোরচাঁদবাবু ৫০/- টাকা পাঠাইলেন। ইহা হইতে কাপড়ওয়াল দীনবন্ধু ৫০০/- টাকা পাইল। ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। ডাব নারিকেল খাইবেন। জগন্নাথবল্লভ উত্থান হইতে ৩টি ডাব আনিলাম। আজ সন্ধ্যাকালে জগন্নাথদাস বাবাজী, বাউলী মঠের মোহন্ত প্রভৃতি আসিলেন। আজ দাদাগোসাই ও কিশোরীবাবু, ইমার মঠ, দক্ষিণ-পার্শ্ব, রাজা গোপাল মঠ, রাঘবদাস মঠ ও অগ্ন্যান্ত মঠের মোহন্তদের ১৭ টাকা ও ছোট এলাচ দিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া আসিলেন।

রেবতীবাবুর কীর্তন : ঠাকুরের শেষ নৃত্য

২৮শে বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ রাত্রিকালে শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন আসিলেন। সকালবেলা শান্তিদিদি বলিলেন, “দেখ বাবা, এই সাধন বাঁহারা করেন, তাঁহারা কি অস্ত্রের মনের ভাব বুঝিতে পারেন? কেহ আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেই তাঁহার মনের অভিপ্রায় টের পাই।” ঠাকুর বলিলেন, “সকলে কি পায়? তা নয়। তোমার ছায় ‘বোকা’ হইলেই পায়।”

সরলনাথ পাবনা জেলার একজনকে গোপনে করঙ্গ দিলেন। রাত্রে রেবতীবাবুর কীর্তন হইল। রেবতীবাবু গাহিতেছিলেন—

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর,
হরি হরি বলিতে নয়নে ব’বে নীর।
আর কারে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব, সো বৃন্দাবন।
রূপ রঘুনাথ বলি হইব আকুতি,
কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি।
রূপ রঘুনাথ পদে বহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

ঠাকুর আজকাল পায়খানা ঘাইতে আমাদের ধরিয়া যান কিন্তু কীর্তনে অনেকক্ষণ নৃত্য করিলেন। জানিতাম না, কীর্তনে এই দিনই ঠাকুরের শেষ নৃত্য। ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, “বসে বসে গাও। মধুর ক’রে গাও।” এই কথা বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

কীর্তনে ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “ঐ দেখ জগন্নাথদেব কীর্তন শুনিতে আসিয়াছেন।” রেবতীবাবুকে নিজের মাথার জটা বাঁধবার ধড়া ও বহির্কাস খুলিয়া দিলেন। এই সময় ভাবাবেশে বলিলেন, “সরলনাথ আছ, জগন্নাথদেব বলছেন, যিনি গান করছেন, তাঁকে এনে একজোড়া লুই দাও।”

সরলনাথ ভাবে অস্থির। শরীর যেন ভাবের বেগ ধারণ করিতে পারিতেছে না। বুক যেন চিরিয়া যায়। বুক চাপড়ের উপর চাপড় মারিতে লাগিলেন। লম্ফের উপর লম্ফ দিতেছেন। মাথা কাৎ করিয়া কৈ মাছের মত কাৎরাইতে কাৎরাইতে একধার হইতে অপর ধারে যাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কৌকড়াইয়া পুঁটুলির মত হইতে লাগিলেন।

কাল রেবতীবাবু যে ফল আনিয়াছেন, উহা ষ্টেশন মাষ্টারকে, পাণ্ডা-দিগকে, শাস্তিদিদি ও আর আর সকলকে দিলেন।

চন্দনযাত্রা

৩০শে বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ অক্ষয়া তৃতীয়া। ‘চন্দনযাত্রার’ দিন। শ্রীশ্রীমদনমোহন, শ্রীমতী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ও সত্যভামাদেবীকে উভয় পার্শ্বে লইয়া নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলী করিতে যাইতেছেন। মদনমোহন, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ও সত্যভামাদেবীর সহিত ভোগ গ্রহণ করিতে করিতে চলিয়াছেন। আমাদের ‘পুংক্তি ঘরেও’ ভোগ হইল। দাদাগৌসাই এই সময় যাইয়া রামকৃষ্ণ, মদনগোপাল, যমেশ্বর, লোকনাথ, কপাললোচন ঠাকুর প্রভৃতিকে এক এক টাকা ভেট দিয়া নমস্কার করিলেন। ঠাকুরেরা প্রত্যেকেই কাষ্ঠ নির্মিত দোলায় চড়িয়া চলিয়াছেন। বিগ্রহ সকলের শোভা বড়ই

পঞ্চদশ অধ্যায়

৩৯১

চমৎকার। বিশেষতঃ মদনগোপাল, লক্ষ্মী, সত্যভামা, রাগকৃষ্ণ প্রভৃতিকে বড়ই সুন্দর সাজাইয়াছিল। সঙ্গে অনেক লোক। কেহ কেহ চামর ব্যঞ্জন করিতে করিতে যাইতেছেন। দৃশ্য অতি সুন্দর ছইয়াছিল। যখন মদনগোপাল নৌকাতে চড়িলেন, তখন হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি আসিল। অনেকে ভিজিয়া বাসায় ফিরিলেন। আমি ঠাকুরের জন্ত ঘড়ি রাখিবার কোঁটা আনিতে গিয়াছিলাম। দৌড়াইয়া বাসায় ফিরিলাম।

আজ এক ধামা ও কতকগুলি তালশাঁস আসিয়াছে। ঠাকুরের নিকট নামানমাত্রই সমস্ত নিবেদন করিয়া উহা হইতে ২টি আম ও একখণ্ড তালশাঁস চাহিয়া খাইলেন। শুনিলাম আনামাত্রই উহা ত্রীত্রীজগন্নাথদেব গ্রহণ করিলেন। তাই ঠাকুর প্রসাদ করিতে এত ব্যস্ত।

সকালে রেবতীবাবু 'চরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলেন। তাহার মধুরস্বরে পাঠ বড়ই মিষ্ট লাগিল। কোরঙওয়ানা সাধুটিকে দুই আনা পয়সা ও এক ঠোঙ্গা চাউল দেওয়াইলেন। সাধুটি যখনই আসেন, তখনই ঠাকুর উহাকে কিছু দেওয়ান। আজ সাধুটি কাঁদিয়া ফেলিলেন। ধুতি চাদর চান। ঠাকুর উহাকে একখানা ভাল ধুতি ও চাদর দেওয়াইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "ইহার জন্ত আমার বড় ক্লেশ হয়।" সাধুটি কখনও রাত্রি দশটায়, কখন বা সন্ধ্যাকালে, কখন বা দিনের বেলায় আসেন। লোকটি সদানন্দ। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই সাধুটি রাত্রে কোথায় থাকেন?" ঠাকুর বলিলেন, "নরেন্দ্রের পাড়ে ভজনের একটি গুপ্ত স্থান আছে—সেখানে গিয়া থাকেন।"

মুন্সেফবাবু এক কলসী চক্রতীর্থের জল কাল আনিয়া ঠাকুরকে দিয়াছিলেন। জল বেশ সুস্বাদু। মুন্সেফবাবু ঠাকুরকে দর্শন করিতে প্রত্যহ একবার আসেন। এত ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও আজ রাত্রি ৯টায় আসিলেন; রাত্রি ১০।১০টায় ঠাকুরের দরজা খুলিলে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

দিদিমার গোপালের নিকট কথকতার উদ্যোগ : জগন্নাথদেবের গায়ে বেতের বাড়ি

৩১শে বৈশাখ, ১৩০৬ সাল ।

আজ ঠাকুরের শরীর বড় অস্থস্থ । চা খাইতে খাইতে অজ্ঞান হইয়া চলিয়া পড়িলেন । চা খাইবার বাটী আসনের একদিকে পড়িয়া রহিল । দু'প্রহরে পায়খানায় যাইয়া দুর্বলতা নিবন্ধন কোঁকাইতে লাগিলেন । এক এক সময় কান্নার মত 'মা', 'মা' শব্দ করিলেন । সেই সময় সমস্ত গৃহে একটি তড়িৎপ্রবাহ খেলিতে লাগিল । শরীরে সরুসরু করিয়া 'শক্তি' চলিতে আরম্ভ হইল । পায়ে পুরাতন ঘুত গরম করিয়া দেওয়া গেল ।

একজন পাঠক আসিয়াছিলেন । তিনি আগামী কল্যা পাঁচটার সময় কথকতা করিবেন । আমি ৩টার সময় দেখিলাম, পাঠককে দেওয়ার হিসাব হইতেছে । মনে বিরক্তি আসিল । দরজার সামনে, ঠাকুরের কাছে বসিয়া শুনিতে লাগিলাম । মনে হইল 'এত টাকার ঋণ রহিয়াছে, ইহার উপর আবার পাঠককে ৩০ টাকা দিয়া কাপড়, দক্ষিণা ২৫ ইত্যাদি দেওয়ার কথা ।' দাদাগোঁসাই আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "খুব দাও, দু'হাতে দাও ।" তাঁহার এই কথায় প্রথমতঃ রাগ হইল । পরে একটু একটু করিয়া মন পরিবর্তিত হইতে লাগিল এবং কতক্ষণ পরে এই দানে সহায়ভূতি আসিতে লাগিল ।

পাঠককে দানের তালিকা :—

- ১। পাঠকের জন্ত দক্ষিণী জোড়—৩০
- ২। পাঠকের স্ত্রীর জন্ত দক্ষিণী শাড়ী—৩০
- ৩। পাঠকের ঝির জন্ত ভাল দেশী কাপড়—
- ৪। বড় ঘড়া, উৎকৃষ্ট কাঁসার থালা, ডিবা,
কমণ্ডলু, পিতলের সিন্দূরের কোটা ও সিন্দূর—

- ৫। পিতলের থালা, পিতলের ধুতুচি, চন্দনের
 . কঁাসার বাটী, চন্দন, মালা.....
- ৬। নগদ দক্ষিণা—২৫—
- ৭। রেলভাড়া ইত্যাদি কলিকাতা পর্য্যন্ত—১৫—
- ৮। আসন, জলচৌকী, টাট, কোশাকুশী...

উপরোক্ত দ্রব্যাদি যতদূর উৎকৃষ্ট পুরী সহরে পাওয়া যায়, তাহাই খরিদ করিয়া আনিতে বলিলেন। দিদিমার গোপালের নিকট পাঠ হইবে। গোপালের জন্ত পীতাম্বরী জোড় ও সোণার চুড়ি ও সাধারণের বসিবার জন্ত ১১৥০ X ৪ হাত, ৪ খানা সতরঞ্চ আনিতে বলিলেন।

পাঠককে দান সম্বন্ধে ঠাকুরের সহিত কথা হইল। আমি বলিলাম, “আপনি যখন দেন, তখন মন খারাপ থাকিলে বিরক্তি আসে। মনে হয়, টাকা শোধ না হইতে এত দেনা কেন?” ঠাকুর বলিলেন, “ভয় নাই, সব টাকা শোধ হইয়া যাইবে। চুপ করিয়া বসিয়া দর্শন কর। জগন্নাথ-দেবের দান, এ কাহার বুঝিবার সাধ্য আছে। আমরা ত আর এখান হ’তে যাচ্ছি না? একটি পয়সা ঋণ থাকিতে এখান হ’তে নড়ব না। জগন্নাথদেবের খেলা কে বুঝবে? মাধবদাস বাবাজীর সঙ্গে কাঁঠাল চুরি করিতে যাইয়া গাছে চড়াইয়া দিলেন; লোকেরা উদ্দেশ্য পাইয়া যেই সাড়া দিল, আর অমনি নিজে চম্পট। মাধবদাস বাবাজীকে ধরিয়া তাহারা মারের উপর মার। মাধবদাস মার খাইয়া সমুদ্রপারে অভিমানে পড়িয়া রহিল। জগন্নাথদেব পাণ্ডা দিয়া ডাকাইলেন। সে আসিবে না; ‘এমন ছুষ্ঠের নিকট যাইতে আছে? আমাকে নিজে সন্না দিয়া নিয়া যাইয়া বিপদের সময় পলায়ন’! পুনরায় পাণ্ডা পাঠাইয়া মাধবদাসকে ডাকাইলেন। আসিয়া দেখেন ঠাকুরের গায়ে বেতের বাড়ী, রক্ত দরদর-ধারে পড়িতেছে। মাধবদাস দেখিয়া ক্লেশে অজ্ঞান।”

বিষ-প্রয়োগ

চারিটার সময় পায়খানায় যাইয়া ঠাকুর জরে উন্নতবৎ প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। কুকুর আসিতেছে, ব্রহ্মচারি লাঠি ছুঁড়িয়া মারিল (অমনি ক্লেশ পাইয়া বলিলেন) “তাড়াইয়া দিতে পার না? মার কেন?” দারোয়ান ভিতরে গেলে, ব্রহ্মচারি বলিল, “দ্বার ছাড়িয়া ভিতরে গেলে কেন?” ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন, “ইহারাও ত আরাম করিবে, সারাদিন কি একভাবে বাহিরে বসিয়া থাকিতে পারে? জীবে দয়া করিবে। দয়াতে যেমন আনন্দ, গালাগালিতে তজ্জপ নয়। দয়ার সমান ধর্ম নাই।” আবার বকিতে লাগিলেন। “আমাকে তোমরা যদি জানুতে তবে বকুতে। আমি জরের জন্তই যে এরূপ করি তাহা নহে। আমার সকলকে খোসামুদি করিয়া চলিতে হয়।” আমি বলিলাম, “কেন?” ঠাকুর বলিলেন, “কেন বলিব? একটু ক্রটি হইলেই চিম্টি কাটে। আমি বলি তোমাদের যথাসাধ্য সেবা করুব।”

পায়খানাতেই ঔষধ খাইলেন। বিষয় জর—এখনও প্রস্রাব হয় নাই। ঔষধ খাইবার সময় প্রণাম করিয়া খাইলেন। রাত্রিকালে দাদাগোসাঁই প্রশ্ন করিলেন, “তোমার হঠাৎ এরূপ অসুখ হইল কেন?” ঠাকুর বলিলেন, “প্রায় ৭৮ দিন হইল, ২২শে বৈশাখ তারিখে এক বাবাজী আসিয়া একটি লাড়ু আমার হাতে দিয়া বলিলেন, ‘এ মহাপ্রসাদ, খায়েন।’ আমি ইতস্ততঃ করিলে বলিলেন, ‘প্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং।’ তখন তোমরা কেহ এখানে ছিলে না। আমি ভাবিলাম, ‘প্রহ্লাদকেও ত বিষ খাওয়াইয়াছিল। তা’র ত তাহাতে মৃত্যু হয় নাই। প্রসাদ বলিয়া যখন দিয়াছে, তখন গ্রহণ করি, যাহা হয় হইবে।’ এই বলিয়া প্রণাম করিয়া উহা গ্রহণ করিলাম। অর্দেক খাইয়া দেখি উহার ভিতর একরূপ কাঁচা পাতা রহিয়াছে। ভাবিলাম, পুদিনার মত কিছু হইবেক।

এক ঘণ্টার পর ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হইল। আমি জগন্নাথদেবকে নমস্কার করিয়া বলিলাম, ‘আমি কোন অপরাধ করি নাই। নিরর্থক উহারা একরূপ করিয়াছে। আপনার কৃপা থাকিলে ইহাতে কি করিবে?’ অতঃপর অজ্ঞান হইয়া গেলাম। ভিতরে খুব জ্ঞান রহিল। নাম খুব চলিতে লাগিল। দেখিলাম, একজন মহাপুরুষ ক্রমশঃ নিকটে বসিয়া বাড়িতেছেন। বাড়িয়া প্রায় তিন ঘণ্টায় শরীর একরূপ নির্বিঘ্ন করিলেন।” দাদাগৌসাই বলিলেন, “আমি বল্‌ব, ঐ লোকটা কে? কয়-দিন হইল আমি বসিয়া আছি। হঠাৎ দেখি তোমাকে বিঘ খাওয়াইতেছে। মনে করিলাম ইহা কল্পনা। আমার স্থির বিশ্বাস, ঐ লোকটাই করিয়াছে।” ঠাকুর বলিলেন, “কাহারও নাম করিও না। জানিলেও ভিতরে চাপিয়া রাখিবে।”

আমি বলিলাম, “সেদিন একজন পরিচিত সাধু ৩৪টি আম, একখানা সরাতে করিয়া, রাত্রি প্রায় ৯।১০টার সময় আসিয়া বলিল, ‘আমি গৌসাইকে দর্শন করিব। এ মহাপ্রসাদ তাঁহার জন্ত আনিয়াছি।’ আমি বলিলাম, ‘এত রাত্রে কেন? প্রসাদ দিতে হয় আমার নিকট দিন।’ লোকটি দর্শনের জন্ত বিশেষ ঔৎসুক্য দেখাইতে লাগিল। আমি বলিলাম, ‘আজ হইবে না, কাল আসিবেন। গৌসাইয়ের শরীর অস্থস্থ।’ ঐ সময় যুগ্মে ফাবুও বাড়ী চলিলেন। লোকটি তাঁহাকে দেখিয়া চলিয়া গেল।” এ ঘটনা ঠাকুরের নিকট উল্লেখ করিয়া বলিলাম, “ইহাতে আমার কিছু সন্দেহ আসে।” ঠাকুর বলিলেন, “ঠিক ধরিয়াছি। আমি থাকাতে এক শ্রেণীর লোকের মর্যাদা ও সম্মানের হানি হইতেছে। এখানে আমি থাকিলে তাহাদিগকে তদ্রূপ সম্মান ও ভক্তি করিবে না। তজ্জন্তই এইরূপ করিয়াছে। ইহারা ‘জন্ম’ বিঘ খাওয়াইয়াছে।”

আজ রাখাবল্লভের স্ত্রী ১০০ টাকা পাঠাইয়া এইখানে আসিবার জন্ত অহুমতি প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর অহুমতি দিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

ক্ৰীত্ৰীনিত্যধামে প্রয়াণ

দিদিমার গোপালের নিকট পাঠ

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ পাঠকঠাকুর কথকতা করিবেন। তাঁহার বাড়ী বরাহনগর। তিনি বাড়ীর দরজায় প্রবেশ করামাত্রই, ঠাকুর মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়কে বলিলেন, “কথকঠাকুরের পা ধোয়াইয়া দিন।” মহেন্দ্রবাবু পা ধোয়াইয়া দিলেন। দিদিমা তাড়াতাড়ি এক ঘটী জল লইয়া আসিয়া বলিলেন, “তুই পা ধোয়াইয়া দিলি? আমার দিবার ইচ্ছা ছিল।” এই বলিয়া পাদোদক গ্রহণ করিলেন। তাহা দেখিয়া মিত্র মহাশয়ও পাদোদক নিলেন। দিদিমার গোপালঠাকুরকে পাঠ শুনাইবার জন্ত পাঠস্থানে আনা হইল। এই উপলক্ষে ঠাকুর বলিলেন, “গোপালের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া নেওয়া হইয়াছে।” মিত্র মহাশয় বলিলেন, “আমরা ত কিছু জানি না।” ঠাকুর বলিলেন, “এ সব কাজ গোপনেই করিতে হয়।” এই কথকতাতে ডেপুটী জগৎবাবু ও শশিবাবু, মুন্সেফবাবু, স্বরেন্দ্রবাবু ও অগ্ন্যগ্ন ভদ্রলোকেরা উপস্থিত ছিলেন। পাঠক মহাশয় ‘কুস্মিনী হরণ’ সম্বন্ধে কথকতা করিলেন, কথা মন্দ হয় নাই। পাঠকটিও খুব বিনীত।

আজও ঠাকুরের শরীর ভাল নয়। পায়খানায় অনেকক্ষণ ছিলেন। পায়ে পুরাতন ঘি মালিশ করা হইল। ফলমূল খাইতে বিশেষ আকাজ্ঞা। কাল জাম খাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু মিলিল না। সকালে কথায় কথায়

দাদাগোঁসাই বলিলেন, “জগৎবাবু বিব প্রয়োগ ঘটনা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, “যে দেশে অকথ্য দুর্নীতি, সেখানে এরূপ হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?”

চক্রান্তকারীদের অনুসন্ধান : গোঁসাই ভাল আছেন ত ?

সরলনাথ বাজারে গিয়াছেন। এক দোকানে এক বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বাবাজী বলিলেন, “তোমাদের গোঁসাই ভাল আছেন ত ?” সরলনাথ বলিলেন, “খুব ভাল।” একথা শুনামাত্র লোকটির মুখ ‘কালী’ হইয়া গেল। কেহ কেহ অহুমান করেন বিষ-প্রয়োগে ইনি একজন প্রধান উद्यোগী। শুনিলাম, অনেকে একত্র হইয়া এই কাজ করিয়াছে। ইহার ভিতর পাণ্ডাও আছেন। ঠাকুর বলিলেন, “সাধুরা অনেকেই ইহা জ্ঞানেন।” মহেন্দ্র ঘোষের নিকট কয়েকটি অপরিচিত সাধু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “গোঁসাই কেমন আছেন?” মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন যে, এই সকল লোককে তিনি চিনেন না। ইতিপূর্বে কদাপি কোন সাধু তাঁহাকে গোঁসাইর সম্বন্ধে এরূপ জিজ্ঞাসা করে নাই। নানকপন্থী বাঙ্গালী সাধুটি, উদাসী বাবাও গতকলা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অনেকক্ষণ গোঁসাইর অবস্থা পুনঃপুনঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন।

কিশোরীবাবুকে বিষ-প্রয়োগ বৃত্তান্ত কথন

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ ঠাকুরের শরীর সুস্থ নহে। মুন্সেফ কিশোরীবাবু বিষ-প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা বলিলেন ও দুঃখ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “বেলা ১১টার সময় এখানে কেহ ছিল না। এক বাবাজী আসিয়া মহাপ্রসাদ বলিয়া লাড্ডুর সহিত বিষ দেন। আমি নমস্কার করিয়া মহাপ্রসাদ বলিয়া

গ্রহণ করি। এক ঘণ্টা কাল বিবম সংগ্রাম হয়। পরে আর সামলাইতে পারিলাম না। অত্যন্ত জ্বর হইল। বাহুজ্ঞান লোপ হইল বটে কিন্তু ভিতরে জ্ঞান ছিল। ‘নাম’ অত্যন্ত তেজের সহিত ‘ছ’, ‘হ’ করিয়া চলিতে লাগিল। এই সময় একজন মহাপুরুষ পার্শ্বে বসিয়া, বিব ব্যাডিয়া ৩ ঘণ্টার উহার শক্তি প্রায় লোপ করিলেন। ইনি বলিয়া গেলেন, “বাহারা চক্রান্ত করিয়া এরূপ করিয়াছে, ইহার প্রতিশোধ পাইবে।” আমি বলিলাম, “দেখুন, আমার ভাগ্যে যে রূপ ছিল তাহাই হইয়াছে, আপনারা ইহাদিগকে দয়া করুন।” তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, এ সম্বন্ধে আমাদের বাহা হয় করিব, তোমায় কিছু ভাবিতে হইবে না।” ৬জগন্নাথদেব প্রকাশ হইয়া “আহা, ইহারা কি করিয়াছে?” বলিয়া ক্লেশ প্রকাশ করিলেন এবং হাত দেখাইয়া বলিলেন, “ইহাদিগকে গুঁতাইয়া ঠিক করিব।” ৬জগন্নাথদেবকে কপূর লাগাইবার জন্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একটি ব্রাহ্মণকে ১৭ টাকা দিলেন। একটি বাবাজী দর্শনে আসিলেন। ইহাকে পূর্বে লুই দেওয়া হইয়াছিল। ইহার মুখ দেখিয়া ডাকাইত বলিয়া বোধ হইল।

বাবাজী গুণ্ডার সর্দার

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ শ্রীযুক্ত মোক্ষদাকুমার বসু ১০০ টাকা পাঠাইলেন। ঠাকুর বলিলেন, “উহার ধার কর্জ, অর্থের এত প্রয়োজন, এ টাকা না পাঠাইলেই হইত।” গতকল্য যে বাবাজীটি আসিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে আজ সরলনাথ নিজেই বাহির হইল। বাবাজী ঠাকুরের নিকট বলিয়াছিলেন, তিনি দক্ষিণ দরজায় আচার্য্যী মঠে থাকেন। ইহাকে ইতিপূর্বে লুই, ধুতি, চাদর দেওয়া হইয়াছিল। সরলনাথ অনুসন্ধান করিলে কাপড়ের দোকানদার বলিল, “ঐ লোকটি ভয়ানক গুণ্ডা। সারাজীবন বদমায়েদী

করিয়া কাটাইয়াছে।” দোকানদার সরলনাথকে বাড়ী দেখাইয়া দিল। সরলনাথ বাড়ীর দ্বারে বাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাবাজী আছেন?” একটি স্ত্রীলোক বলিল “কে?” সরলনাথ—“আমি বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিব।” স্ত্রীলোকটি বলিল, “ভয় না নির্ভয়?” সরলনাথ—“নির্ভয়।” স্ত্রীলোকটি বলিল, “বাবাজী ঐ স্থানে। আপনি কি গোঁসাইবাড়ী হইতে আসিয়াছেন?” সরলনাথ—“না।” বাবাজী বলিলেন, “আপনি কোথায় থাকেন?” সরলনাথ অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া একটি স্থান দেখাইয়া বলিল, “ঐ স্থানে।” বাবাজী বলিলেন, “কেন আসিয়াছেন?” সরলনাথ, “কিছু রামায়ণ শুনিতে।” অল্পসম্মানে জানা গেল লোকটি গুণ্ডার সর্দার।

তৎপরে সরলনাথ জগন্নাথদাস বাবাজীর আশ্রমে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “গোপালদাস বাবাজী আছেন?” তাহার। বলিল, “না।” ঐ কথায় বিশ্বাস না হওয়ায় সরলনাথ জিজ্ঞাসা করিল, “আমি একটু ভিতরে বাইতে পারি?” তাহার। বলিল, “পদ্মত বসিয়াছে, এখন নহে।” “আমি শুধু নমস্কার করিয়া আসিব।” এই কথা বলিয়া হঠাৎ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গোপালদাস চুপ করিয়া মহাবীরের নিকট বসিয়া আছে। এই গোপালদাসই রাত্রি ১০টার সময়, ঠাকুরের অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় ৩৪টি আম লইয়া দর্শন করিতে আসিয়াছিল। ইহা ব্যতীত সে আর কখনও এত রাত্রে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে নাই।

বিষ-প্রয়োগ রহস্য

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ সরলনাথ জগন্নাথদাস বাবাজীর আশ্রমের সম্মুখে পূজারী বলরামদাসকে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি উদ্দেশ্যে সে দিন হুপুরের সময় প্রসাদ লইয়া আমাদের বাসায় গিয়াছিলে? এই পুলিশ

রহিয়াছে, টের পাবে। বল্ বেটা, তোর সঙ্গে আরও কে কে গিয়াছিল ?” ধমক খাইয়া লোকটার মুখ চূণ হইয়া গেল। বুদ্ধি আলুথালু হইয়া পড়িল, মুখে কথা সরে না। বলিল, “বাবু, আমি ত লাড্ডু দেই নাই, নরসিংদাস দিয়াছে। আমি পান প্রসাদ দিতে গিয়াছিলাম।” এ সময় সিংহের দোকানী, আমাদের বেণে মনিয়া, ও তাহার বাবা নিকটে ছিল। সরলনাথ বলিল, “আপনারা ত শুনিলেন, এ বেটাদের পুলিশে দিব।” সরলনাথ আসিয়া এ ঘটনা জগৎবাবুকে বলিল। জগৎবাবু শুনিয়াই বলিলেন, “তবে ত ইহাদের এখনই চৌদ্দ বৎসর।” ঠাকুরের নিকট এ সব ঘটনার আলোচনা হইলে তিনি ষোড়হস্তে ডেপুটী ও মুন্সেফবাবুকে বলিলেন, “ইহারা যাহা ইচ্ছা করুন; আমার দ্বারা যেন কাহারও অনিষ্ট না হয়।” পরে পুলিশ ইনস্পেক্টর নারায়ণবাবু আসিয়া এগ্রিমেন্ট দিতে চাহিলেন যে, ঠাকুরকে কোন ক্রেশ পাইতে হইবে না, কোথাও বাইতে হইবে না। তবুও ঠাকুর কিছুতেই বিব-প্রয়োগকারীদের নাম প্রকাশ করিতে স্বীকার করিলেন না।

আমাদের পুরী আসিবার পূর্বে জগৎবাবু ও মুন্সেফবাবু প্রায়ই এক মোহন্ত বাবাজীর নিকট যাইতেন। ঠাকুর আসিবার পর হইতে উহার আর ঐ বাবাজীর নিকট যাইতেছেন না। সর্বদা এখানেই আসিতে এবং ঠাকুরের আদেশ প্রতিপালন করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন। সাধুসেবার সময় পুরী সহরের মুন্সেফ, ডেপুটী ও অগ্ন্যস্ত্র উক্ত পদস্থ রাজকর্মচারীরা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ঠাকুরের ভাণ্ডার সাধারণ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া মোহন্তবাবাজী ঠাকুরের উপর অতিশয় ঈর্ষান্বিত হন। অধিকন্তু চতুঃসম্প্রদায়ের জমায়েতের প্রদী মোহন্তগণের মর্যাদার দাবী করিয়া যে ভাবে ঠাকুরের নিকট হইতে হাজার টাকা আদায়ের কৌশল করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের নিকট

প্রকাশ হওয়াতে, অতিশয় অপদস্থ হইলেন। এ সকল কারণে ঠাকুরের এ স্থানে অবস্থিতি তাঁহার প্রতিষ্ঠার অন্তরায় বুঝিয়া তিনি বিষ-প্রয়োগ-কার্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন। পরন্তু ভবিষ্যতে এই সকল ঘটনা লোক-সমাজে প্রকাশ হইলে, তাঁহার দুর্নাম সমস্ত ভাবরত্নের সাধু সম্প্রদায়ের নিকট প্রচার হইবে, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় তিনি একই দিনে দাদা-গোসাইকে পানের ভিতর বিষ দ্বারা এবং ঠাকুরকে লাড্ডু দ্বারা বিনাশ করিতে চেষ্টা পান। ঐ বাবাজীটি দু'জন গুণ্ডাও কলিকাতা হইতে আনিয়া আমাদের বাসার সংলগ্ন জগন্নাথবল্লভ উদ্ভানে রাখিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা পরে জানা গেল। গুণ্ডাদের সহিত পান্নার বাবার পরিচয় ছিল, তাহারাই এই কথা পান্নার বাবাকে বলেন। ঠাকুর বলিলেন, “উহার কেনই বা এরূপ করিল? আমি ত আর অধিক দিন এখানে থাকিতাম না।”

ব্রাহ্মসমাজে থাকা অবস্থায় ঠাকুরের প্রাণনাশের চেষ্টা

আজকাল দুষ্টলোক বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের সমুদ্র-স্নানের সময় প্রায় প্রত্যহই একটি কুকুর সঙ্গে সঙ্গে বাইত ও রাত্রিকালে পাহারা দিত। ইহার দরুণ গুণ্ডারা রাত্রে কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। কাল রাত্রে দরজায় কে হঠাৎ উহার পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ভাঙ্গা পায়েই সে আমাদের সহিত সমুদ্র-স্নানে গিয়াছিল। পরে দেখা গেল, রাস্তার অপর পার্শ্বে ফুলমণি চৌধুরীর বাড়ীর নিকটে, কে যেন উহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সামন্ত আজ ১০০ টাকা পাঠাইয়াছেন। জগৎবাবু ও মুন্সেফবাবু, ইনস্পেক্টরবাবুর নিকট গিয়াছিলেন। একজন পুলিশ রাত্রিকালে সদর থানা হইতে জগন্নাথবল্লভ মঠ পর্যন্ত টহল দিবে, এই

বন্দোবস্ত করিলেন। ঠাকুর আজ বিষ প্রয়োগের উল্লেখ করিয়া, পূর্বেও নানাস্থানে যে তাঁহার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিলেন। যখন কেশববাবুর কন্ঠার বিবাহে ঠাকুর ঘোর প্রতিবাদ করেন এবং ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভিন্ন হইয়া কতক লোক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, তখন, পুরাতন দলের কেহ কেহ ঠাকুরের প্রাণহিংসা করিবার ইচ্ছা করেন। অবশ্য এ কার্য্য কেশববাবু জানিতেন না। কয়েকজন প্রধান লোকের পরামর্শে ইহা স্থিরীকৃত হয়। উহাদের মধ্যে একজন দুই টাকা দিয়া গুপ্তা ঠিক করেন—ছোরা বুকে মারিয়াই দৌড়িয়া পালাইবে। ঠাকুরের বাসা তখন ১৪ নং কলেজ স্কোয়ারে ছিল। একটি মদখোর লোক (যিনি উপাসনাতে সর্বদাই যোগ দিতেন) ঐ পরামর্শ রাখাবাজারে গুনিতে পাইয়া ঠাকুরকে সতর্ক করিয়া যান, “সাবধান, কদাচ নীচে নামিও না। তোমরা যে কেমন ব্রাহ্ম এতদিনে টের পাইয়াছি। তোমরা সব করিতে পার। তুমিও পার। নীচে নামিলেই ছোরা বসাইয়া পালাইবে। একটি ব্রাহ্মের সহিত গুপ্তা আসিয়া তোমাকে ডাকিবে। একজন প্রচারক দূর হইতে এ কার্য্য শেষ হইল কি না পর্য্যবেক্ষণ করিবে। ছোরা বসাইলেই ব্রাহ্মটি বাঁশী বাজাইবে, ঐ প্রচারকটি আসিয়া দেখিয়া যাইবেন। আর গোণ হইলে, কারণ জানিবার জন্য ঐ ব্যক্তি গলির মাথায় থাকিয়া বাঁশী বাজাইবে। এক ঘণ্টা পরেই ইহারা আসিবে।” ঠাকুর দেখিলেন, এক ঘণ্টা পরে একটি ব্রাহ্ম ও তাহার সহিত একটি বলিষ্ঠ লোক আসিয়া তাঁহারে ডাকিতেছে। উপরের বারান্দা হইতে ঠাকুর বলিলেন, “কি কাজ বলুন, আমার শরীর ভাল নয়, নীচে যাইব না।” ঘটনাক্রমে সেদিন ঠাকুরের জ্বর ছিল। সে বলিল, “অধিকক্ষণ লাগিবে না, তু’ এক মিনিটেই কার্য শেষ হইবে।” ঠাকুর তথাপি নামিলেন না। তখন গুপ্তা বলিল, “তোমরা এই নির্দোষ লোকটাকে মারুছ? তোমরা ত বড় ভয়ানক লোক!

শীঘ্র আমার টাকা দাও। নতুবা লোকটাকে ডাক—ছোরা মারিয়া যাই।” অগত্যা ২২ টাকা দিয়া তখনই গুণ্ডা বিদায় করিল। এদিকে দেবী দেখিয়া গলির মাথা হইতেও বাঁশী বাজিল। পরদিন ঠাকুর কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, সঙ্গে কালীনাথবাবু। নীচের তলায় পূর্বোক্ত প্রচারকটির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তখনই ঠাকুরের তলপেটে ঘুসির উপর ঘুসি মারিলেন। ঠাকুর কুস্তক করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করিয়া বলিলেন। তিনি শুনিয়া বিশ্বাস করিতে চান না। বলিলেন, “যদি সত্য হয়, ঘটনাটি অতি আশ্চর্য্য।”

গোঁসাইয়ের পত্র : শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী

আজ পান্নাকে দিয়া ঠাকুর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে এই চিঠিখানা লেখাইলেন।

নমোহস্ত শ্রীনিত্যানন্দ বংশধর চরণ সরোজেষু—

আজ ‘বঙ্গবাসী’তে ‘শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী’ নামক প্রবন্ধটি শুনিয়া যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। যখন আমি কলিকাতায় ছিলাম তখন প্রায়ই শুনিতাম যে ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’ পত্রিকায় ‘মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বর পুরী’ শূদ্র ছিলেন লেখা হইতেছে। সেই পর্য্যন্ত আমার মনে সর্বদাই জাগিত যে আমাদের গোস্বামীবংশে কি এমন কেহই নাই যে, এই মিথ্যা এবং ভয়ানক মতের প্রতিবাদ করে? অতঃ আপনার প্রতিবাদ শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম তাহা বলিতে পারি না। যদি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ও সমুদ্র শুকাইয়া যায়, তথাপি ঈশ্বর পুরী যে শূদ্র ছিলেন, এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না। আপনি যেক্রপ যুক্তি-যুক্তভাবে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা খুবই সুন্দর হইয়াছে। যুক্তিগুলি খুব অকাট্য হইয়াছে, তথাপি আমি দুই একটা কথা বলি। আপনি যাহা

প্রমাণ দেখাইয়াছেন তাহা বথেষ্ট হইয়াছে। তবে সবদিকেই ঈশ্বর পুরী যে কখনই শূদ্র হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।

৮মহাপ্রভু যখন গয়াধামে গিয়াছিলেন, সেই স্থানেই ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার প্রকটাবস্থা নয়। আর বর্ণাশ্রমধর্মের থাকিয়া যে তিনি শূদ্রের নিকট দীক্ষা লইবেন এ কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না। গয়াধামে গিয়া ঈশ্বর পুরী ব্রাহ্মণ না হইলে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেনই বা কেন? তাঁহার গুরু পরম্পরায় 'শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরী' বলিয়া লেখা আছে। ঈশ্বর পুরী শূদ্র হইলে মাধবেন্দ্র পুরী তাঁহাকে শিষ্য করিবেন কেন? আপনি যে সকল যুক্তি দেখাইয়া লিখিয়াছেন, তাহাতেই এই সব অসার ও অশ্রদ্ধা মত খুব খণ্ডন করা হইয়াছে। এইরূপ ভয়ানক মত বাহাতে প্রশয় না পাইতে পারে, তজ্জন্ত আপনারা সবিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম লোপ পাইবার মত হইয়াছে। আপনারা বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষার জন্য চেষ্টা না করিলে আর কাহারো করিবে? এই বর্ণাশ্রমধর্ম না দাঁড়াইলে সর্বসাধারণের ধ্বন মঙ্গল হইবে না। বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা হইলেই বথার্থই সকলের কল্যাণ হইবে। পরিশেষে মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যেন, আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন ও যেন তাঁর সত্য ধর্ম এইরূপে রক্ষা করিতে ও লোককে বুঝাইতে শক্তি দেন। *

৮শ্রীক্ষেত্রধাম

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ

১৩০৬

শাস্ত্র ও সদাচাররক্ষাকারী সর্বসম্মতগণের

দাসাত্মদাস,

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

* বহুদিন পরে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে এই পত্রখান মেজদাদা শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করেন এবং উহা আকি শ্রীমান কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে দেন। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "এই চিঠিখানা আমার নিকট থাকিলে হয়ত হারাইতে পারে। আপনারা যত্ন রক্ষা করিবেন।"

উচ্ছিষ্ট বিচার

‘এই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ সকালে পাঠের পর ঠাকুর সরলনাথের দ্বারা দয়ানিধি পূজারীকে আনাইলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত গোপনে তাঁহার সহিত কথাবার্তা হইল। ঠাকুর পরে বলিলেন, “বিষ-প্রয়োগ ঘটনাটি তাঁহার নিকট বলিলে, তিনি বলিলেন, ‘আপনার কোন ভয় নাই। ভগবান যখন রক্ষা করিতেছেন, তখন শত চেষ্টা করিয়াও ইহারা কিছু করিতে পারিবে না। এই ঘটনাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, মানুষের ক্ষমতা কত কম! তোরা ত অতি দারুণ বিষ দিয়া দেখিলি, কিন্তু কই? ভগবান যঁাহাকে রক্ষা করেন তাঁকে মারে কে? অতএব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। উহারা কিছুই করিতে পারিবে না। ভগবান যখন আপনার রক্ষক তখন ভয় কি’।”

আজ হগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারবাবু ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শান্তিদিদি ভোরে স্বপ্ন দেখিলেন, “অনেক সাধু গান করিতেছেন—‘শ্রামা গোপনে গোলকে এসে, শ্রাম সেজেছ’।” ঠাকুর বলিলেন, “যিনি শ্রামা তিনিই শ্রাম। লোকে বোঝে না বলিয়া এত গোলমাল।”

মহেন্দ্র মিত্র ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিতে গেলে গুরু, পুরোহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্ট খাওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের উচ্ছিষ্ট খাওয়া নিষেধ। এ অবস্থায় কি করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়?” উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, “গুরু, পুরোহিত, ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্ট আপনি খাইতে পারেন, তাহাতে দোষ হইবে না।” শ্রীপতি সামন্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “তাঁহাদের মধ্যে একজন ‘দিদিমার’ উচ্ছিষ্ট খাইয়াছেন, ইহাতে কি দোষ হইয়াছে?” ঠাকুর

পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, “ব্রাহ্মণকন্যার উচ্ছিষ্ট খাইয়াছে, যতদূর প্রায়শ্চিত্ত করিতে বল।”

ঠাকুরকে আম না খাওয়াইয়া নিজে খাইবেন না বলিয়া মুস্কেবাবু আজ কয়েকটি বেশ বড় বড় আম একটি পাত্রে করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া নমস্কার করিলেন। দেখিতে বড়ই সুন্দর লাগিল। আজ গেণ্ডারিয়ার কামিনীকুমার বসু মহাশয় ১০০ টাকা পাঠাইয়া ছিলেন। কিছুদিন হইল বড়দাদা নিজ হইতে নৈমিষারণ্যের অতি উৎকৃষ্ট চিড়া পাঠাইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “আভ্যন্তরীণ আত্মায় আত্মায় যোগ হইলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। একজনের অভাব অস্ত্রে টের পার।” ঠাকুর উহা নিত্য সেবা করিতেছেন। আজ বড়দাদার নিকট হইতে এক টুকরি লক্ষ্মীর খরমুজা আসিল। খরমুজা সব পচিয়া গিয়াছিল। অতি সামান্য এক টুকরা খাইয়া বলিলেন, “এ যেন মিশ্রিতে মাখা। যতদূর গেল, টের পাওয়া গেল।”

মহাপ্রসাদ দ্বারা ক্ষেত্রবাবুকে শ্রদ্ধ করিতে আদেশ

আজ টাকা হইতে চিন্তাহরণ ঘোষ ১৫০ টাকা পাঠাইলেন, আরও ৭৭ টাকা আসিল। ইহা হইতে দীনবন্ধু ২০০ টাকা পাইল। এই সময়ে মেদিনীপুরের গুরুভাতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার বহু উপেক্ষনাথ চন্দ আসিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিলেন, “মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্রদ্ধ করিতে হইবে।” ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, “পিতামাতা বর্তমান থাকিতে কিরূপে শ্রদ্ধ হইবে?” তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, “পিতৃপুরুষগণ মহাপ্রসাদের পিণ্ডের জন্ত সর্বদাই হাত পাতিয়া আছেন। অতএব অত্যাঁত পিতৃপুরুষগণের শ্রদ্ধ করিতে হইবে।” ক্ষেত্রবাবু ঠাকুরের কথাতেও সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ

করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয়া শাস্ত্র খুলিয়া দেখাইলেন। তাঁহারা ঠাকুরের আদেশানুসারে পূর্বদিন মস্তক মুণ্ডন করিয়া তৎপর দিন যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিলেন। ঠাকুর আরও বলিয়া দিলেন, “যথাসাধ্য প্রত্যেক দেবমন্দিরে প্রণাম করিবার সময় প্রণামী দিতে হয়। রাজা, সাধু ও দেবতা স্থানে রিক্তহস্তে যাওয়া নিষেধ। এ স্থানে প্রত্যহ পাকাল প্রসাদ না পাইলে শরীর অসুস্থ হইবে।”

আজ কুঞ্জলাল নাগ ৬০০ টাকা তারে পাঠাইলেন। কুঞ্জ ঘোষ মুন্সেফবাবুর নিকট টেলিগ্রাম করিলেন, “ঠাকুর কেমন আছেন?” কুঞ্জলাল নাগও তারে মুন্সেফবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর কেমন?” ঢাকার সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। পুনরায় কুঞ্জলাল নাগ ৯০০ টাকা পাঠাইলেন। ইহা হইতে দীনবন্ধু ৭০০, সোয়ার ৬০০ ও হরি বেহারা ১০০ পাইল। কুঞ্জবাবু লিখিলেন আরও টাকা পাঠাইতেছেন। এখান হইতে তারে খবর দেওয়া হইল “ঠাকুরের শরীর মৃতপ্রায় হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় অলৌকিকভাবে রক্ষা পাইয়াছেন। বিষের ক্রিয়া এখনও আছে তবে জীবনের ভয় নাই।” ঠাকুরকে বলিলাম, “কুঞ্জবাবু পুনরায় ৬০০ টাকা পাঠাইয়াছেন।” ঠাকুর বলিলেন, “প্রাণের টানে অস্থির হইয়াছেন, কি করেন।” মোক্ষদাবাবুর ৫০০ টাকা ও চারুবাবুর ৬০০ টাকা ১১টার সময় তারে আসিল। উহা হইতে দীনবন্ধু ৫০০ টাকা, সোয়ার ৪০০ ও হরি বেহারা ২০০ টাকা পাইলেন।

অদ্ভুতরূপে জাম সংগ্রহ

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ ‘তারে’ শশীমোহন দাসের নিকট হইতে ৪০০ টাকা ও হরেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে ২০০ টাকা আসিল। ঠাকুরের শরীর বড় অসুস্থ।

গতকল্য দ্বাদশীতে ঠাকুরের শরীর একেবারে নিজীব হইয়া পড়িয়াছিল। আজও শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। এক পক্ষ পূর্বে এই দ্বাদশী তিথিতেই ঠাকুরকে বিব প্রয়োগ করিয়াছিল। কয়দিন যাবৎ জাম খাইতে চাহিতেছেন। অমৃত একদিন জগন্নাথবল্লভ উদ্ভান হইতে চারিটি ও অন্য দিন বেলা ৩টা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া কুলের বিচিত্র মত একটিমাত্র জাম পাইলেন। আজ মুসেফ্‌বাবুকে গণেশবাবু অযাচিতভাবে এক ঠোঙ্গা জাম দিয়াছেন। উহা পাইয়াই তিনি ঠাকুরের নিকট জাম লইয়া উপস্থিত হইলেন। জামগুলি বড়ই ভাল। আমাদের দেশেও সচরাচর এরূপ জাম মিলে না। ঠাকুর উহা পাইয়া তৎক্ষণাৎ নিবেদন করিয়া সেবা করিলেন। মুসেফ্‌বাবু বলিলেন, “ঠাকুরের জাম খাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জানিয়া চারিদিকে আফিসের পেয়াদাদের, উহা যেরূপেই হউক, সংগ্রহ করিতে বলিলাম। তাহারা কোথাও পাইল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এম্বিবে গণেশবাবু হঠাৎ আমাকে কতকগুলি জাম পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার বাটিতে জামগাছ আছে। তিনি বলিলেন, গতকল্যই আমাকে জাম পাঠাইবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল, তাহা না পারায় অত্যন্ত ক্লেশ পান। অতঃপরে তিনি উহা পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার তিন বৎসরের আলাপ কিন্তু জাম কখনও পাঠান নাই।”

নরেন্দ্রের গৌসাই চাকর দ্বারা জাম পাঠাইয়াছিল। উহা নিতে নিষেধ করিলেন। “অতঃপর বিশেষ পরিচিত ভিন্ন কেহ কিছু দিলে নিবে না” বলিয়া দিলেন। “কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেও নিষেধ করিবে, বড়ছাতার মোহন্তই হউক, আর জগন্নাথদাস বাবাজীই হউক।” অতিরিক্ত পায়খানা হওয়ায় ঠাকুরের শরীর বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ১টা হইতে শরীরের অনুস্থতা বড়ই বাড়িয়াছে।

নরেন্দ্রের গৌসাইর অদ্ভুত ব্যবহার

ঠাকুরের শরীর বড়ই অসুস্থ ও দুর্বল। এই শরীরে জীবন রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য। গত কলা মহাপ্রসাদ লইয়া অমৃত, নরেন্দ্রের গৌসাইর নিকট গিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের গৌসাই বলিলেন, “আজ আম পাঠাইয়া-ছিলাম তাহা গ্রহণ করা হয় নাই কেন?” অমৃত বলিল, “ঠাকুর, কেহ কোন খাবার জিনিষ দিলে তাহা গ্রহণ করিতে আমাদেরকে নিষেধ করিয়াছেন। সেদিন এক বাবাজী মহাপ্রসাদ বলিয়া ঠাকুরকে বিষ খাওয়াইয়া গিয়াছে।” নরেন্দ্রের গৌসাই বিদ্রূপ করিয়া বলিল, “হাঁ, বিষ খাওয়াইয়াছে! তাদের কি স্বার্থ? বিষ খাওয়াইলে কি মানুষ বাঁচে? যদি কেহ খাওয়াইয়া থাকে, তবে তোমাদের বাসারই কেহ খাওয়াইয়াছে। ইনি ত অবতার। ইহাকে কি কেহ বিষ খাওয়াইয়া মারিতে পারে?” এ সমস্ত ঠাকুরকে জানান হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই ঘটনা শুনিয়া দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক বরং আমাদের আশ্রমের লোকদিগকেই দোষারোপ করিলেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ঠাকুর প্রতিদিন ইহাকে মহাপ্রসাদ নিয়ম মত পাঠাইয়া দিতেছেন। অধিকন্তু ধুতি, চাদর, ‘মুকুটা’, ঘটি ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিসপত্র, এমন কি ঘর মেরামতের টাকা পর্য্যন্তও যখন বাহা প্রয়োজন এখান হইতে নিয়তই পাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন ঠাকুরের এই অসুখে একটু দুঃখ পর্য্যন্ত করিলেন না। মনুষ্য-চরিত্র বড়ই অদ্ভুত। বৈকালে ব্রহ্মচারী ও সরলনাথ যাইয়া তাঁহাকে বলিয়া আসিল, “আপনি যখন গৌসাইর জ্ঞাতিখুড়া হইয়াও আমাদের দুর্নাম দিতেছেন, তখন অস্ত্রে ত ইহা সহজেই বিশ্বাস করিবে। কোথায় আপনি ঠাকুরের অসুখে সহানুভূতি করিবেন, তাহা না করিয়া প্রকারান্তরে দুষ্ট বিষ-প্রয়োগকারী বাবাজীদেরই সমর্থন করিতেছেন। ভাল, আমাদের

সহিত আপনার সংশ্রব আজ হইতে উঠিয়া গেল। আপনি আমাদের ওখানে গেলেও গৌসাইর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না আর মহাপ্রসাদও কাল হইতে আসিবে না। এ ঘটনাতে মনে হয় আপনার সহিত দুই গুণ্ডাদের সংশ্রব আছে। ঠাকুর বলিয়াছেন, ‘মহুয্যকে ভগবানের অবতার বলা মহাপাপ মনে করেন’।”

ঠাকুরের মহাপুরুষের সেবা ও তাঁহার আশীর্বাদ লাভ

কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন যে, তিনি যখন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন, তখন ঢাকার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী তথায় গিয়াছিলেন। তিনি সাধুসেবা করিবেন। সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ার হইল। পক্ষতে সাধুরা বসিয়া গিয়াছেন, তখন নীচ হইতে কেহ ডাকিয়া বলিল, “খাবার চাই”। ঠাকুর নীচে যাইয়া দেখেন, একটি সাধু কিছু না পাইয়া চলিয়া যাইতেছেন। ঠাকুর সাধুকে ধরিলেন এবং তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলেন। উভয়ে যমুনার পাড়ে গেলেন। ঠাকুর নিজের ব্যয়ে লুচি, তরকারী কিনিয়া আনিলেন এবং খুব যত্নসহকারে সাধুকে ভোজন করাইলেন। ঠাকুর বলিলেন, “ইহাদের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।” তিনি বলিলেন, “ইহারা কে? তোমার কি কেহ?” ঠাকুর বলিলেন, “বাহারা মদ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, ইহারা সেই জাতি—জল অচল।” তিনি বলিলেন, “সর্বনাশ! তুমি আগাকে রক্ষা করিয়াছ। ইহাদের নিকট ভোজনীয় গ্রহণ করিলে মহা অনিষ্ট হইত। তোমার ব্যবহারে আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। গুরু অহরূপই ব্যবহার হইয়াছে। তোমার গুরুর মুখাকৃতি মাঝে মাঝে তোমার মুখে বলক্ দিতেছে। এস্থানে আসিবার সময় তোমার গুরু বলিয়া ছিলেন, “আমার এক চেলা শ্রীবৃন্দাবনে আছেন। তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া আসিবেন।” মহাপুরুষদের মধ্যে বাহারা বাহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের মধ্যে পরিচয় আছে। দূরে থাকিয়াও কথাবার্তা হইয়া থাকে।

ঠাকুরের গান শুনিতে আগ্রহ

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ শরৎকুমার বসু নোয়াখালী হইতে ৭০০ টাকা, হরেন্দ্র বসু ১০০ টাকা পাঠাইলেন। ইহা হইতে দীনবন্ধু ৪০০, সোয়ার ২০০ ও হরি বেহারী ১০০ পাঠাইলেন। আজ জগন্নাথ চাকর চলিয়া গিয়াছে। গত রাত্রে সরলনাথের কথা না শুনায় একটু ধমক দিয়াছিল। নাথিয়ার (চাকর) ব্যবহার ২৩ দিন যাবৎ বড়ই বিসদৃশ লক্ষিত হইতেছিল। দাদাগোসাইর কথা শুনে না। দিবা-নিদ্রায় সময় কাটায়। কাজকর্মেও শৈথিল্য। এখান হইতে চলিয়া যাইয়া জগন্নাথদাস বাবাজীর আশ্রমে রহিয়াছে।

আজকাল ঠাকুর গান শুনিতে খুব আগ্রহ দেখাইতেছেন। প্রায়ই গান শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। শ্রীমান বেণী, রেবতীবাবু, প্রিয়নাথ ভোর রাত্রে, সন্ধ্যাকীর্তনের পর, কখন বা ৯টার পাঠের পর নানা বিষয়ক গান করিয়া ঠাকুরকে আনন্দ দেন। একটি গান ঠাকুর খুব ভাল বাসিতেন। উহা পুনঃপুনঃ গাওয়াইয়া শুনিতেছেন এবং একখানা কাগজে লেখাইয়া সামনের আসনের গ্রন্থের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। গানটি এই :—

অই কালরূপ ভুলতে নারব, কোন কালে।

(আমার আমার শ্রামের)

লোকের কথায় কি করব সই, বলুক লোকে যে যা বলে ॥

কাল বাসে, কাল কেশে, লোটন বাঁধিব।

যখন শ্রামকে পড়বে মনে, এলায়ে দেখিব।

কাল কালিন্দিতে যাব, কাল জল যতনে খাব।

কাল বঁধুর গণ গাব, বসব কাল তমাল তলে ॥

কাল ময়ূর, কাল ভৃঙ্গ, করব দরশন ।

দন্তে, নেত্রে নিব কাল মগ্নন, অগ্নন ।

কালরূপ দেখানে ধরব, কালরূপ নয়নে হেরব,

কণ্ঠকয় কাল হরব, তরব মরব, কাল সখির কোলে ॥

আর একটি গানও এই সঙ্গে স্বহস্তে লিখিয়া আসনের বজ্রুর্দেয় কঠোপনিষৎ গ্রন্থে রাখিয়াছেন । গানটি এই :—

বৃন্দা বিপিনে মঙ্গল আরতি হের রে নয়ন আনন্দে ।

মঙ্গল আরতি হতেছে, নাচিছে সখিবৃন্দে ।

কুঞ্জ কুঞ্জ হতে ধাইছে সবে, হেরিতে শ্রীগোবিন্দে ॥

মহেন্দ্রবাবুকে উপদেশ

১৪।১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল ।

আজ বড়দা এক ঝুড়ি বেল ও আমলকীর মোরঝা পাঠাইয়াছেন । বেলগুলি প্রায়ই নষ্ট হইয়াছে । আমলকীর মোরঝাও প্রায় তদ্রূপ ।

কথাপ্রসঙ্গে মহেন্দ্র মিত্রকে ঠাকুর বলিলেন, “শাস্ত্র ও সদাচার যত চলিতেই হইবে । অন্ততঃ নিজের দুষ্কৃতি স্মরণ করে ঘাড় হেঁট করে দীক্ষাকালে যাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা করিতেই হইবে । নচেৎ কিছুতেই ভগবৎতত্ত্ব বুঝা যাইবে না । শারীরিক কাম ক্রোধাদি থাকিতে ভগবৎতত্ত্ব বোঝা যায় না, মোহরের রাশি পড়িয়া থাকিবে, তাহার প্রতি দৃকপাত করিবে না ।” পরে বলিলেন, “সদগুরুর কুপালাত হইলে আর সংসঙ্গের প্রয়োজন নাই । প্রাণায়ামের দ্বারা অন্তর শোচ এবং জলাদি দ্বারা বাহ্যশোচ হইয়া থাকে । যদি অন্তকে উপদেশ দিতে চাও, তবে অগ্রে নিজে তাহা কর ।”

আজ রজনীকান্ত গুহ ঠাকুরতা বানরীপাড়া হইতে ৩৬০ টাকা

পাঠাইলেন। ইহা হইতে দীনবন্ধুর বাকী ২৮০ টাকা অর্থাৎ তাহার প্রাপ্য সমস্ত টাকাই শোধ হইয়া গেল। ৮০ টাকা সোয়ারকে দেওয়া হইল। ডেপুটী শশীবাবু কাল মফঃস্বল হইতে আসিয়াছেন। আফিসে আমাদের বাসার অমঙ্গলসূচক কথা শুনিয়া নিজের কাজ ফেলিয়াই চলিয়া আসিলেন। তিনি এই সকল কথা শুনিয়া অবাক। তিনি কহিলেন, “কেহ হয় ত কিছু প্রার্থনা করিয়া না পাওয়ায় এরূপ করিয়াছে। কিম্বা সাধুসেবা প্রভৃতিতে আপনার এইরূপ গৌরব ও সম্মান সহ্য করিতে না পারিয়া কোন দুষ্ট লোক এরূপ করিয়া থাকিবে।” এখনও উৎপাত চলিতেছে শুনিয়া জগৎবাবু ও শশীবাবু প্রকাশ করিলেন, “এখন একটা বন্দুক রাখা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে ফাঁকা আওয়াজ করিলে ভাল হয়। কিন্তু গোঁসাই কি এরূপ করিবেন?”

‘বিষে ভিতরটা পচিয়া গিয়াছে’

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

ঠাকুরের শরীর অত্যন্ত খারাপ। মুখশ্রী মৃতব্যক্তির ন্যায়। শরীরে ঘেন হরিদ্রা দিয়া এক পৌছ দিয়াছে। মাছিগুলি উড়িয়া উড়িয়া গায়ে পড়িতেছে। সজোরে বাতাস করিয়া উহা তাড়াইতে হইতেছে। স্নানের সময় গোলাপ জল দ্বারা শরীর ধোয়ান হইতেছে। শরীর এমন দুর্বল যে, অনেক সময় পায়খানায় যাইয়া কোঁকান। প্রায়ই কথা বলিতে অত্যন্ত ক্লেশ হয়। অনেক সময় চুপ করিয়া পড়িয়া থাকেন। হাত দিয়া কোন জিনিষ উঠাইতে পারেন না। অল্পকে ভর করিয়া পায়খানায় যান। হরির লুট দেওয়ার সময় নিজে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন না। আমাকে বলিলেন, “আজ অবধি হরির লুট, জগন্নাথদেব প্রভৃতির পূজা অর্চনা এ সব তুমিই করিও।” আমি বলিলাম, “আমি ত পূজা অর্চনা জানি না—

তবে ইষ্টনামে পূজা করিতে পারি।” তিনি উত্তর করিলেন, “উহাই শ্রেষ্ঠ পূজা।” অনেক সময় দুর্বলতায় হাঁপাইয়া থাকেন। শরীর পূর্ববৎ আর স্থির রাখিতে পারেন না। এজ্ঞ কতকগুলি বালিশ করা হইয়াছে। ঔষধ ব্রহ্মচারী গুলিয়া দেয়। আহারে অরুচি হইয়াছে। নামমাত্র আহার করেন। চোখে-মুখে অত্যন্ত দুর্বলতা প্রকাশ পায়। শরীরও ক্লান্ত হইয়াছে। অনেক দিনই যথাসময়ে শৌচে যাইতে পারেন না। আত্ম আবার রাত্রিতে একবার এক কাঁচা ও অল্পবার অর্ধ কাঁচা পরিমিত রক্ত পড়িয়াছে। বলিলেন, “বিষ শরীরের মাংসপেশী বিনষ্ট করিয়া শিরা ও ধমনী সকল আক্রমণ করিয়া রক্তে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিষ যদি অস্থি, মজ্জা আক্রমণ করে তবে আর শরীর রক্ষা করিতে পারিব না।”

দাদাগোঁসাইকে কহিলেন, “বিষ বেরূপ আক্রমণ করিয়া নির্জীব করিয়া আনিয়াছে, কখন কি হয় বলিতে পারি না। তবে একটি কথা। গণেশ ছড়িদার অত্যন্ত ক্লেশে পড়িয়াছে, উহার কন্যার বিবাহে ১০০ টাকা দিস্।” ব্রহ্মচারী ও সরলনাথ কাল রাত্রিকালে ৩ ঘণ্টা বসিয়া তৈল-জল পায়ে মালিস করিয়া গিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন, “তোমরা আত্ম আমাকে বাঁচাইলে, বিবে ভিতরটা পচিয়া গিয়াছে।” আজকাল সর্বদাই একরূপ বিষাক্ত পাকা কফ নির্গত হইতেছে। উহা খেত ও নীলবর্ণ মিশ্রিত। যে সকল নেকড়াতে কফ ফেলেন, তাহা ঠাকুরের কথামত পোড়াইয়া ফেলা হয়। কারণ এগুলি সব বিষাক্ত।

আজ রাত্রি ১০টার সময় নবাগত একটি গুরুভাই ঠাকুরের পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন। হঠাৎ ঠাকুর কিছুকাল অস্পষ্ট কি বলিয়া পরে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম ওঁ রামঃ।”

অর্ধ-বাহ্যাবস্থায় বলিতে লাগিলেন, “এ কে ? এ যেন যমের কিষ্কর!

শীঘ্র একে তাড়াইয়া দেও। তোমরা যাকে-তাকে বাতাস দিতে দাও কেন? যে-সেই কি বাতাস করিবে? যা' বলি তা করে না। একেবারে উচ্চ অধিকার! যাও ব্রহ্মচারী, একে বলে আইস, এ যেন কালই দেশে চলিয়া যায়।”

‘অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া—সরলনাথ’

আজ ডেপুটী বাবু, মুন্সেফ বাবু ঠিক করিলেন, কাল সমস্ত দোকান-দারদের ডাকাইয়া আনিয়া সমস্ত ধার শোধের রসিদ নিবেন। পান্না মঠে মঠে যাইয়া মর্গ্যাদা দিয়া আসিতেছেন। আশ্চর্য্য এই, জগন্নাথদাস বাবাজী যে সকলকে যথাসাধ্য মর্গ্যাদা করিব বলিয়া ঠাকুরের দ্বারা লিখাইয়া লইয়াছিলেন তাহা মঠওয়ালারা কেহ জানে না। সকলেই অতি অল্প পাইয়াও খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

আজকাল ব্রহ্মচারীর সহিত সরলনাথও সারারাত্রি জাগিয়া ঠাকুরের সেবা করিতেছেন। সরলনাথের রাত্রেও নিদ্রা নাই। যখন যাহা বলা যায় অমনি বাজার হইতে আনিয়া হাজির। বস্তুতঃ সরলনাথের পরিশ্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। বাজারে ও অগ্নের সহিত কারবারে একজন সুদক্ষ লোক। কখনও ইনি ডিটে ক্টিভ সাজিতেছেন, কখন বাজার সরকার, কখন বা গৃহের সুদক্ষ গৃহিণী, কখন বা রোগীর পার্শ্বে দিবারাত্রির সেবক! রাত্রিকালে জাগিয়া কখন কখন বড় রাস্তায় কাঁধে লাঠি নিয়া পাহারা দিতেছেন। দিনরাত্রি আদৌ উহার বিশ্রাম নাই। ২৩ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যান। ঠাকুরের ও সকলেরই ইনি পরম আদরের বস্তু। ঠাকুর প্রাণ ভরিয়া জগৎবাবু প্রভৃতির নিকট ইহার প্রশংসা করেন। ব্রহ্মচারীও দিবারাত্রি অবিরাম পরিশ্রম করিয়া ঠাকুরের সেবা করিতেছেন। সে দিন ঠাকুরের নিকট কে যেন বলিলেন, “সরলনাথ এত ত্রস্ত যায় আসে এবং দৌড়ায় যে

অবাক হইতে হয়।” ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “হাঁ, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছিল। সরলনাথ, আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া।”

উইলসন্ হোটেলের বেদানার রস গ্রহণের প্রস্তাবে ঠাকুরের বিরক্তি

ঠাকুর বেদানার রস খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, দাদাগোসাই মণিবাবুকে লিখিয়া কলিকাতা হইতে এক বোতল বেদানার রস আনাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু উহা ভাল হইল না। ইহাতে বিশ্বাস মহাশয় ও দাদাগোসাই প্রভৃতির অনুরোধে, ব্রহ্মচারী অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাইয়া ঠাকুরকে বলিল, “খাঁটি বেদানার রস ‘উইলসন্ হোটেল’ হইতে আনাইয়া দিব? তাতে আপনার উপকার হইতে পারে।” শুনিয়াই ঠাকুর খুব ধমক দিয়া বলিলেন, “তোমার ত ভয়ানক রাজসিক ভাব দেখছি! উইলসন্ হোটেলের বেদানার রস আমাকে খাওয়াইতে চাও।” তাহাতে ব্রহ্মচারী বলিল, “কেন? আপনাকে উইলসন্ হোটেলের জিনিষ ত পূর্বে পেতে দেখেছি।” ঠাকুর বলিলেন, “তাই বলে কি এখনও খেতে হবে? বার বৎসর নিয়ত সঙ্গে থাকিয়াও বুঝলে না, কোথা থেকে কোথায় এসে আমি দাঁড়িয়েছি? পূর্বে ত কতই করেছি। চিরকালই কি এক ভাব?”

জগন্নাথদেবের ইচ্ছায়ই সব হয়

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ ঠাকুরের শরীর নিতান্ত অসুস্থ দেখিয়া, দাদাগোসাই মনে করিলেন, এস্থান হইতে কিছু দূর করিয়া শীত্র শীত্র ঠাকুরকে কলিকাতা লইয়া যাইবেন। পান্নার সহিত এ বিষয়ে কি আলোচনা হইল। পরে ঠাকুরের নিকট এ সব কথা উঠিল। আজ ঠাকুরের শরীর বিশেষ খারাপ

শুনিয়া বাসার প্রায় সকলেই 'চা' খাওয়ার পর ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর দাদাগোঁসাইকে বলিলেন, "তোরা এত ভাবিস্ কেন? স্বয়ং জগন্নাথদেব তিনবার করিয়া আমার খবর নিচ্ছেন। ইনি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, আমার ভয় কি? অত্র স্থানে গেলে কি ত্রাণ পাইব? একটা কাঁটা ফুটিলেও মৃত্যু হইতে পারে। আর এখানে ধরিয়া আছড়াইলেও তাঁহার ইচ্ছা! ভিন্ন কিছু হওয়ার ঘো নাহি। অত্রদিকে তোমরা তাকাও কেন? যা'বার ইচ্ছা হ'লে, তোমরা চলে যাও। আমি কেবলমাত্র লাঠিগাছা অবলম্বন করে পড়ে থাকুব। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কদাপি কিছু ক'রব না। তাঁহার ইচ্ছা হ'লে মুহূর্তের মধ্যে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।—ঠাকুর ঘরের ছেলে ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। জগন্নাথদেব স্বয়ং অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, ভয় কি? তিনি কে এবং তিনি স্বয়ং আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন জান্লে আর ভয় থাক্বে না। তিনি সময় বুঝে আদেশ করবেন। আমি পুনঃপুনঃ বলছি, আর কাহারও উপর নির্ভর ক'রো না।"

গঙ্গাধর খুটিয়া আজ মন্দিরে গেলে পাণ্ডারা বলিল, "কি তোমার এই কাজ? গোঁসাইকে বিষ খাওয়াইয়াছ?" সে কাঁদিয়া লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছে, "শেষে কি আমি এ কাজ করিব?" দাদাগোঁসাই প্রভৃতি বলিলেন, "আমরাও কাহারও নাম নির্দিষ্ট করিয়া বলি নাই।" আজ কুঞ্জ ঘোষ খুব ভোরে Urgent Telegram করিয়াছেন "ঠাকুর কেমন?" বোধ হয় কোন স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। উত্তর গেল "রক্ত আক্রমণ করিয়াছে, বিপজ্জনক, অর্থের প্রয়োজন।"

দেবতাদের সাহায্যে গঙ্গার বিশুদ্ধ বায়ুসেবন

কাল রাত্রিকালে ১০টার সময় ঠাকুর যে চীৎকার করিয়া, "ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ" বলিয়াছিলেন, সেই সময়ে আজ মুন্সেফবাবু ও

জগৎবাবুর নিকট গল্প করিলেন, “কাল যখন দেখিলাম রক্ত আক্রমণ করিয়াছে এবং প্রায় এক কাঁচা, পরে আবার অর্ধ কাঁচা পরিমিত রক্তপাত হইল, তখন মনে করিলাম—গঙ্গার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে আরাম পাই এবং উহা সেবনের একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। এই সময় দেখি দেবতারা একখানা হীরামণিক্য খচিত খাট আনিয়া বলিলেন, ‘ইহাতে উঠুন’। আমি উঠিলাম। ইহারা বলিলেন, ‘বসিয়া যাইতে পারিবেন না!’ আমি বলিলাম, ‘শুইয়াই যাইব’। অতঃপর গঙ্গাতীরে পৌছিলাম এবং বলিলাম, ‘আমাকে অন্তর্জলী করুন।’ তাঁহারা খাটপুত্র আমাকে গঙ্গায় নামাইলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম, ‘ও গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ।’ গঙ্গার হাওয়ায় আমার শরীর পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।”

কয়েকদিন যাবৎ ঠাকুর গাঙ্গালের বোল খাইতেছেন। উহাতে রক্তশোধন ও বিষের জ্বালা নিবারণ করিয়া শরীর ঠাণ্ডা করে। দিদিমাতা ঠাকুরাণী উহা সম্বন্ধে তৈয়ার করেন। ঠাকুর বলিলেন, “অজ্ঞ নিবেদন করিলে ৬জগন্নাথদেব আসিয়া প্রায় সমস্তই খাইয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে তিনি নানারূপে আশ্বস্ত ও দয়া না করিলে কি আর বাঁচি। তাঁর অপার করুণা।” দিদিমাতা ঠাকুরাণী শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

প্রিয়নাথের গান

বাইসারী নিবাসী প্রিয়নাথ ঘোষ বড় মিষ্ট গান করে। রাত্রে ঠাকুর করযোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, “প্রিয়নাথ, দয়া করিয়া একটি গান শুনাও।” প্রিয়নাথ বলিল, “গানের একটিমাত্র পদ জানি।” ঠাকুর বলিলেন, “তুমি যেটুকু পার গাও, তাতেই মধু বর্ষণ হ’বে।” প্রিয়নাথ গাইল :—

দেখ্লেম্ যত নারী ব'সে নীরে,
 নিয়ে সে কমলিনীরে,
 নীরে নিবারিছে আশি নীরে ।

কেহ নিয়ে যায় তুলসী, করে গদ্যজল,
 'রাই ম'ল', 'রাই ম'ল' ব'লে করে অন্তর্জল ;

কৃষ্ণ লাগি (যার) অন্তর জলে, কাজ কিরে তার অন্তর্জল,
 হরি হরি বল সকলে, কালে কি করিবে কিশোরীরে ।

কেহ বলে যায় গো ধনী, কেহ বলে আয় গো ধনী,
 কেহ দিচ্ছে হরিধ্বনি, ধনীর ধ্বনি আর কি শুনবে ফিরে ॥

বাজার ধার শোধ : বিষ-প্রয়োগকারীদের
 জ্বালা নিবারণের প্রার্থনা

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল ।

আজ বলিলেন, “প্রায় ১৫ আনা বিষ উঠিয়া গিয়াছে, বাহা আছে তাহা
 অতি অল্প এবং উহাও কফের সঙ্গে সঙ্গে নির্গত হইয়া যাইতেছে ।”

হরিদাসবাবু বোলপুর হইতে তারে ৬০০ টাকা ও রেজেষ্ট্রী করিয়া
 পণ্ডিত মহাশয়ের নামে ৪০০ টাকা, এই হাজার টাকা পাঠাইলেন ।
 বাজারের সমস্ত দেনা শোধ হইল । আজ চিনিওয়াল, দীনবন্ধু প্রভৃতি
 টাকা প্রাপ্তির রসিদ দিয়া গেল । সন্ধ্যার প্রাক্কালে হরেকৃষ্ণ পাণ্ডা, দীনবন্ধু
 পাণ্ডা প্রভৃতি অনেক লোক অষ্টাদশভুজা যোগমায়ার মূর্তি ‘কাচ’ (সং)
 সাজাইয়া ঠাকুরকে দেখাইতে আনিল । ঠাকুর উঠিয়া সরলনাথকে ভর
 করিয়া বারান্দায় গেলেন ও দর্শন করিয়া ২৫ টাকা দিলেন । সকলেরই
 খুব আনন্দ । ঠাকুর প্রার্থনা করিলেন, “আপনারা আশীর্বাদ করুন,
 আমাকে যে বিষ খাওয়াছিল, তাহার জ্বালা যেমন নিবারণ হয় ।”

সকলেই আশীর্বাদ করিলেন, “তাহাই হউক।” যোগমায়ার মূর্তি অতীব সুন্দর হইয়াছিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন দর্শন করিতেছিলেন, তখন পণ্ডিত মহাশয় দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর তাঁহার চোখে চোখ দিয়া অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন।

রাত্রিকালে চন্দনতালাও হইতে মন্দিরে মদনগোপাল বাইতেছেন, দর্শন করিলাম। অতি সুন্দর দৃশ্য—গজমোক্ষণ বেশ। গান গাইতে গাইতে বহুদীপালোকে চতুর্দিক আলোকিত করিয়া, চামরের বাতাস ও আরতি করিতে করিতে ঠাকুরের মন্দিরে পুনর্গমন দেখিতে কি মধুর!

পাণ্ডাদের আশীর্বাদ

১৯২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজারীদিগকে প্রতিশ্রুত ৫০০ টাকা দিলেন। ঠাকুরের শরীর অত্যন্ত খারাপ। খুব দুর্বল। সরলনাথ প্রভৃতি প্রাণ ভরিয়া সেবা করিতেছেন। দানকালে ঠাকুর ঘোড়হুস্তে বলিলেন, “আপনারা আশীর্বাদ করিবেন, যেন জগন্নাথদেবের দাসহুদায় হইয়া থাকিতে পারি।” পাণ্ডারা খুব প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। কোন কোন পাণ্ডাকে আজ মটকা দিলেন।

রাত্রি ১২।০টার সময় ঠাকুর যখন প্রস্রাব করিতে পায়খানায় যান, তখন সরলনাথ ও বেণী গান ধরিল :—

লম্পট নিরদয় হরি, দয়াময় বলে তোমায় কোন্ গুণে!

কেহ চন্দন দানে, বসুল রাজ সিংহাসনে,

আমরা প্রাণ দানে, স্থান পেলেম না ও চরণে ॥

গৌসাই পায়খানা থেকে ভাবাবেশে বিভোর হ'য়ে বল্লেন, “বেশ, আবার গাও।”

আজকাল প্রায়ই বেণীকে দিয়া এই গানটি শুনিতেছেন :—

চিরদিনের আমি গো তার, আমার প্রাণবন্ধু আমার ।

সে মুখ দেখিলে আমি ভুলে থাকি ত্রিসংসার ॥

সুন্দর কিছু দেখিলে, সুমিষ্ট কিছু শুন্লে,

ওঠে চম্‌কি প্রাণ কই সে আমার,

ঐ বুঝি এল বঁধু আমার ॥

গোপনে কি কথা বলে, (আমার) ভাসায় নয়ন জলে

সেই হতে প্রাণ বিকল আমার,

এখন কিরাতে পারি না যে আর ॥

না জানি কি গুণ ক'রে, ভুলায়ে রেখেছ মোরে ।

এখন দেখতে ইচ্ছা করে

না দেখলে, চোখে শুধু দেখি আধার ॥

“মালী, তুমি আমার চিরদিনের মালী” : “সোয়ার, তুমি
আমার চিরদিনের সোয়ার”

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল ।

আজ ইদিলপুর হইতে শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র রায় এবং চন্দ্রমোহন ঘোষ
৫৫০ টাকা ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুহ ও তাঁহার পত্নী শরৎসুন্দরী হাজার
টাকা পাঠাইলেন । আজ মোট ১৭০০ টাকা আসিল । মণিবাবুর নিকট
কলিকাতা যাইবার টীমার ভাড়ার জন্য তারে খবর গেল এবং ১৬০০
টাকা পাঠান হইল । ছয় মাসের জন্য হারিসন রোডের বাড়ী ভাড়ার
আদেশ গেল । বিধুবাবুকে শ্রীক্ষেত্রে আসিতে লেখা হইল । ইঞ্জিনিয়ার
স্বরেনবাবুর বাড়ী আজ নিমন্ত্রণ । বাসায়ও ঠাকুরের জন্ত প্রসাদ আসিল,
সমস্ত গৃহ চূণ দিয়া লেপাইলেন । বানরদিগকে বাহিরে খাবার দিতে

বলিলেন। বেণীর দ্বারা লাল নূতন কঞ্চল পায়খানার পর্দার জন্য আনাইয়া বলিলেন, “ইহাতে যেন জল, ময়লা প্রভৃতি না লাগে।” নরেন্দ্রের পার হইতে একটি তুলসী গাছ আনাইলেন। অশ্বিনী বেই তুলসী গাছটি নামাইল, অমনি ঠাকুর বলিলেন, “নরেন্দ্রের তুলসী গাছ, নরেন্দ্রেই যাইবে।” দিদিমাতা তখন নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই কথা ঠাকুর বলিলেন কেন ভাবিয়া দিদিমার একটু উদ্বেগ হইল।

ঠাকুর যাইবেন শুনিয়া শ্রীযুক্ত মহাপাত্র ও মালী সাক্ষাৎ করিতে আসিল। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিল, “আপনি যাইবেন শুনিয়া দেখা করিতে আসিয়াছি।” মালীকে ঠাকুর বলিলেন, “মালী, তুমি আমার চিরদিনের মালী, তুমি আমাকে চিরদিন ফুল দিবে।” মালী বলিল, “আমার পুত্রসন্তান নাই।” তাহাতে তিনি বলিলেন, “এবারই তোমার পুত্র হইবে।” সোয়ারকে ঠাকুর বলিলেন, “সোয়ার, তুমি আমার চিরদিনের সোয়ার। তুমি আমাকে চিরদিন মহাপ্রসাদ দিবে। তোমার ছেলে বড় সোয়ার হইবে।” দিদিমা নিকটে দাঁড়াইয়া এ সকল শুনিতেছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “মাতৃদোষে ছন্নতা! চলে যাচ্ছেন, চিরদিন আবার মহাপ্রসাদ কি করিয়া দিবে? তবে কি আমাদের বিদায় করিয়া দিয়া এখানে থাকিবেন?” দিদিমা বলিলেন, “এই চিন্তায় তাঁহার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।”

অশ্বিনী ও জগবন্ধুবাবুর বিবাদ মীমাংসা : ঠাকুরের

আশার বাণী

আজ বৈকালে অশ্বিনী ও জগবন্ধুবাবুতে ঝগড়া হয়। ঝগড়া একটু বেশী পরিমাণ হইয়াছিল। ঠাকুর আহারের সময়ে সমস্ত অস্পষ্টরূপে শুনিয়াছিলেন। রাত্রি ৯টার সময়ে ব্রহ্মচারীকে ঘুম হইতে তুলিয়া ঠাকুর

অশ্বিনী ও জগবন্ধুবাবুর বগড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত গুনিয়া ক্লেণ করিতে করিতে পায়খানায় গেলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় জগবন্ধুবাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, “তোমরা নাকি আজ বড় বগড়া করিয়াছ? অশ্বিনীকে নাকি মারিতে উত্তত হইয়াছিলে? আমি ইহাতে বড়ই মর্শাস্তিক ক্লেণ পাইয়াছি। তোমাদের নিজেদের ভিতর সন্ডাব না দাঁড়াইলে কিছুই হইবে না।” এই বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, “এইমাত্র জগন্নাথদেব প্রকাশ হইয়া বলিলেন, উহাদের সকলকে জানাইয়া দেও—রাগ বড় চণ্ডাল। রাগ হইলে যিনি রাগিবেন, তখনই তিনি যেন অন্ত্র চলিয়া চান। আর তুমি ইহাদের হইয়া ক্ষমা চাও।” এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জগবন্ধুবাবুর নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন, “তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।” এই সময় জগবন্ধুবাবু, ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিবাদের ঘটনা বলিতে উত্তত হইলে, ঠাকুর বলিলেন, “আর বলায় দরকার নাই। আমার শরীর অশুশ্ব, আমি সব জানি।” জগবন্ধুবাবু বলিলেন, “এ সামান্য বগড়া, এরূপ আরও কত হইয়াছে। তবে আমার অন্তায় হইয়াছে জানিয়া আমি ক্লেণ পাইয়াছি। আমি অশ্বিনীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতেছি।” এই বলিয়া উঠিতে উত্তত হইলে, অশ্বিনী আসিয়া জগবন্ধুবাবুর পায়ের ধুলা নিলেন, জগবন্ধুবাবুও প্রতিনমস্কার করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “তোমরা একে অত্বে ক্ষমা করিয়া মন পরিষ্কার করিয়া, একবার উভয়ে উভয়ে আলিঙ্গন কর, আমি দেখি।” অশ্বিনী ও জগবন্ধুবাবু পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন।

ব্রহ্মচারীর নিকট গুনিলাম, ঠাকুর বলিয়াছেন, “তোমাদের ভার আমি জগন্নাথদেবের উপর দিলাম। তিনিও তাহা অঙ্গীকার করিলেন।” জগবন্ধুবাবু বলিলেন, “আমাদের চিন্তের এরূপ হৃদিশা কি যাইবে না?” ঠাকুর সতেজে বলিলেন, “নিশ্চয় যাইবে। তোমরা সকলেই শান্তি পাইবে।

তবে উহা কিছু সময়সাপেক্ষ। এই সাধন যাহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা ই শান্তি পাইবেন। গীতাখানা ভালরূপ পড়িলেই আমাদের সাধনের সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়। স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যে 'নাম' অভ্যাস করিতে হয়।"

পরে আপনা আপনি দুইটি পরলোকবাসী আত্মার প্রতি বলিলেন, "এখন সাধন পাইতে আসিয়াছ? যখন এ পৃথিবীতে সাধন হচ্ছিল, তখন কোথায় ছিলে? তুমি এমন দুষ্কর্ম করিয়াছ, আবার সাধন? নরকে ডুবিয়া পচিয়া পচিয়া বহুজন্মে সদগতি পাইবে।" অশ্রুটিকে বলিলেন, "তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ বটে, কিন্তু আমার শরীর অসুস্থ।"

সরলনাথ ও ব্রহ্মচারী বহুক্ষণ তৈল জল মালিশ করিয়া দিল। পরে ব্রহ্মচারী অবসন্ন হইয়া কতক সময় তন্দ্রাবেশে ছিল। ঠাকুর সরলনাথের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "আমি নিশ্চয় বলছি সমস্ত শীতল হইয়া যাইবে।" সরলনাথ ইহা শুনিয়া কৃতার্থ হইলেন। সরলনাথের নিকট শুনলাম, ঝগড়ার বিষয় কথোপকথনের সময়ে কেহ কেহ জগবন্ধুবাবুকে তুচ্ছ করিয়া কথাবার্তা বলিতেছিল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "জগবন্ধুকে তোমরা সামান্য ভাবিও না। দেখ, শ্রীকৃন্দাবনে গোবিন্দজী, গোপীনাথ ও মদনমোহন ঠাকুর স্বপ্নে ইহার নিকট খাবার চাহিয়াছিলেন, যে-সে লোকের নিকট কি ইহার চান? ইনি সাধনের একটি উৎকৃষ্ট অবস্থা পাইয়াও পাইতেছেন না; তজ্জন্ত ইহার প্রাণ সর্বদাই তপ্ত খোলার মত হইয়া আছে। লোকে কোন কথা বলিলে সহ্য করিতে পারেন না, চটিয়া উঠেন।"

শ্রীশ্রীনিত্যধামে মহাপ্রয়াণ

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

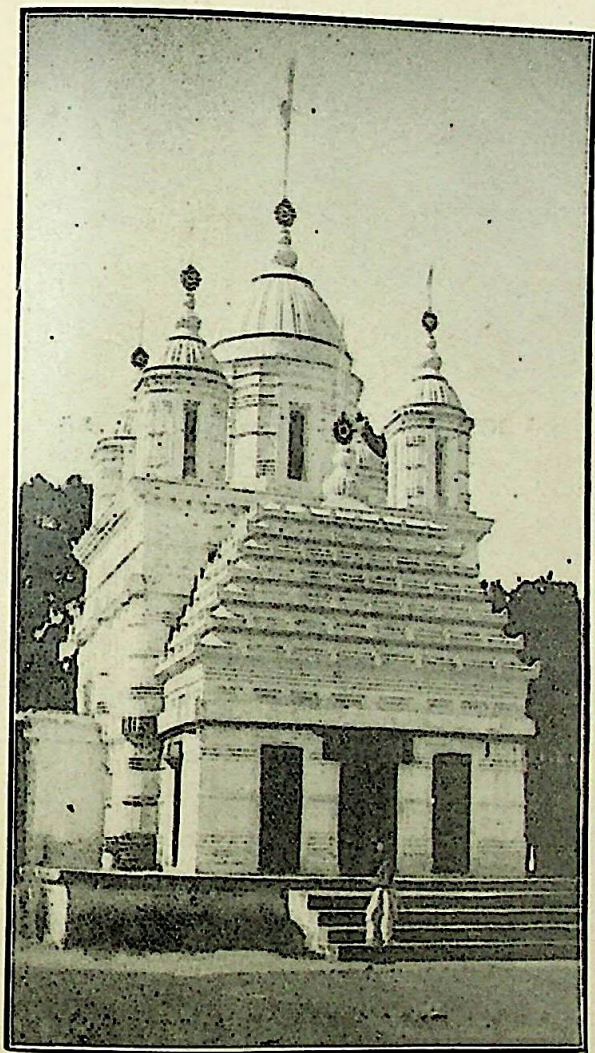
ভোরে ডেপুটী শশীবাবু আসিলেন। ঠাকুরের শরীর বড়ই অসুস্থ। শশীবাবুকে বলিলেন, "আপনি আবার আসিয়াছেন কেন? আপনার

ছেলে যখন নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে, তখনই ত হইয়াছে !” ঠাকুর এ সময় তাঁহাকে সম্মেলনদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, “দেখুন, আর এখানে সাধুদের কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না। প্রসাদ কখনও যার-তার হাতে থাইবেন না। যদি সাধুর নিকট থাইতে হয়, জগৎবাবুর পরিচিত শ্রীরামদাস মঠের ঐ সাধুটির নিকটে যাইবেন। আপনি অতি সজ্জন; ইহা-দিগকে সম্মান করিয়া বিপদে পড়িতে পারেন, তাই বলিলাম।” শশীবাবু কাদিয়া ফেলিলেন এবং ঠাকুরকে আসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল, শশীবাবুকে ঠাকুর আজ কৃপা করিলেন। শশীবাবু পরে বলিয়াছেন, “অতঃপর শ্রীমন্দিরে যাইয়া কেবল গোসাইকে চক্ষে পড়িতে লাগিল।”

আজ পাখ্যানায় অনেকক্ষণ রহিলেন। যাতনায় অব্যক্ত ক্লেশহৃৎক শব্দ করিতে লাগিলেন। ভিক্ষা নেকড়া চাহিলেন। ঘরে আসিয়া বলিলেন, “মেজেতে কাপড় পাতিয়া দাও।” আসনে আসিয়া সটান হইয়া ওইয়া পড়িলেন। অজ্ঞান। সরলনাথকে ডাকিলাম। সরলনাথ, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলেই ক্রমে ক্রমে আসিতে লাগিল। দুই প্রহরে অতি ক্লেশে ‘হরি হরয়ে নমঃ’ এই কীর্তন করিয়া একটু জ্ঞান হইলে ঔষধ দেওয়া হইল। তিনটার সময় অর্দ্ধ পরিমাণ ঔষধ অতি ক্লেশে খাওয়ান হইল। রাত্রি আন্দাজ ৮।০টার সময় দিব্যজ্ঞান হইল। ব্রহ্মচারীর নিকট ঔষধ চাহিয়া থাইলেন। ডাবের জল, মহাপ্রসাদের আমানি জল ও বোল চাহিয়া থাইলেন। ‘জগবন্ধু’ বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন। তিনি নিকটে আসিলে বলিলেন, “আজ আমার নিকট থাকিও।” এই সময় পুনঃপুনঃ ঘড়ীতে ক’টা বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।

মুন্সেফ্‌বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন আছেন?” ঠাকুর বলিলেন, “ভাল আছি। মাথাটা ধরিয়া আছে।” মুন্সেফ্‌বাবু বলিলেন, “আজ

চা খান নাই ; একটু চা খান ।” তিনি বলিলেন, “তবে একটু (light) পাতলা করে আনুন ।” মুন্সেফবাবু অমনি দোতালার শাস্তিদিদির ঘরে চা করিতে গেলেন । মুন্সেফবাবুর বহুদিনের ইচ্ছা ছিল, ঠাকুরকে নিজ হাতে চা করিয়া খাওয়ান । চা আসার পূর্বেই ঠাকুর আসন ত্যাগ করিয়া মাটিতে বালিস ঠেসান দিয়া বসিলেন, মুন্সেফবাবু চা আনিলেন । নারিকেলের মালায় চা দেওয়া হইল । তাই অল্প অল্প দুই-বার পান করিলেন । পরে কাহাকে যেন প্রকাশিত দেখিয়া অহুমতি লইলেন এবং মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিতে করিতে ২২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, রেবতী নক্ষত্রে কৃষ্ণ দ্বাদশী তিথিতে (সাবিত্রী ত্রতের দুই দিন পূর্বে) রাত্রি ৯টা ২০ মিনিটে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে চোখের জলে ভাসাইয়া শ্রীশ্রীনিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন । আমাদের সমস্ত আশা ফুরাইল ।



গোস্বামী প্রভুর সমাধি-মন্দির—পুৰীধাম

পরিশিষ্ট

৩পুরীতে শেষ সময়ের দৈনন্দিন কার্য

ঠাকুর ভোর ৩০টার সময় উঠিয়া পায়খানা হইতে আসিয়া প্রায় ৪টার সময় হোম করিতেন। ব্রহ্মচারী অগ্নিতে আহুতি দিত; ঠাকুর মন্ত্রপাঠ করিতেন। এ সময়ে টবে রোপিত তুলসী বৃক্ষ গৃহে আনিয়া আসনের নিকট রাখা হইত। তৎপরে তিনি নিজে করতাল বাজাইয়া ভোরের আরতি গান করিতেন

আরতির গান :—

১। হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ গাও রে।

গাও শ্রীমধুসূদন, যশোদানন্দন, গোপীজনবল্লভ প্রাণারামে ॥

২। বৃন্দা বিপিনে, মঙ্গল আরতি, হের রে নয়ন আনন্দে।

মঙ্গল আরতি হোতেছে নাচিছে সখীবৃন্দে।

কুঞ্জ কুঞ্জ হইতে ধাইছে সবে, হেরিতে শ্রীগোবিন্দে ॥

পরে বৃন্দাবনের ঠাকুর সকল ও প্রসিদ্ধ স্থানাদির 'জয়' উচ্চারণ করিয়া, চারি সম্প্রদায়ের চারিধামের ও সমস্ত সাধুসজ্জনগণের জয় দিয়া কীর্ত্তন সমাপণ করিতেন। 'জয়' ধ্বনি, যথা :—

শ্রীবৃন্দাবন কি জয়, গোপেশ্বর মহাদেব কি জয়, গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন কি জয়, কেশীঘাট কি জয়, দ্বাদশ আদিত্য টীলা কি জয়, রাধা-কুণ্ড শ্রামকুণ্ড কি জয়, গিরি-গোবর্দ্ধন কি জয়, বিশ্রামঘাট কি জয়, কেশবজী কি জয়, গোবর্দ্ধন কি জয়, বৃন্দাবনবাসী সাধুভক্ত বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়।

বড় রাস্তায় পাখীদিগকে চাউল জল দেওয়াইতেন। ভোরে বানর আসিলে তাহাদিগকে ছোলা, কলা, আম প্রভৃতি এবং দাউজি, পুষ্টি, প্রভৃতি ছেলেরা আসিলে তাহাদিগকে মিষ্ট মহাপ্রসাদ দেওয়াইতেন।

এই সময় একটি প্রকাণ্ড বণ্ড আসিত, তাহাকে চাউল, কলা, মুড়কি, খাজা ইত্যাদি খাওয়ান হইত। সকালে কখন কখন শান্তিদিদি, জগবন্ধুবাবু, দিদিমা ও দাদাগোঁসাই আসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তা হইত।

ছয়টার সময় পায়খানা বাইতেন। ৬।৪৫ মিনিটে পায়খানা হইতে আসিতেন। মুখ ধুইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিতেন ও টবের তুলসী গাছে জল দিতেন। ঐ বৃক্ষের নীচে চড়ুই পাখীদিগকে চাউল ছড়াইয়া দেওয়াইতেন।

পরে পূজা, বথা :—

১। জগন্নাথদেব, বলদেব ও সুভদ্রামায়ীর পদতলে এক একটি সচন্দন তুলসী পত্র দিতেন। পশ্চাৎ ‘অন্নরা’ ও ‘কুন্দ’ ফুল দিয়া সাজাইতেন (অন্ন ফুলে নহে), কখন কখন কেতকী পুষ্পও দিতেন। বসন্ত পঞ্চমী ও দোলের সময় ‘আবীর’ ও আত্র মুকুল দিতেন।

২। বালকৃষ্ণ বস্ত্র। একটি সচন্দন তুলসীমঞ্জরী চরণে দিতেন। পরে অন্নরা ও কুন্দ ফুল দিয়া সাজাইতেন। বিশেষ বিশেষ তিথিতে কাঠের মন্দির দু’টির দরজার সম্মুখে প্রথমতঃ তুলসীমঞ্জরী পরে ফুল দিতেন।

৩। আসনের দক্ষিণপার্শ্বস্থ চৌকির গ্রন্থ সকলের ঢাকনি বস্ত্র উঠাইয়া, উহাতে চন্দনের ছিটা দিতেন। অতঃপর আসনের গ্রন্থ সকলের মধ্যে রক্ষিত ঘড়ীতে চাবি দিতেন। তৎপশ্চাৎ উহা ঢাকিয়া রাখিয়া জগন্নাথদেবের একখানা ‘দন্তকাঠে’ সচন্দন তুলসী পত্র দিতেন। একখণ্ড জগন্নাথদেবের বস্ত্র (যাহা তিনি মাথায় বাঁধিতেন এবং যাহা দেহত্যাগের পর মাথায় পাগড়ীর আকারে দেওয়া হইয়াছিল) পূজা করিতেন।

(৪) অগ্ন্যগ্ন গ্রন্থে ও গ্রন্থসাহেবে সচন্দন তুলসী পত্র ও পুষ্প দিতেন।

(৫) নাগাজীর শ্রীকৃষ্ণের পটে পদপ্রান্তে একটি সচন্দন তুলসী দিতেন।

(৬) তুলসী পূজা—তুলসী বৃক্ষমূলে পুষ্প দিতেন। দেহত্যাগের অন্ত কয়েকদিন পূর্বে, এ সকল পূজা আমাকেই করিতে বলিয়াছিলেন।

পূজা শেষ হইলে ঐ চন্দন দ্বারা নিজে তিলক করিতেন। কখন কখন একটি সচন্দন তুলসীও মস্তকে দিতেন।

প্রায় আটটার সময় 'চাঁ' দেওয়া হইত। ঐ সময়ে মুড়কি, খাজা কিম্বা অন্য কোন মিষ্ট মহাপ্রসাদ ও ঘরের তৈয়ারী অন্ন ফীর প্রসাদ পাইতেন। ঘরের তৈয়ারী অন্য জিনিষও কখন কখন দেওয়া হইত।

নয়টার সময় পাঠ আরম্ভ হইত। অমৃত পাঠ করিতেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রার্থনা, বাঙ্গালা শ্রীমদ্ভাগবত, কখন কখন উপদেশসংগ্রহ ও অন্য গ্রন্থও পাঠ হইত। তৎপরে ঠাকুর নিজে 'গ্রন্থ সাহেব' ও সংস্কৃত অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিতেন। ১১টার সময় তিলকাদি করিয়া ঔষধ সেবনের পরে 'পাঁকাল প্রসাদ' (মহাপ্রসাদের পান্ডাভাত) পাইতেন। উহার সঙ্গে লেবু, হুন, পুরাতন তেঁতুল দেওয়া হইত। মন্দিরের বালভোগের দহি, মুড়কি সরভাজা কখন কখন সরলনাথ আনিয়া দিত। ফল, মূল, ডাব ও যাহা জুটিত দেওয়া হইত। পাখীদিগকে জল ও চাউল এই সময়ও দেওয়াইতেন। ব্রহ্মচারী নিকটে থাকিয়া পাখা করিত।

দেড়টা হইতে শ্রীযুক্ত পান্নালাল ঘোষ কালীপ্রসন্ন সিংহের বাঙ্গালা মহাভারত, জৈমিনী ভারত, হরিবংশ ইত্যাদি পাঠ করিতেন। কখন কখন নিজেও পাঠ করিতেন। তৎপরে কিছুকালের জন্য কথাবার্তা হইত কিম্বা সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন। অধিনী এই সময় কখন কখন জটা বাছিত।

তিনটার সময় প্রশ্নাবাদি করিতে গমন করিতেন। পরে ঔষধ সেবনান্তর লেবু অথবা পুরাতন তেঁতুলের সরবৎ খাইতেন। ইহার পর মহাপ্রসাদ আহাৰ করিতেন। সেই সঙ্গে কিছু ঘন দুধ খাইতেন। বানরদিগকে মহাপ্রসাদ দিতেন। পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধর্ম্মালোচনা ও কথাবার্তা হইত। পরে মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া আসনে বসিতেন। এই সময় আমরা প্রদীপ জালিয়া, ধুতুটিতে ধূপ, ধূনা, গুগ্গুল, নবঙ্গ, কপূরাদি

জালাইতাম। উহা সমস্ত ঘরে দেওয়া হইত। পরে সন্ধ্যা-কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। সাধারণতঃ এই গানগুলি গীত হইত :

১। হরিষে লাগি রহরে ভাই।

তেরা বনত বনত বনি যাই ॥

অকঁ। তারে, বক্রা তারে, তারে স্মৃজনকে সাই।

শুয়া পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মৌরাবাদি ॥

দৌলত হুনিয়া মাল খাজানা, বেনিয়া বয়েল চচাই।

এক বাত্‌মে টাণ্ডা লাগে, খোজ খবর নেহি পাই ॥

এয়সা ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই।

সেবা বন্দন, আউর অধীনতা সহজে মিলয়ে গৌসাই ॥

২। প্রভুজি এয়সা নাম তৌহার।

পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার, সকল করত নমস্কার।

জাত বরণ কোই পুছত নেহি। যাচত চরণারাবার

সাধুসঙ্গ নানক বুধ পাই। হরিকীর্ত্তন জীউ আধার।

৩। সদাই হরিবোল, হরিনামের নাই তুলনা।

(নামে) অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে।

(তারে) যমদূতে ছুঁতে পেল না ॥

যদি বিষয়েতে স্থখ হ'ত রে (ওরে অবোধ মন রে আমার

কিসে ভুলে র'লিরে, দিন ত বয়ে গেল রে।)

(তবে) লালাজী ফকির হ'তো না ॥

(নামে) মহাপাপী ত'রে গেল রে।

(আহা) অপার নামের মহিমা ॥

৪। নাচে আর হরি বলে গৌর-নিতাই

(আমার) গৌর, নিতাই নাচে অঈশ্বর গৌসাই (হরিবোল বল রে)



শ্রীযুক্ত কলদানন্দ ব্রহ্মচারী

(আহা) এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখি নাই।

তারা যেচে প্রেম বিলায় রে, তারা জ্বাভের বিচার করে না রে,

তারা আচণ্ডালে হরি বলায়, এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখি নাই।

৫। তোরা কে নিবি লুঠ, লুঠেনে নিতাই টাদের প্রেমের বাজারে।

হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হয়েন শ্রীচৈতন্য, মুন্সিগিরি

দিলেন অধৈতরে।

হরিদাস খাজাঞ্চি হ'য়ে লুঠ বিলালেন নগরে (সবারে)

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁরা ভাবে নিরস্তর, ধ্যান করিয়ে না পেল বাহারে।

নারদ মুনি মগ্ন হ'য়ে বীণাযন্ত্রে গান করে। (হরিবোল বলে রে)

রাত্রি ৯০টার সময় কিঞ্চিৎ মিষ্ট (খাজা কি গজা) মুখে দিয়া ঔষধ

সেবন করিতেন। ১০।১০০টা পর্যন্ত সাধারণতঃ ধ্যানস্থ থাকিতেন।

ব্রহ্মচারী এ সময় হইতে সারারাত্রি জাগ্রত থাকিয়া ঠাকুরের প্রয়োজন

মত সেবা করিত। শেষকালে সরলনাথ ১১টা হইতে ২৩টা পর্যন্ত

জাগিয়া সেবা করিত, বেণীও সাহায্য করিত। ১২টার সময় প্রশ্নাবাদি

করিয়া ঔষধ সেবন করিতেন। এই সময় সামান্য মিষ্ট মুখে দিতেন।

ঔষধ অত্যন্ত তীব্র হওয়ায় ইহার প্রয়োজন হইত। ১টা হইতে ৩০টা

পর্যন্ত ধ্যানস্থ থাকিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার আদৌ নিদ্রা ছিল না।

কখন কখন ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সহিত কথাবার্তা বলিতেন। ৩০টার

পায়খানা বাইতেন। পায়খানায় ২ ঘণ্টা জল, বসিবার চৌকি, তাহার

নীচে বালি দ্বারা অর্ধ পরিপূর্ণ একটি টব, পার্শ্বে মাটি দ্বারা অর্ধ পরিপূর্ণ

আর একটি টব রাখা হইত। উপরে দড়িতে গামছা রাখা হইত। পরে

মুখ ধুইয়া কোপীন বহির্কাস উভয়ই পরিবর্তন করিতেন।

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীমদগুরু সঙ্ক

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের

দেহাশ্রিত অবস্থার ৭ বৎসরের (১২২৩-২২ সাল) অলৌকিক ঘটনাবলী
শ্রীচরণাশ্রিত নিত্যসেবক শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী সংগৃহীত।

সাধন-সমস্তার চূড়ান্ত মীমাংসা। এই পুস্তকে সত্যরক্ষা ও বীৰ্য্যধারণের
জলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বীৰ্য্যধারণ করিতে হইলে, নানা প্রলোভনে
সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়া তপস্বী করিতে হয়, তাহা বিশদভাবে
বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একাধারে উপনিষদ ও উপন্যাস। ঋষিগণের সারগর্ভ
বাক্যাবলী ব্রহ্মচারীজী জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন।
উচ্চ আদর্শকে দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে এত সহজ ও স্বথপাঠ্য করা
হইয়াছে যে, পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।

সকল পথের, সকল মতের সামঞ্জস্য করিয়া, মনুষ্যত্বলাভের পথ
দেখাইয়াছেন। গুরুর দয়া, শিষ্যের উদ্ধত্যা; গুরুর আদেশ, শিষ্যের
আনুগত্য দেখাইয়া গুরুর মাহাত্ম্য প্রকট করা হইয়াছে।

মহাপুরুষগণের ও নানাস্থানের চিত্রে সুশোভিত

প্রথম খণ্ড (১২২৩) ১।০। তৃতীয় খণ্ড (১২২৮) ২।

দ্বিতীয় খণ্ড (১২২৭) ১।০। চতুর্থ খণ্ড (১২২৯) ২।

পঞ্চম খণ্ড (১৩০০) ২।০।

"BRAHMACHARI KULADANANDA"

Vol. I

(Early life and training under Bijoykrishna)

By

Dr. B. M. Barua, D. Lit, (London)

With a foreword from

Sir Sarbapalli Radhakrishnan.

Price Rs. 5

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগোরাঙ্গসুন্দর তা। ২০নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড

শ্রীবিখনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠাকুরবাড়ী, পুরী

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।





